রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে হবস, লক ও রুশো: তুলনামূলক বিশ্লেষণ
[Hobbes, Locke and Rousseau on the Origin and Nature of the State: A Comparative Analysis]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি.
ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মন্দিরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০২/২০১৮-২০১৯
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৪৯/২০২২-২০২৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে হবস, লক ও রুশো: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

[Hobbes, Locke and Rousseau on the Origin and Nature of the State: A Comparative Analysis]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি.
ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মন্দিরা চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ০২/২০১৮-২০১৯
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৪৯/২০২২-২০২৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০২৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
দর্শন বিভাগ

অনুমোদনপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, *রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে হবস, লক ও রুশো: তুলনামূলক বিশ্লেষণ* [Hobbes, Locke and Rousseau on the Origin and Nature of the State: A Comparative Analysis] শিরোনামে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এটি মন্দিরা চৌধুরীর একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সকল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ইতোমধ্যে অন্য কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/গবেষণাকর্ম বা এ জাতীয় কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়নি ।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি আমার একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. হারুনার রশীদ, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় অন্যান্য উৎস থেকে সংযোজিত তথ্যের তথ্যসূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটি আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ কোনো অংশই ডিপ্লোমা বা ডিগ্রির জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়নি।

মন্দিরা চৌধুরী
পিএইচ.ডি. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আমি সর্বপ্রথম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড.এ.কে.এম. হারুনার রশীদের প্রতি, যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক নূরুজ্জামানকে, যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত সাম্প্রতিক গবেষণাকর্ম, গ্রন্থ, মূল্যবান পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের পথকে সুগম করেছে। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী ও অধ্যাপক ড. নাঈমা হকের প্রতি, আমাকে এ কাজে অব্যাহত সাহস ও সমর্থন প্রদানের জন্য। এছাড়াও দর্শন বিভাগে আমার শিক্ষকমণ্ডলী ও সহকর্মীবৃন্দ এ কাজ সম্পন্ন করতে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. সালমা চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন এবং সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. সঞ্চিতা গুহকে, যারা এ কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় যে সকল দেশি-বিদেশি লেখক ও দার্শনিকের গ্রন্থ, প্রবন্ধ, পত্রপত্রিকার সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অভিসন্দর্ভের যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্ধৃতিতে লেখক ও দার্শনিকবৃন্দের নাম, গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম, পত্রপত্রিকা এবং অনলাইন ডকুমেন্টসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও দর্শন বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি (দেবস্মৃতি পাঠাগার)-এর কর্তৃপক্ষ গবেষণা কাজে আমাকে আন্তরিক সহেযোগিতা করেছেন। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে এবং গভীর কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করছি আমার পিতা এবং মাতাকে, যারা আমার জীবনের আলোকবর্তিকা এবং আমার চিন্তাকে শাণিত করেছেন। ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্বামী ও সন্তানের প্রতি যারা আমার অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

পরিশেষে, কম্পিউটার কম্পোজ করার ক্লান্তিকর কাজটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সম্পন্ন করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন দর্শন বিভাগের উচ্চমান সহকারী জনাব রাজীব কুমার মণ্ডল। তার প্রতি রইলো আমার অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মন্দিরা চৌধুরী
পিএইচ.ডি. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র মানুষের পারস্পরিক রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতার ফসল। সমাজজীবনের উপযোগিতা এবং বাস্তব প্রয়োজনেই মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র জনগণকে দিয়েছে রাজনৈতিক চেতনা, সার্বভৌম ক্ষমতা, জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য এবং অধিকারের রাজনৈতিক স্বীকৃতি। এ স্বীকৃতি ব্যক্তিকে নাগরিকে পরিণত করে এবং তাকে আইনগত ও রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতন করে তোলে। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রথম রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রাক-রাজনৈতিক জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করে। আধুনিককালের চুক্তিবাদী রাষ্ট্রদার্শনিক হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), লক (১৬৩২-১৭০৪) ও রুশো (১৭১২-১৭৭৮) তাদের সামাজিক চুক্তি মতবাদে এ বিষয়ে একমত। তবে রাষ্ট্রের স্বরূপ, সরকারব্যবস্থার ধরণ, সার্বভৌমের প্রকৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, অধিকার, সমতা, স্বাধীনতার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি এসব বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা রয়েছে।

রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় অবাধ স্বাধীনতা ভোগকারী মানুষ স্বেচ্ছায় স্বীয় স্বাধীনতা সংকুচিত করে রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে এবং নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। রাষ্ট্র মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কী ধরণের পরিবর্তন সাধন করেছে এবং কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে তার রাষ্ট্রদার্শনিক অনুসন্ধান এ গবেষণাকর্মে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রাষ্ট্র মানুষের জীবনে রাজনৈতিক ক্ষমতার উন্মেষ ঘটায়। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি মূলত কর্তৃত্বমূলক। রাষ্ট্রের স্বরূপ অনুসন্ধানে দেখা যায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমূলক ভূমিকা একে টিকে থাকতে সাহায্য করে। তবে রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা সর্বদা দমনমূলক বা নির্যাতনমূলক নয়। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, সংহতি, স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে রাষ্ট্রকে যেমন কঠোর হতে হয়, আবার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে যেন ক্ষোভ, বিদ্বেষ, অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে না পারে সে লক্ষ্যে কল্যাণমূলক ভূমিকা রাখা জরুরী।

রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি জনসম্মতি যুক্ত হয়ে রাষ্ট্রের বৈধতা তৈরি হয়। আধুনিক চুক্তিবাদী দার্শনিকগণ কমবেশি কর্তৃত্ববাদকে সমর্থন করেছেন রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, জাতীয়তাবাদ ও জননিরাপত্তা রক্ষার্থে। তবে রাষ্ট্র যদি এ সকল বিষয়ে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়ে কেবল পীড়নমূলক হয় সেক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত বিদ্রোহের অধিকারকে তারা সমর্থন করেছেন। কিন্তু এ বিদ্রোহ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়; রাজনৈতিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, বণ্টন ও স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে একপ্রকার ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য।

এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে অবাধ স্বাধীনতাভোগকারী মানুষের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। চুক্তিবাদীদের এ আলোচনা থেকে জানা যায় রাষ্ট্র সৃষ্ট্রির পূর্বেও আইনের উপস্থিতি এবং মানুষের অধিকার ছিল, যা প্রাকৃতিক আইন এবং প্রাকৃতিক অধিকার নামে পরিচিত। এসকল আইন পরবর্তীতে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল আইন তথা রাজনৈতিক আইন সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। প্রাকৃতিক অধিকারের রাজনৈতিক অধিকারে রূপান্তর দ্বারা ব্যক্তি-অধিকার ও নাগরিক অধিকার অধিকতর সুসংবদ্ধ হয়েছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে আইন ও অধিকার যথাযথ ও পর্যাপ্ত ছিল না বিধায় রাজনৈতিক আইনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। নাগরিকের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র অধিক সক্রিয় হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বলপ্রয়োগ ব্যতীত স্বীয় ইচ্ছা ও প্রয়োজনে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সম্মত হয়। রাষ্ট্র সৃষ্টির পশ্চাতে মানুষের উদ্দেশ্য ছিল উন্নততর জীবনের অনুসন্ধান, স্বীয় নিরাপত্তা প্রাপ্তি, ব্যক্তিগত স্বার্থের সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজনে সামষ্টিক স্বার্থকে সমন্বিতকরণ।

আত্মস্বার্থবাদী ব্যক্তির চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক জীবনে পর্দাপণের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। রাষ্ট্র কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা, ব্যক্তিস্বার্থের সংরক্ষণ রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ হওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা,

Dhaka University Institutional Repository

সামষ্টিকতাবোধ, নৈতিকতার গাঁথুনি সুস্থ রাজনৈতিক সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও নাগরিকের পরস্পরের প্রতি রাজনৈতিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা ও আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চম অধ্যায়ে সরকারব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনায় চুক্তিবাদীদের কাছে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়নি। যদিও জনসম্মতিতে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন এবং সরকার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে তারা জনসমর্থনকে সংযুক্ত করেছেন। সরকার ও নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়ে চুক্তিবাদীগণ সরকারের কর্তৃত্ববাদী আচরণকে সমর্থন করেননি। তাদের সরকারব্যবস্থার ভিত্তি লোকায়ত রাষ্ট্রচিন্তা, কোনো ধর্মভিত্তিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য দ্বারা তারা সরকার পরিচালনা করেননি। সরকার এবং আইনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক দৃশ্যমান। তারা সরকারের ধরণ অপেক্ষা জনগণের অধিকার, নিরাপত্তা, সম্পত্তির সুরক্ষার মতো বিষয়াবলীর প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। ইহজাগতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ধর্মীয় ভিত্তি ব্যতিরেকেও তাদের রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতার প্রকাশ ঘটেছে ভিন্নরূপে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সার্বভৌমের কর্তৃত্ববাদী অবস্থানকে মূল্যায়ন করা হয়েছে শাসকের দূরদর্শিতা, জনগণের মঙ্গলচিন্তা এবং রাষ্ট্রের জাতীয়তবাদী ধারাকে অব্যাহত রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে। রাষ্ট্র, শাসক ও নাগরিকের নৈতিক আদর্শবাদিতার ধারাও বিবেচনায় আনা হয়েছে। জনসম্মতির দ্বারা সার্বভৌমের কর্তৃত্ববাদী আচরণ বৈধতাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ জনসম্মতি ভয় থেকে উৎসারিত নয়, জনপ্রত্যাশার পরিতৃপ্তি বিধান এ সম্মতির বৈধতা উৎপাদন করে এবং সার্বভৌম ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমূলক আচরণকে গ্রহণ করে নেয়। সপ্তম অধ্যায়ে অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতার মাত্রাগত ভিন্নতার পরিচয় মেলে চুক্তিবাদীদের কাছে। এ তিন বিষয়কে স্বতন্ত্রভাবে বিচার বা উপভোগ সম্ভব নয়। এগুলো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তির অধিকার, সাম্য ও স্বাধীনতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, আবার রাষ্ট্র ও নাগরিকের বৃহত্তর স্বার্থে, সামষ্টিক কল্যাণের স্বার্থে এতে হস্তক্ষেপও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে সম্পত্তিতত্ত্ব ও ব্যক্তিমালিকানার ধরণ পর্যালোচনায় বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিছবি স্পষ্ট। পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তিশালীকরণের অব্যাহত রাষ্ট্রদার্শনিক প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তবে রুশোর দর্শনে এর পাশাপাশি সামষ্টিক স্বার্থের সংরক্ষণে বিশেষ প্রচেষ্টাও দৃশ্যমান।

যে যুদ্ধ পরিস্থিতি, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল, তার কি কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে? আধুনিককালে রাষ্ট্র জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে এবং সমতা ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানে কতদূর সফল হয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধংদেহী মনোভাব, সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য, স্বাধীনতার অপব্যবহার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি সমস্যাসমূহ আজো অব্যাহত রয়েছে। যদিও উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বাংলাদেশের সৃষ্টি তবুও স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিতে বিদেশি শক্তির প্রভাব, সক্রিয় নাগরিকতার অনুপস্থিতি, রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার, প্রকট সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য, নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব বর্তমানে সংকটগ্রস্থ। এসব বিষয়কে সামনে রেখে সর্বশেষ অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক চুক্তির প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। সামাজিক চুক্তি সম্পর্কে চুক্তিবাদীদের চিন্তার পর্যালোচনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আবহে বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক তা এ অধ্যায়ে আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে ওঠে এসেছে। লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের শাসন, সামাজিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও উন্নততর জীবনের অন্বেষণে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটলেও সে রাষ্ট্র প্রকৃতবিচারে জনবান্ধব ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে পারছে কিনা, অধিকাংশ গণমানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে কিনা এসব বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্র কি পূর্ণরূপে বুর্জোয়া চরিত্র পরিগ্রহ করবে নাকি মানবিক কল্যাণরাষ্ট্রের ধারায় আবর্তিত হবে সে সিদ্ধান্ত বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে নাগরিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা প্রয়োজন। লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সক্রিয় নৈতিক মূল্যবোধের সংযোগ

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রকে অধিকতর স্থিতিশীল, কার্যকর, মানবিক গুণসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তার অন্বেষণে রাজনৈতিক-নৈতিকতার প্রশ্নে, গৃহযুদ্ধ ও স্বৈরশাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের রূপরেখা প্রাপ্তিতে, দায়িত্বশীল সরকারের স্বরূপ নির্ধারণে, রাষ্ট্রে সম্পত্তির ধারণা ও নাগরিকের অধিকার সর্বোপরি শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজজীবনের সন্ধানে সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব কেবল বর্তমান বাংলাদেশে নয়, বিশ্বব্যবস্থায়ও সামগ্রিকভাবে প্রাসঙ্গিকতার দাবিদার।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

অনুমোদনপত্র I

ঘোষণাপত্র II

কৃতজ্ঞতা স্বীকার III

সারসংক্ষেপ IV

সূচিপত্র .... VII-IX

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় ১০

প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা ও মানবপ্রকৃতি ১০

টমাস হবস ১১

প্রকৃতির রাজ্য ১২

মানবপ্রকৃতি ১৫

জন লক ১৯

প্রকৃতির রাজ্য ২০

মানবপ্রকৃতি ২২

জ্যাঁ জ্যাক রুশো ২৪

প্রকৃতির রাজ্য ২৫

মানবপ্রকৃতি ২৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৪

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার ৩৪

গ্রিক রাষ্ট্রদর্শন ৩৪

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শন ৩৫

প্রাকৃতিক আইনের আধুনিক ব্যাখ্যা ৩৬

প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের পার্থক্য ৩৭

হবসের ধারণা ৩৮

প্রাকৃতিক আইন প্রসঙ্গে লকের ভাষ্য ৫০

রুশোর মত ৫৮

তৃতীয় অধ্যায় ৭২

সামাজিক চুক্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ৭২

হবসের *লেভিয়াথান* ৭২

লকের *সেকেন্ড ট্রিটিজ* ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* ৮৩

চতুর্থ অধ্যায় ৯৮

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন ৯৮

হবসের দৃষ্টিভঙ্গি ৯৮

লকের ধারণা ১০৩

রুশোর মত ১০৬

পঞ্চম অধ্যায় ১১৮

সরকারব্যবস্থা ও সামাজিক চুক্তি ১১৮

হবসের ধারণা ১১৯

সরকারব্যবস্থা ১১৯

আনুগত্যের ধারণা ১২৬

বুর্জোয়াব্যবস্থার স্বরূপ ১২৭

লকের ধারণা ১২৯

ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ ১৩২

সরকারব্যবস্থা ১৩৩

রুশোর ধারণা ১৪১

শাসনব্যবস্থা ১৪৫

সরকার, সার্বভৌম ও সামাজিক চুক্তি ১৫৩

সরকার ও রাষ্ট্রের পার্থক্য ১৫৬

নাগরিকের দায়িত্ব ১৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬৮

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সার্বভৌম ক্ষমতা ১৬৮

হবসের তত্ত্ব ১৬৮

লকের ধারণা ১৮৩

রুশোর মত ১১৯

সপ্তম অধ্যায় ২০৮

স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের ধারণা ২০৮

স্বাধীনতা সম্পর্কে হবসের অবস্থান ২০৮

সমতা সম্পর্কে হবস ২১৬

অধিকার সম্পর্কে হবস ২১৭

স্বাধীনতা সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গি ২২০

Dhaka University Institutional Repository

সমতা সম্পর্কে লক ২২৪

অধিকার সম্পর্কে লক ২২৫

স্বাধীনতা সম্পর্কে রুশোর অবস্থান ২২৯

সমতা সম্পর্কে রুশো ২৩৩

অধিকার সম্পর্কে রুশো ২৩৬

অষ্টম অধ্যায় ২৫১

সম্পত্তিতত্ত্ব ও ব্যক্তিমালিকানার ধরণ ২৫১

হবস ২৫১

লক ২৫৬

রুশো ২৬৬

নবম অধ্যায় ২৭৯

বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য ২৭৯

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট ২৮১

সিভিল সোসাইটি ও বর্তমান বাংলাদেশ ২৮২

জনগণের অবস্থান ২৮৫

ধর্ম প্রসঙ্গে ২৮৮

আইন ও সংবিধানের প্রশ্ন ২৮৯

উপসংহার ২৯৭

গ্রন্থপঞ্জি ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলে দেখা যায় সরকারের কাছে নাগরিক জীবন অপেক্ষা অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীর প্রসার অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন সর্বাগ্রে গুরুত্ব না পেয়ে গুরুত্ব পেয়েছে জীবিকা। জীবন ও জীবিকার মেলবন্ধন ঘটাতে গিয়ে জীবন হয়ে উঠেছে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ, রাষ্ট্র তার শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নাগরিকের (শ্রমিকের) জীবনের চাকাকে মাধ্যমরূপে ব্যবহার করছে। পুঁজিবাদী সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কার্যকলাপসমূহকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং তাই অর্থবিত্ত ব্যক্তিজীবনের মর্যাদার নিয়ামক হয়ে ওঠে। বিত্তশালী ব্যক্তি নাগরিকরূপে গুরুত্ব পায় সরকারব্যবস্থায়, কিছু ক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে। রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

চুক্তিবাদী রাষ্ট্রদার্শনিক হবস, লক ও রুশোর সরকারভাবনায় যে ধরনের নৈতিক বার্তা ছিল বর্তমান বিশ্বে তা তিরোহিত। এখানে নৈতিকতার যে দোহাই দেওয়া হয় তাকে মূলত ম্যাকিয়াভেলীয় নৈতিকতা বলা যায়। বলা বাহুল্য সমকালীন সরকারব্যবস্থাসমূহে অর্থনীতিতে যে গুরুত্বারোপ করা হয় তার অর্ধেকাংশও নৈতিকতা বিকাশে করা হয় না। যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সংকট। এ ধরণের ব্যবস্থায় প্লেটোর 'ন্যায়' অপেক্ষা (যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াই ন্যায়) থ্র্যাসিমেকাসের 'ন্যায়' (শক্তিমানের স্বার্থ সংরক্ষণই ন্যায়) দৃশ্যমান। প্লেটোর নৈতিকতা নয়, সোফিস্টদের নৈতিকতাই বিবেচ্য হয়ে ওঠে। বিত্তবান শ্রেণিই রাষ্ট্রের কাছে সমাদৃত ও পূজনীয়। অর্থনীতির চালিকশক্তিরূপে এরাই হয়ে ওঠে মুখ্য। রাষ্ট্র ও সরকার বাণিজ্য গোষ্ঠীর ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ে। সাম্য ও সমতার ধারণা হয়ে উঠেছে পুঁথিগত। এরিস্টটলীয় দাসব্যবস্থার নতুন মোড়কপ্রাপ্তি ঘটেছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের যুগে সরকারব্যবস্থায় অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের ক্রীড়নকে পরিণত হয় অর্থনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রসমূহ।

'প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা ও মানবপ্রকৃতি'– শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে হবস, লক ও রুশো এই তিনজন চুক্তিবাদীর বর্ণনা থেকে প্রাক-সামাজিক ও প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। মানবসমাজে আইন, কর্তৃত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়। হবস–উল্লেখিত প্রকৃতির রাজ্যের সার্থকতা এখানে যে, শাসনবিহীন এবং কর্তৃপক্ষবিহীন অবস্থায় মানুষের জীবন কেমন ছিলো, রাজনৈতিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিলো তা বোঝা যায় তার প্রকৃতির রাজ্যের আলোচনা থেকে। লক ও রুশোও একটি উন্নততর সুসংবদ্ধ জীবনের জন্য রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। যদিও তাদের প্রকৃতির রাজ্য ছিলো অধিকতর উন্নত কিন্তু তাঁদের প্রকৃতির রাজ্য বা মানবপ্রকৃতির চিত্রসমূহ যথাযথ বা পরিপূর্ণ ছিলো না। তাঁদের প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতির আলোচনা থেকে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক প্রগতির অন্যতম শর্তরূপে রাষ্ট্রের এবং রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজন দেখা দেয়।

হবস, লক এবং রুশোর প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতির পর্যালোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে রাজনৈতিক সমাজেই ব্যক্তি তার দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, অনিরাপদ, অন্যায্য অবস্থার সমাধান খুঁজেছে। যেখানে ব্যক্তি জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ খুঁজে পেয়েছে। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের আপাত আদর্শপূর্ণ সমাজে মানুষ যতই সরল ও শান্তিপ্রিয়ভাবে বসবাস করুক, সম্পত্তির প্রতি লোভ, অপরের উপর আগ্রাসনমূলক সুপ্ত মনোভাব তাদের ছিলো। ব্যক্তির বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং অনৈতিক অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্ভবকে তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করে।

হবসের মতো ক্ষমতা কিংবা লকের মতো সম্পত্তি কোনোটিই রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে মানবচরিত্রে অপরিহার্য ছিলো না। জনগণের স্বল্প চাহিদা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের আপাতপ্রাপ্তির দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিলো। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সমবেদনাবোধ ছিলো কিন্তু তারা (বন্য মানুষ) পরিবার গঠনের মতো কোনো

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়িত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির প্রয়াস চালায়নি। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের বন্য মানুষের (the noble savage) মধ্যে একপ্রকার একাকীত্ব ছিলো। তাদের চাহিদাও ছিলো সীমিত।

প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণে হবস–উল্লেখিত সামাজিক চুক্তির সাথে লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তির পার্থক্য রয়েছে। হবসের চুক্তি অনুষ্ঠিত হয় জনগণের সাথে জনগণের; এতে চুক্তি সম্পাদনের পর জনগণ ক্ষমতা হারায়, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র ও সরকার। লকের প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণে পরিলক্ষিত হয় বুর্জোয়া অর্থনীতি, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চেহারা। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের স্বাভাবিক অসাম্য রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পরিণত হলো রাজনৈতিক অসাম্যে।

'প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। প্রাকৃতিক অধিকার বলতে বোঝানো হয় রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির পূর্ববর্তী অরাজনৈতিক সমাজ বা প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের স্বেচ্ছামূলক স্বাধীনতা। অরাজনৈতিক সমাজে মানুষের আইনবিহীন অবস্থায় প্রাপ্ত অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলা যায়। প্রাকৃতিক অধিকারের সাথে যুক্ত স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মস্বার্থের প্রাধান্য। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক আইন হলো বিধি। এর সাথে যুক্ত থাকে যুক্তিবাদিতা, নিয়মাবলী বা শর্ত, নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক আইন প্রকৃতির রাজ্যের অবাধ প্রাকৃতিক অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক আইনের সাথে ধর্মতাত্ত্বিক বা নৈতিক সংযোগ লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক অধিকার প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের মধ্যে অসম ক্ষমতার প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক অধিকারে কোনো দায়বদ্ধতা ছিলো না। হবসের প্রাকৃতিক আইন দায়বদ্ধতাহীন অবাধ অধিকার উপভোগে এবং অসম ক্ষমতার লড়াইয়ে লাগাম টানে। প্রাকৃতিক আইন অরাজনৈতিক সমাজে জনগণের নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে এবং এর মূল ভিত্তি হলো প্রজ্ঞা। প্রাকৃতিক আইন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আইন (পজিটিভ ল') সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

জন লকের কাছে প্রাকৃতিক আইন অপেক্ষা প্রাকৃতিক অধিকার অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে জনগণ যে সকল অবশ্যম্ভাবী অধিকার ভোগ করত সেগুলোই লক প্রাকৃতিক অধিকাররূপে চিত্রিত করেছেন। এসকল প্রাকৃতিক অধিকার প্রাকৃতিক আইন দ্বারা যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল না বলে জনগণ রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভব ঘটায়। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান এবং নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে কাজ করেছে প্রাকৃতিক আইন। তার প্রাকৃতিক আইনের দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমতা এবং স্বাবলম্বিতা বা স্বাতন্ত্র্য। এ দুই বিষয়ের সাথে যুক্ত তার প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা।

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার প্রসঙ্গে রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে কোনো সুস্পষ্ট আলোচনা লক্ষ করা যায়না। তাঁর *ইনইক্যুালিটি* গ্রন্থে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় এতে প্রাকৃতিক আইনের উপস্থিতিই অপ্রয়োজনীয়। তাঁর প্রকৃতির রাজ্য যেহেতু ন্যায়-অন্যায়, শান্তি-শৃঙ্খলার পূর্ববর্তী 'নিরীহ' অবস্থা, তাই এখানে আইন এবং অধিকারের বিষয় অগুরুত্বপূর্ণ। আইনের প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রে জনগণকে শৃঙ্খলিত করা। প্রকৃতির রাজ্যে অসমতা থাকলেও সেজন্য আইনের প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্ন একটি মৌলিক সমস্যা। রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয়টি আমাদের যে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তা হলো– কেন ব্যক্তি রাষ্ট্রকে মান্য করবে অথবা কেন ব্যক্তির রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত। এখানে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তি নামক সামাজিক সত্তা বিনিময়সূত্রে আবদ্ধ এবং এতে অবশ্যই ব্যক্তির দায়দায়িত্ব বেশি। ব্যক্তি বা নাগরিককে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না। রাজনৈতিক সমাজের প্রতি ব্যক্তির বা নাগরিকের অবশ্যই রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। এ দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেবে নৈতিক মূল্যায়নের দাবীদার।

হবস, লক ও রুশো– প্রত্যেকেই রাজনৈতিক সমাজের উত্থান, প্রকৃতি ও কার্যাবলির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। চুক্তি সম্পাদিত হয় সমাজকে কেন্দ্র করে। সরকারের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়নি। সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান করা। রাষ্ট্রে ব্যক্তির জীবন কেবলমাত্র প্রকৃতির দান নয়, বরং রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির জীবন জড়িত। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের সম্মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা তাকে চুক্তিবদ্ধ করে এবং একই সাথে ব্যক্তি কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের অধীনে আসে। এটি রাজনৈতিক সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কোনো ব্যক্তিক নেতৃত্ব নয়। ব্যক্তির সম্মতিতে সৃষ্ট এবং এই নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে ব্যক্তি সম্মত। নেতৃত্বের অধীনতা প্রকারান্তরে শক্তির প্রতি আনুগত্য। যা রাজনৈতিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'সামাজিক চুক্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ে চুক্তিবাদীগণ সামাজিক চুক্তিকে সম্মতির ফলরূপে গ্রহণ করলেও সম্মতির ধারণা ব্যবহারে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে এ বিষয়ে তারা একমত যে একবার প্রকৃতির রাজ্য থেকে বেরিয়ে সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করলে পুনরায় প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও রুশো মনে করেছেন সামাজিক চুক্তি ও রাজনৈতিক সমাজ সম্পদশালীদের দ্বারা সৃষ্ট একটি কৌশল এবং তা মানুষের উন্নত জীবনের জন্য যথার্থ নয়। তবুও মানুষ এ সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ক্ষমতা মানুষের কাছে প্রধান। রুশো সামাজিক চুক্তির সাহায্যে ক্ষমতার বৈধতা প্রদান করেন।

সামাজিক চুক্তির ফলে মানুষ নানা প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও বিনিময়ে যা লাভ করে তা একপ্রকার পুরস্কার। অধিকতর পরিশীলিত ও যৌক্তিক এক অবস্থা, যাতে নিম্নতর অবস্থা থেকে ব্যক্তিমানুষ উচ্চতর অবস্থায় গমন করে। সত্তা হিসেবে সে কেবল স্বীয় স্বার্থে মনোনিবেশ করে না, অপরের জন্যও ভাবে। এতে ব্যক্তি নৈতিক স্তরে উন্নীত হয়, যাকে আমরা সমাজ বিকাশের পথে অগ্রসরতা বলতে পারি। সামাজিক চুক্তি প্রাকৃতিক মানুষকে নৈতিক ও সামাজিক সত্তায় উন্নীত করে। বিকশিত করে সমাজ জীবন, প্রদান করে নৈতিক পূর্ণতা।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে হবসের বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি যুদ্ধাবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সামাজিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটলেও এখনও যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। যদিও মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করবে এমন প্রাক-কল্পনা হবসের ছিলো। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী রূপটা মুখ্য হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধ নিবৃত্তির জন্য রাষ্ট্রের উত্থান ঘটলেও সে যুদ্ধ থেমে যায়নি। তবে যুদ্ধের ধরণ বদলেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রসমূহ অধিকতর যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠেছে।

লক প্রাকৃতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বশাসনের একজন বড় সমর্থক। রাষ্ট্র বা অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনসমূহকে জনগণের ইচ্ছার মাপকাঠিতে অর্থাৎ তাদের পছন্দ-অপছন্দ, সিদ্ধান্তের নিরিখে বৈধতা লাভ করতে হবে। লকের রাজনৈতিক চিন্তার এ স্থান অত্যন্ত গুরুত্ববহ। লক অদৃষ্টবাদ বা ব্যক্তির নিয়তির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতার পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন। ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো পূর্বনির্ধারিত কাঠামোতে বন্দী না করে ব্যক্তিকে চিত্রিত করেছেন দায়িত্বশীল সত্তারূপে; দিয়েছেন ব্যক্তির স্বশাসন, স্বনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি।

রুশোর চুক্তিবাদে স্বাধীন এবং মুক্ত মানুষ (যারা হবসের মতো ভয়াবহ প্রকৃতির রাজ্যে ছিলো না, আবার লকের মতো প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত হতো না) পরস্পর স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়, রাজনৈতিক শক্তি ও সংগঠন সৃষ্টি করে সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করলেও সরকারের কাছে রুশো মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা দেননি। মানুষের জীবন রাজনৈতিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের উর্দ্ধে। মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বর্তায় সাধারণ ইচ্ছা এবং প্রজ্ঞার ওপর।

আধুনিককালে জাতীয় রাষ্ট্রসমূহ মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে অতিক্রম করতে পেরেছে এমনটা বলা যায় না। মধ্যযুগীয় সামন্তবাদের মতো জমিদার-ভূমিদাস প্রথা না থাকলেও ধনবৈষম্যমূলক সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এ সম্পর্কই নতুন নামে ফেরত এসেছে পুঁজিপতি তথা মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের দ্বারা। দুঃখজনক হলেও সত্য যে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে পুঁজিপতি বা ধনিক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। এ শ্রেণির স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়াসরূপে তারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তথা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদের জয়গান করেছে। যা মূলত ক্ষমতা ও

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের আবরণে ব্যক্তিকে পরস্পরের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সম্পদের মোহে আবিষ্ট মানুষ নিরন্তর ছুটে চলার প্রতিযোগিতায় রত। সামাজিক শান্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে হবস সামাজিক চুক্তির অবতারণা করলেও এ চুক্তি সমকালীন বিশ্বে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতটা সফল সে প্রশ্ন চলে আসে। হবসের কাছে রাজনৈতিক সমাজে রাষ্ট্র বলপ্রয়োগমূলক আইনের দ্বারা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) রাজনৈতিক আনুগত্য আদায় করে নেয় এবং এর পক্ষে রাজনৈতিক সমাজ বিবিধ প্রকার যুক্তি উপস্থাপন করে– কেন সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকোচন বা এতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

'রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে হবস, লক ও রুশো: তুলনামূলক বিশ্লেষণ' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে চুক্তিবাদীদের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে কিছু বিষয় সামনে আসে। যেমন, রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাজনৈতিক আনুগত্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও উপভোগের সীমারেখা কতদূর বিস্তৃত ইত্যাদি। যদিও রাষ্ট্রদার্শনিক আলোচনায় ব্যক্তির স্বশাসন এবং আইন মান্য করার কর্তব্য– এ দুয়ের মধ্যে কোনো যৌক্তিক অসঙ্গতি নেই। হবসের রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রশ্ন আসে সার্বভৌমের সাথে প্রজাদের সম্পর্ক কেমন এবং প্রজার প্রতি সার্বভৌমের কোনো দায়বদ্ধতা আছে কিনা। আবার প্রজারা যদি তাদের সকল অধিকার ত্যাগ করে তাহলেও কি সার্বভৌম প্রজাদের অধিকারের প্রতিনিধিত্বকারী থাকে? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হবসের কাছে লক্ষ করা যায়নি। রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং আইনের কর্তৃত্বের উপস্থিতি তাঁর কাছে উপযোগবাদী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী দিক থেকে গৃহীত হয়েছে, এই অর্থে যে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজকে স্বার্থ পূরণের একটি মাধ্যমরূপে গণ্য করে। আবার মানুষ আইনের উপস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য মনে করে যতক্ষণ এগুলো ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে পারে।

লকের সম্মতিতত্ত্বে আইন মান্য করার কর্তব্যের সাথে ব্যক্তির স্বশাসনের অনুমোদনকে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এতে নাগরিকগণ স্বেচ্ছা সম্মতির দ্বারা আইন মানতে রাজী। এজন্য রাজনৈতিক সমাজে, রাষ্ট্রে নাগরিকদের মুক্তভাবে সম্মতির বিধান রাখা হয়েছে। লকের কাছে মুনষের রাজনৈতিক জীবন আবর্তিত হয়েছে সম্পত্তিকে ঘিরে। সম্পত্তির প্রতি ব্যক্তির অধিকার অর্জিত নয়, সহজাত। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টির পর তাদের উন্নততর জীবন বিধানের জন্য প্রাকৃতিক অধিকার দিয়েছেন। প্রাকৃতিক আইন এ অধিকারের উৎস। অন্য মানুষ যেন ব্যক্তির অধিকারের ওপর অন্যায্য হস্তক্ষেপ না করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যক্তি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করে। রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটায়, রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এ শক্তির কাছে নাগরিকের প্রত্যাশা ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষা, সম্পত্তির নিরাপত্তা।

রুশোর রাষ্ট্রদর্শনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারণায় দুটি বিষয় লক্ষণীয়। যে সাধারণ ইচ্ছা কর্তৃক নাগরিকের কর্মকাণ্ড সীমিত করা হয় তা অপরের দ্বারা আরোপিত নয়, নাগরিকের সৃষ্ট। সাধারণ ইচ্ছার প্রতি তারা স্বাধীনভাবেই আনুগত্য প্রদর্শন করে। রুশোর রাষ্ট্রদর্শন এবং সমাজচিন্তার মূল ভিত্তি প্রোথিত স্বাধীন ইচ্ছার ধারণার মধ্যে। স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা তার রাষ্ট্রদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। সাধারণ ইচ্ছা নাগরিকের স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং উপলব্ধির মাধ্যম। গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ইচ্ছা স্বাধীনাতার পূর্বশর্তরূপে কাজ করেছে। যদিও সাধারণ ইচ্ছা আক্ষরিক অর্থে কতদূর স্বাধীন সে প্রশ্নের অবকাশ থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়ে "সামাজিক চুক্তি ও সরকারব্যবস্থা" সম্পর্কিত আলোচনায় চুক্তিবাদীদের কাছে রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিরূপে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তারা কমবেশি রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা সমর্থন করেছেন। অবশ্য রুশোর কাছে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। হবসের সরকারব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী। একে পুরোপুরি দমনমূলক বলা যাবে কিনা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ সার্বভৌম ক্ষমতার যে প্রকৃতি তাতে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, জাতীয়তাবাদ, জনগণের স্বার্থের সংরক্ষণ হবসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দমন-পীড়নের অভিযোগকে ছাপিয়ে যায়। হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ যে নিরাপত্তার অন্বেষণে রাজনৈতিক সমাজে প্রবেশ করেছে সে আশার প্রতিফলন ঘটেছে তার সরকারব্যবস্থায়। কর্তৃত্ববাদী হওয়া সত্ত্বেও তার সরকার প্রজাদেরকে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েছে, উন্নততর জীবন ও সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে। চুক্তিবাদীদের সরকারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পারলৌকিকতার পরিবর্তে লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পায়।

লকের সরকারব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। শিক্ষা ব্যক্তির মাধ্যে নাগরিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে, ব্যক্তিকে অধিকার সচেতন করে, যাতে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে ব্যক্তি সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁর চুক্তিতত্ত্বে সরকারব্যবস্থার অভিজাত শ্রেণির সক্রিয় উপস্থিতি, সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং মূলত এ শ্রেণির সম্মতিই সরকারের চালিকাশক্তি হয়েছে। লকের দর্শনে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেকার সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া লক্ষণীয়। তিনি কোনো একক ব্যক্তির হাতে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা তুলে দেননি। জনগণের কাছে সরকার পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছেন। যদিও তিনি তার সরকারব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক নয়, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র উল্লেখ করেছেন। তার সরকারব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে আইনসভার কাছে। এ সরকার জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

রুশো সামাজিক কল্যাণের জন্য কেবল তাত্ত্বিক ধারণা প্রদানে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবে জনগণের অংশগ্রহণ দ্বারা সার্বিক ভালো কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জনগণ কীভাবে যথার্থ আইনগত অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করতে পারে তা চিত্রিত করেছেন। রুশো দেখিয়েছেন কীভাবে জনগণের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং এতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটিয়েছেন। সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বে জনগণ সামষ্টিক ইচ্ছার প্রতি সম্মতি প্রদর্শন দ্বারা রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে।

'রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সার্বভৌম ক্ষমতা' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে চুক্তিবাদীদের কাছে সার্বভৌম রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হবসের সার্বভৌমতত্ত্ব তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। হবস মনে করেন একটি স্বাধীন, সুসংহত জাতীয় রাষ্ট্রের বিকাশে একচ্ছত্র ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োজন। একে তিনি নাম দিয়েছেন সার্বভৌম শক্তি। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বে একপ্রকার পারস্পরিকতার সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে যাতে ভিত্তিরূপে কাজ করেছে আনুগত্য এবং নির্ভরশীলতা। শাসক প্রজাদের কাছে থেকে আশা করে তার কাজের অনুমোদন এবং আনুগত্য। পক্ষান্তরে প্রজারা আশা করে তাদের নিরাপত্তা, শান্তি এবং একটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র। এভাবে প্রজা এবং সার্বভৌম একপ্রকার দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের আলোচনায় ন্যায়বিচার, নৈতিক প্রজ্ঞা ও নৈতিক মূল্যবোধের আবেদন পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়পরতা এবং ঔচিত্যের ধারণা সার্বভৌমের কার্যাবলী সম্পর্কে এক নতুন দিকের ইঙ্গিত দেয়, যাতে শুধুমাত্র নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রক্ষমতা নয়, বরং নৈতিক অবস্থান গ্রহণ দ্বারা তিনি সার্বভৌম ও রাষ্ট্রের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা টেনেছেন। নৈতিক দায়বদ্ধতার কারণেই তিনি সম্ভবত অমরণশীল ঈশ্বরের কাছে 'মরণশীল ঈশ্বর'কে তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ করেছেন।

জন লকের রাষ্ট্রদর্শনে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে হবসের মতো সুসংবদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান পরিলক্ষিত হয়নি। হবসের কাছে সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাতীয় রাষ্ট্রের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষার্থে এবং প্রজাদেরকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। পক্ষান্তরে লকের কাছে সার্বভৌম ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়– যদি না তা জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা বিধানে অসমর্থ হয়। সার্বভৌমের কাছে কোনো অবাধ, অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য কিংবা স্বেচ্ছামূলক ক্ষমতা ছিলো না বিধায় সার্বভৌমের স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সুযোগ নেই। লকের দর্শনে সার্বভৌমের মূল বিষয় হবসের মতো আনুগত্যপ্রাপ্তি নয় বরং সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান। সার্বভৌম ক্ষমতা আইনসভার কাছে ন্যস্ত করা হলেও আইনসভা মূলত একটি জিম্মাদারমূলক সংস্থারূপে কার্যকর। তাঁর সার্বভৌমতত্ত্বে ক্ষমতার পুঞ্জীভবন নয়, বরং ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং জবাবদিহিতা লক্ষণীয়। সার্বভৌম জনগনের প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক কোনো অধিকার হরণ করতে পারে না। তিনি সার্বভৌমকে দেখেছেন বিভাজিত এবং খণ্ডিতরূপে। ফলে সাধারণ জনগণের বা নাগরিকের শর্তহীন আনুগত্যের প্রশ্ন নেই।

Dhaka University Institutional Repository

রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে সাধারণ ইচ্ছা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সমাজ বলতে তিনি মনে করেন সমাজের অংশ বা সদস্যরূপে সাধারণ জনগণ, যারা পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংস্থার সদস্যরূপে নাগরিকের স্বীকৃতি লাভ করে। সমাজ সার্বভৌম শক্তির বাহক। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বের বিশেষত্ব হলো– সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছারূপে শাসক আবার সমাজের বিধিবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন দ্বারা সার্বভৌম হয়ে ওঠে শাসিত। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বে ক্ষমতা একতরফা রাজার কাছে ন্যস্ত, লকের তত্ত্বে জনগণ ও সার্বভৌমের কাছে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক; পক্ষান্তরে রুশোর কাছে জনগণই শাসক আবার তারাই শাসিত। শাসিত জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক ও বাহক। সাধারণ ইচ্ছা বা গণসম্মতি সার্বভৌমের ক্ষমতার উৎসরূপে কাজ করে। নাগরিকরূপে প্রত্যেকেই স্বীয় জীবনে স্বাধীন, আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের অধীন। নাগরিক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে দুই ধরণের ভূমিকা পালন করে। রুশোর সার্বভৌম নাগরিকের কাছে আনুগত্য আশা করে, তবে আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে না। এখানে রাষ্ট্র এবং নাগরিক পারস্পিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। হবস ও রুশো উভয়ের সার্বভৌমতত্ত্বে বলপ্রয়োগকারী শক্তির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তবে হবসীয় সার্বভৌমে বলপ্রয়োগ দ্বারা জনগণকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা হয়। রুশোর সার্বভৌম হচ্ছো রাষ্ট্রের একটি যৌথ সত্তা। রুশো আইনগত শক্তি এবং শাসনিক শক্তির যূথবদ্ধরুপকে সার্বভৌমের যৌথ অস্তিত্ব মনে করেন। সার্বভৌম শাসক এবং শাসিত উভয়ের মধ্য দিয়েই সমগ্রের ইচ্ছার বাস্তবায়ন করে। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে 'সকলের ইচ্ছা' এবং 'বিশেষ ইচ্ছা' তাৎপর্যপূর্ণ নয়, এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো সাধারণ ইচ্ছা। যা নির্ধারিত হয় সকলের স্বার্থের নিরিখে। তবে রুশো সার্বভৌমের ক্ষমতার বিভাজনে পক্ষপাতী নন। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে সাধারণ ইচ্ছার সংযুক্তিকে সামষ্টিক উদারতাবাদ এবং সামষ্টিক নৈতিকতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়।

'স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের ধারণা' নামক সপ্তম অধ্যায়ে চুক্তিবাদীদের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের সময়কালে বিশেষত হবস ও লকের কাছে ব্যক্তিস্বার্থ ও ইচ্ছা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে হবসের কাছে তা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আইন ও সার্বভৌম দ্বারা। লকের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা অগ্রগণ্য। রুশোর কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও তা সাধারণ ইচ্ছাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। হবসের স্বাধীনতার ধারণায় তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্রের প্রতিফলন লক্ষ করা। হবসীয় স্বাধীনতার সাথে যুক্ত বাধ্যতা এবং লকীয় স্বাধীনতার সাথে যুক্ত বাধা। এ বাধা হলো আইনি এবং নৈতিক প্রতিবন্ধকতা। তাঁর দর্শনে রাজনৈতিক স্বাধীনতা খুব বেশি দৃশ্যমান নয়। হবস ও রুশো উভয়ের দর্শনে কর্তৃত্ববাদী রূপ পাওয়া যায়। তবে হবসের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কাজ করে জননিরাপত্তার লক্ষ্যে, রুশোর কাছে তা সার্বিক মঙ্গল স্থাপনের পক্ষে। হবসের প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের অন্যতম বিধিরূপে সমতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী সমতা হলো ব্যক্তি অন্যের জন্য যতটা অধিকার অনুমোদন করে তার চেয়ে অধিক অধিকার অনুমোদন নিজের জন্য না করা। হবস সমাজের দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং প্রজার নিরাপত্তা বিধানের জন্য শাস্তির অধিকার সমর্থন করেছেন।

লকের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবিধা-অসুবিধা মানদণ্ডরূপে গণ্য হয়েছে। যেমন সমাজের একজন সভ্যরূপে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাকে সমর্পণ করেছে রাজনৈতিক সমজের কাছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মেনে নেওয়াকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। তাঁর স্বাধীনতা মূলত সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সম্মতির দ্বারা জনগণের অধিকারের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে। প্রাকৃতিক অধিকারের সংরক্ষণ রাজনৈতিক সমাজে সরকারের প্রধান দায়িত্ব। প্রাকৃতিক অধিকারের সংরক্ষণ একদিকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে, অন্যদিকে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহয্য করে। তিনি সরকারের একচ্ছত্র ক্ষমতার ঘোরতর বিরোধী। লকীয় স্বাধীনতা রুশোর মতো গণঅভিপ্রায়ের মাঝে লীন হয় না; হবসের মতো সার্বভৌমের একতরফা ইচ্ছার মাঝেও স্থিত হয় না। লকের স্বাধীনতা ও অধিকারবোধ রাষ্ট্রকে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মানবিক অধিকারের চেতনায় অগ্রসর করেছে, শাণিত করেছে পুঁজিবাদী চেতনাকে। লকের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রাকৃতিক আইনের সীমারেখা দ্বারা।

Dhaka University Institutional Repository

রুশো ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্মনির্ভরশীলতা রক্ষায় চরম রাজতন্ত্র, রাজতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন কাঠামোসমূহের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তাঁর দর্শনে স্বাধীনতার সাথে যুক্ত নিয়ন্ত্রণ। চুক্তিবাদীদের স্বাধীনতার ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণে রুশোর স্বাধীনতার নৈতিক ভিত্তি ও সামষ্টিক চেতনা শক্তিশালী মনে হয়। হবসের স্বাধীনতার ধারণায় সামষ্টিক চেতনা বেশ দুর্বল। তাঁর কাছে সার্বভৌম স্বাধীনতার চালিকাশক্তি। পক্ষান্তরে লকের কাছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, মুক্তি, স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণায় ব্যক্তির সাথে সামষ্টিকতার ক্ষেত্রবিশেষে মেলবন্ধন পাওয়া যায়। রুশোর স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের আলোচনায় বড় সীমাবদ্ধতা হলো নারীর অধিকার ও স্বাধীনতার অনুপস্থিতি। যদিও তিনি স্বাধীনতা রক্ষায় নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কিন্তু তিনি নারীকে নাগরিকের মর্যাদা দেননি। রুশোর মতে, অধিকারের সীমানা সামাজিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করতে পারে না। তিনি জনগণকে ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে উপভোগ্য করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার আংশিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জননৈতিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। হবসের স্বাধীনতার ধারণায় স্বাধীন ইচ্ছা অপেক্ষা আত্মস্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ। তবে হবস এবং রুশো উভয়ের ক্ষেত্রে জনগনের সাথে সার্বভৌমের বা রাষ্ট্রের একটি সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। রুশোর স্বাধীনতা, সমতা এবং অধিকারের ধারণায় জনসংযোগ এবং নৈতিকতার অবস্থান মুখ্য। রাষ্ট্র এবং কমিউনিটি ব্যক্তির নৈতিক ব্যক্তিত্ব গঠনে ও স্বাধীনতার সুরক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এর মাধ্যমে তিনি সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ককে সামনে আনেন। নৈতিকতার উন্মীলন ব্যক্তিকে সাহায্য করে সমতা প্রতিষ্ঠায়। রুশোর স্বাধীনতা, সমতা এবং অধিকারের ধারণায় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ তাঁর পূর্ববর্তী চুক্তিবাদীদের মতো অতটা জোরালোরূপে রক্ষিত হয়নি। আইনগত বাধ্যবাধকতা কিংবা বৈষয়িক স্বার্থের সন্তুষ্টি বিধানের পরিবর্তে রুশো চেয়েছেন সমষ্টির সাথে যুক্ত করে ব্যক্তির অন্তঃস্থিত মহত্ত্ববোধকে প্রতিষ্ঠা করতে।

'সম্পত্তিতত্ত্ব ও ব্যক্তিমালিকানার ধরণ' শিরোনামে অষ্টম অধ্যায়ে ত্রয়ী চুক্তিবাদীদের সম্পত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা বিষয়ে স্বতন্ত্র অবস্থান রয়েছে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার পতনের পর আধুনিককালে রাজনৈতিক দর্শন বুর্জোয়া (পুঁজিবাদী) সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছে বলা যায়। ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা একমাত্র চাওয়া হয়ে রাজনৈতিক সমাজে থাকেনি। জীবনের মতো মূল্যবান হয়ে ওঠে বৈষয়িক সম্পত্তির মালিকানা। কখনো সম্পত্তির মালিকানা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ব্যক্তি অধিকারের নীতিতে, আবার কখনো সার্বভৌম বা কালেকটিভ বডির দ্বারা। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাব চুক্তিবাদীদের লেখনীতে দৃশ্যমান। এ প্রভাব ব্যক্তির মনস্তত্ত্বে ক্ষমতার স্পৃহাকে বেগবান করেছে, আবার রাষ্ট্রের কাছে এ প্রভাব সৃষ্টি করেছে কর্তৃত্ববাদী জাতীয়তাবাদী চেতনা। তারা বিভিন্নভাবে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে বৈধতা প্রদান করেছেন এবং কমবেশি তিনজন চুক্তিবাদীই সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার অধিকার রেখেছেন। ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের আর্বিভাব ঘটলেও সম্পত্তি বা অর্থনীতি সামাজিক-রাজনৈতিক বলয়ের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ধরণের ভিন্নতার ফলে কখনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শক্তিশালী হয়েছে আবার কখনো শক্তিশালী হয়েছে ব্যক্তিমালিকানা। যার পরবর্তী গতিধারায় লক্ষ করা যায় বিবিধ বহুজাতিক কোম্পানির প্রসার, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাসমূহের উপস্থিতি। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির প্রভাব সমাজজীবন ও রাজনৈতিক জীবনকে এমনভাবে গ্রাস করে যাতে ব্যক্তির কাছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনযাপন অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অর্থনীতি।

হবসের রাষ্ট্রতত্ত্বে সার্বভৌমের কাছে সম্পত্তির সকল মালিকানা সংরক্ষিত। সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির মালিকানা থাকলেও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকবে সার্বভৌমের। ব্যক্তির সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে সম্পত্তির নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সার্বভৌম কমনওয়েলথে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নাগরিকের জন্য সম্পত্তির অধিকারও সৃষ্টি করবে। হবসের কাছে সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারিত হয়েছে সার্বভৌম কর্তৃক সিভিল আইন দ্বারা, বাজারব্যবস্থা দ্বারা নয়। সার্বভৌম সম্পত্তির মালিকানা ও বণ্টনব্যবস্থা ন্যায্যতা দ্বারা নিশ্চিত করবেন। সম্পত্তিতে নাগরিকের অধিকার থাকবে তবে তা অবাধ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

লক সম্পত্তি বলতে সার্বিকভাবে বুঝিয়েছেন প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতাকে; তবে তিনি বৈষয়িক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে রাজনৈতিক সমাজে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজনৈতিক সমাজের কাছে মানুষ সম্পত্তির সুরক্ষা দাবি করে এবং স্বীয়-অধিকার রক্ষায় সম্পত্তির ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করে। লক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা দিয়েছেন সরকারের কাছে। রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিরেকে তার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেননি। লকের সম্পত্তিতত্ত্বে ব্যক্তিগত মালিকানার যে ধরণ চিত্রিত হয়েছে তা বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। রাজনৈতিক শক্তির চালিকাশক্তি বা নিয়ন্ত্রণ রক্ষিত হয়েছে অর্থনীতির দ্বারা। সম্পত্তির অসম বন্টনের বিপরীতে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার্থে রাষ্ট্র তার অর্থনীতিকে যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে সংগঠিত করার দ্বারা কাজ করতে পারে। লকের সম্পত্তিতত্ত্বে ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে বন্টনমূলক ন্যায্যতার বিষয় উপেক্ষিত। তাঁর তত্ত্বে পুঁজিবাদী ধারা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ শক্তিশালী রূপ পেয়েছে। এসব বিষয় ব্যক্তিকে কালক্রমে বিচ্ছিন্নতাবোধের দিকে ধাবিত করে।

একটি সমতাপূর্ণ এবং ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় রুশো সম্পত্তিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। সম্পত্তিতে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ থাকলে রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকের প্রয়োজনীয় পরিতৃপ্তি বিধান সম্ভব হয়। বন্টনের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পক্ষে নন। তাঁর কাছে কেবল রাজনৈতিক সমতা যথেষ্ট নয়। তিনি অর্থনৈতিক সমতাকেও প্রয়োজনীয় মনে করেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় সমতা নিশ্চিতকরণ দ্বারা স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সাথে যৌথ মালিকানা এবং সাধারণ ইচ্ছা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এর ফলে সম্পত্তির অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি আনুগত্য ও দায়বদ্ধতার পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। সমাজের যৌথ অংশের বা সামষ্টিক স্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্র ব্যক্তি/নাগরিকের সম্পত্তিতে তার সম্মতি ব্যতীত করারোপ করতে পারে। রাষ্ট্র/সরকার কোনো ট্রাস্ট নয়। ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে যেন অসমতা সৃষ্টি না হয় তা প্রতিরোধে রাষ্ট্র সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ে রুশোর কাছে একপ্রকার সমন্বয়বাদী অবস্থান লক্ষণীয়, যা করা হয়েছে ব্যক্তির অধিকার এবং সার্বিক কল্যাণের দ্বারা। রুশো লকের মতো সম্পত্তির অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার মনে করেন না। সম্পত্তির অধিকারের সূত্রপাত রাজনৈতিক সমাজ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা। সম্পত্তির ক্ষেত্রে সার্বিক ভালোর জন্য সামষ্টিক স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের আগে স্থান পাবে। এতদ্সত্ত্বেও এটা বলা যাবে না যে, রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কামনা করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে তবে এর ওপর রাষ্ট্রের নজরদারিও থাকবে যাতে তা সীমাহীন অসাম্য সৃষ্টি না করে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ততক্ষণ বৈধ যতক্ষণ ব্যক্তি তার জীবিকা নির্বাহের জন্য এর উপর নির্ভরশীল।

'বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা' শিরোনামে নবম অধ্যায়ে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক সমাজ, জনগণ, জনগণের ক্ষমতায়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম সামষ্টিকতাবাদ, ক্ষমতা বনাম নৈতিক মূল্যবোধের সংকট, অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য, জাতীয়তাবাদ বনাম উগ্র জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিষ্পেষণে বৈশ্বিক রাজনীতির মেরুকরণ এবং ব্যক্তি মননে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ চুক্তিবাদীদের রাষ্ট্রচিন্তার নিরিখে সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, জনগণের অধিকার এবং সরকারের জবাবদিহিতার জন্য প্রাসঙ্গিক।

সামাজিক চুক্তি মতবাদকে রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে একটি বৈপ্লবিক, যুগান্তকারী সূচনা বলা যায়। যার দ্বারা ব্যক্তিমানুষ তার রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে, পাশাপাশি পায় ব্যক্তিস্বাধীনতার আস্বাদ, সুশৃঙ্খল এবং উন্নততর জীবনব্যবস্থা। শক্তি নয় যুক্তিবাদিতা, পারলৌকিকতা নয় ইহজাগতিকতাই রাজনৈতিক সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। চুক্তিতত্ত্ব রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এ ভিত্তি শক্তি নয়, জনগণের সম্মতি এবং স্বার্থরক্ষা, স্বাধীনতা, পারস্পরিকতার দায়ে আবদ্ধ। চুক্তিতত্ত্বের অন্যতম দিক হলো তা ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্মতি ও সংঘবদ্ধতা,

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের সূচনা ঘটায় এবং তাতে প্রণিধানযোগ্য উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপূরণ।

উল্লেখযোগ্য সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের দিক হলো সরকারবিহীন এবং অ-রাজনৈতিক পরিবেশে মানুষের জীবনযাত্রা; এ ধরণের জীবনযাত্রার বিপরীতে মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং একটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। এ ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে রয়েছে সরকার। চুক্তিতত্ত্বে হবস রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাকে যেমন সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে লক এবং রুশো রাষ্ট্র অপেক্ষা জনগণের ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে ক্ষমতার রাজনৈতিক ব্যবহার রাষ্ট্র এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যকে যথাযথভাবে পালনে সাহায্য করে। এ তত্ত্ব সরকার, সার্বভৌমত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংহতিবাদ, সংঘবদ্ধ সমাজ সংরক্ষণ ও সংগঠনে পথপ্রদর্শন করেছে।

সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব হবসের কাছে চরম সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার তত্ত্ব, লকের কাছে তা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার হাতিয়ার, এবং রুশোর কাছে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার তত্ত্বরূপে পরিগণিত হয়। শুরুর দিকে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তায় সামাজিক চুক্তিতত্ত্বকে গণ্য করা হয় ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তার বৌদ্ধিক প্রকাশরূপে– যেখানে রাজা এবং প্রভুদের গণ্য করা হয় রাজনৈতিক, আইনগত এবং সামরিক কার্যক্রমের অংশরূপে।

সামাজিক চুক্তির মূল বিষয় ছিলো রাষ্ট্রের উৎপত্তি। রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হয়েছে জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা দ্বারা। বাংলাদেশের বাস্তবতায় জনগণের সাথে সরকারের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্ক প্রয়োজন। সরকার যদি জনবিচ্ছিন্ন হয় তবে সে সরকার জনগণের সম্মতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না। আবার রাজনীতি-সচেতন না হলে জনগণ নাগরিক হয়ে উঠতে পারে না। রাজনীতিবিমুখ জনগণ বা অসচেতন নাগরিকের কাছে সরকারের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামাজিক চুক্তির পর্যালোচনায় একথা বলা যায় যে, যখন জনগণ সরকারের কার্যক্রমে সন্তুষ্ট থাকে, তখন তারা সরকারের প্রতি অনুগত থাকে, রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পায়, রাজনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের তাৎপর্য হলো– রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নাগরিকের অংশগ্রহণের পরিধির বিস্তার। সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উত্থান দ্বারা নাগরিকে পরিবর্তিত করে। জনগণ রাজনৈতিক অধিকার-সচেতন হয়ে ওঠে। নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি তার সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহে অধিকতর সতর্ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দ্বারা রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রের প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের প্রকোপ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে দৃঢ় জাতীয়তাবাদী চেতনার যেমন প্রয়োজন, আবার উগ্র জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে হুমকির সম্মুখীনও করতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা ও মানবপ্রকৃতি

রাষ্ট্র মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনযাপন ও চেতনার ফল। মানুষ সমাজজীবনের উপযোগিতা তথা বাস্তব প্রয়োজনেই রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র মানুষকে অসংবদ্ধ ও বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত করে সামাজিক স্বীকৃতি, সার্বভৌম ক্ষমতা, রাজনৈতিক চেতনা, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মানবিক অধিকারের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজনৈতিক স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে তা মানুষকে আইনগত ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে সচেতন করে। রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকার পরিচালনা– পদ্ধতিতে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল যুক্তি ও নৈতিকতার ওপর; মধ্যযুগে তা ছিল ধর্মভিত্তিক এবং আধুনিক যুগে তা যৌক্তিক ভিত্তিতে শক্তিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের রূপলাভ করে। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইহজাগতিক কর্তৃত্ববাদী লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে এবং আইনের শাসন গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিককালের রাষ্ট্রচিন্তায় নবজাগরণ এবং ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সরাসরি প্রভাব রয়েছে।

আধুনিককালের তিনজন চুক্তিবাদী রাষ্ট্রদার্শনিক হলেন টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), জন লক (১৬৩২-১৭০৪) এবং জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। তাঁদের মতে প্রাক-রাষ্ট্রীয় অবস্থায় মানুষ প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা পরিচালিত হতো। পরবর্তীতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে প্রাকৃতিক আইনের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের এই তিনজন চুক্তিবাদী দার্শনিক তাদের সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা, মানবচরিত্র, প্রাকৃতিক আইন ইত্যাদি সম্পর্কে যে চিত্র তুলে ধরেছেন, তাতে যেমন তাদের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়, অন্যদিকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও স্বরূপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে সামাজিক চুক্তি মতবাদেই প্রথম রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জনগণ স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং প্রাক-রাজনৈতিক যুগ থেকে রাজনৈতিক যুগে পদার্পন করে। সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে জনগণ রাজনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান থেকে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

হবস, লক ও রুশো – তিনজন চুক্তিবাদী দার্শনিকই তাঁদের চুক্তিতত্ত্বে প্রকৃতির রাজ্য, মানবপ্রকৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এসব বিষয়ে তাঁদের মতপার্থক্য থাকলেও রাষ্ট্র যে চুক্তির ফসল সে বিষয়ে তারা একমত। সামাজিক চুক্তির তাৎপর্য এখানে যে, এর ফলে একটি কর্তৃত্বমূলক শক্তির উদ্ভব ঘটে, যে শক্তি রাজনৈতিক এবং যার উপস্থিতিতে সমাজের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়, শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরাপদ ও নিশ্চিত জীবন বিধানের লক্ষ্যে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে এবং এখানেই মানুষের যুক্তিবাদিতার প্রকাশ– তিনজন চুক্তিবাদীই এ বিষয়ে একমত।

সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী, মানুষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হয়ে চুক্তি সম্পাদন দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পাশাপাশি রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় মানবপ্রকৃতি, অধিকার, স্বাধীনতা, আইন, সম্পত্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত ধারণা কেমন ছিল এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এগুলোর ধারণা কেমন তার তুলনা করা যায়। তিনজন চুক্তিবাদী দার্শনিকই প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতির ধারণার সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের মত বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে আধুনিককালে রাষ্ট্র কীভাবে ধর্মীয় ভিত্তি থেকে মুক্ত হয়ে যৌক্তিক ভিত্তির সাহায্যে শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, কর্তৃত্বপরায়ন ও জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে।

টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯)

সতের শতকের ব্রিটিশ দার্শনিক টমাস হবস আধুনিককালের প্রথম চুক্তিবাদী দার্শনিক। তিনি ছিলেন নবজাগরণের সময়কালের শেষ দার্শনিক এবং রাষ্ট্রদর্শনে তিনি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রচিন্তা প্রদান করেছেন। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার পতন এবং বুর্জোয়া অর্থনীতির আবির্ভাবকালীন সময়ে হবসের রাষ্ট্রচিন্তা আবর্তিত হয়েছে। তিনি প্রথম আধুনিক রাষ্ট্রদার্শনিক যিনি রাষ্ট্র, রাজনীতি ও মানবচরিত্র সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রদর্শনকে বস্তুবাদী তথা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন।[১]

হবস-এর *লেভিয়াথান* গ্রন্থ আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে কর্তৃত্ববাদী জাতীয় রাষ্ট্রের একটি বড় দলিল, যেখানে তিনি জনগণের হাতে নয় শুধুমাত্র শাসকের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ ইহজাগতিক তথা লোকায়ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এখানে একদিকে ধর্মের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে আবার অন্যদিকে রাজনীতির কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শাসক একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনসমর্থন গুরুত্বহীন বরং শাসকের কর্তৃত্বই মুখ্য। অবশ্য হবসের পূর্বে ম্যাকিয়াভেলিই প্রথম এ মত প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ম্যাকিয়াভেলি প্রবর্তিত আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রচিন্তাকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে হবস সামাজিক চুক্তির ধারণার সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্বরূপের এক সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

গৃহযুদ্ধের পরবর্তীতে রচিত বিখ্যাত *লেভিয়াথান* গ্রন্থে তিনি গৃহযুদ্ধের ভীতিকর পরিস্থিতির ধারণা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা তুলে ধরেছেন। হবসের মতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তাঁর এ বক্তব্য থেকে আর্থার মেলজার মনে করেন, মানুষের এধরণের প্রকৃতির জন্য এমন একজন চরম শাসক কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত যে শাসক মানুষকে কঠোর হস্তে শাসন করবে।[২] গৃহযুদ্ধের ভীতিকর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন পাওয়া যায় তাঁর প্রকৃতির রাজ্য এবং মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায়।

ডি সিভ গ্রন্থে তিনি রাজার সার্বভৌম ক্ষমতাকে এবং চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। রাজার নীতির প্রতি বিরোধিতা পোষণের জন্য তিনি পার্লামেন্টের প্রতি বীতশ্রদ্ধও ছিলেন। রাজার সাথে তৎকালীন পার্লামেন্টের বিরোধ দেখা দিলে তিনি রাজার চরম ক্ষমতাকে সর্মথন দেন। পরবর্তীতে তিনি *লেভিয়াথান* গ্রন্থে তাঁর পূর্ববর্তী মতকে আরো সুদৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের সাথে যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তুমুল সংঘাত চলছিল গৃহযুদ্ধের সে সময়কালে হবসের আর্বিভাব। তাঁর কর্মময় জীবন ও লেখনীতে দেখা যায় তিনি কখনো রাজশক্তির আনুকুল্য পাচ্ছেন আবার কখনো উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে হবস চিত্রিত নেতিবাচক ধারণা সম্পর্কে ম্যাকনেলি মনে করেন, হবস সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার এমন একটি সময়কালে অবস্থান করেছেন যে, তাঁর কাছে এসকল অসুবিধা পরিহার করাটা মুখ্য ছিল।[৩]

প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে হবস তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার যে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে জানা দরকার। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ডেকার্ট, ইউক্লিড, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও প্রমুখের প্রভাব লক্ষণীয়। চুক্তিবাদীদের মধ্যে হবস রাষ্ট্রচিন্তায় যে জড়বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। অবশ্য তাঁর চিন্তায় বৈজ্ঞানিক প্রকাশ আকস্মিক বলা যাবে না। কারণ রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ফলে সমাজ, দর্শন, শিল্প-সংস্কৃতি তার বিমূর্ত বলয় ভেঙ্গে যেমন মূর্তমান হয়েছে তদ্রুপ জ্ঞানের রাজ্যেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্পর্শ লেগেছে। ফলে হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় পাওয়া যায় বিজ্ঞানমনস্কতা। পাশাপাশি মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিকতার প্রভাব থেকে তিনি তাঁর দর্শনকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন।

হবসের বস্তুবাদে ডের্কাটের সংশয় পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যেমন প্রভাব রয়েছে সেই সাথে রয়েছে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতত্ত্ব, কোপার্নিকীয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং গ্যালিলিওর গতিতত্ত্বের প্রভাব। এসবের সাহায্যে হবস তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার জড়বাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তিনি ব্রিটিশ অভিজ্ঞাতাবাদের এমন একজন দার্শনিক যিনি একই সঙ্গে গণিত এবং অভিজ্ঞতাবাদকে গ্রহণ করেছেন। হবসের পূর্বে আমরা যদি কান্টীয় দর্শনের দিকে তাকাই তাহলে দেখি কান্ট গাণিতিক জ্ঞানকে অভিজ্ঞতাপূর্ব বলে গ্রহণ করেছেন। হবস ইউক্লিডীয় জ্যামিতির দ্বারা সমাজ পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। গ্যালিলিওর গতির ধারণা দ্বারা জড়বস্তুর সাথে মানব চরিত্রের সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন। হবস চেয়েছেন তাঁর তত্ত্ব হবে বৈজ্ঞানিক, অভিজ্ঞাতানির্ভর নয়।[৪]

হবস জগতের সব কিছুকে বস্তু বলে গণ্য করেছেন। মানুষও বস্তু। মানুষের দেহ বস্তুর সমষ্টি। জগতের প্রাণময় এবং প্রাণহীন সকল সত্তা বস্তু এবং গতিসম্পন্ন। হবসের মতে, মানুষের মধ্যে যেমন প্রাণ রয়েছে তদ্রুপ যন্ত্রপাতির মধ্যেও প্রাণ রয়েছে। তবে যন্ত্রপাতির প্রাণ কৃত্রিম।[৫] এ ধারণা থেকে হবস রাষ্ট্রকে বস্তু বলে মনে করেন এবং একে লেভিয়াথান নামে অভিহিত করেন। লেভিয়াথান একটি মানবসৃষ্ট কৃত্রিম বস্তু, কৃত্রিম সংগঠন। এ সংগঠনের প্রাণ আছে। এর প্রাণ হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্বকে তিনি লেভিয়াথানের আত্মা (কৃত্রিম) মনে করেন। রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। লেভিয়াথান একটি কৃত্রিম দেহ হলেও মানুষের মতো জন্ম, বৃদ্ধি ও বিনাশ আছে। কাজেই রাষ্ট্র কোনো ঐশী প্রতিষ্ঠানও নয়, আবার কোনো শাশ্বত প্রতিষ্ঠানও নয়, এটি মানবসৃষ্ট একটি কৃত্রিম যন্ত্র। এ লেভিয়াথানের অসীম ক্ষমতা। এটি সাধারণ মানুষের কাছে জবাবদিহি করে না, এটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। হবস যদিও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না তবুও তিনি ঈশ্বরের সাথে লেভিয়াথান-এর ক্ষমতাকে তুলনা করেছেন এবং একে তিনি মরণশীল ঈশ্বর (Mortal God) নামে অভিহিত করেছেন।

প্রকৃতির রাজ্য

তৎকালীন ইংল্যান্ডের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজের পুন:প্রতিষ্ঠায় হবসীয় ধারণা (যদিও জটিল) বেশ শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। হবস উত্থাপিত প্রকৃতির রাজ্যের ধারণা হবস বিরোধীদের জন্য মূলত আদর্শিক অস্ত্র। হবস অংশত ঐতিহাসিক এবং স্বীয় দার্শনিক অবস্থান রেখেছেন, অংশত নৃতাত্ত্বিক প্রমাণের আবেদন এবং সাধারণভাবে তার পাঠকদেরও সাংস্কৃতিক অন্ধবিশ্বাসে সকল বিষয় দ্বারা প্রভাবিত বলে অ্যাশক্রাফট মনে করেন।[৬] হবসের লেখনীতে আদিম এবং নৈরাজ্যবাদীদের সমার্থক রূপে ইংরেজ সমাজে 'সভ্যতা' এবং শৃঙ্খলা সন্নিবেশিত হয়েছে। অ্যাশক্রাফট হবসকে অনুধাবনের জন্য তার বিরোধী মতসমূহও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাঁর মতে, ফিলমার এবং হবস ব্যতীত যেমন লক হতে পারে না, তদ্রুপ হেগেল এবং এডাম স্মিথ ব্যতীত মার্ক্স হতে পারে না।[৭]

হবসের প্রকৃতির রাজ্য ছিল প্রাক-সামাজিক এবং প্রাক-রাজনৈতিক। এটি তাঁর একটি অনুমিত ধারণা বা প্রাক-কল্পনা। প্রকৃতির রাজ্যের কোনো বাস্তব ভিত্তির কথা তিনি বলেননি। অবশ্য হবস ও লক কখনো কখনো প্রকৃতির রাজ্যের বাস্তব অস্তিত্বের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন। যেমন হবস তৎকালীন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের বর্ণিত জীবনকে প্রকৃতির রাজ্যের সাথে তুলনা করেছেন।[৮] এদের কোনো সরকার ছিলনা, সভ্যতা ছিলনা, এরা ছিল বর্বর প্রকৃতির।[৯] এধরণের কল্পিত চিত্র থেকে সমাজব্যবস্থার গোড়াপত্তন, প্রাকৃতিক সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে পদার্পনের তথা একটি রাষ্ট্র সৃষ্টির রূপরেখা তাঁরা প্রণয়ন করেছেন।

মানুষ পুরোপুরি তার আচরণের দাস নয়। সে তার যুক্তিবাদিতা দ্বারাও পরিচালিত হয়। তাই প্রকৃতির রাজ্যের দুর্বিষহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে প্রজ্ঞা বা যুক্তিবাদিতা দ্বারা জনগণ সঠিক নির্দেশনা পায় এবং অসহনীয় অবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

হাত থেকে মুক্তি খোঁজে। যুক্তিবাদিতা দ্বারা ব্যক্তি শান্তি অন্বেষণ করে। এই প্রজ্ঞা বা যুক্তিবাদিতাকে হবস বলেছেন 'articles of peace' বা প্রাকৃতিক আইন (laws of nature)।[১০]

হবসের প্রকৃতির রাজ্য ছিল সভ্যতা বিবর্জিত একটি অবস্থা। তিনি প্রকৃতির রাজ্যকে যুদ্ধাবস্থা বলে গণ্য করেছেন। এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রতিনিয়ত সংঘাত লেগে থাকত। মানুষের সাথে মানুষের বিদ্বেষ, হিংসা, অশান্তি, অবিশ্বাস, শত্রুতার এক দুর্বিষহ অবস্থা বিরাজ করত।[১১] হবসের ভাষায় প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের কোনো সাধারণ বা সার্বিক ক্ষমতা ছিল না। একটি ভীতিকর পরিবেশে তারা বাস করত; যাকে তিনি যুদ্ধের রাজ্য বা যুদ্ধাবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। এ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যেকের শত্রু। ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করতে পারত অর্থাৎ অন্যকে আক্রমণ, অপরের সম্পত্তি হস্তগত, অন্যকে হত্যা করায় কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করত না। জীবনের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল না। কোনো সংস্কৃতি ছিল না, তাই কোনো সভ্যতাও ছিল না। নৌ যোগাযোগ ছিল না, তাই তাদের পণ্য পরিবহন, আমদানি-রপ্তানির জন্য কোনো যানবাহন এবং মেরামতের জন্য কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না। প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছিল না, সময়, সমাজ, শিল্পকলা, কোনো বিষয়েই জ্ঞান ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সব সময় বিপদ এবং মৃত্যুর ভীতি বিরাজ করত। এক কথায় মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, নোংরা, পাশবিক এবং ক্ষণস্থায়ী।[১২]

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সম্পদের কোনো ধারণা ছিল না। কোনো সাহায্য-সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব ছিল না। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থকরণে অন্যকে আক্রমণ, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং অপরকে হেয় করার প্রবৃত্তি ছিল। মানুষ কেন পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে না–এ সম্পর্কে হবস ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মৌমাছি ও পিপীলিকার উপমা টেনেছেন। এদের পরস্পরের মাঝে প্রকৃতিগতভাবেই ঐক্য রয়েছে। এরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত নয়। আবার শ্রদ্ধা বা সম্মানের জন্য লালায়িত নয়। কর্তৃত্বকারীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এরা কৌশল ব্যবহার করে না। পক্ষান্তরে মানবসমাজে এর বিপরীত দৃশ্য লক্ষণীয়। প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ ও মানসিকতা ব্যক্তির মাঝে সর্বদাই বিরাজমান।

প্রকৃতির রাজ্যের দুর্বিষহ, অসহনীয় অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয় এবং একজন কেন্দ্রীয় শাসকের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সামাজিক চুক্তির দ্বারা জনগণ স্বীয় অধিকার স্বেচ্ছায় সমপর্ণ করে তৃতীয়পক্ষ বা সার্বভৌমের কাছে। এভাবে জন্ম নেয় রাজনৈতিক শক্তি। হবস মনে করেন শাসক হবেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অন্যথায় তিনি যুদ্ধাবস্থার নিরসন করতে পারবেন না। সার্বভৌম শাসক প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রকৃতির রাজ্যের অবিরাম যুদ্ধের অবসান ঘটায়; অভ্যুদয় ঘটে একটি রাজনৈতিক সমাজের।

যদিও বার্ট্রান্ড রাসেল এ চুক্তিকে কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করেন না।[১৩] হবসের চুক্তির বর্ণনায় যে যুক্তি তা রাসেল অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তি মানুষ কেন শাসক নামক কর্তৃপক্ষের কাছে স্বাধীনতা হস্তান্তর করে এবং কেন জনগণের স্বাধীনতা হস্তান্তর করা উচিত সে ব্যাখ্যাকে বৈধতা দানের জন্য হবস সামাজিক চুক্তির প্রেক্ষাপটরূপে প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতিকে চিত্রিত করেছেন। শাসকদের কাছে স্বাধীনতা হস্তান্তর দ্বারা দুর্বিষহ অবস্থা থেকে স্বীয় জীবনকে নিরাপদ রাখতে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়। এভাবে হবসের প্রকৃতির রাজ্যে শাসকের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

হবসের প্রকৃতির রাজ্যকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্যের লেখকগণ, যেমন– গথিয়ার প্রাক-কল্পনা নির্মাণ, যৌক্তিক বিমূর্ততা, পদ্ধতিগত ছক ইত্যাদি বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন।[১৪] আবার স্যাবাইন মনে করেন হবসের প্রকৃতির রাজ্য প্রকৃতবিচারে কোনো বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ নয় এবং ইতিহাস কিংবা নৃতত্ত্ব কোনোটির সাথেই সম্পর্কিত নয়।[১৫] তবে গথিয়ার, স্যাবাইনের মতের বিপরীত মত পাওয়া যায় ওয়ারেন্ডার,[১৬] হুড,[১৭] রিচার্ড

Dhaka University Institutional Repository

পিটার্স[১৮] প্রমুখের কাছে। যেমন, ওয়ারেন্ডার মনে করেন, 'হবসের প্রকৃতির রাজ্য হলো ঐতিহাসিকভাবে স্বত:সিদ্ধ অপেক্ষা যৌক্তিকভাবে স্বত:সিদ্ধ।'

প্রকৃতির রাজ্যের যুদ্ধাবস্থা যতটা না স্বাধীনতার জন্য তার চেয়ে অধিক ছিল শ্রেষ্ঠত্বের, ক্ষমতার লড়াই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তার করতে চাইত, নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চাইত। মানুষ স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু সর্বদাই অন্যকে অধীনস্থ করে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও বীরত্ব জাহির করতে চায়। কাজেই মানুষের মধ্যে বরাবরই এক সাংঘাতিক কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা কাজ করে। এর দ্বারা ব্যক্তির স্বার্থপর প্রবৃত্তি আত্মসুখ অন্বেষণ করে। অপরের সুখ ও স্বার্থকে পরোয়া করে না। স্বার্থপরতা ও কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার কারণে প্রকৃতির রাজ্য ও রাজনৈতিক সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন পড়ে শাসক, আইনের।

হবসের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ কোনো ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করেছে এমনটা জোরালো ভিত্তিতে দাবি করা যায় না। বরং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় এবং মৃত্যুভীতি এড়াতে অধিকতর শক্তিশালী কোনো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করে। প্রকৃতির রাজ্যে তারা অন্যায্য বিষয়কে কেন্দ্র করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত। যুদ্ধের মূল অস্ত্রই ছিল শক্তি এবং প্রতারণা। এ দুয়ের সাহায্যে যে কোনো মূল্যে তারা অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করতে চাইতো। যদিও হবস বলেন সকল মানুষ জন্মগত বা প্রকৃতিগতভাবে সমান। বলা যায়, প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতা অপেক্ষা শান্তি ও নিরাপত্তা অগ্রগণ্য ছিল। ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীনতা পিয়াসী কিন্তু অপরের স্বাধীনতা হরণে আনন্দিত। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর মানুষ তাই যুদ্ধাবস্থায় মুক্তি খুঁজেছে রাজনৈতিক সমাজের চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন শক্তির কাছে। এ সম্পর্কে ম্যাকফার্সন বলেন, হবস ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক অর্থনীতি এবং সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সার্বভৌম ক্ষমতার মতো চরম ক্ষমতার দ্বারা।[১৯]

হবসের প্রকৃতির রাজ্যকে যদি কেবল একটি বিশ্লেষণী গঠন রূপে দেখা হয় তবে তার যুক্তির কিছু দিক উহ্য থেকে যায়। যেমন হবস কেবল এরিস্টটলীয় বিশ্বতত্ত্বের ধারণাকে বর্জন করলেন না সেসাথে তিনি গ্রহণ করলেন প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বকে যাতে তিনি মানুষের কেবল সদগুণাবলী সমূহের পরিবর্তে প্রবৃত্তিগতভাবে ব্যক্তি কতটা হীন বা স্বার্থপর, ক্ষমতালোভী এ সমস্ত বিষয়কে সামনে এনেছেন। এছাড়াও মানবপ্রকৃতি ও প্রকৃতির রাজ্যের এ বিশ্লেষন থেকে আরেক দিক সামনে এসেছে যাতে সরকারের উৎপত্তি কীভাবে হতে পারে (সম্মতির ভিত্তিতে নাকি বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে নাকি পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের ভিত্তিতে) তা উঠে এসেছে (হবস মনে করেন সরকার অবশ্যই সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত)।[২০] মানুষ এবং পশুর মধ্যে প্রবৃত্তিগতভাবে বিশেষ কোনো তফাৎ নেই বরং তাদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী দিক হলো যখন তারা একটি রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করে। এভাবেই হবস মানুষের জন্য একপ্রকার "কৃত্রিম বিনির্মাণ"–এর কথা বলেন যা ঈশ্বর কর্তৃক বা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট নয়। বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনীয়তার কারণে ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজ নামক কৃত্রিম সংগঠনের দিকে ঝুঁকেছে।[২১] মানুষ এবং পশুর মধ্যেকার জীবনের তফাৎরূপে যদি আমরা সমাজবদ্ধ অবস্থাকে চিহ্নিত করি তাহলেও বলতে হয় পশুকুল যতটা সংঘবদ্ধ অবস্থায় বসবাস করে তা তাদের জন্য পর্যাপ্ত কিন্তু মানুষের জন্য সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে চুক্তি যা তাদের সংঘবদ্ধ রাখতে এবং থাকতে সহায়তা করে। যখন ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করে তাহলে আইনও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। হবস মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মাঝে পরিবার বা সংবদ্ধতা থাকলেও নিরাপত্তাবোধ ছিল না।[২২] প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ পরিবারের সদস্য হতে পারে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চুক্তিবদ্ধ না হয়ে, কোনো সার্বভৌম শক্তির অধীনে না আসল ততক্ষণ তারা সত্যিকারের মানুষ নয়।[২৩] কাজেই হবস মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ঐশী মত কিংবা এরিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এর কোনটি অস্বীকার করেননি তবে তিনি এগুলোর পুর্নসংজ্ঞায়ন করেছেন। যা দ্বারা তিনি রাজনৈতিক সমাজের উৎপত্তিকে তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানবপ্রকৃতি

হবস মানুষ বলতে ব্যক্তি (Individual)কে নির্দেশ করেছেন। এতে সকল মানুষের আচরণকে সাধারণীকরণ না করে একক ব্যক্তির আচরণগত দিকের পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যক্তির চরিত্রের পরিবর্তনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায় হবসের চিন্তায়। তিনি মনে করেন কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা বা জ্ঞান জন্মায় তা মূলত ঐ বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে আমাদের সংবেদনশীলতা থেকে উদ্ভূত। সংবেদনশীলতা আসে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। বস্তুর গুণাবলীসমূহ যখন সংবেদনে ধরা দেয় তখন তা গতিময় হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই সংবেদন অভিজ্ঞতানির্ভর। অভিজ্ঞতাবাদী হিসেবে হবস সহজাত ধারণাকে স্বীকার করেননি। তাই বুদ্ধি সহজাত–প্লেটোর এ ধারণার সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। হবস মনে করেন বুদ্ধি পরিশ্রমলব্ধ তথা অভিজ্ঞতালব্ধ। বুদ্ধি যদি সহজাত হতো তবে সকল মানুষের বৌদ্ধিক সক্ষমতা একস্তরে হতো। পরিপক্ক বুদ্ধি এবং অপরিপক্ক বুদ্ধি বলে কিছু থাকত না। গতি সম্পর্কিত আলোচনায় হবস আরো বলেন গতিরই একটি অংশ চেষ্টা। যে চেষ্টা সফলতা দেয় সেটা কামনা। যে চেষ্টা সফলতা প্রদান করে না তা ব্যর্থতা নিয়ে আসে, বিরাগ কাজ করে। কামনা এবং বিরাগের একটি শক্তিশালী রূপ হলো সংকল্প। সংকল্পই ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করে। তাই ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ধারণার সাথে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। এভাবে হবস বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং পূর্বনির্ধারণবাদ দ্বারা মানবচরিত্র আলোচনা করেন।[২৪]

পূর্বনির্ধারণবাদ অনুযায়ী মানুষের সকল আচরণ ও কর্মকাণ্ড পূর্ব থেকেই নির্ধারিত। মানুষের আচরণ বস্তুর গতির নিয়মে ক্রিয়াশীল। কোনো অলৌকিকতা দ্বারা বা কারো ইচ্ছা মাফিক নিয়ন্ত্রিত নয়। মানুষ একটি যন্ত্র, তার রয়েছে স্বাভাবিক গতি; সমাজও যন্ত্র, মানুষ কর্তৃক চালিত, এর গতি যান্ত্রিক। হবস গ্যালিলিওর গতিসূত্রকে মানবপ্রকৃতিতে আরোপ করেন। তাঁর মতে মানুষ নিজেও একটি জড় সত্তা, তবে এ জড়েরও গতি রয়েছে, আবেগ হলো তার গতি। আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণে মানবপ্রকৃতি গড়ে ওঠে।[২৫]

হবস মনে করেন মানুষের ইচ্ছা নিয়মের অধীন। গতির নিয়মে পরিচালিত ব্যক্তির গতিশীল ক্রিয়াকে আমরা বলি প্রচেষ্টা। কোনো বস্তু লাভের প্রচেষ্টা হলো আকাঙ্ক্ষা, এবং কোনো বস্তুর প্রতি অনাগ্রহ হলো বিতৃষ্ণা।[২৬] গতি যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। সেই অর্থে মানুষের ইচ্ছারও কোনো স্বাধীনতা নেই। কারণ তার আচরণ, ইচ্ছা, অভিব্যক্তি সমস্তই গতির নিয়মের অধীন।

মানবচরিত্র বিশ্লেষণে হবস আত্মগত মূল্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো বস্তুর আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ক্ষমতার ওপর যদি বস্তুর ভালো-মন্দ নির্ভর করে তাহলে আমরা বস্তুটির স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সেটির মূল্য নিরূপন করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির দ্বারা করি।[২৭] বস্তুর ভালো-মন্দ ব্যক্তি কর্তৃক আরোপিত, বাস্তব অবস্থা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় না। এভাবে আমরা বস্তু সম্পর্কে একটি আত্মগত ধারণা পাই, যা অভিজ্ঞতার সাথে পরিবর্তনশীল। হবসের মানবচরিত্র বিশ্লেষণে আমরা তাঁর সুখবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় পাই। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যের দুর্বিষহ, ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চায়। সুখ ও শান্তির লক্ষ্যে প্রকৃতির রাজ্যে উত্তরণ ঘটায়। ব্যক্তিকে যা সুখ দেয় ব্যক্তি তা-ই কামনা করে। সুখের প্রশ্নে ব্যক্তি স্বভাবতই স্বীয় সুখের অন্বেষণ করে। সে লক্ষ্যে ব্যক্তি অন্যের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। অপরের সুখের বিষয় ব্যক্তির কাছে গৌণ, নিজের সুখ অন্বেষণ করতে গিয়ে ব্যক্তি অপরের সাথে সংযুক্ত হয়। অপরের স্বার্থ সংরক্ষণে নয়।

হবসের মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায় তিনি এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তীকালে মানবচরিত্র সম্পর্কে যে আদর্শমণ্ডিত ধারণা সেটিকে সম্পূর্ণভাবে বদলে দেন, যাকে বিশপ ব্রামহলো বলেছেন 'সত্তাতাত্ত্বিক হ্রাসবাদ' (Ontological reductionism)।[২৮] হবসের প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতির চিত্র বিশ্লেষণে তাঁর পূর্বে প্রকৃতিতে যে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য, সামঞ্জস্য প্রায়শই পাওয়া যায় এর বিপরীতে এক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিশৃঙ্খলা, স্বার্থপরতার চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। তিনি মানুষের মহত্বের পরিবর্তে স্বার্থপরতার বৈশিষ্ট্য অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। অবশ্য মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে হবসীয় এধরণের নেতিবাচক ধারণার কিছুটা পূর্ব ধারণা লক্ষ করা যায় ক্যালভিনিজমে। [এ ধর্মমতে মনে করা হয় ধর্ম ব্যতীত বা ধর্মীয় আশ্রয় সহযোগিতা ব্যতীত মানুষ পশুর মতই বন্য এবং বিশৃঙ্খল প্রাণী।] মানুষও পশুর মতো প্রবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত।[২৯] এ থেকে বোঝা যায় প্রকৃতির রাজ্যে বিশৃঙ্খল জনতার মাঝে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উচ্চতর শক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। ক্যালভিনের মতে, কোনো শহর বা নগরী ম্যাজিস্ট্রেট বা পলিটি ব্যতীত কাজ করতে পারে না।[৩০]

হবস মানবপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে তিনি গ্যালিলিওর গতিসূত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর মতে মানুষ হলো জড় আর তার আবেগ গুলো গতি। আবেগ ও যুক্তির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে ব্যক্তির স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক আকাঙ্খা। তাঁর মতে ইচ্ছা গতির নিয়মে পরিচালিত। মানুষ হলো একপ্রকার বস্তু এবং ইচ্ছা হলো তার গতি। গতিশীল ক্রিয়াকে তিনি বলেছেন চেষ্টা। কোনো বস্তু লাভের প্রয়াস হলো আকাঙ্খা এবং কোনো বস্তুর প্রতি আমাদের অনীহা হলো বিতৃষ্ণা।[৩১] মানবপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে হবসের ব্যাখ্যায় এক প্রকার দ্বান্দিকতা লক্ষণীয়। যেমন–ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণাকে যদি আমরা নয় প্রতিনয় মনে করি তাহলে সমন্বয় হলো গতি। এই গতি যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। এ থেকে বলা যায় মানুষের ইচছার স্বাধীনতা নেই, তার আচরণ নিয়মের অধীন এবং তা হলো গতির নিয়ম। বস্তুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ক্ষমতার ওপর আমরা বস্তুটিকে ভালো-মন্দরূপে সংজ্ঞায়িত করি। কোনো বস্তুর স্বীয় বৈশিষ্ট্যে আমরা সেটির মূল্য নিরূপণ করি না। বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে আত্মগত হয়ে পড়ে। বস্তুর ভালোত্ব-মন্দত্ব ব্যক্তি আরোপ করে। এগুলো বস্তুর মধ্যে অবস্থিতির অনুরূপ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। বলা যায় আমরা বস্তুর মূল্য সম্পর্কে একটি আত্মগত ধারণা পাই, বস্তুগত ধারণা নয়। হবস মানুষের আত্মগত মূল্যের গুরুত্ব দিয়েছেন। বস্তুর ভালো-মন্দ গুণাবলীর সাথে মানুষের আকাঙক্ষা ও বিতৃষ্ণা নির্ভরশীল।

হবসের মতে, মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির যাবতীয় প্রচেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা ও বিতৃষ্ণা। ক্ষমতাপ্রাপ্তি ব্যক্তির সফলতা-ব্যর্থতার নির্দেশক। হবস মনে করেন মানুষের ঈপ্সিত বস্তু হলো ক্ষমতা, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষ পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। তিনি প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের যুদ্ধংদেহী অবস্থার পেছনে তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন, যথা– প্রতিযোগিতা, আস্থাহীনতা, সম্মান/গৌরব; এগুলোর পেছনেও রয়েছে ক্ষমতা।[৩২]

প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তৈরি করে। যে কোনো মূল্যে ব্যক্তি সফলতা চায়। ক্ষমতার লিপ্সা প্রতিযোগিতাকে ঘনীভূত করে। হবস মনে করে মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সমান। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, শারীরিক ও মানসিকভাবে যদি সবাই সমান হয় তাহলে কেউ অধিক শক্তিশালী, কেউ অধিক মেধাবী রূপে বিবেচনার সুযোগ থাকে কিনা। এর উত্তরে হবস মনে করেন শারীরিক ও মানসিকভাবে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির কিছু তফাৎ থাকতে পারে। যেমন, কেউ অধিক শক্তিশালী আবার কেউ অধিক বুদ্ধিমান। কিন্তু তা হলেও যে অধিক গুণাবলীসম্পন্ন সে সর্বদা জয়লাভ নাও করতে পারে। হবসের প্রকৃতির রাজ্যে এধরণের চিত্র লক্ষ করা যায়। তিনি যা বলেছেন তা বর্তমান মানবসমাজের প্রেক্ষাপটেও প্রযোজ্য। প্রকৃতির রাজ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। চরম শক্তিশালী ব্যক্তিও অত্যন্ত দুর্বল ব্যক্তির কাছে পরাস্ত হতে পারে। এভাবে হবস বোঝাতে চাইলেন শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই মানুষ সমান।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা। সম্মানের সাথে ক্ষমতা ও সুখ জড়িত। অন্যদের চেয়ে অধিক গৌরব বা সম্মান প্রাপ্তির আশায়, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো। ক্ষমতা ও দুখের স্পৃহা দ্বারা ব্যক্তি ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মুক্তি পেতে চাইত। হবসের মতে, "আমি সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

মানবজাতির একটি সাধারণ প্রবনতার দিকে আলোকপাত করছি; তা হলো ক্ষমতার অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা, একমাত্র মৃত্যুতেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এর কারণ এই নয় যে মানুষ ইতিমধ্যে যে সুখ লাভ করেছে, তার চেয়ে আরো তীব্র সুখের কামনা করে; অথবা সে পরিমিত ক্ষমতায় তুষ্ট থাকতে পারে না; বরং এর কারণ এই যে, সে অর্জিত ক্ষমতা ও ভালোভাবে জীবন যাপনের পন্থাকে অধিকতর ক্ষমতা অর্জন ব্যতীত নিরাপদ ও সুনিশ্চিত করে তুলতে পারে না।"[৩৩]

হবসের মতে, মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। তাই স্বীয় স্বার্থেই মানুষ সামাজিক জীবনের সন্ধান করে। আরাম আয়েশ ও নিরাপত্তার সাথেই জড়িত ব্যক্তিস্বার্থের লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন। প্রকৃতির রাজ্য ছিল প্রাক-সামাজিক অবস্থা। প্রকৃতির রাজ্যে কোনো আইন ছিল না। হবসের মতে, সামাজিক ও নৈতিক সত্তারূপে নয় মানুষ নমনীয় হয়েছে ক্ষমতার কাছে। এ ক্ষমতা কোনো নৈতিক অনুশাসনের নয়, আইনগত ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বসম্পন্ন ক্ষমতা। প্রাথমিক অবস্থায় হবসের কাছে ব্যক্তির নৈতিক প্রবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাকে জনসমর্থনের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে হবস আধুনিক সমাজের প্রশাসনিক গতি নির্ধারণ করলেন। ক্ষমতার সাথে সমর্থন যুক্ত করে হবস একে কর্তৃত্বে পরিণত করলেন। ক্ষমতা যতক্ষণ কর্তৃত্বসম্পন্ন না হয় ততক্ষণ তা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব বিধান করতে পারে না; আবার এ ক্ষমতা যখন জনসমর্থন লাভ করে তাহলে বৈধতা পেয়ে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে। হবস মনে করেন, নৈরাজ্যবাদ অপেক্ষা স্বৈরাচারী শাসক শ্রেয়োতর।

হবস মানুষের চরিত্রে সুখকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যে বস্তু বা বিষয় ব্যক্তিকে সুখ দেয় ব্যক্তি সেটা কামনা করে। যা স্পষ্টতই সুখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তি স্বভাবতই স্বীয় সুখের অন্বেষণ করে, ফলে সে অপরের সুখের বিষয় গুরুত্ব দেয় না। এ থেকে বলা যায় মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। এ বিবেচনায় হবসকে একজন আত্ম সুখবাদী বলা যায়। তিনি মনে করেন নৈতিক গুণাবলী অভিজ্ঞাতাপূর্ব নয়। মানুষের মৌলিক প্রবণতাই হচ্ছে আত্মরক্ষা। আমরা যা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তার সম্মুখীন হই, তা মোকাবেলা করি। যেমন–যা আনন্দ দেয় তা প্রাপ্তির জন্য আমরা কাজ করি এবং আমরা আকাঙ্ক্ষা, ভালোবাসা ইত্যাদি নামে অভিহিত করি। পক্ষান্তরে যা আমরা বেদনাদায়ক বোধ করি তা পরিহার করি; সেসব আমাদের মধ্যে ঘৃনা এবং রাগ সৃষ্টি করে। বেদনা, ঘৃণা, রাগ এসব বৈশিষ্ঠ্যসমূহ হলো না পাওয়া বা ব্যর্থতার। এগুলো মূলত ক্ষমতাহীনতার বহি:প্রকাশ। ক্ষমতাহীনতা ব্যক্তির মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে হবসের বিস্তৃত আলোচনা আমরা পাই তাঁর প্রকৃতির রাজ্যের আলোচনায়। ভালোবাসা-বেদনা এসবের চক্রাকার আবর্তনে তিনি কোনো পরম ভালো বা চরম মন্দকে স্বীকার করেননি। তিনি মনে করেন চরম মন্দ মানব মনের কল্পনা মাত্র। হবসের সুখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে আমরা বলতে পারি ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয় ব্যক্তির পরিতৃপ্তি বা অসন্তুষ্টির প্রেক্ষিতে।[৩৪]

দুর্বিষহ, ভীতিপ্রদ প্রকৃতির রাজ্য থেকে মানুষ রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্রে পদার্পণ করে। হবসের *লেভিয়াথান*-এ ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি বজায় রাখা শাসকের জন্য মুখ্য। ব্যক্তির ইচ্ছা কিংবা স্বাধীনতার সংরক্ষণ হবসের কাছে গৌণ। শাসক হবেন চরম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু প্রশ্ন হলো প্রকৃতির রাজ্যের ক্ষমতালিপ্সু, বিশৃঙ্খল মানুষ কেন এবং কীভাবে সংঘটিত হলো এবং যুক্তিবাদী হয়ে উঠল। কীভাবে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ শাসন ব্যবস্থা ও সরকারব্যবস্থার প্রবর্তন করল। মানুষের যে নেতিবাচক রূপ হবস অঙ্কন করেছেন তাতে হঠাৎ করে তাদের যুক্তিবাদী হয়ে ওঠার ব্যাপার বোধগম্য নয়। এর এক ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় স্যাবাইনের লেখায়। তাঁর মতে হবসের লোকসমাজ একটি কাল্পনিক সমাজ। এ সমাজের অস্তিত্ব নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সমাজের ব্যক্তিবর্গ সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের আশায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সমাজ সৃষ্টি করে। কাজেই হবসের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট, যে কোনো ধরণের সরকারব্যবস্থার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা এবং জনগণের অধীনতা সমর্থন অত্যাবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

হবসের মানবপ্রকৃতি পর্যালোচনায় আত্মরক্ষার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আত্মরক্ষার স্বার্থে ব্যক্তি বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে সুশৃঙ্খল হতে বাধ্য হয়েছে। হিংসা, স্বার্থপরতা, অবিশ্বাস, আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। স্বীয় প্রয়োজনেই সে অপরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আবার শান্তি লাভের প্রয়াসে স্বাধীনতার সংকোচনে তার আপত্তি নেই। চুক্তির দ্বারা ব্যক্তি যে সমাজ সৃষ্টি করল এর লক্ষ নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব বিধান করা। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজন চুক্তির শর্ত ভঙ্গ না করা। রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভব প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে সভ্যতার উন্মেষ ঘটায়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো, নিরাপদ জীবন নিশ্চিত হলো। এক্ষেত্রে আমরা হবসের আলোচনায় ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে উপযোগবাদের মেলবন্ধন দেখতে পাই। সমাজ স্বার্থপর মানুষের সমন্বিত ফল। রাষ্ট্র ব্যক্তিগত স্বার্থের সামষ্টিক সুরক্ষা দেয়। রাষ্ট্রের উদ্ভব সভ্যতা, সমাজ, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেল। রাষ্ট্র নামক কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান আধুনিক অর্থনীতি বিকাশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা লুপ্ত হয়। নৈতিকতা নয়, আইন গুরুত্ব পায়।

লেভিয়াথান-এ মানবপ্রকৃতি, প্রকৃতির রাজ্য, সমাজ, রাজনীতি, সরকার সমস্ত কিছুর মূলে শেষ পর্যন্ত আমরা পাই ক্ষমতা। মানবচরিত্র বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি, সম্পত্তির অধিকারের চেয়ে ক্ষমতা তথা নিরাপত্তার প্রশ্ন কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সাধারনভাবে মানুষ ক্ষমতা তোষণকারী। যেখানে ক্ষমতা এবং লাভের প্রশ্ন সেখানে ব্যক্তি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়। ক্ষমতাস্পৃহা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব সর্বদা বিদ্যমান। প্রকৃতির রাজ্য থেকে মানুষের রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের পশ্চাতে কেবল নিরাপত্তার প্রশ্নটিই মুখ্য ছিল না; পাশাপাশি ক্ষমতা এবং স্বার্থের কারনে রাজনৈতিক সমাজে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলো। মানুষের সুখ অন্বেষণের পশ্চাতেও কিন্তু ক্ষমতা প্রচ্ছন্ন। ম্যাকিয়াভেলির মতো হবসও মনে করেন মানুষের লক্ষবস্তু হলো ক্ষমতা। ক্ষমতা আস্বাদনের জন্যই ব্যক্তির যাবতীয় প্রচেষ্টা। ক্ষমতার প্রাপ্তি দ্বারাই ব্যক্তির সফলতা-ব্যর্থতা নির্ধারিত হয়। মানুষের ইচ্ছা হলো ক্ষমতা লাভের ইচ্ছা।[৩৫] সকল মানুষের ঈপ্সিত বস্তু হলো ক্ষমতা। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষ পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। হবস প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের যুদ্ধংদেহী অবস্থার জন্য তিনটি বিষয়কে[৩৬] চিহ্নিত করেছেন (প্রতিযোগিতা, আস্থাহীনতা, গৌরব বা সম্মান) সেসবের পশ্চাতেও রয়েছে ক্ষমতা স্পৃহা।

প্রতিযোগিতার কারণে মানুষ পরস্পরকে ছাড়িয়ে যেতে চায়, নিজেকে সেরা দেখতে চায়, অন্যকে অবদমিত করে রাখতে চায়। প্রতিযোগিতা করে অপরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। এসব কিছুর মূলে রয়েছে ব্যক্তির ক্ষমতালিপ্সা। ব্যক্তির মাঝে নিরাপত্তাহীনতা থেকে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়। আস্থাহীনতা ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। কারণ সে চায় স্বীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হোক। সে নিশ্চয়তা বিধানেও ব্যক্তির প্রয়োজন ক্ষমতা। আস্থাহীনতা থেকে সৃষ্ট ভীতি অবসানের জন্য দরকার ক্ষমতা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে গৌরব বা সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা। সম্মানের সাথে ক্ষমতার একটি সংযোগ আছে। যদিও সব ক্ষমতা সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়। গৌরব বা সম্মান প্রাপ্তির আশায় ব্যক্তি পরস্পরের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হয়। ব্যক্তির উদ্দেশ্য এক– তা হলো ক্ষমতা তথা সুখ।

কাজেই বলা যায়, মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রয়েছে ক্ষমতা স্পৃহা। এটা প্রাপ্তির দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে নিরাপদ রাখতে চায়। অন্যথায় ব্যক্তির মাঝে কাজ করে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা। ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে ব্যক্তি সংঘাত-সংঘর্ষে জড়িয়েই থাকে। সংঘাত-সংগ্রাম কেবল উচ্চশ্রেণির মাঝে নয়, সকলের মাঝেই আছে। যেহেতু আকাঙক্ষা এবং ক্ষমতা স্পৃহা সবার মাঝে বিদ্যমান। জ্ঞান, শিল্প, বিশ্রাম, আরাম-সমস্ত কিছুই ক্ষমতা লাভের আনুষাঙ্গিক উপকরণ মাত্র।

শাসনবিহীন এবং কর্তৃপক্ষবিহীন অবস্থায় মানুষের জীবন কেমন ছিল, রাজনৈতিক সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল তা বোঝা যায় হবসের প্রকৃতির রাজ্যের আলোচনায়। পাশাপাশি আমরা লক ও

রুশোর মতবাদে লক্ষ করি একটি উন্নততর ও সুসংবদ্ধ জীবনের জন্য রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজন। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক প্রগতির শর্তরূপে রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে।

জন লক (১৬৩২-১৭০৪)

একজন উদারতাবাদী দার্শনিকরূপে রাষ্ট্রদর্শনে জন লকের পরিচিতি। তিনি ছিলেন জ্ঞানালোক যুগের প্রথম দার্শনিক এবং তাঁকে ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের তাত্ত্বিক উদগাতা বলা হয়। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা হবস অপেক্ষা অধিকতর মানবিক এবং উদারনৈতিক। লক জনগণের সমতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অধিকার ইত্যাদি বিষয়সমূহে জনগণের পক্ষে লেখনী ধারন করেছেন। নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সমর্থক লক তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা, যেমন, শাসক নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহে জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। লকের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি হলো জনসম্মতি পক্ষান্তরে হবসের রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি শক্তি। হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ একপাক্ষিক। লকের চুক্তিতত্ত্বে জনগণের মতের গুরুত্ব স্বীকৃত। স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাই জন লকের সামাজিক চুক্তিকে দ্বিপাক্ষিক বলা যায়। দ্বিপাক্ষিক চুক্তির একটি হয়েছে জনগণের সাথে জনগণের, আরেকটি হয়েছে জনগণের সাথে সরকারের।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন লক অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের একমাত্র উৎসরূপে গ্রহণ করেন এবং সহজাত জ্ঞানের ধারণাকে বর্জন করেন। তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বিচারবিযুক্ত ভাবধারাকে সমর্থন করেননি। *An Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, আবার প্রত্যাদেশজাত জ্ঞানসমূহের যৌক্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন প্রত্যাদেশসমূহকে অবশ্যই যুক্তির নিরিখে বিচার্য হতে হবে। তিনি ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু ধর্মীয় গোড়ামীতে আচ্ছন্ন ছিলেন না। সেই সাথে তাঁর দর্শনে নৈতিকতার বিশেষ স্থান ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি সংসদীয় রাজতন্ত্র সমর্থন করেছেন। এর বৈশিষ্ট্য হলো রাজা, সংসদ, সরকার, রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান সকলে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। নৈতিক বিধি-বিধান ও সাংবিধানিক রীতিনীতি দ্বারা সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। লকের এ ধারণা উদারনীতিবাদের ভিত্তি স্থাপন করে।[৩৭]

লক উদারনৈতিকতাবাদের একটি তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করেন যা পরবর্তীকালে ইংল্যান্ড, ইউরোপ এবং আমেরিকার রাজনীতিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর *Two Treatises On Civil Government* গ্রন্থকে কেউ কেউ মনে করেন ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থনে রচিত। আবার ক্র্যানস্টোন মনে করেন, এ গ্রন্থ মূলত ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে প্রিন্স উইলিয়াম ও মেরীর সমর্থনের উদ্দেশ্যে রচিত।[৩৮]

লকের *Two Treatises On Civil Government* গ্রন্থ দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম *ট্রিটিজ*-এ তিনি রবার্ট ফিলমার কর্তৃক রচিত *Patriarcha* গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন এবং দ্বিতীয় *ট্রিটিজ*-এ তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে রবার্ট ফিলমার তাঁর *প্যাট্রিয়ার্কা* গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি মূলত পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা এবং রাজার ঐশী ক্ষমতার সমর্থনে রচিত। ফিলমার মনে করেন রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। পরিবারে যেমন পিতা সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তদ্রুপ একটি রাষ্ট্রে রাজাই সকলের উর্দ্ধে। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সাধারণ জনগণের দায়িত্ব রাজার আদেশ-নির্দেশ শর্তহীনভাবে মেনে নেয়া। রাষ্ট্র একটি ঐশী প্রতিষ্ঠান। রাজতন্ত্রই হলো সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধাচারন নৈরাজ্যের শামিল। ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয়কে

প্রতিষ্ঠার জন্য ঈশ্বর রাজাকে প্রেরণ করেছেন। রাজার ক্ষমতা চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট নয়, ঈশ্বরের মাধ্যমে প্রাপ্ত। রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন জনগণের পবিত্র দায়িত্ব।

আধুনিক সমাজ রাষ্ট্রকে ঈশ্বরের নির্দেশ নয়, মানুষের সংগ্রামের ফল মনে করে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তার স্থলে ইহজাগতিক লোকায়ত রাষ্ট্রচিন্তা গুরুত্ব পায়। মানুষ স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মবিশ্বসী এবং অধিক যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। এধরণের পরিস্থিতিতে জন লক তাঁর প্রথম *ট্রিটিজ*-এ ফিলমারের *প্যাট্রিয়াকা*-গ্রন্থেরও তীব্র সমালোচনা করেন এবং উদারতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন।

লক তাঁর প্রথম *ট্রিটিজ*-এ মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিকতা এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার অসারতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তিনি হবস প্রবর্তিত সরকারের অসীম, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা বর্জন করেছেন। লক মাতৃতান্ত্রিক দিক থেকে কর্তৃত্বকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন, পরিবারে কেবল পিতাই সব নন, মাতার ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মাতাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পিতা ও মাতার ক্ষমতা সমপর্যায়ের। পিতৃতন্ত্রকে সমর্থন দ্বারা ফিলমার স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

প্রকৃতির রাজ্য

জন লক তাঁর দ্বিতীয় *ট্রিটিজ*-এ প্রকৃতির রাজ্য, মানবপ্রকৃতি, সামাজিক চুক্তি, সরকার, আইন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। হবসের মতো প্রকৃতির রাজ্য যুদ্ধাবস্থা ছিল না। লকের প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তির রাজত্ব। মানুষের জীবন ছিল শৃঙ্খলাপূর্ণ। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা, সম্প্রীতি, এমনকি নৈতিকতাবোধ এবং মানবিকতাও ছিল। হবসের প্রকৃতির রাজ্যে যা ছিল না। লকের প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিল, জনগণ এই আইন মেনে চলত। প্রাকৃতিক আইন নৈতিক বিধি দ্বারা পরিচালিত হতো। প্রাকৃতিক আইন মনুষ্যসৃষ্ট নয়, ঈশ্বর সৃষ্ট। প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান ছিল প্রাকৃতিক আইন, রাজনৈতিক সমাজে এই আইন আর থাকে না। লক বিশ্বাস করতেন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বুঝতে গেলে একজন ব্যক্তির প্রকৃতির রাজ্য ও প্রাকৃতিক আইন থেকে যে রাজনীতির উত্থান ঘটেছে তা বুঝতে হবে।[৩৯]

হবসের সাথে লকের প্রকৃতির রাজ্য এবং মানবচরিত্রের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। হবসের ধারণার সাথে লকের প্রধান পার্থক্য হলো হবসের প্রকৃতির রাজ্য ছিল প্রাক-সামাজিক এবং প্রাক-রাজনৈতিক উভয়ই। পক্ষান্তরে লকের প্রকৃতির রাজ্য প্রাক-সামাজিক নয়, প্রাক-রাজনৈতিক।

হবসের প্রকৃতির রাজ্যের পরিবেশ ছিল অসহনীয়। কিন্তু লকের রাষ্ট্রচিন্তায় এর বিপরীত ছাপ স্পষ্ট। লকের কাছে প্রকৃতির রাজ্য শান্তিময়, সুখের রাজত্ব। মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাবোধ ছিল। এ রাজ্যকে তিনি বলেছেন 'a state of perfect freedom'।[৪০] তাঁর প্রকৃতির রাজ্য অসহনীয়, বিপদসঙ্কুল, ভীতিপূর্ণ ছিল না। বরং প্রকৃতির রাজ্য ছিল যথার্থ সাম্য, স্বাধীনতা, শান্তি, সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার রাজ্য। একটি মুক্ত ও স্বাধীন পরিবেশে মানুষ বাস করত। সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্যসমূহ এখানে বিদ্যমান ছিল। অশান্তি-কলহ যা হবসের প্রকৃতির রাজ্যের নৈমিত্তিক ব্যাপার তা লকের প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায়নি। জনগণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসপ্রবণ ও আস্থাশীল ছিল, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সমতা বিরাজ করত।[৪১]

হবসের রাজ্যে স্বাধীনতা এবং সাম্য ছিল না, কিন্তু লকের রাজ্যে ছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সকলে কমবেশি সমান ছিল। প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করত, তবে তা অবাধ বা যথেচ্ছ নয়। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের এক প্রকার নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ছিল। যা ব্যক্তির যুক্তিবাদিতা ও নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। তাঁর কাছে স্বাধীনতা ছিল অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা, কোনোভাবেই যথেচ্ছাচার নয়। প্রকৃতির রাজ্যের

জনগণের সাম্য, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বও ছিল পারস্পরিক। লক প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে বলেছেন নৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। প্রকৃতির রাজ্যে যুক্তিবাদিতার স্থান ছিল, তাই অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করলেও কেউ স্বেচ্ছাচারী ছিল না। মানুষ যেহেতু যুক্তি ও নৈতিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো তাই অপরের স্বাধীনতায় সে হস্তক্ষেপ করতোনা। নিজের অধিকার ভোগ করতো এবং অপরের স্বাধীনতা উপভোগে সাহায্য করতো। যেহেতু সকলেই সমান তাই কেউ কারো প্রভু নয়। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ছিল না।[৪২]

প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত। আত্মরক্ষার অধিকার ছিল সর্বাগ্রে। কেউ নিজেদের নিরাপত্তাহীন বোধ করতোনা। প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং রাজনৈতিক সমাজের আর্বিভাবে তাদের সে স্বাধীনতা আরো সম্প্রসারিত এবং সংহত হলো। হবসের প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তির অধিকার ছিল না। কিন্তু লকের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতো। সম্পত্তির অধিকার তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতির রাজ্যে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদ জনগণ যার যার প্রয়োজন মতো ব্যবহার ও ভোগ করতে পারত, কিন্তু সম্পত্তি অপচয় করার অধিকার ছিল না।[৪৩] প্রাথমিক অবস্থায় সম্পত্তিতে সকল জনগণের সামষ্টিক অধিকার ছিল। কালক্রমে জনগণ তাদের শ্রম নিযুক্তকরণ দ্বারা সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করল।[৪৪]

প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের যুক্তি, বুদ্ধি ছিলো। কিন্তু লক মনে করেন সুবিচার, নৈতিকতা এ সকল প্রশ্নে জনগণের মধ্যে মাত্রাগত ভিন্নতা ছিল। সম্পত্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিতকরণে [একজন যাতে অপরের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে] প্রাকৃতিক আইনের অভিন্ন ব্যাখ্যাকারী ছিলনা; প্রাকৃতিক আইনের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী না থাকায় আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের কোনো উপযুক্ত বা অভিন্ন কর্তৃপক্ষ ছিল না, আইন কার্যকর করার মতো কোনো কর্তৃপক্ষ ছিল না।[৪৫]

আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানের জন্য কোনো বিজ্ঞ আইনজ্ঞ, আইন কার্যকরী করার জন্য কোনো বিচারক এবং আইন মান্যকারীর জন্য পুরস্কার এবং অমান্যকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডসহ শাস্তিবিধান করার ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত বিচারক ও আইনজ্ঞের প্রয়োজন দেখা দিল প্রকৃতির রাজ্যে। এধরণের কর্তৃপক্ষ সৃষ্টির দ্বারা লকের প্রকৃতির রাজ্যের প্রাক-রাজনৈতিক জনগণ রাজনৈতিক সমাজে পদার্পন করল। এভাবেই তাঁর প্রকৃতির রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও প্রকৃতির রাজ্যে সামাজিক জীবন ছিল। প্রকৃতির রাজ্যে সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ জীবনের লক্ষ্যে লক রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজন বোধ করলেন। সম্পত্তির সুরক্ষার বিধানে জনগণ সৃষ্টি করে সামাজিক চুক্তিদ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ। এ প্রসঙ্গে আমরা গ্রিফিথের মন্তব্য স্মরণ করতে পারি। তিনি রাজনীতিকে বোঝার ক্ষেত্রে লকীয় প্রকৃতির রাজ্য থেকে মানবপ্রকৃতির রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণকে মানুষের বৌদ্ধিক বা যুক্তিবাদী চিন্তার মৌলিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ "The state of nature must be viewed in light of Locke's Theory on human understanding because this philosophical experiment revealed human rational thought as the real basis for understanding politics."[৪৬]

লকীয় প্রকৃতির রাজ্যের যে বর্ণনা আমরা পাই তাতে দুটি প্রশ্ন জাগে। প্রথমত, প্রাকৃতিক আইনের মতো বিধান থাকার পরও তাদের কেন রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজন পড়ল এবং দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যের নৈতিক, সামাজিক, স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের মধ্যে কীভাবে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠিন শাস্তি বিধানের প্রয়োজন পড়ল? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে লক রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভবের কথা বলেছেন। চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি তার অধিকার রাজনৈতিক সমাজ বা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেনি। যা সে ত্যাগ করেছে বা হস্তান্তর করেছে তা হলো শাসন করার ক্ষমতা। কারণ প্রাকৃতিক আইন থাকলেও এ সম্পর্কে তাদের মধ্যে অভিন্ন ব্যাখ্যা ছিল না।

হবসের প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের কোনো অধিকার ছিল না। পক্ষান্তরে লকের প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সমানাধিকার ছিল। মানুষ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। কারণ প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ সমান সুযোগ-সুবিধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করত। হবস ও লক উভয়ের রাজ্যে কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ছিল না। হবসের প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ ছিল অসহিষ্ণু। লকীয় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ ছিল যুক্তিবাদী, সহিষ্ণু। লকের রাজ্য প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত। যেহেতু প্রাকৃতিক আইন ছিল তাই তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন ছিল। প্রকৃতির রাজ্যে কোনো একক ব্যক্তির হাতে ঈশ্বর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব প্রদান করেননি। লকের প্রকৃতির রাজ্যে নৈতিকতার স্থান ছিল, কিন্তু হবসের রাজ্যে তা ছিল না। নৈতিকতার কারণে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ অন্যের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার ক্ষতি করে না বলে লকের ধারণা। কারণ তা ঈশ্বরের সম্পত্তি, যা ব্যক্তির আরাম-আয়েশের জন্য সৃষ্ট, অপচয়ের জন্য নয়।[৪৭]

মানবপ্রকৃতি

মানুষ সম্পর্কে লকের ধারণা হবসের মতো নয়। মানুষের মধ্যে হানাহানি, বিদ্বেষ, স্বার্থপরতা, কর্তৃত্বের লড়াই ছিল না। তবে মানুষের মধ্যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার স্পৃহা ছিল না তা বলা যাবে না। লকের প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন ছিল, যা সামাজিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। হবস তাঁর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে শারীরিক বা দৈহিক ও মানসিক সমতার কথা বলেছেন। লক বলেছেন নৈতিক সমতার কথা। হবস মানব চরিত্রে পেয়েছেন বিদ্বেষ, কদর্যতা, প্রতিযোগিতা, এবং এগুলোই ব্যক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বলে তিনি মনে করেন। পক্ষান্তরে লকের মানবচরিত্র ন্যায়পরায়ণ, সামাজিক। তিনি মানুষের সামাজিকতা, বিচক্ষণতা ও সহিষ্ণুতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, যুক্তিবোধ ছিল বলে তারা প্রাকৃতিক আইন মেনে চলত। কিছুটা ব্যতিক্রম ছাড়া মানবচরিত্র সদর্থক গুনাবলিসম্পন্ন ছিল। তবুও অধিকতর সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছে।

লকের মানবপ্রকৃতির ধারণায় সমতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা হবসের কাছে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। হবস তাঁর বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় ব্যক্তির দৈহিক সাম্যের বিষয় নির্দেশ করেছেন। লক নৈতিক অসাম্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। পক্ষান্তরে রুশো সামাজিক ও নৈতিক উভয় অসাম্যই নির্দেশ করেছেন। সামাজিক সমতার কারণে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করত। নৈতিক অসাম্যের কারণে রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। লকের ধারনায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে ভারসাম্য ছিল। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ শত্রুভাবাপন্ন ছিল না। লকের মানবচরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো– প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ অধিকারের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান দ্বারা স্বীয় অধিকার ভোগ করত।[৪৮] নৈতিক সমতার সাথে যুক্তিবাদিতার সংযোগ তাঁকে হবস ও রুশো থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। নৈতিকতাবোধ ব্যক্তিকে অপরাধ, অসাম্য থেকে বিরত রাখে; যুক্তিবাদিতা ব্যক্তির ওপর স্বনিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, ফলে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতার উপলব্ধি হয় এবং ব্যক্তির স্বীয় আচরণ আইনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হলেও ব্যক্তি আইনকে মান্য করে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে। কাজেই বলা যায়, লকের মানব চরিত্রে যুক্তিবাদিতা এবং নৈতিক সমতা সমান্তরালে চলে। যুক্তিই ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। জন লকের উদারতাবাদের সীমাবদ্ধতা হলো –এ দর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়গান ঘোষিত হয়। বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও এ সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত করে, কিন্তু ব্যক্তির আবেগময়তা এতে প্রাধান্য পায়নি।

লক হবসের মতো রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে সকল ক্ষমতা ত্যাগ করেননি। লকের কাছে স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের যুক্তিবাদিতায় তাঁর আস্থা ছিল। তাই লক রাষ্ট্র বা সরকারের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ভরসা করেছেন জনগনের যুক্তিবাদিতার ওপর। লকের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে

জ্ঞানালোক যুগের প্রভাবে যেখানে মানুষ ও তার যুক্তিবাদিতা অগ্রগণ্য। লকের রাষ্ট্রচিন্তা ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক। যে উদারতাবাদী ভাবধারায় তিনি আবেগের সাথে নৈতিকতার সংমিশ্রন ঘটিয়েছেন তাতে সামষ্টিক স্বার্থ, কর্তব্য কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা ভাবার অবকাশ আছে। কারণ ব্যক্তিস্বার্থই তাঁর কাছে অগ্রগণ্য। যদিও সে সম্পর্কে মানবিকতা আছে, সেই সাথে আছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কোনো ভীতিকর দানবও নয়। বরং রাষ্ট্র সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, রাষ্ট্র ও সরকার নিয়মতান্ত্রিক ও সীমিত ক্ষমতার মালিক। শর্তহীন আনুগত্য নয়, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জনগণ সরকারের কর্তৃত্ব মেনে নেয়।

লকের প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ নিজেই নিজের ভালো-মন্দের বিচারক প্রত্যেকের প্রাকৃতিক আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা ছিল। লকের এমন ধারণার সাথে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করেন মরিস ক্র্যানস্টোন।[৪৯] ব্যক্তি যখন স্বীয় কাজের বিচারক হবে স্বাভাবিকভাবেই সে যে সর্বদা পক্ষপাতমুক্ত হয়ে তা মূল্যায়ন করবে তেমনটা নয়। ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে আত্মপ্রেম অথবা তার প্রিয়জনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। আবার বিরাগভাজন হলে শত্রুভাবাপন্ন মনোবৃত্তি কাজ করতে পারে। তাছাড়া নৈতিকতার ব্যবহার সর্বদা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা নাও করতে পারে। নৈতিকতার জ্ঞান স্থান, কাল, পাত্র দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। নৈতিকতার জ্ঞান আপেক্ষিক বলে বিশৃঙ্খলা ও দ্বিধার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সম্ভবত তিনি ঈশ্বরের নির্দেশ কিংবা রাজনৈতিক সমাজে সুশীল সমাজ ও সরকারকে সমাধানরূপে গ্রহণ করেছেন।

হবস ও লক উভয়ই মানুষের সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তাস্বরূপ সামাজিক চুক্তিদ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টির কথা বলেছেন। রাষ্ট্র ব্যক্তির রাজনৈতিক সমাজের উৎস। উভয়ের কাছেই প্রকৃতির রাজ্যে শক্তিশালী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। রাজনৈতিক সমাজ ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সুপ্ত সম্ভাবনার লালনক্ষেত্র। অবশ্য প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় হবস ও লকের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। হবসের প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক ক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক অধিকার দাবী করত। ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা করতে পারত। হবসীয় প্রকৃতির রাজ্য ছিল স্বেছাচারের রাজত্ব। তাঁর প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তির অধিকার ছিল না। সম্পত্তির অধিকার রাজনৈতিক সমাজে সৃষ্ট। পক্ষান্তরে লকের প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, অধিকার, যুক্তিবাদী মানবচরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

আর্নেস্ট বার্কার মনে করেন, হবসের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ যেখানে দাবি করত প্রাকৃতিক অধিকারের, নিজের ইচ্ছামত যা কিছু করার সুযোগ ছিলো সেখানে লকের জনগণ তাদের ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে।[৫০] প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের কাছে দুটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হলো– ১) সম্পত্তির অধিকার এবং ২) প্রাকৃতিক আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের বিধান– যা প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা থেকে অনুভূত। লকের প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের যেসকল প্রাকৃতিক অধিকারের উল্লেখ তিনি করেছেন তা থেকে বার্কার লকের প্রকৃতির রাজ্যকে একটি রাজনৈতিক সমাজ বলে দাবি করেন।[৫১]

একটি সুসংগঠিত সমাজ অপেক্ষা লকের প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল অযথার্থতা তিনি লক্ষ করেন তাকে তিনভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন– ১) একজন যর্থাথ বিচারকের অভাব যিনি সকলের জন্য পক্ষপাতমুক্ত আইন প্রনয়ণ করবেন এবং বিচার রীতির যথাযথ বাস্তবায়ন তদারক করবেন।[৫২]

এধরণের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ নিজেদের পরিবর্তে তৃতীয় পক্ষকে বিচারকরূপে নির্বাচন করে। কারণ ব্যক্তি যদি স্বীয় কাজের বিচারক হয় তাহলে সে ব্যক্তিগত রাগ-অনুরাগ, স্বার্থবোধ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হবে; ফলশ্রুতিতে বিচারিক প্রক্রিয়া পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়বে। এ সকল বিবেচনায় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ বিচারকের প্রয়োজনবোধ করে। তারা বিচারকের কাছে অপরকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা সমর্পণ করে। হবসের জনগণের মতো লকের জনগণ সকল প্রকার ক্ষমতা ত্যাগ করেনি। তাই সম্পত্তিতে ব্যক্তির ক্ষমতা বলবৎ ছিলো। লকের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ কেবলমাত্র শাসনমূলক বা নির্বাহী ক্ষমতা (অপরকে শাস্তিদানের মতো) ত্যাগ করে।

নির্বাহী ক্ষমতা থেকে পরবর্তীতে গড়ে ওঠে আইনসভা। যারা আইন প্রণয়নের কাজও করবে। উল্লেখ্য আইনসভার সদস্যবৃন্দ বা প্রতিনিধিবৃন্দ নির্বাহী বিভাগ হতে কিংবা জনগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্বাচিত হবেন।[৫৩]

হবস রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের পথে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকার সংকুচিত করেন। পক্ষান্তরে লক কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধীনে অন্যান্য সকলের অধিকারের শর্তহীন হস্তান্তর সমর্থন করেননি। বরং নির্ভর করেছেন সকল মানুষের সমর্থন ও ইচ্ছার ওপর। লকের প্রকৃতির রাজ্যে আইন ছিল, বিচারক ছিল না। সমাজ ছিল, রাষ্ট্র ছিল না। হবসের কাছে কোনোটিই ছিল না। লকের প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ যুক্তিবাদিতার দরুন পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ, স্বীয় স্বার্থের সাথে অপরের স্বার্থের সমন্বয়, অধিকতর শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধানে প্রত্যাশী ছিল। রাজনৈতিক সমাজে জনগণ ব্যক্তি স্বাধীনতা হারায়নি, বরং আরও সুসংহত হলো। ব্যক্তি যদি তার স্বাধীনতা হারায় তাহলে অন্যান্য প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ, শান্তি-নিরাপত্তাও হারিয়ে ফেলে। লক মনে করেন স্বাধীনতার পূর্ণ উপলব্ধিই ব্যক্তির শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। স্বাধীনতার হস্তান্তর মানে জীবন বিপন্ন হওয়া। লকের মতে, "পরম স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা থেকে স্বাধীনতা মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য যত বেশি আবশ্যক এবং তার সঙ্গে এত বেশি জড়িত যে মানুষ নিজের নিরাপত্তা ও জীবন বিপন্ন না করে সে স্বাধীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।"[৫৪]

বলা যায় প্রকৃতির রাজ্য মানুষের যে স্বাভাবিক অবস্থার নির্দেশক ছিল রাষ্ট্রে সে স্বাভাবিক অবস্থা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হলো। রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হলো। পক্ষান্তরে হবসের কাছে অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল প্রকৃতির রাজ্যে। স্বাভাবিক অবস্থা হলো রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সমাজ। হবসের কাছে স্বাধীনতা নয় সন্তুষ্টি ও নিরাপত্তাই মুখ্য। প্রশ্ন থেকে যায়, আবদ্ধ জীবন কতদূর শান্তির সন্ধান দিতে পারে। যদিও হবস ও লক উভয়েই রাষ্ট্রকে দেখেছেন নাগরিকের স্বার্থ সংরক্ষণের যন্ত্ররূপে।

জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো (১৭১২-১৭৭৮)

আঠারো শতকের ফরাসি রাষ্ট্রদার্শনিক রুশোকে রোমান্টিক আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা যায়। তাঁর সময়কালের অপরাপর মনীষিবৃন্দ যেমন- ভলতেয়ার, মন্টেস্কু, দিদেরো প্রমুখ অপেক্ষা তিনি স্বতন্ত্র চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি সত্যিকার অর্থে জনগণের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। রুশোকে ফরাসি বিপ্লবের তাত্ত্বিক উদগাতা বলা হয়ে থাকে। ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। রুশোর চিন্তাধারায় রোমান্টিক ভাবধারা স্পষ্ট। রোমান্টিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদী নীতি দ্বারা প্রভাবিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রুশো জাতীয়তাবাদী ছিলেন এর জোর প্রমান মেলে না; তবে রুশোর মত জাতীয়তাবাদ প্রসারে সহায়ক ভূমিকা রাখে।[৫৫] তাঁর প্রথমদিকের চিন্তায় যুক্তি অপেক্ষা আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি তাঁর কাছে অনভিপ্রেত ছিল। আবার পরবর্তী চিন্তায় তিনি প্রাথমিক চিন্তার সাথে বৈপরীত্য পোষণ করেছেন। তিনি মনে করেন বিজ্ঞান, সভ্যতা ও শিল্পকলার অগ্রগতি মানুষের নৈতিক অধ:পতনের জন্য দায়ী।

"মানব সভ্যতায় কলা ও বিজ্ঞান কি কোনো সুফল বয়ে এনেছে?" (Has the Revival of the Science and Arts helped to purify or Corrupt Morals?) – এই প্রবন্ধ দ্বারা লেখক রূপে রুশোর আত্মপ্রকাশ ঘটে।[৫৬] এ প্রবন্ধের জন্য তিনি দিঁজ একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এ প্রবন্ধে তিনি বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। সভ্যতার অধঃপতনের জন্য তিনি বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দায়ী করেছেন এবং প্রাকৃতিক জীবনের জয়গান করেছেন। তিনি মনে করেন প্রকৃতির কোলেই মানুষ সহজ-সরল জীবনযাপন করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে ব্যক্তিমানুষের জীবন অধঃপতিত হয়েছে।[৫৭]

জ্ঞানালোক যুগের দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও রুশোর চিন্তায় যুক্তিবাদিতার চেয়ে আবেগের প্রাধান্য ছিল বেশি, যা তার সমসাময়িকদের চেয়ে তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। সাধারণ মানুষ বা গণমানুষ তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। উল্লেখিত প্রবন্ধটিতে তিনি সমাজ, সভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিরোধিতা করেছেন।[৫৮] তাঁর মতে মানুষ স্বভাবত ভালো, কিন্তু সমাজ তাকে কলুষিত করেছে। তিনি সমাজকে দুর্নীতিগ্রস্থ মনে করেন যা ব্যাক্তির সারল্য-সততা নষ্ট করে।

সি.ই.ভন রুশোর রচনাসমূহকে দুই সময়কালে বিভক্ত করেছেন।[৫৯] প্রথম ভাগের *Discourse On Inequality* গ্রন্থে তিনি চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে সমর্থন করেছেন। এ সময়কালকে ভন গঠনমূলক যুগ বলেছেন। এ যুগে রুশো দিদেরোর বিরোধিতা করেছেন। আর দ্বিতীয় ভাগে 'Social Contract' গ্রন্থে চরম সমষ্টিবাদের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। যার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব। যেখানে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইছার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন।[৬০]

প্রকৃতির রাজ্য

রুশো তাঁর *Discourse On the Origin of Inequality* গ্রন্থে প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।[৬১] রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য কোনো স্থির, নিশ্চল অবস্থা নয়। এ ছিল ক্রমবর্ধমান ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে মানুষ সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষ প্রকৃতির রাজ্য থেকে সামাজিক জীবনে পদার্পণের ফলে যে সমস্ত লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে তা মূলত সামাজিক সংমিশ্রণ ও যোগাযোগের দ্বারা সৃষ্ট।[৬২] তাঁর মতে প্রকৃতির রাজ্য মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এটি হলো রাজনৈতিক সমাজের প্রাথমিক স্তর। কারণ এ স্তরে মানব চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন কৃত্রিম প্রবৃত্তি, যেমন– ক্ষমতা, শান্তির অন্বেষণ, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ ইত্যাদি থাকে। এ সকল গুনাবলী অবশ্য ব্যক্তির সহজাত নয়, এগুলো মানুষ সমাজ থেকে অর্জন করে।[৬৩] রুশোর প্রাক-সামাজিক মানবচরিত্র কলুষিত ছিল না, সমাজ তথা রাজনৈতিক জীবনে পদার্পন করে ব্যক্তির চরিত্র অধ:পতিত হলো। রুশো মনে করেন মানুষের প্রকৃত চরিত্র সামাজিক আবরণের ছত্রছায়ায় আবৃত। এ আবরণ উন্মোচিত হলে ব্যক্তির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে।

রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ ছিল সুখী, সন্তুষ্ট, স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ন। স্বাধীন ছিল, কারণ প্রকৃতির রাজ্যে কোনো নিয়মনীতি ছিল না; বাধামুক্ত পরিবেশে প্রকৃতির কোলে সাধারণ মানুষ বেড়ে ওঠে। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় না। তবুও হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মতো তা ভয়ঙ্কর, দুর্বিষহ ছিল না, বরং প্রকৃতির রাজ্যে ছিল সহজ-সরল জীবন। বল প্রয়োগ, হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না। আত্মরক্ষা ও সহানুভূতি এ দুটি গুন দ্বারা মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ছিল। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে যুক্তিবাদিতা, নৈতিকতা ছিল না কিন্তু শান্তি ছিল। রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য হলো অ-জ্ঞান অবস্থা। কারণ এ স্তরে কোনো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, যুক্তিবাদিতা-যুক্তিহীনতা কিছুই ছিল না। এটি ছিল প্রাক-সামাজিক অবস্থা। এ সময়কালে ব্যক্তির মাঝে প্রজ্ঞা ছিল না। সমাজজীবনে প্রবেশের দ্বারা ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হলো। প্রকৃতির রাজ্যের অসম্পূর্ণ জনগণ সমাজজীবনে প্রবেশ করে প্রজ্ঞা এবং নৈতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হলো।[৬৪] প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ সমাজ জীবনে প্রবেশের দ্বারা দায়িত্ব-সচেতন হলো।

প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে রুশো আইন ও নৈতিকতাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচনা করেননি। প্রাকৃতিক আইনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক অধিকারকেও তিনি প্রকৃতির রাজ্যে উহ্য রেখেছেন।[৬৫] তাঁর কাছে সমবেদনা বা পরার্থপ্রেম আইনের চালিকাশক্তি। প্রশ্ন আসে, আত্মসংরক্ষণের জন্য যদি অন্যের ক্ষতিসাধনই একমাত্র উপায় হয়

তবে রুশো কি বলবেন? রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের অপর লক্ষণীয় বিষয় হলো এ রাজ্যে কোনো অভাব, বিশৃঙ্খলা বা নিয়মভঙ্গের প্রশ্ন ওঠেনি। অভাবই মানুষকে যুদ্ধের দিকে প্রলুব্ধ করে। সে যুদ্ধ অর্থনৈতিক বা মানসিক বা রাজনৈতিক বা নৈতিক যুদ্ধ হতে পারে। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের মধ্যে অভাব ছিলো না। পরিতৃপ্তিবোধ ছিলো, তাই আইনের প্রয়োজন ছিলো না। হবস ও লকের রাজ্যে এ চিত্র ছিলো বিপরীত, তাই আইনের প্রয়োজন ছিলো।

লক্ষণীয় হলো, যে সমাজকে রুশো নিকৃষ্ট মনে করেছেন, সে সমাজেই রুশো মানবপ্রকৃতির নতুন দিগন্ত অন্বেষণ করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যেকে লক নৈতিক অবস্থা বলেছেন, যেখানে জনগণ কিছু অধিকার ভোগ করত, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলত। প্রকৃতির রাজ্যের আপাত শান্তিতে বসবাসকারী জনগণ তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার প্রয়োজনে চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। লকের ব্যক্তিমানুষ সমাজ জীবনে বসবাসের পূর্বেও স্বাধীন ও শান্তিপ্রিয় ছিল এবং সমাজে পদার্পণ করেও তাদের বৈশিষ্ট্যগত কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। লক ছিলেন সুসংহত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক। সুসংহত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ অনুযায়ী মানুষ স্বীয় স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ভিত্তিতে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর আত্মতুষ্টি বিশেষত তাদের সম্পত্তির মালিকানা ও ভোগের সহজাত অধিকার রক্ষার উপর নির্ভরশীল।

লকের প্রকৃতির রাজ্যের এধরণের অবস্থার ঠিক বিপরীত চিত্র পওয়া যায় রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে। রুশোর প্রকৃতির রাজ্য নৈতিক-অনৈতিক অবস্থার উর্দ্ধে, যা সম্পূর্ণ নিস্পাপ অবস্থা। রুশো মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ পরস্পর সম্পর্কহীন ছিলো। তাই তাদেরকে আমরা সংঘবদ্ধ সত্তা না বলে বিচ্ছিন্ন সত্তা বলতে পারি। এদের আচরণের ভালো-মন্দ যাচাইয়ের সুযোগ নেই। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তির চাহিদা ছিল খাদ্য ও নিদ্রা আর ভীতি ছিল ক্ষুধা ও যন্ত্রণা। মৃত্যুভয় এবং আতঙ্ক সম্বন্ধে যখন মানুষ বুঝতে শিখল যে সময় থেকে তার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটল।

রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য থেকে সমাজজীবন (যাকে রুশো বলেছেন সিভিল সোসাইটি) উত্তরণের ক্ষেত্রে মানুষ অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করেছে। যেমন–প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ পরিবার গঠন করে, পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তির মধ্যে মানবতা, সৌহার্দ্য, ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। পরবর্তীতে সম্পত্তির উদ্ভব ও সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার ধারণা ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব সংঘাতের কারণ হয়ে ওঠে। যদিও গোড়ার দিকে সরল সামাজিক সহাবস্থান মালিকানা সংক্রান্ত মন্দ দিক সমূহকে ছাপিয়ে অধিক সুবিধা দেয়। যেমন, এখানে মানুষ অপরের সাহচার্য পায়, আনন্দ উপভোগ করে এবং সে সাথে কেন অন্যদের আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে তাও সে বুঝতে পারে। সমাজব্যবস্থায় পদার্পণের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে রুশো বলেন,– "placed by nature; .... 'at an equal distance from the stupidity of brutes and the fatal ingeniuty of civilised man'_ this period of expansion of the human faculties .... must have been the happiest and most stable of epochs."[৬৬]

কিন্তু মানুষের এই সুখকর অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সম্পত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যক্তির যৌক্তিক আত্মস্বার্থ ও সংকীর্ণ আত্মস্বার্থের মধ্যকার দূরত্ব এতটা বেড়ে যায় যে ব্যক্তি কেবল স্বীয় প্রয়োজনের নিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকেনি বরং অন্যান্যদের অপেক্ষা নিজেকে উর্দ্ধে রাখার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে কাজ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ব্যক্তিকে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করতে এবং অন্যের সম্পদ আহরণে প্রলুব্ধ করে। স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি করে। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বা সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তি সম্পত্তির সংঘাতে জড়িয়ে গেলো। সাম্যাবস্থা, স্থিতিবস্থা নষ্ট হলো। ধনী-গরিবের লাগামহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতিগত সহানুভূতি ন্যায্যতার বিষয়কে দুর্বল করে দিল এবং সে স্থান দখল করলো অর্থলিপ্সা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অনৈতিকতা।[৬৭]

মানবপ্রকৃতি

মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে হবসের মধ্যে একটি নেতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু রুশোর কাছে লক্ষ করা যায় এর বিপরীত চিত্র। রুশো মনে করেন আত্মপ্রেমই ব্যক্তির সকল আবেগের (Passion) উৎস। তাই প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ নিজের জীবন বিপন্ন না হলে অপরকে আক্রমণ করত না। রুশোর কাছে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন এবং সামষ্টিক জীবন দুই ক্ষেত্রেই ব্যক্তির আচরণ নিজের জন্য এবং অপরের জন্য স্বস্তিদায়ক ছিল, হবসের মতো ভীতিপ্রদ ছিল না। রুশোর মতে, "since the state of [n]ature is that in which care of our self-preservation is the least prejudicial to the self-preservation of others that state was consequently the best suited to peace and the most appropriate for the Human Race"[৬৮]

রুশোর মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় ব্যক্তিজীবনের উৎস অন্যের সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক নয় বরং স্বসত্তার প্রতি ইতিবাচক স্নেহ (affection) এবং সরলতা।[৬৯]

রুশোর মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে গিয়ে ম্যাকফারলেন সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন এরিস্টটলের সাথে। এরিস্টটল এবং রুশো উভয়ের মানব প্রকৃতি বিশ্লেষণে ম্যাকফারলেন দাবি করেন এদের কাছে মানবচরিত্রের রূপ যা বিদ্যমান তা নয় বরং কিরূপ হওয়া উচিত সেটা। ব্যক্তির অর্ন্তনিহিত গুণাবলীর বিকাশ ঘটতে পারে অর্ন্তদর্শন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে।[৭০]

রুশো *ইনইক্যুয়ালিটি*–তে মত প্রকাশ করেন যে, সমস্ত নষ্টের মূলে সভ্যতা।[৭১] সভ্যতা ব্যক্তির মধ্যে অসৎ গুণাবলীসমূহ প্রবৃষ্ট করায়। যেমন – অস্পৃশ্যতা, ঘৃণা, শঠতা ইত্যাদি। ব্যক্তির নৈতিক স্খলন সভ্যতার অগ্রগতির ফল। সভ্যতা কালক্রমে মানুষের মধ্যে সকল কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। সভ্যতার অগ্রগতি ব্যক্তির মধ্যে কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেছে, ব্যক্তিকে আবেগশূন্য এবং অমানবিক করেছে। রুশো মনে করেন প্রজ্ঞা নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সম্পত্তি ব্যক্তিকে সংঘবদ্ধ করে। মানবপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণে রুশোর সাথে হবসের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। একথা রুশো নিজেই স্বীকার করেছেন। হবসের মানবপ্রকৃতির বিরোধিতা করে রুশো বলেন,

"পরিশেষে আমরা যেন হবসের মত এই সিদ্ধান্তে না আসি যে ভালো সম্বন্ধে মানুষের কোনো ধারণা নেই বলে সে খারাপ, সৎ কি তা অজানা বলে সে অসৎ; যা নিজের দাবি করার অধিকার নেই বলে তার ধারণা, অনুরূপ ব্যক্তিদের এমন সব সেবা দিতে যে সর্বদাই অস্বীকার করে, অথবা যা তার প্রয়োজন তা অনাবৃতভাবে অধিকারের ভিত্তিতে দাবি করে, সে নির্বোধের মত নিজেকে বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি মনে করে।"[৭২]

রুশো হবসের এই ধারণার বিপরীতে বলেন কোনো ব্যক্তির ভালো সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাটা তার অপরাধ নয়। অসৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা ব্যক্তিকে অসৎ কার্য সংঘটন থেকে বিরত রাখে। এ ক্ষেত্রে তিনি আবেগের উল্লেখ করেন যা তাকে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষের যত বেশি বুদ্ধির বিকাশ ঘটে সমাজে তত বেশি অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। ভালো-মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং আইনি নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিকে অসৎ কাজ হতে বিরত করে। বলা যায়, ব্যক্তির আবেগ ও অজ্ঞানতাই তাকে অসৎ কাজ থেকে দূরে রাখে।

রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ কোনো প্রজ্ঞা এবং যুক্তিবাদিতা দ্বারা পরিচালিত সত্তা নয়, তাই তাদের কোনো সচেতনতাও ছিলো না। রুশোর মতে এরা ছিল ভীরু, নিঃসঙ্গ এবং কুঁড়ে, যারা মৌলিক চাহিদাসমূহের পরিতৃপ্তি ঘটায়। মৌলিক চাহিদা বলতে রুশো বুঝিয়েছেন খাদ্য, ঘুম এবং যৌন পরিতৃপ্তি। এসব প্রবৃত্তি আদিম মানুষ কর্তৃকও সহজেই পূরণীয়। তাই এক্ষেত্রে কোনো যুদ্ধের অবস্থারও প্রয়োজন পড়েনি। আবার কোনো অমীমাংসিত সামাজিক জীবনযাত্রার প্রশ্নও ওঠেনি।

'স্বাভাবিক মানুষ' বসবাস করত প্রকৃতির রাজ্যে, সমাজে নয়। প্রকৃতির রাজ্যে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্পত্তি-আহার্য এসব কিছুই ছিল না। ছিল শুধু ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি। সভ্যতা ও প্রগতি দুটোই প্রকৃতির জন্য অপ্রয়েজনীয় মনে করেন রুশো। তিনি তাঁর *ইনইক্যুালিটি*-তে বিজ্ঞান অপেক্ষা আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন যা সভ্যতার সাথে সাথে সংকুচিত হয়েছে। তাঁর এ বক্তব্য আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর কাছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি অপেক্ষা নৈতিক ইচ্ছা মহত্তর। রুশোর কাছে বুদ্ধি খারাপ কারণ তা শ্রদ্ধা নষ্ট করে, বিজ্ঞান খারাপ তা বিশ্বাস নষ্ট করে এবং প্রজ্ঞা নৈতিকতার বিপক্ষে ব্যক্তিকে বিচক্ষণতা দান করে বা পরিনামদর্শী করে তোলে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তিকে সভ্যতার পথে চালিত করে। যুক্তিবাদিতার উন্মেষ ঘটায়, ব্যক্তিকে বিচক্ষণ করে তোলে। সভ্যতার এ বিকাশ মানুষকে কলুষিত করেছে। রুশোর কাছে প্রজ্ঞার বিপরীতে নৈতিক অনুভূতি গুরুত্ব পেয়েছে।[৭৩]

"What is the Origin of Inequality Among Men, and is it Authorised by Natural Law"–এটি রুশোর দ্বিতীয় রচনা যা ১৭৫৩ সালে প্রবন্ধ আকারে রচিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৫ সালে গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর পূর্ববর্তী বিশ্লেষণ থেকে সরে আসেন। মানুষ স্বভাবত ভালো কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে খারাপ। মানুষ যে বাস্তব ক্ষেত্রে খারাপ তা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। রুশোর দ্বিতীয় বক্তব্যকে প্রথম বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। যে মানুষকে তিনি স্বভাবত ভালো বললেন তাকেই আবার বাস্তব ক্ষেত্রে খারাপ বললেন। এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর বক্তব্যে। মানুষের হিংস্রতা, দুর্বলতা, অত্যাচার, দারিদ্র, প্রাচুর্য, ক্ষমতা, সম্পদ ইত্যাদি মানুষের মৌলিক রূপ নয়, কৃত্রিম রূপ। এ সকল বৈশিষ্ট্য কেবল প্রহেলিকা যা ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বা বাহ্যিক আচরণ মাত্র। ক্ষমতার চাহিদা ও দ্বন্দ্ব না থাকার কারণে রুশোর কাছে প্রাকৃতিক আইন অপ্রয়োজনীয় ছিলো। যন্ত্রের আবিস্কার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পত্তির আর্বিভাব, রাজনৈতিক সামজের উদ্ভব এসবই কালক্রমে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। ভলফ মনে করেন, প্রাথমিক পর্যায়ে রুশোর জনগণ তাদের অভাব পূরণের জন্য হবসের ব্যাখ্যা মতো পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়নি বরং রুশোর জনগণ মানবপ্রকৃতির চাহিদা পূরণের জন্য নতুন আবিস্কারকে গ্রহণ করে। তাই রুশো মনো করেন যেদিন মানুষ তার কাজকে সহজ করতে যন্ত্র আবিস্কার করতে শিখলো তাহলে তার বুদ্ধি এবং গর্ব জেগে উঠলো।[৭৪]

রুশোর মতে প্রাকৃতিক মানুষ দুই ধরণের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হতো। যথা-আত্ম সংরক্ষণ ও সমবেদনা বা সহানুভূতি। আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তি মানব ও অমানব উভয় শ্রেণির মধ্যে থাকলেও অ-মানব শ্রেণি এ গুণকে ব্যবহার করে কেবল প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে। সেক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিবৃত্তির তেমন কোনো প্রভাব থাকে না কিন্ত মানুষের ক্ষেত্রে রয়েছে ইচছার নিয়ন্ত্রণ। যেমন, প্রকৃতির অন্যান্য নির্দেশনাসমূহও মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণী বিনা বাক্য ব্যয়ে মান্য করে। পক্ষান্তরে একই নির্দেশনা মানুষের পালনের ক্ষেত্রে সে ইচ্ছা ও স্বাধীনতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

সমবেদনা বা সহানুভূতি ব্যক্তির এই গুণকে রুশো 'কেবল প্রাকৃতিক সদগুণ' নামে অভিহিত করেছেন।[৭৫] মূলত এ প্রবৃত্তি বা প্রবণতাই প্রাকৃতিক মানুষকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিকতার বাইরে এসে ব্যক্তির অন্যান্য মানবিক ও সামাজিক গুণাবলীসমূহ যেমন– উদারতা, মহত্ব, বদান্যতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি বিকশিত করতে সাহায্য করে। সমবেদনাকে প্রাধান্য দিয়েই রুশো তাঁর *Discourse On the Origin of Inequality*[৭৬] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সমবেদনাই প্রকৃতির রাজ্যের আইন, নৈতিকতা, সদগুনের ভূমিকা গ্রহণ করে। একে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এর দ্বারা দুর্বলের ওপর অত্যাচার বা নিপীড়ন থেকে বিরত হয়।[৭৭] এখানে হবস ও লক অপেক্ষা রুশোর স্বাতন্ত্র্য। হবস ও লকের মতো রুশো বিশ্বাস করেন মানুষ প্রথমত ও প্রধানত আত্মসংরক্ষণের নীতি দ্বারা পরিচালিত। তবে তারা যে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেননি তা হলো সমবেদনা। যা রুশো লক্ষ করেছিলেন।[৭৮] রুশো

উল্লিখিত ‘বন্য মানুষের’ কৃতিত্ব এই যে তারা আত্মসংরক্ষণ ও সমবেদনা উভয়গুণাবলী বা প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত। হবস ও লকের রাজনৈতিক সমাজে মানুষের প্রতি পারস্পরিক সমবেদনা বা ভালোবাসা লুপ্তপ্রায় যা রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান ছিলো। বলা যায়, রুশোর ‘সমবেদনা’ হবস ও লকের প্রাকৃতিক আইনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

রুশোর দৃষ্টিতে মানুষের মন্দ স্বভাবসমূহ ব্যক্তির বাহ্যাবরণ বা ক্ষণস্থায়ী রূপ। ব্যক্তির প্রকৃত রূপ ছায়া রূপের আড়ালে লুকায়িত, প্রকৃত রূপে ব্যক্তি সৎ এবং ভালো। মানুষের চরিত্রের মন্দ বৈশিষ্ট্যাবলী আরোপিত; সহজাত নয়। সামাজিক চুক্তির ধারণায় তিনি স্বাধীনতা অপেক্ষা সাম্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতার বিনিময়ে তিনি সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পরিবেশই মানুষকে সংঘাতময়, প্রতিযোগিতাপরায়ন করে।

রুশোর রাজনৈতিক সমাজ অপেক্ষা হবস ও লকের সমাজ ভিন্ন। হবস ও লকের সমাজ উপযোগবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের সদস্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা লাভ ও প্রদানের মাধ্যমে তারা পরস্পরের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধানে কাজ করে। রুশো এক প্রকার নৈতিক বন্ধনকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন যা ব্যক্তিগত স্বার্থ, সম্পত্তি, লোভ-লালসার উর্দ্ধে সমাজকে আবদ্ধ করে রাখে। তিনি তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*- গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে গৌণ করে দেখেছেন এবং সামষ্টিক স্বার্থকে মুখ্য করে দেখেছেন। তিনি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে সামাজিক বৈষম্যের কারণ বলে মনে করেন। যদিও তাঁর মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংঘাত থেকেই রাজনৈতিক সমাজের অভ্যুদয়। ব্যক্তির আত্মউন্নয়নে বাহ্যিক ও মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনীয়তা, জনসংখ্যার বৃদ্ধি (যা প্রাকৃতিক খাদ্যের ওপর ক্রমগত চাপ সৃষ্টির কারণ) ইত্যাদি বিষয়সমূহ একজন প্রাকৃতিক মানুষকে বৌদ্ধিক মানুষে রূপান্তরিত করে।

ইনইকুয়ালিটি গ্রন্থে রুশো সামাজিক বৈষম্যেও প্রকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা বুঝতে সহায়ক। তাঁর এ আলোচনা থেকে আমরা মনে করি ব্যক্তির সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া তথা সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের অনিবার্য ফল হলো বৈষম্য। তিনি বৈষম্য বলতে কেবল সম্পত্তি বা অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই বোঝাননি, পাশাপাশি ব্যক্তির শারীরিক বৈষম্যকেও নির্দেশ করেছেন।

হবস ও রুশো উভয়েই মনে করতেন মানুষ সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু লক মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে উদার ধারণা পোষণ করেছেন। লক প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে পেয়েছেন স্বার্থপরতা ও যুক্তিহীনতা। হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ পরিচালিত হতো আবেগ ও প্রবৃত্তি দ্বারা, যুক্তি দ্বারা নয়। তারা ছিল যুক্তি ও বিচার-বিবেচনাবর্জিত। কিন্তু লকের প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিল নৈতিক সত্তা। যুক্তিবাদিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ছিল এ মানুষের বৈশিষ্ট্য।

তথ্যনির্দেশ

১. Andrea Bardin, “Materialism and Right Reason in Hobbes’s Political Treatises: A Troubled Foundation for Civil Science”, *History of Political Thought*, Vol. XL, No. 1, Spring, 2019, pp. 89-92.

২. Arthur M. Melzer, *The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau’s Thought*, University of Chicago Press, Chicago, 1990, p. 20.

৩. F. S. McNeilly, *The Anatomy of Leviathan,* St. Martin’s Publications, New York, 1968, p. 3.

৪. Thomas Hobbes, *Leviathan*, A. P., Martinich, and B., Battiste, (eds.), Revised Edition, Broadview Edition, Canada, 2011, Introduction, p. 14.

৫. *Ibid.*, Ch. I.

৬. R. Ashcraft, “Hobbes’s Natural Man: A Study in Ideology Formation”, *The Journal of Politics*, Vol. 33, No. 4, The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association, 1971, pp. 1977-1080. https://doi.org/10.2307/2128422

৭. *Ibid.*

৮. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XIII, p. 126.

৯. *Ibid.*, p. 124.

১০. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory*, Nelson & Son, London, 1972, p. 2.

১১. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XIII, p. 125.

১২. *Ibid.*, pp. 125-126.

১৩. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy,* Routledge, London, Reprint, 1995, pp. 531-533.

১৪. David Gauthier, *Logic*, in Andrew Hacker, *Political Theory: Philosophy, Ideology, Science*, Macmillan, New York, 1961, pp. 118-119.

১৫. George H. Sabine, *A History of Political Theory,* Revised by Thomas Landon Thorson, 4th Edition, IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi: Oxford, 1973, p. 474.

১৬. Howard Warrender, *Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Clarendon Press, Oxford, 1970, p. 30.

১৭. FC. Hood, *The Divine Politics of Thomas Hobbes: An Interpretation of Leviathan*, Clarendon Press, Oxford, 1964, pp. 81, 177.

১৮. Richard Peters, *Hobbes*, Penguin, London, 1956, pp. 192-193.

১৯. C.B. McPherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Reprint, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 19-22.

২০. Ashcraft, “Hobbes’s Natural Man: A Study in Ideology Formation”, p. 1100.

২১. Richard Peters, *Hobbes*, pp. 117-118.

২২. Hobbes, *Leviathan*, pp. 128-129.

২৩. Ashcraft, “Hobbes’s Natural Man: A Study in Ideology Formation”, p. 1106.

২৪. *Ibid.*, Ch. V & VI.

২৫. *Ibid.*, Ch.VI, pp.69-71.

২৬. *Ibid.*
২৭. *Ibid.,* Ch.VI, pp.70-78.
২৮. Ashcraft, "Hobbes's Natural Man: A Study in Ideology Formation", p. 1081.
২৯. John Calvin, Institutes of the Christian Religion, S. C. M. Press Ltd., 1960, pp. I, 47, 286-287, 296, 317, 367, 600; II, 1311.
৩০. *Ibid.,* Vol. II, p. 1211.
৩১. Hobbes, *Leviathan*, p. 69.
৩২. *Ibid.,* p. 125.
৩৩. রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস, হিমাংশু ঘোষ (অনু), পৃ. ৪৩২
৩৪. *Ibid.,* p. 126.
৩৫. *Ibid.,* Ch. XI, p. 105.
৩৬. *Ibid.,* Ch. XI, p. 125.
৩৭. ১৬৮৮ সালে সংঘটিত রক্তপাতহীন গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সংসদীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিপ্লবের রাজনৈতিক এবং নৈতিক সমর্থন দেন লক। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এ বিপ্লব বিখ্যাত এই কারণে যে তা রাজার ঐশী ক্ষমতার অবসান ঘটায় এবং পার্লামেন্টকে সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। গৌরবময় বিপ্লবে ইংল্যান্ডে পূর্বমীমাংসিত ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট দ্বন্দ্ব নতুন করে শুরু হয় এবং এ বিপ্লব দ্বারা প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় রাজতন্ত্র পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং আংশিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্বশীল ছিল। লকের রাষ্ট্রচিন্তায় হল্যান্ডের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করে। হল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি রচনা করলেন *Letters Concerning Toleration, Essay Concerning Human Undderstanding*। পরবর্তীতে লক যখন ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তন করেন তাহলে সে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে তিনি তাঁর উদার মানসিকতার প্রতিফলন ঘটালেন।
৩৮. Maurice Cranston, *John Locke and Government by Consent,* David Thompson (ed.), *Political Ideas,* Ch. 7, London: Watts, 1966.
৩৯. Mark F. Griffith, "John Locke's Influence on American Government and Public Administration", *Journal of Management History*, Vol. 3, No. 3, MCB University Press, 1997, p. 227.
"Locke believed that to understand political power one must comprehend that politics emerges from natural law and the state of nature."
৪০. John Locke, *Two Treatises of Government,* 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967, pp. 111-112.
৪১. প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে লক বলেন, "New living together according to reason, without a common Superior on Earth with Authority to judge between them, is *properly the State of nature*." *Ibid.,* Ch. VII, pp. 111-112.
৪২. *Ibid.,* Ch. IX, p. 123.
৪৩. *Ibid.,* Ch. V.
৪৪. *Ibid.,* Ch. V, § 27, pp. 305-306.
৪৫. John Locke, *Second Treatise*, Ch. IX, pp. 125, 126.
৪৬. Mark F. Griffith, "John Locke's Influence on American Government and Public Administration," Journal of Management History, p. 227.
৪৭. John Locke, *Second Treatise,* Peter Laslett (ed.), Ch. V, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1967, §31, p. 308.

৪৮. *Ibid.*, § 4, p. 287.
৪৯. Maurice Cranston, *Locke on Politics, Religion and Education*, The Macmillan Company, New York, 1965, p. 23.
৫০. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau,* Oxford University Press, London, 1982, p. XIX.
৫১. *Ibid.,* p. XX.
৫২. Locke, *Second Treatise*, § 124-126.
৫৩. *Ibid.,* § 127.
৫৪. *রাজনৈতিক মতাবাদের ইতিহাস*, ননী ভৌমিক (অনু.), খণ্ড ২, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, পৃ. ৮৯।
৫৫. রোমান্টিক আন্দোলনের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়– এ আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের সমর্থনে বিপ্লব এবং স্বাধীনতা রক্ষায় যুদ্ধকে সমর্থন করা হয়েছে। রোমান্টিক আন্দোলনের এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ আমরা রুশোর *Social Contract* গ্রন্থের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় লক্ষ করি। রুশোর এই গ্রন্থটিতে আবেগ অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য লক্ষণীয়। এ গ্রন্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থন পাওয়া যায়, আবার রাষ্ট্রের সর্বনিয়ন্ত্রবাদী একটি রূপও পাওয়া যায়। রুশো গণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন তা ছোট রাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য, মাঝারি রাষ্ট্রের জন্য অভিজাততন্ত্র এবং বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য রাজতন্ত্র ভালো। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার বলতে রুশো গনতন্ত্রকে নয়, অভিজাততন্ত্রকে নির্দেশ করেছেন।
৫৬. Jean-Jacques Rousseau, "Discourse on the Arts and Sciences", Translated by G. D. H. Cole, International Relations and Security Network: Primary Resources in International Affairs. www.isn.ethz.ch http://oll.libretyfund.org/
৫৭. Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality,* Donald A Cress (trans.), Indianapolis, Cambridge, 1992, p. XII.
৫৮. *Ibid.*
৫৯. C. E. Vaughan (ed.), *The Political Writings of Jean Jacques Rousseau*, Vols. 1, 2, John Wiley & Sons. Inc., New York, 1962, Introduction.
৬০. *Ibid.*
৬১. Rousseau, *Discourse On the Origin of Inequality,* pp. XII-XIV.
৬২. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory*, Nelson and Song Ltd, London, 1972, p. 15.
৬৩. Rousseau, *Discourse On the Origin of Inequality*, Introduction.
৬৪. *Ibid.*, pp. XIII-XIV.
৬৫. *Ibid.,* p. X.
৬৬. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract,* Translated by Maurice Cranston, Penguin Books, 1968, p. 198.
৬৭. Macfarlane, *Modern Political Theory,* p. 16.
৬৮. Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality,* pp. XVI, p. 35.
৬৯. Melzer, *The Natural Goodness of Man;* p. 38.
৭০. Macfarlane, *Modern Political Theory,* p. 13.
৭১. Rousseau, *Inequality,* pp. XV-XVI.
৭২. নির্মল কুমার সেন, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, ৩য় মুদ্রণ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৩২১-৩২২।
৭৩. Rousseau, *Inequality,* pp. 48-52.
৭৪. Jonathan Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised Edition, Oxford University Press, 2006, p. 28৩২

১৫. Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality*, pp. 57-60.
১৬. *Ibid.*, pp. 60-70.
১৭. *Ibid.*, p. 24.
১৮. *Ibid.*

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাকৃতিক আইনের ধারণা জটিল এবং কখনো বিভ্রান্তিকর। এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ও সুসংহত বক্তব্য পাওয়া যায় না। এমনকি এর প্রকৃতিই শুধু নয়, এর উৎপত্তি সম্পর্কে সকলে একমত নন। এর সংজ্ঞায়নেও রয়েছে ভিন্নতা। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের উপস্থিতি সম্পর্কে কেউ মনে করেন এটি কোনো সুসংহত বিধান নয়, আবার কারো মতে এটি পরিপূর্ণ আইনও নয়। প্রকৃতির রাজ্যে তথা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে রাষ্ট্রীয় আইনহীন অবস্থায় প্রাকৃতিক আইন এক প্রকার নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে সক্ষম হয়েছে বলে চুক্তিবাদীদের লেখনী থেকে বলা যায়। তবে প্রাকৃতিক আইনের মানদণ্ডে তৎকালীন প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজের সাথে পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থার নৈতিক এবং রাজনৈতিক ভালোমন্দ তুলনা সম্ভব। আধুনিককালে ত্রয়ী চুক্তিবাদী (টমাস হবস, জন লক, জ্যাঁ জ্যাক রুশো) ছাড়াও আমরা প্রাচীন দার্শনিকদের কাছে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা দেখতে পাই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন প্লেটো, এরিস্টটল, সিসেরো প্রমুখ। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শনে প্রাকৃতিক আইনের বেশ কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে সেইন্ট টমাস একুইনাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রিক রাষ্ট্রদর্শন

গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের অধিকার ব্যক্তির অধিকারের আগে। এ বক্তব্যের সমর্থনে সক্রেটিসকে স্মরণ করা যেতে পারে। যিনি নিজেকে আইনের দাসরূপে মনে করতেন। শুধু সক্রেটিস নন, সমগ্র এথেনীয়বাসী এধরণের মনোভাব পোষণ করতেন। এতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় বলে তারা মনে করতেন।

প্রাচীন রাষ্ট্রদার্শনিক আলোচনায়, প্রাকৃতিক আইনতত্ত্ব সরাসরি গ্রিক এবং রোমান স্টোয়িকবাদ থেকে উদ্ভূত এবং প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত তত্ত্বটির একটি সুসংবদ্ধ রূপ হাজির করেন দার্শনিক সিসেরো।[১] মূলত স্টোয়িকদের কাছে থেকে রোমানদের কাছে প্রাকৃতিক আইনের ধারণা আসে। রোমান আইনেও প্রাকৃতিক আইন গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শরূপে পরিগণিত হয়েছে। এমনকি এরিস্টটলের পজিটিভ ল বা বিচারকসৃষ্ট আইন রোমান আমলে প্রকৃতিক আইনের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে অতিক্রম করতে পারেনি। স্টোয়িকদের মতে ঐশী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত মহাবিশ্বে মানুষ কোনো হস্তক্ষেপ বা পরিবর্তন সাধনে অক্ষম। তবে মানুষের মধ্যে এক ধরনের সহজাত বোধশক্তি রয়েছে। ভালো-মন্দ সম্পর্কে সহজাত বোধশক্তির সাথে যুক্ত হয় ব্যক্তির প্রজ্ঞা। স্টোয়িক দার্শনিক সিসেরো প্রাকৃতিক আইনকে ঐশী আইনের মতো উচ্চতররূপে গণ্য করেছেন। সোফিস্ট সম্প্রদায় অভিজ্ঞতার নিরিখে নৈতিক মানদণ্ডের প্রশ্নে আইনকে বর্জন করেন এবং আইনগত মানদণ্ডকে আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীলরূপে উপস্থাপন করে।[২]

প্লেটোর *রিপাবলিক*[৩] গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনায় প্রাকৃতিক আইনের ধারণা পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন প্রকৃতি নৈতিকভাবে এবং নীতিগতভাবে নিরপেক্ষ নয়। প্রাকৃতিক আইনের সাথে নৈতিক আইনের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতিতে নৈতিক এবং অনৈতিক আচরণের একটি মূল্য রয়েছে। সেটি এই অর্থে যে নৈতিক আচরণের জন্য পুরস্কার এবং অন্যায় তথা অনৈতিক আচরণের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। প্লেটো মনে করেন, মানব জীবনের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য হলো তার প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞাই ব্যক্তিকে প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানে সাহায্য করে। ব্যক্তির নৈতিক-অনৈতিক আচরণের সাথে প্রজ্ঞার একটি সম্পর্ক রয়েছে। প্রজ্ঞা ব্যক্তিকে নৈতিক জীবন যাপনে

প্রভাবিত করে। তাঁর মতে, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে জীবনযাপনের জন্য একজন মানুষকে ন্যায়বান হতে হবে। প্রাকৃতিক আইন হলো মূলত নৈতিক আইন যা ব্যাক্তিকে আচরণের নির্দেশাবলি প্রদান করে এবং ব্যক্তির কাছে রাজনৈতিক ও নৈতিক আনুগত্য দাবি করে। প্রাকৃতিক আইন নৈতিক এবং নীতিগত বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। প্রাকৃতিক আইনের স্বতঃমূল্য আছে বলে প্লেটো মনে করেন।[৪]

প্লেটোর পর গ্রিক দর্শনে প্রাকৃতিক আইনের আলোচনা লক্ষ করা যায় এরিস্টটলের *পলিটিক্স* গ্রন্থে। এরিস্টটলের মতে দুই প্রকার আইন রয়েছে। যথা– বিশেষ আইন ও সার্বিক আইন। বিশেষ আইন হলো যা কোনো গোত্রের বা সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য সে সম্প্রদায় প্রয়োগ করে। যা অংশত লিখিত এবং অংশত অলিখিত। সার্বিক আইনকে এরিস্টটল প্রাকৃতিক আইন বলেছেন। এ আইন দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি পরস্পরের সাথে ন্যায়-অন্যায়ের সম্পর্কে আবদ্ধ, এক্ষেত্রে যদি ব্যক্তি কোনো সমিতির সদস্য না হয় কিংবা কোনো ধরণের চুক্তিবদ্ধ না হয় তবুও। এরিস্টটল মনে করেন প্রাকৃতিক আইন সার্বজনীন আইন এবং এ আইনে সমতা ও স্থায়িত্বের ধারণা অপরিবর্তনীয়। কামনা, বাসনা দ্বারা প্রাকৃতিক আইন প্রভাবিত হয় না। এ আইনের ভিত্তি প্রজ্ঞা।

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রদর্শন

মধ্যযুগে প্রাকৃতিক আইন অত্যন্ত পবিত্র ও নৈতিক বিধিরূপে গন্য হতো এবং এটিকে আদর্শ মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হতো। মধ্যযুগের বিচারকদের কাছে প্রাকৃতিক আইন মনুষ্যসৃষ্ট আইন বা রাজনৈতিক আইন (Positive law) অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধরূপে গণ্য হতো। এটি সাধারণ মানুষ, বিচারক, শাসক সকলের ক্ষেত্রে নির্দেশনারূপে কাজ করত। উল্লেখ্য যে, এরিস্টটলের বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অংশ লিখিত, কিন্তু প্রাকৃতিক আইনের কোনো লিখিত ভিত্তি নেই। প্রাকৃতিক আইনকে যুক্তি বা প্রজ্ঞার আইন বলা যেতে পারে, যে আইনের আলোকে সকলকে চলতে হতো। মধ্যযুগে প্রাকৃতিক আইনকে অনেকটা ঐশ্বরিক বিধানরূপেই বিশ্বাস করা হতো। মধ্যযুগীয় দার্শনিক তথা ধর্মযাজকগণ প্রাকৃতিক আইনকে কেবলমাত্র একটি আইন নয় বরং ঈশ্বরের পবিত্র নির্দেশের মতো মান্য করতেন এবং জনগণকে তা মান্য করতে উদ্বুদ্ধ করতেন ও নির্দেশনা দিতেন।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে প্রাকৃতিক আইন ঈশ্বরের নির্দেশ বলেই এটি সকলের মান্য করা উচিত, না কি এই আইন যুক্তিবাদিতার বহি:প্রকাশ বলে মেনে চলা উচিত। এধরণের বিতর্ক নামবাদী ও বাস্তববাদীদের মধ্যেও রয়েছে।

প্রাকৃতিক আইনের মধ্যযুগীয় ব্যাখ্যার প্রধান দার্শনিক টমাস একুইনাস। একজন ধর্মযাজক হওয়ার সুবাদে একুইনাস তাঁর লেখায় প্যাগান ঐতিহ্যের সাথে খ্রিস্টীয় শিক্ষাকে সমন্বিত করে এতে প্রাকৃতিক আইনের শক্তিশালী ভূমিকা চিত্রিত করেছেন। *সুম্মা থিওলজিকা* গ্রন্থে তিনি প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যাদেশ রূপে তুলে ধরেন। একুইনাস মনে করেন প্রাকৃতিক আইনের মধ্যেই যিশু খ্রিস্ট বৈশ্বিক মানুষের নৈতিক শৃঙ্খলা বিধানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। একুইনাসের প্রাকৃতিক আইনের এধরণের ব্যাখ্যা থেকে বলা যায় তিনি মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিকবাদে খ্রিস্টীয় ভাবধারার সুদৃঢ় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বরের বিধানের সাথে যুক্ত করেছেন। পাশাপাশি কেবল স্থানিক নয়, খ্রিষ্টধর্মের ছায়াতলে বিশ্বজনীন দায়িত্ব পালন এবং নৈতিকতা বিধানের লক্ষে কাজ করে মনে করেন।[৫] একুইনাসের মতে, প্রাকৃতিক আইন কেবলমাত্র মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপই নয়, বরং এটি বিশ্বে ঈশ্বরের নৈতিক শৃঙ্খলা বিধানের বিষয়গত নীতি, ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিফলন।[৬] একুইনাসের কাছে মধ্যযুগীয় সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাকৃতিক আইন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে, যা অতীন্দ্রিয় জগতের সাথে ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ স্থাপনে ও শৃঙ্খলা বিধানে কাজ করেছে। এ সম্পর্কে কার্বন্যু বলেন: Aquinas

achieved a remarkable reconciliation of the transcending and practical order of existence by limiting the invariability of the natural law to its "primary principles" and allowing for fluctuations in its "subnorms".[৭]

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ব্যাখ্যায় প্রাচীন যুগে প্রাকৃতিক আইনের সাথে প্রজ্ঞাকে এবং মধ্যযুগে প্রাকৃতিক আইনের সাথে ঈশ্বরের নির্দেশ ও বিশ্বাসকে সংযুক্ত করা হয়েছে। মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক দর্শনচিন্তায় প্রাকৃতিক আইনকে এক প্রকার ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের সাথে তুলনা করা হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন চিন্তায় প্রাকৃতিক আইন মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। উভয়কালেই লক্ষ করা যায় ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় তথা সামষ্টিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পেয়েছে। তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাকৃতিক আইন গুরুত্ব পেয়েছে, প্রাকৃতিক অধিকার নয়।

আধুনিককালে প্রাকৃতিক আইনের আলোচনা লক্ষ করা যায় জার্মান ভাববাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে। কান্ট তাঁর দর্শনচিন্তায় আইন ও নৈতিকতাকে দুটি পৃথক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আইন ও নৈতিকতার সমীকরণকে তিনি দুটি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। তিনি আইন এবং নৈতিকতাকে আকারগতভাবে পৃথক করেছেন। তিনি আইনকে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছেন সমাজের মানুষের বাহ্যিক স্বাধীনতার সংকুলান রূপে এবং নৈতিকতাকে ব্যক্তির অন্তস্থ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ব্যক্তিগত বিবেকবোধের নির্দেশরূপে।[৮]

প্রাকৃতিক আইনের আধুনিক ব্যাখ্যা

আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভবের সাথে সাথে যখন স্কলাস্টিকবাদ, থমিস্টিক চিন্তাভাবনা হ্রাস পেতে থাকল, পারলৌকিক রাষ্ট্রচিন্তার স্থলে ইহজাগতিক, লোকায়াত রাষ্ট্রচিন্তা প্রাধান্য বিস্তার করে তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুটি ভিন্ন অবস্থান পরিগ্রহ করে। আধ্যাত্মিক চিন্তা অপেক্ষা রাজনৈতিক চিন্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, পুঁজিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সামষ্টিকতাবাদের আবদন হ্রাস পেতে থাকলে ক্যাথলিক ধর্মচিন্তার স্থলে স্থান পায় প্রটেস্ট্যান্ট নৈতিকতা। রাজনীতিতে ইহজাগতিক রাষ্ট্রচিন্তার জাগরণে প্রাকৃতিক আইনতত্ত্ব নতুন করে মাত্রা লাভ করে। এ-সময় রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্র পোপের কর্তৃত্ব হ্রাস করে জনগণের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করে। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের আলোচনা আমরা দেখি প্রধানত তিনজন চুক্তিবাদী দার্শনিক টমাস হবস, জন লক ও জ্যাঁ জ্যাঁক রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায়।

গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার সাথে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার তফাৎ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন আর্নেস্ট বার্কার। বার্কার মনে করেন আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত ব্যক্তির অধিকার রক্ষার চিন্তা থেকে। আধুনিককালে রাষ্ট্র ব্যক্তির অস্তিত্ব ও অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বিকাশে কাজ করে। গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় মূলত প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্রের (ন্যায় রাষ্ট্রের) অধিকার। বার্কারের এধরণের বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রের সুরক্ষা তথা রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি। এধরণের মনোভাব পক্ষান্তরে, আধুনিক রাষ্ট্রের উপজীব্য রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষা তথা ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র।[৯]

আধুনিক রাষ্ট্রদার্শনিকদের পাশাপাশি সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণের কাছে প্রাকৃতিক আইনের ধারণাটি স্থান পেয়েছে। সমকালীন দার্শনিকগণের মধ্যে রয়েছেন মার্গারেট মীড, লিও স্ট্রস, ডি এট্রিভস প্রমুখ। সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার উভয় আলোচনায় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা অধিকতর গুরুত্বের সাথে এসেছে এবং তারা কম-বেশি প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক আইনের সাথে নৈতিকতার দিকটি যুক্ত করেছেন। সেই

সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, রাষ্ট্র বনাম ব্যক্তি, জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি বিষয়সমূহও উঠে এসেছে।

সমকালীন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক মার্গারেট মীড প্রাকৃতিক আইনের সংজ্ঞায় বলেছেন, প্রাকৃতিক আইন হলো আচরণের এমন নিয়ম যা উদ্ভূত হয়েছে কোনো শ্রেণির সুনির্দিষ্ট নৈতিক বৈশিষ্ট্যাবলীর আলোকে। এসকল নৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যে কোনো সাধারণ সমাজে উদাহরণরূপে আবির্ভূত হয়।[১০] ক্যারিট মনে করেন নৈতিক এবং নীতিবিদ্যক সত্যতা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক আইন স্বতঃপ্রমাণিত রূপে নির্দেশিত এবং একে সন্দেহ বা অস্বীকার করা যায় না।[১১]

অধ্যাপক ডি' এন্ট্রিভস তাঁর বিখ্যাত *ন্যাচারাল ল* গ্রন্থে বলেন, প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব বোঝার জন্য আমাদের এটিকে গ্রহণ করতে হবে মনস্তাত্ত্বিকভাবে এবং অত:পর এটিকে সংযুক্ত করতে হবে সে-সব শক্তির সাহায্যে যার মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়।[১২] তিনি আরো বলেন, আমাদের প্রাকৃতিক আইনকে গ্রহণ করতে হবে "সমাধানের বিস্তারিত পরিকল্পনা" অপেক্ষা "সমস্যাবলীর ওপর আলোকপাত" রূপে। তিনি মনে করেন, প্রাকৃতিক আইন একাধিক সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারে।[১৩]

আধুনিককালে বিশেষত ঊনিশ শতকে প্রণীত রাজনৈতিক আইন, যেমন– মানুষ এবং নাগরিকের অধিকারের ঘোষণা, আমেরিকার স্বাধীনতাপত্রের ঘোষণা এবং আমেরিকার সংবিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে প্রাকৃতিক আইনে ঔচিত্যবোধের, নীতি-নৈতিকতার যে প্রতিফলন পাওয়া যায় তা রাজনৈতিক আইনে দেখা যায় না। প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে এক প্রকার আদর্শিক ভাবধারা লক্ষ করা যায়। জ্যাক মারিটা প্রাকৃতিক আইনের সংজ্ঞায় বলেন, প্রাকৃতিক আইন হলো এমন এক ধরণের শৃঙ্খলা বা বৈশিষ্ট্য যা মানব প্রজ্ঞা আবিষ্কার করে এবং যা অনুসারে মানবজীবনের অনিবার্য উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধনে মানুষ কাজ করবে।[১৪]

প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের পার্থক্য

হবস প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রাকৃতিক অধিকার হলো ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক স্বাধীনতা যার সাথে ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের বিষয়টি জড়িত। পক্ষান্তরে, মানুষ যে বিধি অনুযায়ী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় তার কিছু অধিকার পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ত্যাগ করে এবং কিছু কাজ করা বা না করে থেকে বিরত থাকে সেটাই হলো প্রাকৃতিক আইন। প্রাকৃতিক অধিকারের সাথে যুক্ত স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা, আত্মস্বার্থের প্রাধান্য; আর প্রাকৃতিক আইনের সাথে যুক্ত হলো বিধি-নিষেধ, যুক্তিবাদিতা যা ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টানে এবং ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক অধিকার ব্যক্তির মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার বিষয়টি জিইয়ে রাখে, ব্যক্তির হাতে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা থাকে। ভারসাম্যহীন ক্ষমতার লড়াই ও বিস্তার প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা তৈরি করে।

প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তির 'অসম ক্ষমতার' লড়াইয়ে রাশ টেনে ধরে, প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের জীবনকে পরিবর্তন করে। প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তির প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খল জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করে। শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। প্রাকৃতিক অধিকার কেবল বেঁচে থাকার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে, কিন্তু প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তির যুক্তিবাদিতার বন্ধন সৃষ্টিতে আলোকপাত করে যা পরবর্তীতে মানুষকে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখে। প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তির মার্জিত সত্তার সহায়ক। প্রাকৃতিক অধিকারে কোনো পারস্পরিক দায়বদ্ধতা নেই, অবাধ স্বাধীনতা আছে, এটি একতরফা। প্রাকৃতিক আইনে হবস স্বাধীনতা বলতে বোঝান বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি। এ স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত, যুক্তিবাদী, তবে আত্মস্বার্থ বর্জিত নয়। প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে

রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সাহায্য করে, চুক্তিবাদী করে তোলে। প্রাকৃতিক আইন প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের প্রতি এক প্রকার দায়বদ্ধতার সম্মুখীন, যদিও দায়বদ্ধতার পরিবেশ মানুষই সৃষ্টি করেছে একটি চুক্তির মাধ্যমে।

এসকল বিষয় প্রাকৃতিক অধিকারে আমরা অনুপস্থিত দেখি তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো, প্রাকৃতিক অধিকার আইনবিহীন অবস্থা; এখানে মানুষের জীবন অনিরাপদ ছিল যা প্রাকৃতিক আইনের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত উন্নততর হয়েছে। তবে প্রাকৃতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের মতো ব্যক্তির জীবনকে নিরাপদ, সুসংহত এবং ভীতিহীন করতে পারেনি। প্রাকৃতিক অধিকার প্রকৃতির রাজ্যের সকল জনগণ ভোগ করত। যদিও জনগণের কাছে স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার ছিল কিন্তু নিরাপত্তাবোধের এ অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। প্রাকৃতিক আইন পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে অধিকার নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপত্তা বিধান করে, যদিও তা পুরোপুরি নয়।

হবসের ধারণা

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী এ নিয়ে সতের থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত দার্শনিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা ছিল। চুক্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে টমাস হবস প্রথম দার্শনিক যিনি প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার এ দুটিকে পৃথক করেন। লিও স্ট্রস মনে করেন, হবসের প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পৃথকীকরণ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার উৎপত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ। হবসের পূর্ববর্তী সময়কালে প্রাকৃতিক অধিকারকে প্রাকৃতিক আইন থেকে বিশেষভাবে পৃথকরূপে দেখা হতো না। হবস প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাকে পৃথকীকরণ দ্বারা প্রাচীন গ্রিক ও রোমানদের প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত ধারণায় পরিবর্তন আনেন। তিনি মনে করেন প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার দুটি ভিন্ন ধারণা। আইন ও অধিকার বোঝাতে তিনি যথাক্রমে Lex ও Jus শব্দদ্বয় ব্যবহার করেন। স্ট্রস হবস কর্তৃক প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের পৃথকীকরণের জন্য তাকে আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্বের জনক বলেছেন।[১৫]

প্রাকৃতিক আইন ও প্রথাসিদ্ধ রাজনৈতিক আইন প্রসঙ্গে ব্রিটিশ আইনবিদ জন অস্টিনের মত এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। অস্টিন প্রাকৃতিক আইন অপেক্ষা রাজনৈতিক আইনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাকৃতিক আইনের প্রবক্তারা যেখানে মানুষের জন্য আইনের বিপরীতে আইনের তাত্ত্বিক দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে তিনি মানুষের জন্য আইনের ব্যবহারিক দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জন অস্টিনের মতো ডর্কিন, হার্ট, হোমস প্রমুখ আইনজ্ঞগণ প্রাকৃতিক আইনকে আধুনিককালে রাজনৈতিক আইন বা পজিটিভ ল' এর ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্ববহ মনে করেন না। তারা আইনের জন্য আইনকে প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। তাঁদের আইন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈতিকতার বিষয়টি গৌণ, শক্তি তথা বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক আইনে মানুষের স্বতঃমূল্যের দিকটি উঠে এসেছে, কিন্তু পজিটিভ ল'-তে তা নেই। যেমন– জন অস্টিন তাঁর বিখ্যাত *Lectures On Jurisprudence*-গ্রন্থে রাষ্ট্রের জন্য আইনকে সর্বেসর্বা মনে করেছেন। তিনি আইনের অনিবার্য বৈশিষ্ট্যরূপে যুক্তি এবং বলপ্রয়োগকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন আইন হলো একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির ওপর আরোপিত নির্দেশনা, যার সাহায্যে ব্যক্তি অপরের ওপর কর্তৃত্ব আরোপ বা শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।[১৬] হবসের ক্ষেত্রেও আমরা আইনের লিগাল পজিটিভিজম এর দিকটি গুরুত্বপূর্ণ রূপে দেখেছি।[১৭]

হবস প্রাকৃতিক আইনকে *Lex Naturalis* এবং প্রাকৃতিক অধিকারকে *Jus Naturale* রূপে উল্লেখ করেন। হবসের ভাষায়-

> "... though thy that speak of his subject use to confound *Jus* and *lex*, right and law: yet they ought to be distinguished, because *Right* consisteth in liberty

to do; to forbear: whereas law determineth and bindeth to one of them: so that law and right differ as much, as obligation and liberty."[১৮]

অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন এবং প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। অধিকারের সাথে স্বাধীনতার বিষয়টি জড়িত, যাতে কোনো কিছু করা বা সহ্য করার বিষয়টি চলে আসে, পক্ষান্তরে আইনের ক্ষেত্রে এর যে কোনো একটি জড়িত। তাই আইন এবং অধিকার বাধ্যতাবোধ ও স্বাধীনতার প্রশ্নে একে অন্যের থেকে পৃথক। হবস প্রাকৃতিক অধিকার এবং প্রাকৃতিক আইনকে পৃথক করেছেন এভাবে–

"প্রাকৃতিক অধিকার বলতে হবস বুঝিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের তার স্বীয়জীবন রক্ষার ক্ষমতা এবং প্রাকৃতিক আইন হলো ব্যক্তির স্বীয়বিচার বিবেচনা এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে কোনো কিছু করার ক্ষমতা।"[১৯]

অর্থাৎ প্রাকৃতিক অধিকার হলো সেই স্বাধীনতা যা প্রত্যেক মানুষের কাছে ছিল এবং যা দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় ক্ষমতার ব্যবহার এবং ইচ্ছামত স্বীয় প্রকৃতির সংরক্ষণ করতে পারে। স্বীয় যুক্তি বিচার দ্বারা স্ব স্ব জীবনের অধিকার, কোনো কাজ করার স্বাধীনতা এগুলো ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকার। হবস তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থে যে প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলেছেন একে আমরা স্বাভাবিক অধিকারও বলতে পারি। প্রাকৃতিক অধিকারের অধীনে ব্যক্তি আত্মরক্ষার স্বাধীনতা ভোগ করে। স্বীয় প্রকৃতি রক্ষার্থে হবসের প্রাকৃতিক অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে, ক্ষমতার ব্যবহারের স্বাধীনতা ভোগ করতে এবং সেই সাথে ব্যক্তি স্বীয় বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি ব্যবহার দ্বারা কোনো কাজকে সেই উদ্দেশ্যের যথার্থ উপায় রূপে গ্রহণ করতে পারে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনায় লক্ষণীয় দিক হলো এখানে তিনি ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা, কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন তবে সে ক্ষমতা ও স্বাধীনতাকে যুক্তি ও বুদ্ধির সাথে সম্পর্কিত করেছেন। তিনি ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার কথা বলেছেন এবং এ স্বাধীনতা উপভোগে বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি কামনা করেছেন তাঁর প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বে। প্রাকৃতিক আইনকে তিনি এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন: প্রাকৃতিক আইন হলো এমন এক প্রকার বিধি, বা সাধারণ নীতি, যা যুক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং যা ব্যক্তিকে তার স্বীয় জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক হতে পারে অথবা তাকে আত্মরক্ষার উপকরণ থেকে বঞ্চিত করতে পারে এমন কোনো কিছু সম্পাদন করা বা না করা থেকে বিরত রাখে।[২০]

কাজেই বলা যায়, প্রাকৃতিক আইন হলো এমন নীতি বা বিধি যা ব্যক্তির মধ্যে যুক্তিবাদিতার জন্ম দেয়। এটি প্রচলিত আইনের অনুরূপ কোনো আইন নয়। বরং এটি হলো বিধি, যা ব্যক্তিকে সমস্ত অন্যায় ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখে এবং শান্তিময় জীবন ও আনুগত্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট করে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একদিকে এটি স্বীয় স্বার্থে ব্যক্তির জীবনকে শৃঙ্খলাময় করে, অন্যদিকে সমাজের ও অপরের সাথে যে কোনো প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে ব্যক্তিকে দূরে রাখে। বলা যায় প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তির মধ্যে যুক্তিবৃত্তির জন্ম দেয় যা তাকে আলোকিত করে; এতে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থের পাশাপাশি অপরের সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে মনোযোগী হয় অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে সহমর্মিতা-সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক আইন একদিকে ব্যক্তির মধ্যে জন্ম দেয় যৌক্তিকতা এবং অন্যদিকে জন্ম দেয় ন্যায্যতাবোধ। প্রকৃতির রাজ্যের অসভ্য-বর্বর মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে কেবল যুক্তিবাদী হয়ে উঠল না, পাশাপাশি তারা নৈতিকতার প্রতি মনোযোগী হলো এ বোধ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করল সভ্য সমাজের অনুরণন। এ থেকে আমরা দাবি করতে পারি যে হবসের প্রাকৃতিক আইন শুধু যৌক্তিকতা, ন্যায়নীতিবোধই সৃষ্টি করল না, বৃহত্তর অর্থে এটি ব্যক্তির মধ্যে বিশাল মনোজাগতিক পরিবর্তন সংঘটিত করল। আত্মকেন্দ্রিক মানুষ সচেতন বা অবচেতনভাবে অপরের স্বার্থের সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠল। প্রকৃতির রাজ্যের অসভ্য-অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে মানুষ

সভ্যতার দিকে অগ্রসর হলো যা সমাজ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করল। পরবর্তীতে তা ধাপে ধাপে রাষ্ট্র গঠনের পথে ধাবমান হয়। প্রাকৃতিক আইনকে সরকার গঠনের প্রাক পদক্ষেপ বলা যায়।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি ছিল নৈতিকতা। প্লেটো, এরিস্টটল, সিসেরো প্রমুখ দার্শনিকবৃন্দ মনে করেন নৈতিকতা প্রাকৃতিক আইনের উৎস বা ভিত্তি। কিন্তু হবস এর বিপরীত চিত্র প্রদান করেন। তিনি প্রাকৃতিক আইনের ওপর নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি ছিল নৈতিকতা। আর হবসের কাছে রাষ্ট্রের ভিত্তি নৈতিকতা নয়, আইন।

তবে স্ট্রস মনে করেন, হবসের নৈতিকতা ও রাজনীতির ভিত্তি প্রাকৃতিক আইন নয় বরং প্রাকৃতিক অধিকার। স্ট্রসের মতে, প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক অধিকার থেকে উদ্ভূত বা প্রাকৃতিক অধিকারের ধারাবাহিক পরিনতিই হলো প্রাকৃতিক আইন।[২১] হবসের প্রাকৃতিক অধিকারকে জনাথন উলফ্ বলেছেন স্বাধীনতার প্রাকৃতিক অধিকার। এটি হলো এমন স্বাধীনতা যার সাহায্যে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছামত সকল ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ পায়, আত্মরক্ষার অধিকার লাভ করে। উলফ্ মনে করেন স্বাধীনতার প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন বিরাজ করত।[২২]

হবস উনিশটি আইন বা স্বতঃসিদ্ধ (theorems) এর কথা বলেছেন। তাঁর প্রথম তিনটি আইনকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। হবসের প্রাকৃতিক আইনের প্রথম সূত্রটি হলো "that every man, ought to endeavour peace, as farre as he has hope of obtaining it; and when he cannot obtain it, that he may seek, and use all helps and advantages of war."[২৩]

প্রাকৃতিক আইনের প্রথম সূত্র থেকে লক্ষণীয় যে প্রত্যেকটি মানুষ শান্তিলাভের প্রচেষ্টা চালায়, শান্তি অন্বেষণ করে এবং যারা শান্তির বিঘ্ন ঘটায় তাদেরকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। মূলত এধরণের মনোবৃত্তি থেকেই হবসের সামাজিক চুক্তিতত্ত্বে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এমন দাবি করা যায়। মানুষের আত্মরক্ষার এই নীতি শুধু তৎকালীন প্রকৃতির রাজ্যেই নয়, বর্তমান সময়েও মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। মানুষ শান্তি অন্বেষণ করে। মানুষ নিজের শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে থাকতে আগ্রহী। হবসের প্রাকৃতিক আইনের প্রথম সূত্রটিতে জ্যামিতিক যুক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।[২৪] হবস যখন প্রথম সূত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তাহলে তিনি এ সূত্রটি প্রমাণের জন্য ব্যতিরেকী প্রমাণ (reductio ad absurdum)-এর দ্বারা জ্যামিতিক যুক্তি প্রয়োগ করেন, যেমন– কোনো ব্যক্তি যদি প্রাকৃতিক আইন মান্য না করে শান্তি প্রতিষ্ঠা না করে তবে ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যেই থাকবে এবং পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করবে। শান্তি প্রতিষ্ঠা না করা হলে প্রকৃতির রাজ্যের হানাহানিতে মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে যা প্রাকৃতিক আইনের বিরোধী। তাই হবস শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন।

হবসের প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের প্রথম নিয়মটিতে যে বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক অধিকারের পূর্ববর্তী। প্রাকৃতিক আইনের প্রথম এবং মৌলিক সূত্রটি হলো 'শান্তির অন্বেষণ এবং এর অনুসরণ' আর প্রাকৃতিক অধিকারের মূল বিষয় হলো 'যে কোনো উপায়ে আত্মরক্ষা করা'।[২৫] হবসের প্রাকৃতিক আইনের প্রথম নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক মানুষের শান্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং শান্তি অর্জনের জন্য বা শান্তি লাভের আশা করা উচিত এবং যখন সে শান্তি অর্জনে বা অন্বেষণে অসমর্থ হবে তাহলে সে যুদ্ধের সুবিধা নিতে পারে।[২৬]

প্রকৃতির রাজ্যের যুদ্ধংদেহী অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হতো বলে হবস মনে করেন। প্রতিপক্ষ বা শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্যক্তির যে কোনো কিছুর অধিকার ছিল– এমনকি যে কাউকে হত্যা করার অধিকারও রাখত। প্রাকৃতিক অধিকার অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের সবকিছু করার অধিকার থাকলেও

ব্যক্তি যতই জ্ঞানী বা শক্তিশালী হোক না কেন তার প্রকৃতিপ্রদত্ত সময় পর্যন্ত (হবস এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কথা না বলে প্রকৃতির কথা বলেছেন) সে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা পায় না। হবসের মতে মৌলিক প্রাকৃতিক আইন হলো শান্তির অন্বেষণ এবং তা অনুসরণ করা। প্রাকৃতিক আইনের প্রথম বিধিটি সম্পর্কে তিনি বলেন- সকল মানুষ ততদূর শান্তি লাভের জন্য আশা করে যতদূর সে শান্তি লাভের জন্য চেষ্টা করে এবং সকল অন্বেষণ ও সাহায্য গ্রহণ সত্ত্বেও যখন সে তা অর্জন করতে পারে না তাহলেই প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ যুদ্ধের সুযোগ নেয়।[২৭]

প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের আত্মরক্ষার প্রবণতা থেকে প্রাকৃতিক আইনের দ্বিতীয় সূত্রটি উদ্ভূত। দ্বিতীয় সূত্রটি হলোঃ “that a man be willing, when others are so too, as far forth, as for peace, and defense of himself re shall think it necessary lay down his might to all things; and be contented with so much liberty against other men, as he would allow other men against himself.[২৮]

হবসের প্রাকৃতিক আইনের দ্বিতীয় সূত্রটিতে লক্ষণীয় হলো মানুষ কোনো নৈতিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঔচিত্যেবোধ থেকে অপরের কল্যাণে কাজ করে না, যদি করতো তাহলে এটিকে একটি নৈতিক আইনের মর্যাদা দেয়া যেত। কিন্তু তা না করে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি কাজ করে, তাই হবস প্রাকৃতিক নিয়মকে 'rule of personal advantage’ বলে গন্য করেছেন। ফলশ্রুতিতে কোনো নিয়ম যতক্ষণ ব্যক্তির সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে ততক্ষণ সেটাকে মান্য করে, বশ্যতা স্বীকার করে; একই সাথে একজন ব্যক্তি আশা করে অন্য ব্যক্তিরাও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নতি স্বীকার করবে। হবসের প্রাকৃতিক আইন পারস্পরিক সম্মতি এবং ভাগাভাগির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভাগাভাগি এই অর্থে যে কেউ অন্য কারো বিষয়ে অন্যায্য হস্তক্ষেপ করবে না এবং শান্তি বিধানের জন্য স্বীয় অধিকার, স্বার্থ ত্যাগ করবে। যখন ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে আইন মান্য করবে তাহলে সে নিরাপদে বাস করতে পারবে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের দ্বিতীয় নিয়মটি বা সূত্রটি হলো যে কোনো উপায়ে আমরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করি।[২৯] নিয়মটি হলো চুক্তি এবং শান্তির পথ। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছামূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে তাহলে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করে। তাই প্রত্যেকের উচিত যা খুশি তা করার অধিকার ত্যাগ করে যা যুক্তিগ্রাহ্য তা করা। প্রত্যেকে নিজেদের কিছু অধিকার ত্যাগ করার মাধ্যমে সকলে নিজেদের অধিকার ত্যাগ করে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি হয়, যাতে প্রত্যেকে শান্তির পথে এগিয়ে আসে। বলা যায় মানুষ শান্তি লাভের প্রচেষ্টাস্বরূপ তার স্ব স্ব স্বেচ্ছামূলক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখে। স্বাধীনতার এসব সংকোচন দ্বারা ব্যক্তি এখানে লাভ করল শান্তি এবং নিরাপত্তা। হবসের এই দ্বিতীয় নিয়মটিতে এক প্রকার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যার দ্বারা মানুষ নিরাপদ জীবন পেতে পারে। তাদের এই চুক্তি পরবর্তীতে সামাজিক চুক্তির বাস্তবায়নে সহযোগী হয়, শান্তি পাওয়ার বা লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় নিয়মটিতে আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো শান্তি লাভের প্রচেষ্টা স্বরূপ ব্যক্তির পারস্পরিকতাবোধে সংযুক্ত হওয়া। এতে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ বুঝতে পারল ভালো থাকার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের জন্য তাদের প্রত্যেকের যথেচ্ছাচারিতামূলক আচরণ তথা অধিকার পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তারা পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় আবদ্ধ হলো। মানুষের এধরণের মনোবৃত্তিকে আমরা হবসের গস্পেলের নিয়মের সাথে তুলনা করতে পারি– তুমি অন্যের কাছে যেরূপ আচরণ আশা করো অথবা অপরের তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ/ব্যবহার করা উচিত বলে তুমি প্রত্যাশা করো, তোমারও অন্যের প্রতি অনুরূপ আচরণ করা উচিৎ। তুমি নিজের প্রতি যেমনটা হওয়ার প্রত্যাশা করো না, তেমনটা তুমি অন্যের প্রতিও করো না।[৩০] গস্পেলের এই নীতিটিকে হবস নঞর্থক সুবর্ণ মধ্যক নিয়ম আকারে পেশ করেছেন। দ্বিতীয় নিয়মটির সারকথা তিনি এভাবে উল্লেখ করেন:

পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে শান্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি তার স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে অন্যের বিরুদ্ধে সে ততটা স্বাধীনতা অনুমোদন করে যতটা স্বাধীনতা সে নিজের জন্য কামনা করে তথা অনুমোদন করে।[৩১]

এভাবে হবস তাঁর প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় দেখালেন প্রত্যেক মানুষ শান্তি কামনা করে। প্রকৃতির রাজ্যের পরিবেশ শান্তির জন্য সহায়ক ছিল না। প্রাকৃতিক আইনের তৃতীয় সূত্রটি প্রথম দুটির সমন্বয়ে উদ্ভূত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এর দ্বারা মানুষ চুক্তিবদ্ধ হলো। তৃতীয় সূত্রটির দ্বারা তিনি প্রাকৃতিক আইনকে আত্ম-স্বার্থের উপপাদ্য (theorems of self interest) রূপে কেবল গ্রহণ না করে বরং এমন একটি নিয়মরূপে গ্রহণ করেছেন যার দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় অধিকার ত্যাগ করে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় অধিকারের কিছু অংশ হস্তান্তর করে।[৩২]

প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় লক্ষণীয় হলো শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য জনগণ তাদের অধিকারকে হস্তান্তর করল (সমর্পণ করল) উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত প্রথম তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের ব্যাখ্যায় আমরা লক্ষ করি প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ স্বেচ্ছায় (পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে) কিছু অধিকার সমর্পণ বা ত্যাগ করে অধিকতর উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে, একটি সাধারণ ক্ষমতা নির্ধারণ করে প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা যা শক্তি এবং অধিকারের সংমিশ্রণে কার্যকর হয়ে ওঠে। শক্তি জনগণের সামাজিক চুক্তির ফলে প্রাপ্ত এবং অধিকার যা জনগণ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে।

ব্যক্তি ঐচ্ছিকভাবে বা স্বেচ্ছায় অধিকার অস্বীকার বা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত প্রকৃতির রাজ্যের যে কোনো কিছুর উপর প্রাকৃতিক অধিকার ছিল, যতক্ষণ ব্যক্তি নিজে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করত। হবস মনে করেন হস্তান্তর বা অস্বীকার করার মাধ্যমে কেবল অধিকার ত্যাগ করা সম্ভব। এ দুই উপায়ের যে কোনো একটি একভাবে ত্যাগ করা হলে ব্যক্তি আর অধিকার দাবি করতে পারে না এবং ত্যাগকৃত অধিকার পুনরায় ফেরত নিতে বা বাতিল করতে পারে না। হবসের মতে, ব্যক্তি যে অধিকার অস্বীকার বা হস্তান্তর করেছে তা সে পুনরায় দাবি করলে তা হবে অন্যায় এবং ক্ষতিকর।[৩৩]

মানুষ যখন তার অধিকার হস্তান্তর করে বা অস্বীকার করে তার পশ্চাতে মানুষের কোনো ভালো কিছু লাভের উদ্দেশ্য থাকে। ব্যক্তির ঐচ্ছিক অধিকার ত্যাগের পশ্চাতে থাকে তার নিজের জন্য ভালো কিছুর আশা বা প্রতিদান প্রাপ্তি। তাহলে আমরা বলতে পারি ব্যক্তিগত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগের উদ্দেশ্য। তবে হবস একটি বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ করেন, ব্যক্তি অন্যান্য সকল অধিকার ত্যাগ করলেও তার জীবনের অধিকার কখনো সে ত্যাগ বা হস্তান্তর করে না। কারণ এতে অন্য ব্যক্তির দ্বারা সে আহত হতে পারে কিংবা অপর ব্যক্তি বলপূর্বক তার জীবন ছিনিয়ে নিতে পারে, বন্দি কিংবা দাসত্ববদ্ধ হতে পারে যা ব্যক্তি নিজের জন্য কখনো মঙ্গলজনক মনে করে না। ব্যক্তি তার জীবনের অধিকার নিজের কাছে রেখে অপরাপর অধিকারসমূহের হস্তান্তর বা অস্বীকৃতি দ্বারা মূলত জীবনের নিরাপত্তা প্রাপ্তিই তার লক্ষ এবং উদ্দেশ্য।

অধিকার হস্তান্তর এবং কোনো দ্রব্য হস্তান্তর- এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অধিকারের পারস্পরিক হস্তান্তরকেই হবস বলেছেন চুক্তি।[৩৪] কোনো দ্রব্যের অধিকারের হস্তান্তর যদি পারস্পরিক না হয়, যদি কোনো এক পক্ষের মাধ্যমে কোনো বন্ধুত্ব, বা বন্ধুর কাছ থেকে কোনো সেবা প্রাপ্তি, সুনাম অর্জন ইত্যাদি হয় তাহলে এগুলোকে কোনো চুক্তি বলা যায় না, বরং বলা যায় উপহার। পারস্পরিক হস্তান্তর প্রক্রিয়া হলো চুক্তির মূল বিষয়। হবস তাঁর দ্বিতীয় সূত্রটিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিকে তার সকল জিনিসের প্রতি অধিকার ত্যাগের কথা বলেছেন। আবার পরবর্তীতে সকল জিনিসের প্রতি সকল অধিকার ত্যাগের পরিবর্তে তিনি সকল জিনিসের প্রতি কিছু অধিকার ত্যাগ করার কথা বলেছেন। কিছু অধিকারের মধ্যে হবস অধিকাংশ বা অনেকগুলো অধিকার ত্যাগের কথা বলেছেন। এ ত্যাগ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর হলো চুক্তি সম্পাদন দ্বারা; চুক্তির মাধ্যমে অধিকার কোনো মনোনীত সত্তার কাছে

সমর্পণ করে। 'সমর্পণ' এই কারণে যে এটি তারা স্বেচ্ছায় করেছে, স্বীয় স্বার্থে, বৃহত্তর ও ব্যক্তিগত কল্যাণে। যার কাছে সমর্পন করল সেই মনোনীত সত্তা হলো 'সার্বভৌম'।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের তৃতীয় সূত্রটি চুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। তিনি মনে করেন মানুষ যে চুক্তি সম্পাদন করেছে তাকে রক্ষা করতে হবে, অন্যথায় তা কথার কথা হয়ে পড়বে। চুক্তির দ্বারা ব্যক্তির অধিকার রক্ষা সম্ভব, অন্যথায় মানুষ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ফিরে যাবে।[৩৫] তৃতীয় সূত্রটি তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই নিয়মটির বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামাজিক চুক্তি অধ্যায়ে দেখতে পাব। তৃতীয় সূত্রটি প্রাকৃতিক আইনের যে ঊনিশটি সূত্র তিনি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হবসের আইনের তৃতীয় শর্ত হলো মানুষের সৃষ্ট চুক্তির শর্ত পালন করা উচিত। এর দ্বারা মানুষ চুক্তিটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তৃতীয় সূত্রটির আলোচনায় আমরা ন্যায় শব্দটির দ্বিবিধ ব্যবহার পাই। যেমন– সংকীর্ণ অর্থে ন্যায় হলো চুক্তি রক্ষা করা এবং অন্যায় হলো চুক্তি পালন না করা। হবসের আইনের তৃতীয় সূত্রটির সাথে ন্যায়পরতার সম্পর্ক রয়েছে। এ সূত্রে চুক্তির পাশাপাশি, ন্যায়-অন্যায়, ন্যায়বিচার, কমনওয়েলথ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের আলোচনায় একে দুই দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের ক্ষেত্রে এবং কাজের ক্ষেত্রে। মানুষের ক্ষেত্রে ন্যায় আচরণের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের সাথে তুলনা করেছেন, আর কাজের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচার করেছেন। এ ক্ষেত্রে আচরণ, ব্যক্তির জীবন অন্য কোনো বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দেননি। কাজের ক্ষেত্রে ন্যায় দুই ধরণের হতে পারে– বিনিময়মূলক ও বণ্টনমূলক। প্রথমটি গাণিতিকহারে এবং বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত, আর দ্বিতীয়টি জ্যামিতিকহারে এবং তা ব্যক্তির সাথে যুক্ত।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে কিছুটা মতদ্বৈততা দেখা যায়, তা এরকম – হবস কি এ প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন না কি জ্যমিতির ওপর তথা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর। হবসের প্রাকৃতিক আইন কখনো অভিজ্ঞতানির্ভর এবং কখনো বৈজ্ঞানিক বা জ্যামিতিক মনে হয়। তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতিকেই বৈজ্ঞানিক মনে করেছেন। তাঁর মতে উদ্দেশ্য এবং উপায় উভয়ই জ্যামিতিক যুক্তিবাদিতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং এ ধরণের যুক্তিকে তিনি বৈজ্ঞানিক বলেছেন।[৩৬]

হবসের চতুর্থ আইনটিকে বলা যায় কৃতজ্ঞতার আইন। এ আইন দ্বারা একজন ব্যক্তি তার আনুগত্য প্রদর্শন করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি সুবিধা ভোগ করে; যদি না সে এমনভাবে কাজ করতে চেষ্টা করে যাতে তার লাভ হয়, সে তার জন্য উপকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গিয়ে আরো যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সে ব্যক্তি নিজেকে তার বদান্যতার জন্য অসুবিধাজনক অবস্থায় রেখেছে।[৩৭]

ওয়ারেন্ডার মনে করেন, হবসের চতুর্থ আইনটি মৌনচুক্তি তত্ত্বের সাথে প্রাসঙ্গিক। তাঁর তত্ত্ব মূলত প্রতিজ্ঞা রক্ষা অপেক্ষা চুক্তি রক্ষায় জোরারোপ করে। যে কারণে তিনি চতুর্থ আইনকে ন্যায়ের আইন অনুযায়ী সজ্জিত করেছেন। চুক্তির মধ্যে সবসময় লাভ-ক্ষতির বিষয়টি চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীসমূহের কাছে গুরুত্ব পায়। তাই ন্যায়ের আইন এবং কৃতজ্ঞতার আইন এর মধ্যে বেশ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। হবস মৌনচুক্তির কথা বলেছেন তাদের জন্য যারা চুক্তিতে কোনো প্রকাশ্য সম্মতি দান করেনি। অর্থাৎ সে-সব ব্যক্তি যারা কোনো প্রকার প্রকাশ্য আনুগত্য প্রদর্শন বা সম্মতি প্রদান করেনি তারা যখন সুরক্ষার সুবিধাসমূহ স্বীকার করে তাহলে মৌন চুক্তির বিষয়টি আসে। কৃতজ্ঞতার আইন এবং ন্যায়ের আইন উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। তা মূলত যে তত্ত্বের ওপর গড়ে উঠেছে তা হলো প্রতিজ্ঞা রক্ষার নীতি।[৩৮] প্রাকৃতিক আইনের বিশ্লেষণে আমরা ব্যক্তির আত্ম-রক্ষার্থে আইনের প্রতি বাধ্যতা বা আনুগত্য প্রদর্শন দেখি এবং বাধ্যতা তারা প্রদর্শন করে শান্তি প্রচেষ্টার অংশরূপে যা ব্যক্তির জীবন নিরাপদ ও সুরক্ষিত করবে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের পঞ্চম সূত্রটির মূল বিষয় হলো শিষ্টতা। ব্যক্তি অপরের জন্য নিজেকে অপরের সাথে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নিবে।[৩৯] এক্ষেত্রে তিনি পাথরের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। পাথর বিভিন্ন আকার-

আকৃতি-কাঠিন্যের হওয়া সত্ত্বেও এরা মজবুত গাথুনি তৈরি করে, তদ্রুপ মানুষ স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় নিজেকে অপরের সাথে মানিয়ে নেবে। এর দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অন্যথায় তা পূর্ববর্তী প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের ষষ্ঠ সূত্রটি হলো ক্ষমাশীলতা।[৪০] ক্ষমাপ্রার্থনা হলো মূলত তাদের পূর্ববর্তী শত্রুভাবাপন্ন আচরণের জন্য, যুদ্ধাবস্থাময় পরিস্থিতির জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে পুনরায় এধরণের আচরণ থেকে বিরত হওয়া। অন্যথায় তা প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের সপ্তম নিয়মটি হলো ব্যক্তির অতীতের মন্দ আচরণ স্মরণে রেখে মন্দ কাজ না করা এবং ভবিষ্যতে ভালো কাজকে অনুসরণীয় রূপে গ্রহণ করা। প্রাকৃতিক আইনের সাহায্যে প্রতিহিংসা তথা প্রতিশোধপরায়ণতা ত্যাগ করা সম্ভব। যার ফলে ব্যক্তি প্রতিশোধের প্রবণতা থেকে সরে এসে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইনকে হাতে তুলে না নিয়ে ভালো কাজ করবে, যুক্তির সাহায্যে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ দ্বারা ব্যক্তি ভবিষ্যত ভালো পথে এগিয়ে যাবে।[৪১]

প্রাকৃতিক আইনের অষ্টম সূত্রটি হলো ঔদ্ধত্যের বিপক্ষে। কোনো ব্যক্তি তার আচরণ, কার্যকলাপ, কথা, দৈহিক অঙ্গভঙ্গির দ্বারা অন্যের প্রতি কোনো রূপ ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারবে না। যদি করে তবে তা হবে অবমাননা এবং প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন।[৪২]

প্রাকৃতিক আইনের নবম সূত্রটি অহঙ্কারের বিরুদ্ধে।[৪৩] প্রকৃতিতে এ অবস্থায় সকল মানুষ সমান। এখানে কোনো উচ্চতর-নিম্নতর অবস্থান মানুষ বিচার করতে পারে না। অসমতা উদ্ভূত হয়েছে সিভিল ল থেকে। এরিস্টটল যেমন কিছু মানুষকে জ্ঞানী বা বিচক্ষণ মনে করেন যারা প্রভু হওয়ার যোগ্য এবং কিছু মানুষ দাস হওয়ার যোগ্য যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা, সাহস ইত্যাদি সদ্‌গুণসমূহের অনুপস্থিতি দেখা যায়। এরিস্টটল তাঁর *পলিটিক্স* গ্রন্থে বলেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট, তাই মানুষের প্রভূত্ব বা দাসত্ব ব্যক্তি কর্তৃক নির্ণিত নয়, প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত।

হবস এ মতের বিপরীতে বলেন প্রকৃতি নয়, বরং আইনই এ ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থানগত বিভাজনের বিচারক।[৪৪] তাঁর মতে, প্রকৃতি যদি মানুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করে থাকে তবে মানুষে-মানুষে শ্রেণিবিভাজন থাকতে পারে না, সমতাকেই স্বীকার করে নেওয়া উচিত। আবার প্রকৃতি যদি মানুষকে অসমানভাবে সৃষ্টি করে তাহলে মানুষ সমতা লাভের চেষ্টা করলেও হবস উল্লেখিত শান্তির অবস্থায় (প্রাকৃতিক আইনের প্রথম সূত্র) প্রবেশ করতে পারবে না। তাই প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অপরের সমতার স্বীকৃতি স্বীকার করে নেয়। যদি সে তা না করে তবে তা হবে এই বিধির লঙ্ঘন এবং তা হবে অহঙ্কার।

প্রাকৃতিক আইনের দশম সূত্রটি দাম্ভিকতার।[৪৫] প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ শান্তির অন্বেষণ ও লাভের আশায় নিজেদের কিছু অধিকার যখন তারা ত্যাগ করে, তাহলে তারা তাদের কিছুটা স্বাধীনতাও ত্যাগ করে। তারা নিজেদের জীবনধারনের জন্য অপরিহার্য এমন কিছু বিষয়– যেমন, নিজের শরীরের ওপর পরিচালনার অধিকার, বাতাস, জল, গতিশীলতা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া– এসব বিবিধ বিষয়ে তারা স্বাধীনতা ত্যাগ না করে অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা হস্তান্তর এবং ত্যাগ করে। ব্যক্তি শান্তির আশায় যে-সব অধিকার ত্যাগ করেছে অন্যকেও সে-সকল কাজের অনুমোদন করে না। এমতাবস্থায় ব্যক্তি যদি নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তা হবে ব্যক্তির প্রাকৃতিক সাম্যের প্রতি অস্বীকৃতি, যে সাম্যাবস্থাকে ব্যক্তি স্বীকার করে নিয়েছে প্রাকৃতিক আইনরূপে তার লঙ্ঘন। সোজা কথায় তা হবে আইনের লঙ্ঘন। যারা আইন পালন করে তাদেরকে হবস বলেছেন বিনয়ী এবং যারা ভঙ্গ করে তাদের উদ্ধত মানুষ।

প্রাকৃতিক আইনের একাদশ সূত্রটি হলো সমতার (Equity)।[৪৬] প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ যাকে বিচার করার জন্য বিশ্বস্ত মনে করেছে সে ব্যক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সমানভাবে দেখবে। অন্যথায় অসমতা আবার ব্যক্তির

মধ্যে যুদ্ধময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তাই বিচারকার্যে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব বিচারকের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করবে। একাদশ সূত্রের লক্ষণীয় দিকটি হলো বণ্টনের ন্যায্যতা, যে– কারণে মানুষ উর্দ্ধতন শক্তির শরণাপন্ন হয়।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের দ্বাদশ সূত্রটি হলো জিনিসের সমান ব্যবহার।[৪৭] কারণ বণ্টন যদি অসম হয় তবে অসমতা তৈরি হবে, অসন্তোষ সৃষ্টি হবে এবং তা হবে প্রাকৃতিক আইনের একাদশ সূত্রের পরিপন্থী। যে জিনিসকে ভাগ করা যায় তা সমানভাবে ভাগ করতে হবে, অর্থাৎ সমানুপাতিকহারে অধিকারভুক্তদের মধ্যে ভাগ করতে হবে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের ত্রয়োদশ সূত্রটিতে বলা হয়েছে– কিছু জিনিস যা সম্মিলিতভাবে উপভোগ্য নয় বা সকলের মধ্যে বিভাগ করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে লটারি বা বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।[৪৮]

হবসের প্রাকৃতিক আইনের চতুর্দশ সূত্রটিতে উল্লেখ করা হয়েছে লটারি বা বাছাইকরণের মাধ্যমে[৪৯] যখন কোনো জিনিসের মালিকানা নির্ধারণ করা হবে তাহলে জ্যেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়া হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচন দুই ধরণের হতে পারে– খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারী এবং প্রাকৃতিক। স্বেচ্ছাচারী নির্বাচন হলো যা প্রতিযোগীদের ইচ্ছায় নির্ধারিত এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো যা জ্যেষ্ঠত্ব দ্বারা নির্ধারিত। হবস মনে করেন যে বিষয়টিকে সম্মিলিতভাবে ভোগ বা সকলের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব নয় তা প্রথমে কর্তৃত্বাধিকার অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের পঞ্চদশ সূত্র অনুযায়ী শান্তি লাভের জন্য যে-সকল ব্যক্তি শান্তি রক্ষায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তারা সরকারি রক্ষাপত্ররূপে অনুমোদিত হবে। আইনের ক্ষেত্রে শান্তির নির্দেশ হলো লক্ষরূপে, মধ্যস্থতার নির্দেশ উপায়রূপে এবং মধ্যস্থতার উপায় হলো সরকারি রক্ষাপত্র।[৫০]

হবসের প্রাকৃতিক আইনের ষষ্ঠদশ সূত্রটি হলো– মানুষ কোনো সালিশ বা বিচারকের অধীনে নিজেদের মূল্যায়ণের ভার দিল।[৫১] প্রাকৃতিক আইনের আলোচনাকালে হবস এ কথা পুনরায় ব্যক্ত করেছেন যে সকল মানুষ স্বেচ্ছায় আইন মান্য করবে কিংবা আইনের বিরুদ্ধে যাবে না তা নয়। আবার আইন মান্যকারীদের কেউ অধিকারের প্রশ্নে আবার কেউ বিষয়গত কারণে আইন মান্য করবে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ তাই একজন ব্যক্তিকে বিচারক মনোনীত করেছে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য, যার নির্দেশ মানতে মানুষ বাধ্য।

সপ্তদশ সূত্রানুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রাকৃতিক আইনের অধীনে আসার পর কোনো মানুষ আর স্বীয় বিচারক নয়। কারণ প্রত্যেকেই একজন বিচারকের কাছে দায়বদ্ধ। যেহেতু তারা প্রত্যেকেই কেবল স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছিল, অপরের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করে এধরণের অসম এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যেই কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ তৃতীয় পক্ষের কাছে গেল। এই তৃতীয় পক্ষই তাদের মীমাংসক বা বিচারকের ভূমিকায় থাকবে, ব্যক্তি নিজে নয়।[৫২]

প্রাকৃতিক আইনের অষ্টাদশ সূত্রানুযায়ী যেহেতু ব্যক্তির মধ্যে পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার থাকার কারণে সে স্বীয় বিচারক হওয়ার সক্ষমতা হারাল, তাই বিচারক যদি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেন অথবা ঘুষ গ্রহণ করেন তবে তিনি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস সমস্তই হারাবেন।[৫৩]

হবসের প্রাকৃতিক আইনের ঊনবিংশতম সূত্রটি হলো কোনো বিচারক যদি তার গ্রহণযোগ্যতা হারান তাহলে তার পরেরজন, আবার তার অগ্রহণযোগ্যতা তৈরি হলে অপরজন বিচারক হবেন। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে একসময় অবশ্য শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা চলে আসে, যদিও তা প্রাকৃতিক আইনের বিরোধী।[৫৪]

হবসের প্রাকৃতিক আইনের এই ঊনিশটি সূত্র হলো প্রকৃতির রাজ্য থেকে সুশীল সমাজ তথা রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের পথ পরিক্রমা। এ সকল বিধি ব্যক্তিকে শান্তির অন্বেষণের নির্দেশনা দেয়। প্রাকৃতিক আইনের ঊনিশটি বিধিকে আমরা যদি সংক্ষেপে বোঝাতে চাই তাহলে বলা যায়, ব্যক্তির অপরের প্রতি এমন কোনো আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত যা ব্যক্তি নিজের প্রতি করে না বা আশাও করে না (*Do not that to another which thou wouldest not have done to thyself.*)।[৫৫] আমরা বলতে পারি, প্রাকৃতিক আইনের বিধিসমূহকে হবস মূলত সংযুক্ত করেছেন বিবেকের নির্দেশনার সাথে।[৫৬] বিবেকের সাথে সংযুক্তির ফলে তিনি নম্রতা, বাধ্যতাবোধের মতো বিষয়সমূহকে বিধিরূপে যুক্ত করেছেন। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, শর্ত ভঙ্গ না করা, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা/অনধিকার চর্চা, অযাচিত হস্তক্ষেপ এ সকল বিষয় কেবল আইনগতভাবে নয় আমাদেরকে নৈতিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। নৈতিকতার এই বোধকে তিনি দাবি করেছেন বিবেকবোধের সাথে। নৈতিকতাবোধের তাড়নাতেই ব্যক্তি শান্তির অন্বেষণ করবে, কেবল শাস্তির ভয়েই ব্যক্তি আইন মান্য করে তা নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের আকর্ষণ– এগুলো কেবল আইন দ্বারা টিকিয়ে রাখা যায় না। সাথে প্রয়োজন নৈতিক শৃঙ্খলা। প্রাকৃতিক আইন অমান্য করা কেবল বেআইনি নয়, এটি নৈতিকতা বা বিবেক বহির্ভূত।

অবশ্য ওয়ারেন্ডার হবসের বিবেকের নির্দেশনাকে (in foro interno) সংকীর্ণতর অর্থে বিবেচনা করেছেন, এটি বৈধতার জন্য অন্য লোকের পারস্পরিকতার ওপর নির্ভর করে না।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনার সাথে তাঁর প্রকৃতির রাজ্য বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে প্রকৃতির রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনি যে কর্তৃত্বমূলক শক্তির উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন তা স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক শক্তি। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃতিক আইনের মাধ্যমে আংশিকভাবে এই রাজনৈতিক শক্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ শক্তির বিশেষত্ব হলো এটি জনগণকে নির্দেশ দিতে পারে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার্থে জনগণ সে নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকে। এ শক্তির হাতে আইন প্রনয়ণের ক্ষমতাও দিল জনগণ। এ কথা আমরা বলতে পারি যে, মানুষের মৃত্যুভয়ই তাকে রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে তাড়িত করে। কারণ রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণিত অবস্থা জনগণের সুন্দর জীবনের জন্য কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করা সত্ত্বেও মানবজীবন শান্তিময় না হয়ে বিপদসংকুল ছিল। তাই প্রয়োজন দেখা দিল আইনের। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে, প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে প্রাকৃতিক অধিকার ভোগকারী জনগণের জন্য হবস প্রাকৃতিক আইনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাকৃতিক আইনতত্ত্ব হলো এক প্রকার নৈতিক দর্শন। এই দর্শন হলো ভালো-মন্দের বিজ্ঞান, যা মানব সমাজে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভালো-মন্দের বিচার করে।[৫৭] এর আলোকে ব্যক্তির আচরণের অনুরাগ-বিরাগ, বাসনা, বিতৃষ্ণা, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শের মতো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসহ ব্যক্তির যুক্তির কাছে যা গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণ কীভাবে ভিন্ন হতে পারে এ সমস্ত দিক আলোচিত হয়। এর দ্বারা হবস মূলত তাঁর প্রাকৃতিক আইনের ঊনিশটি বিধির প্রকাশ বুঝিয়েছেন।

প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ছিল ভালো-মন্দের মাপকাঠি। কালক্রমে ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাল যে শান্তি ভালো। শান্তি লাভের পথে ন্যায়, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, সাম্য, করুণা, দয়া ইত্যাদি গুণসমূহ প্রয়োজনীয়, যা আমরা বিভিন্ন সময়ে হবসীয় প্রাকৃতিক আইনে দেখেছি। এ সকল গুণাবলীকে হবস বলেছেন নৈতিক সদগুণ (moral virtues)।[৫৮] এর বিপরীত গুণসমূহ হলো মন্দ (vices, evil)। হবসের ভাষায়, নীতিদর্শন হলো সদ্গুণ এবং মন্দের বিজ্ঞান; সুতরাং সত্যিকারের প্রাকৃতিক আইনতত্ত্ব প্রকৃত নীতিদর্শন।[৫৯]

হবসের মতে, প্রাকৃতিক আইন হলো যুক্তির আদেশ: এ আইন ও এর বিধিসমূহ হলো স্বতঃসিদ্ধ, কারণ এগুলো ব্যক্তির রক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। আইনের সাথে অধিকারের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। উন্নততর জীবনের লক্ষ্যে অধিকার ব্যক্তির স্বেচ্ছা হস্তান্তর। তাই বলা যায় প্রাকৃতিক অধিকারের সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ প্রাকৃতিক আইনের সূত্রপাত ঘটায়। হবস তাঁর প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বে মনে করেন নৈতিকতা আইনের ভিত্তি হতে পারে না, আবার নৈতিকতা রাষ্ট্রেরও ভিত্তি হতে পারে না। হবস প্রাকৃতিক অধিকারকে মানুষের নৈতিকতার সম্পর্ক এবং ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন নি। বরং প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার উভয়কে তিনি মানবচরিত্রের জড়বাদী ব্যাখ্যা (বৈজ্ঞানিক ভিত্তি)-র ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। পক্ষান্তরে লক প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের ব্যাখ্যায় আইনের নৈতিক ভিত্তি খুঁজেছেন। নৈতিকতার পাশাপাশি লক একটি ধর্মতাত্ত্বিক তথা ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। হবসের প্রাকৃতিক আইনের সাথে লকের প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের পার্থক্য দেখতে পাই। আমরা লক সম্পর্কিত আলোচনায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেখতে পাব।

হবস মনে করেন নৈতিকতা আইন কিংবা রাষ্ট্র কোনোটির ভিত্তি হতে পারে না, কারণ নৈতিকতা সংক্রান্ত মত অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপেক্ষিক হয়, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। নৈতিকতার কোনো সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। আবার প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের মধ্যেকার পারস্পরিক অবিশ্বাস তাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা এবং ঐক্যমত সৃষ্টি করতে পারে নি।

অবশ্য হবসীয় প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের আলোচনায় নৈতিক সদগুণের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে বলে কার্বন্যু মনে করেন। তাঁর মতে, হবসীয় আইনতত্ত্বে কোনো আদর্শনিষ্ঠ ধারা লক্ষ করা যায় না, এতে দেখা যায় কেবল শক্তি এবং ভীতির প্রাধান্য। তিনি বলেন: হবসীয় প্রাকৃতিক আইনতত্ত্ব সিভিল ল এর সারবস্তু এবং প্রাকৃতিক আইনের মধ্যেকার মূল্য সম্পর্কে মৌলিক বিশ্লেষণ প্রদান করেনা। রাজনৈতিক সমাজে নৈতিক সদ্‌গুনসূহের তুলনামূলক কম তাৎপর্যপূর্ণমূলক অবস্থানটি উদ্ভূত হয়েছে প্রাকৃতিক আইনের এ চরিত্র থেকে যেখানে প্রাকৃতিক আইনের সাথে সার্বভৌমের ইচ্ছার কোনো অনিবার্য সম্পর্ক নেই এবং প্রাকৃতিক আইনের কোনো বলপ্রয়োগকারী চরিত্র নেই।[৬০]

কার্বন্যু'র এ বক্তব্যের সাথে আমরা একমত হতে পারি না। হবসের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনায় এক প্রকার নৈতিক অনুশাসন লক্ষ করা যায়। হবস যখন প্রাকৃতিক আইনের সরলীকরণার্থে বলেন ব্যক্তির নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এমন আচরণ ব্যক্তি অপরের কাছে এবং অপরের জন্য কামনা করে না, সেই অর্থে আমরা হবসীয় প্রাকৃতিক আইনকে নৈতিক বিধি বলতে পারি। এই নৈতিক বিধি প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছে নৈতিক অনুশাসনের উপস্থিতি দুর্বিষহ প্রকৃতির রাজ্যের ব্যক্তিজীবনকে অধিকতর নিরাপদ ও সম্ভাবনাময় করে তুলেছে।

প্রশ্ন আসতে পারে প্রকৃতির রাজ্যের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা থেকে মানুষ কীভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হলো। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি হবসীয় প্রাকৃতিক রাজ্য হলো ব্যক্তির এককাবস্থা এবং প্রাকৃতিক অধিকার ব্যক্তির একই অবস্থার প্রকাশ। প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যাকে যদি সামষ্টিক দিক থেকে চিন্তা করা হয় তাহলে এ বিরোধের সমাধান সম্ভব। ব্যক্তির একক অবস্থায় যে যুদ্ধ ছিল সামষ্টিক যৌক্তিকতায় তা হয়ে উঠল শান্তির অন্বেষণ। হবসের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিকতার এ অবস্থান আমাদের কাছে প্রিজনারস ডিলেমা-এর সাথে সাদৃশ্যময় মনে হয়।[৬১] যেমন– প্রকৃতির রাজ্যে কোনো একক ব্যক্তি স্বীয় নিরাপত্তা রক্ষায় অন্যকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একই আচরণ প্রকৃতির রাজ্যকে অধিক যুদ্ধময় করে তোলে। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক আইনের যৌক্তিকতার দরুন জনগণ প্রাকৃতিক আইন দ্বারা যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির সন্ধান পায়। প্রাকৃতিক আইন মান্য করার দরুন ব্যক্তি সামষ্টিক দিক থেকে ভয়ের পরিবর্তে শান্তিতে বাস করতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যের যৌথ মানুষ যুদ্ধাবস্থা পরিত্যাগ করে শান্তির

দিকে অগ্রসর হলো। কাজেই প্রকৃতির রাজ্যের যুদ্ধাবস্থাই মানবপ্রকৃতির অপরিহার্য অবস্থা নয়, কারণ মানবপ্রকৃতির অপর আচরণটি তাকে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তির পথে তাড়িত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় প্রকৃতির রাজ্যের প্রত্যেক সদস্যের আইন মান্য করা (নৈতিক) দায়িত্ব। কেবল দায়িত্ব বলেই প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ আইন মান্য করতে উৎসাহিত হবে? এর উত্তরে হবস মনে করেন, মানুষের প্রাকৃতিক আইন মান্য করার দায়িত্ব তার অভ্যন্তরীন বা অন্তঃস্থ অনুমোদন; যা বিবেকবোধ থেকে উৎসারিত। আইনের একটি কার্যকারিতার দিক রয়েছে এবং ব্যক্তি স্বীয় কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের বাহ্যিক দিকটি বিবেচনায় রাখে। কিন্তু কেবলমাত্র আইন ভঙ্গ করলে শাস্তির ভীতি তথা বাহ্যিক অনুমোদনই ব্যক্তির আইন মান্য করার ক্ষেত্রে কাজ নাও করতে পারে। আর তাই প্রয়োজন বিবেকবোধ তথা নৈতিক অনুমোদন। প্রাকৃতিক আইনের ক্ষেত্রে বিবেকবোধের উপস্থিতি দ্বারা আমরা হবসের কাছে এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাই। যাতে দেখা যায় মানুষ কীভাবে সুখ অন্বেষণ করে এবং দুঃখ এড়িয়ে যেতে চায়।

হবস নৈতিকতার মধ্যে আইনকে অন্বেষণ না করে আইনের উপস্থিতির সাথে নৈতিকতাকে যুক্ত করেছেন। তাই তার প্রাকৃতিক আইনের আলোচনায় দেখা যায় আইনকে তিনি অন্যায় বলেননি এবং এই আইনই ন্যায়ের উৎস এবং ঝর্নাধারা।[৬২] ব্যক্তি যখন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুমোদন করে তাহলে প্রাকৃতিক আইন মান্য করে, আবার বহিঃস্থ ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুমোদন দ্বারা ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে না।

হবসীয় প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে আরো বলা যায় তাঁর দর্শনে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ইত্যাদি আইন দ্বারা নির্ণিত হয়েছে, প্রকৃতি দ্বারা নয়। মূলত সামাজিক চুক্তি মতবাদে হবস বলপ্রয়োগকারী শক্তিকে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের মাধ্যমে বৈধতা দিয়েছেন। তার ভিত্তি তৈরি হয় প্রাকৃতিক আইনের পথ পরিক্রমায় এমনটা দাবি করা যায়। হবসীয় প্রাকৃতিক আইনের ও প্রাকৃতিক অধিকারের আলোচনায় আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্পষ্ট অবস্থান দেখতে পাই। জন প্লামেনাটজ তাঁর *Man and Society* গ্রন্থে বলেন হবসের প্রাকৃতিক আইনের আনুগত্যের পশ্চাতে কাজ করেছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। তিনি প্রকৃতির রাজ্যের প্রাকৃতিক আইনের শর্তসমূহ সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু ঐশী আইন সম্পর্কে বলেননি আইনের প্রতি আনুগত্য তাই ব্যক্তিস্বার্থ পূরনে ব্যবহৃত।[৬৩]

হবসের প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক আইন প্রয়োজনীয় ছিল। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হবস আইনের প্রয়োজন বোধ করেছেন। হবসীয় আইনের মধ্যে স্পষ্টতই আত্মস্বার্থবাদী প্রবণতা রয়েছে যা বস্তুতপক্ষে মানবচরিত্রের আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার পথ দেখিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে মানুষ স্বীয় শাসন অপেক্ষা কোনো উচ্চতর শক্তির আদেশ-নির্দেশ পালনে অধিকতর বাধ্যগত থাকে। এই উচ্চতর শক্তি ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস বা রাজনৈতিক তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বলপ্রয়োগকারী শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার। হবস একে বলপ্রয়োগকারী ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন।

হবসের আত্মসংরক্ষণের নীতিতে কারো কারো কাছে আনন্দ ও বেদনা গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হলেও স্যাবাইন তা মনে করেন না। তিনি মনে করেন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যক্তির প্রেরণা ও সাড়া। ইন্দ্রিয় সবসময় সাড়া দেয় বলে ব্যক্তির ঐচ্ছিক আচরণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। আবার পেরেজ জাগোরিন মনে করেন হবসের মানব-প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ হলো শরীরবিদ্যা এবং আসক্তি অর্থাৎ কামনা-বাসনা।[৬৪]

এলিনর কারান মনে করেন লক অপেক্ষা হবস আধুনিক এবং সমকালীন অধিকারতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনায় অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছেন। অধিকার সংক্রান্ত দার্শনিক এবং বিচারমূলক বিশ্লেষণে লক অপেক্ষা হবসের অধিকারতত্ত্ব

অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গতিপূর্ণ। কারানের মতে, প্রথমত হবসের ব্যক্তিক অধিকার সম্পর্কে স্বতন্ত্র তত্ত্ব রয়েছে। লকের অধিকারতত্ত্বের ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তির বাইরেও ভিত্তি রয়েছে বলে এ.জে. সিমন্স যে মত দেন কারান তার বিরোধিতা করেন। কারান মনে করেন, লকের অধিকারতত্ত্ব পুরোপুরি ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে হবসের অধিকারতত্ত্ব কেবল ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হবসের আলোচনায় আদর্শনিষ্ঠ দিক অপেক্ষা অধিকারতাত্ত্বিক আলোচনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। হবস তাঁর অধিকারতত্ত্বের সাথে আইন, বাধ্যবাধকতা এবং প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা যুক্ত করেছেন। হবসের তত্ত্ব হলো ব্যক্তির জন্য বাস্তব অধিকারের তত্ত্ব যা ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কিছু সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের সুরক্ষা দেয়।[৬৫]

হবস প্রাকৃতিক অধিকার বলতে প্রত্যেক মানুষের স্বীয় ক্ষমতাকে স্বীয় প্রকৃতি রক্ষার্থে স্বেচ্ছামূলকভাবে ব্যবহারের স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। হবসের ভাষায়ঃ

> For though they that speak of his subject use to confound *jus*, and *lex*, *right and law*; Yet they ought to be distinguished; because right, consisteth in liberty to do or to forbear; wherease law determineth and bindeth to one of them; so that law and right, differ as much as obligation and liberty; which in one and the same matter are inconsistent.[৬৬]

উপরের অনুচ্ছেদে হবস অধিকারের সৃষ্টি, ধারণাগত ভিত্তি, আইন ও বাধ্যতাবোধের সাথে অধিকারের কি সম্পর্ক তা উল্লেখ করেছেন। বাধ্যতাবোধের সাথে অধিকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণে বলা যায় হবসের কাছে অধিকার হলো কোনো বাধ্যতাবোধ থেকে মুক্তি; অধিকারের ধারণা বাধ্যতার ধারণার বিপরীত। পাশাপাশি অধিকারের সাথে আইনের সম্পর্ককে বৈপরীত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। হবস আইন ও অধিকারের বিপরীতধর্মী অবস্থাকে উল্লেখ করেছেন। আইন হলো কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ করতে বা অর্জন করতে বাধ্য হওয়া এবং স্বাধীনতা হলো কোনো কাজ পছন্দ বা বর্জনের সুযোগ। হবসীয় প্রাকৃতিক অধিকারের ব্যাখ্যায় বলা যায় সকল অধিকার হলো স্বাধীনতা কিন্তু সকল স্বাধীনতা অধিকার নয়। অর্থাৎ সমাজে বসবাস করতে গেলে আমরা সকল স্বাধীনতাকে অধিকার বলে দাবি করতে পারি না। হবস তাঁর *The Elements of Law* গ্রন্থে বলেন, সকল বস্তুর প্রতি সকল ব্যক্তির অধিকার কার্যত কারও অধিকার হতে পারে না অথবা অধিকাররূপে কার্যকরী হতে পারে না।[৬৭]

ব্যক্তির অধিকার ব্যক্তিকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। এ কারণে প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক অধিকারভোগী মানুষ যুদ্ধের রাজ্যে বিরাজমান ছিল। এ ধরনের স্বাধীনতার অধিকার হলো হবসের মতে সে সকল স্বাধীনতা, যা নৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্থে নির্দেশিত। তাই হবসের মতে নৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার হলো ব্যক্তির সে স্বাধীনতা যা ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটিতে ধারণ করে। যেমন– অপরকে আক্রমণের অধিকার যা ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যে ধারণ করত। রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগের জন্য সে অধিকার ত্যাগ করে দৈহিক আনন্দ বা বেঁচে থাকার জন্য নয়, স্বাধীনতা উপভোগের জন্য। কাজেই কেবল দৈহিক আনন্দ বা বেঁচে থাকার জন্য নয়, স্বাধীন, মুক্ত জীবনের জন্য ব্যক্তি অধিকার ত্যাগ করে।

হবসের আলোচনায় অধিকার অপেক্ষা আইনের গুরুত্ব বেশি, যাতে আইনের বলপূর্বক দিকটি মুখ্য। প্রাকৃতিক অধিকার এবং প্রকৃতির রাজ্যের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। আত্মস্বার্থবাদী বিশৃঙ্খল মানব-প্রকৃতি অপরের কল্যাণে নয়, মুখ্যত স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে নিজের জীবনকে নিরাপদ করার লক্ষ্যে আইনের ওপর আস্থা স্থাপনে বাধ্য হয়েছে। তবে হবসের কাছে প্রাকৃতিক আইন কোনো ঈশ্বরের নির্দেশরূপে গণ্য হয় নি, তিনি আইনকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেছেন। তাঁর আইনের প্রথম তিনটি সূত্রে

আইনের কঠোরতার দিকটি গুরুত্ব পেলেও পরবর্তী সূত্রসমূহে এবং সার্বিক বিশ্লেষণে প্রাকৃতিক আইনের মাঝে এক প্রকার নৈতিক আবেদন রয়েছে।

হবস প্রাকৃতিক আইনসমূহকে বলেছেন শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়। এসব আইনে যা নিষিদ্ধ তা আইনানুগ হতে পারে না, আবার এ প্রাকৃতিক আইনের আদেশ বেআইনী হতে পারে না। হবস এভাবে তাঁর প্রাকৃতিক আইনসমূহ সামান্যীকরণ করেছেন যা নৈতিকভাবে সংকীর্ণ হতে পারে। যেমন– সমতার যে বিধি তিনি উল্লেখ করেছেন তা অথবা অন্য কোনো কাজ যা একজনের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য অপরের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা যায় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের আত্মরক্ষার্থে এ আইনের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক আইন নামক বিধি ব্যক্তিকে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। একটি যুক্তিভিত্তিক সমাজের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতির রাজ্যে ভারসাম্য স্থাপনের একটি উপায়রূপে প্রাকৃতিক আইনের সৃষ্টি। হবসের প্রকৃতির রাজ্য এবং প্রাকৃতিক আইনের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় দিক হলো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সামষ্টিকতায় অগ্রসর। তিনি ব্যক্তির আচরণ এবং সুযোগ সুবিধাকে সূক্ষ্মরূপে দেখেছেন।

কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হবস সমর্থন করলেও তিনি এটাও মনে করেন রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে, নিরাপত্তা বিধান করতে পারে তাহলে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের আইন, সরকার ও ক্ষমতার প্রতি জনগণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং শ্রদ্ধাশীল হবে। হবসের প্রকৃতির রাজ্যের আলোচনাতেও আমরা দেখি সমাজের মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও কতগুলো শর্ত মেনে চলার মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো হবস মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ সত্ত্বেও মুক্তি তথা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন।

প্রাকৃতিক আইন প্রসঙ্গে লকের ভাষ্য

হবসের ধারণার বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় লকের চিন্তায়। লকের রাজনৈতিক সমাজ আবির্ভাবের পেছনে প্রাকৃতিক অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনেই প্রাকৃতিক আইন গুরুত্ব পেয়েছে। প্রাকৃতিক অধিকার লকের কাছে মুখ্য। প্রাকৃতিক অধিকার বলতে লক বুঝিয়েছেন ব্যক্তির কিছু অবশ্যম্ভাবী অধিকার, যথা– জীবনের প্রতি অধিকার, স্বাধীনতা ভোগের অধিকার এবং সম্পত্তি লাভের অধিকার। এ সকল প্রাকৃতিক অধিকার প্রকৃতির রাজ্যের পূর্ববর্তী। প্রাকৃতিক অধিকারসমূহকে লক বলেছেন ব্যক্তির জন্মগত বা সহজাত অধিকার। এগুলো সমাজসৃষ্ট অধিকার নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, লকীয় প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ চুক্তিভুক্ত নয়, এগুলো চুক্তির উর্দ্ধে। তিনি প্রাকৃতিক অধিকারকে মৌলিক মনে করেন। এনট্রিভ লককে সমর্থন করে বলেন, মানুষের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তার প্রাকৃতিক আইনের জ্ঞান ব্যতীত আর কিছু না, একইভাবে একজন ইংরেজ ব্যক্তির স্বাধীনতা নিহিত থাকে ইংল্যান্ডের আইন অনুযায়ী তার কার্যমীমাংসা এবং সম্পত্তিতে।[৬৮]

প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে জন লক তাঁর *Two Treatises of Government* (1690) গ্রন্থে প্রাকৃতিক আইনের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেছেন।[৬৯] হবসের সাথে লকের প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পার্থক্য দেখতে পাই। লকীয় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় দেখা যায় এই আইন ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণি বা রাজার ক্ষমতার রক্ষাকবচ না হয়ে সাধারণ জনগণের চাওয়া-পাওয়ার রক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারকে সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কাজ করে প্রাকৃতিক আইন। এধরণের কাজের মাঝে যে ঘাটতি তৈরি হয় তা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক আইনের পাশাপাশি প্রয়োজন পড়ে সিভিল আইনের। লকীয় প্রাকৃতিক আইন সাম্য ও স্বাধীনতার বার্তা দেয়।[৭০] তিনি মনে করেন প্রাকৃতিক আইনকে অধিক সুসংহত

করার জন্য প্রয়োজন পড়ে রাজনৈতিক সমাজ এবং রাজনৈতিক আইন। লক প্রাকৃতিক আইন বলতে বুঝিয়েছেন: প্রকৃতির রাজ্যের পরিচালনার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক আইন, যা সকলে মেনে চলতে বাধ্য। প্রাকৃতিক আইনের মূল বিষয় হলো প্রজ্ঞা। প্রাকৃতিক আইন সমগ্র মানবজাতিকে সমতা এবং স্বাতন্ত্র্য শিক্ষা দেয়, একজন অপরের জীবন, স্বাস্থ্য স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে না।[৭১]

আমরা চুক্তিবাদীদের আলোচনায় দেখতে পাই মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। তবে এই মানুষ আত্মস্বার্থবাদী। মানুষ প্রথমত ও প্রধানত স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে পরে অপরের স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামায়। হবস এবং লক উভয়ের আলোচনাতে আমরা দেখতে পাই ব্যক্তিগত স্বার্থই মুখ্য (তা নিরাপত্তা বা সম্পত্তি যা হোক), সামষ্টিক স্বার্থ প্রথম বিবেচ্য নয়। এদের আলোচনাতে আমরা দেখি প্রকৃতির রাজ্যে শুরুতে সামাজিক বন্ধন ততটা শক্তিশালী নয়। উভয়েই স্বার্থের সম্পর্ক অটুট রাখতে গিয়ে নীতিকে এর ওপর নির্ভরশীল করেছেন। নীতি স্বয়ং গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি। গফ মনে করেন, লকের *Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে পরিশীলিত সুখবাদ প্রকাশ পায়। একজন ভালো মানুষের কাজের উদ্দেশ্য কিন্তু কেবল সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের মধ্য সীমাবদ্ধ নয়। লকের সুখবাদে তিনি আনন্দ ও বেদনাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ভালো এবং মন্দের নিরিখে।[৭২]

লকের প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় লক্ষ করেছি, তিনি প্রাকৃতিক অধিকারের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে সমাজের ক্ষমতা ও বিভিন্ন গোষ্ঠী তথা সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করেছেন। লকীয় আলোচনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের সুস্পষ্ট অবস্থান দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষাকে তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্যক্তিগত নীতি-নৈতিকতা অপেক্ষা সম্পত্তির সুরক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে। নৈতিক বিধানাবলীকে তিনি সম্পত্তির সুরক্ষার্থে স্থাপন করেছেন। এর স্পষ্ট প্রকাশ পাই তাঁর প্রাকৃতিক আইনের আলোচনায়। যদিও লক মনে করেন যে ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমাজের কল্যাণ একই সূত্রে গাঁথা তবুও এর যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি তাঁর কাছে দেখতে পাই না। ব্যক্তিগত অধিকার তথা সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদানই প্রাকৃতিক আইনের উপস্থিতিকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। তার এধরণের বক্তব্যে স্পষ্টতই আত্মস্বার্থবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। প্রাকৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা অন্বেষণ রাজনৈতিক সমাজের অস্তিত্ব প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। এ লক্ষ্যে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সমাজ পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পথকে মসৃণ করেছে।

লকের প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের সাথে নৈতিক সংশ্লিষ্টতা লক্ষণীয়। হবসীয় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় আইনের ওপর নৈতিকতা নির্ভরশীল, বিপরীতে লকের তত্ত্বে নৈতিকতার ওপর আইনকে নির্ভলশীল করা হয়েছে। অর্থাৎ নৈতিকতা আইনের পূর্বগামী। লকীয় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় মধ্যযুগীয় ধর্মতাত্ত্বিক প্রভাব বেশ স্পষ্ট। যেখানে তিনি কেবল নৈতিকতা নয়, ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও আইনের সাথে যুক্ত করেছেন। স্যার জেমস ফিজ্যামস লকের প্রাকৃতিক আইনের সংজ্ঞায়নে লক্ষ করেছেন যে, লক প্রাকৃতিক আইনকে সংবেদন এবং প্রজ্ঞা থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন; আবার পরবর্তীতে তিনি প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বরের ওপর আরোপিত করেন, ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত মনে করেন।[৭৩] ঈশ্বরের প্রতি অভিজ্ঞতাবাদী লকের নির্ভরতা ও যৌক্তিক সংশ্লিষ্টতাকে তিনি অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর *The Reasonableness of Christianity* গ্রন্থে। লক প্রত্যাদেশ ও প্রজ্ঞার মধ্যে কোনো বৈরিতা আছে মনে করেন না, বরং তিনি মনে করেন প্রজ্ঞার সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোনো কিছুই ঈশ্বরের নির্দেশ হতে পারে না, অযৌক্তিকতার ভিত্তিতে কখনো ঈশ্বর নির্দেশ দেন না।

লক প্রাকৃতিক আইনকে সপ্তদশ শতকের গ্রোসিয়াসের মতো নৈতিক ও আইনবিদ্যার ক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধরূপে মনে করেন। প্রশ্ন থেকে যায়, কতগুলো নৈতিক বিধানকে স্বতঃপ্রমাণিত বা স্বীকার্য সত্যরূপে গ্রহণ করার মাধ্যমে কি ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা যায়? লকের মতো অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও

সম্পত্তির অধিকারসমূহকে প্রাকৃতিক এবং সহজাত বলে সম্মতি দিয়েছেন, পাশাপাশি এগুলো ঈশ্বরের কাছে থেকে ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় এমন মতও পোষণ করেন।[৭৪]

লকের প্রাকৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি অধিকার সুরক্ষায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের মাধ্যমে সামষ্টিক স্বার্থের নিশ্চয়তা ও কল্যাণ অন্বেষণ করেছেন। লকীয় আলোচনায় আমরা যেরূপ শ্রেণিগত ঐক্যের জন্য কাজ করতে দেখেছি অনুরূপ হবসের কাছে দেখি না। যদিও হবস এবং লক দুজনেই পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি তথাপি লক শ্রেণিস্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি স্বার্থ সংরক্ষণে অধিক উদ্যোগী ছিলেন। স্যাবাইন লকের মতকে সুসংহত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের (Systematic individualism) প্রকাশ বলে মনে করেন।[৭৫]

লকের প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় লক্ষ করা যায়, সরকার ছাড়াও একটি বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য জীবন মানুষ যাপন করতে পারে। তবে এ জন্য লক তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৬] যথা–

(ক) যথাযথ স্বাধীনতার অবস্থা; (খ) সাম্যের অবস্থা ও; (গ) প্রাকৃতিক আইন।

লক এই তিনটি অবস্থাকে অধিকার সম্পর্কিত নৈতিক দাবি বলে মনে করেন। তাই কোনো ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে অবদমিত বা শোষণ করার কোনো অধিকার নেই। লকের এই ভাবনাটি অর্থাৎ অপরকে অধস্তন করার বা শাসনাধীন করার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন দ্বারা তিনি মূলত রবার্ট ফিলমারের সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত প্রাকৃতিক স্তরায়নের প্রতি আক্রমণ করেন। শাসক কর্তৃক যে কোনো কর্তৃত্ববাদী বা উৎপীড়নমূলক আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেছেন লক। এখানে হবসের সাথে লকের রাজনৈতিক চিন্তার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হবস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং জনগণের কাছে থেকে শর্তহীন আনুগত্য আশা করেন। কিন্তু লকীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দ্বিপাক্ষিক, হবসের মতো একপাক্ষিক নয়। লক রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার সমর্থন করেননি, তাছাড়া তিনি জনগণ ও সরকারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাস করতেন, জনগণের একতরফা দায়বদ্ধতায় নয়।

জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে তবে তা শর্তহীন বা নিরঙ্কুশ নয়, রাষ্ট্রও স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে না। লক মনে করেন, যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক স্বাধীনতার সীমা ও নিশ্চয়তা বিধান করে।[৭৭] লকীয় প্রকৃতির রাজ্যের শৃঙ্খলাপূর্ণ জনগণকে অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন এবং একটি রাজনৈতিক সমাজের আস্বাদ প্রাপ্তির জন্য, প্রাকৃতিক অধিকারকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য লক প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাস করেন। প্রাকৃতিক অধিকারের উদ্ভব মূলত মানবতা থেকে, যা কেবল সরকারের পরিচালনার ওপর নির্ভর করে না সে সাথে এ অধিকার এক প্রকার সামষ্টিক শক্তি, যা যে কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে।[৭৮]

লক প্রাকৃতিক আইনকে সামাজিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, লক বলেন প্রাকৃতিক আইন সকল মানুষের ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য সমভাবে একক মানুষের ওপরও প্রযোজ্য।[৭৯] মানবজাতির সকল সদস্য একই সম্প্রদায়ভুক্ত একটি সমাজ গঠন করেছে যা অন্যান্য প্রজাতির সম্প্রদায় এবং সমাজ থেকে ভিন্ন। যদি তা না হতো তাহলে মানুষ চুক্তির দ্বারা একত্রিত হতে পারত না। তাই মানুষের প্রথম এবং মৌলিক প্রাকৃতিক আইন হলো... সমাজ এবং সমাজস্থিত প্রত্যেক সদস্যের সংরক্ষণ।[৮০]

প্রাকৃতিক অধিকার এবং প্রাকৃতিক আইনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে হবস ও লকের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন– উনিশটি প্রাকৃতিক আইনের মধ্যে হবসের কাছে মৌলিক প্রাকৃতিক আইনটি হলো শান্তির অন্বেষণ, যদি অন্যান্য সকলে সে আইন মান্য করে। অন্যথায় বলা যায়, এ আইন হলো যুদ্ধের সুবিধা নেওয়া। হবস এর প্রাকৃতিক আইনের

আলোচনায় কোনো নৈতিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই বলে প্রায়শ বলা হয় এবং শক্তি, শান্তি এগুলোই হবসের প্রাকৃতিক আইনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হবসীয় প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি নৈতিকতা না হলেও নৈতিকতার সাথে সংশ্লিষ্টতা বা যোগসূত্র রয়েছে।

হবস এবং রুশোর প্রকৃতির রাজ্য ও প্রাকৃতিক আইন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বার্থের প্রকাশ জোরালোরূপে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে লকের কাছে দেখি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আত্মরক্ষার সাহায্যে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সামষ্টিক স্বার্থের দিকেই অগ্রসর হলো। এখানে কেবল ব্যক্তিস্বার্থই গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যক্তি নিজেকে নিরাপদ রাখলেও সামষ্টিক স্বার্থে ব্যক্তি প্রজ্ঞার সাহায্যে অধিক চালিত হয়। লকের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনায় এক্ষেত্রে গফ লক্ষ করেন এক প্রকার পরার্থপর মানসিকতার প্রকাশ এবং উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।[৮১] যাতে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থ এবং অপরের স্বার্থ উভয়ই সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়। যদি কোনো ব্যক্তি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, প্রাকৃতিক আইন অমান্য করে, অপরের হুমকির কারণ হয় তাহলে সে সমাজ ও সমাজের সদস্যদের দ্বারা বিচারের মুখোমুখি হবে, কারণ রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি (নিয়মভঙ্গকারী) প্রাকৃতিক আইন বা বৌদ্ধিক আইনের অধীন নয়। প্রাকৃতিক মানুষ অন্যদের শাস্তি দানের অধিকার লাভ করে।

লক প্রাকৃতিক আইনের শর্ত-সংরক্ষণের বিষয়ে কোনো জোরজবরদস্তির পরিবর্তে ঈশ্বরতাত্ত্বিক বিধানের ওপর নির্ভর করেছেন। যেমন– তিনি মনে করেন এডাম এবং ঈভ-এর মতো অন্যান্য সকল পিতামাতার প্রতি এধরণের বাধ্যবাধকতা ছিল যে তারা সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষিত এবং লালন-পালন করবেন। বিনিময়ে সন্তানসন্ততির উচিত তাদের পিতামাতাকে সম্মান দান করা। অবশ্য লক মনে করেন নবজাতক শিশুরা এ দায়বদ্ধতার বাইরে, কারণ তাদের মধ্যে বৌদ্ধিক বৃত্তিসমূহের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত শিশুরা এ নীতির বাইরে থাকবে।

লকের কাছে প্রাকৃতিক আইন হলো এক প্রকার নৈতিক বিধি এবং তাঁর প্রাকৃতিক আইনের ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তিও রয়েছে। নৈতিক বিধির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক আইন হলো এমন বিধান যার দ্বারা ব্যক্তি অন্যের জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লকীয় প্রকৃতির রাজ্যের সকল মানুষ সমান, কেউ কারো চেয়ে উর্ধ্বতন বা অধস্তন নয়। ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায়– ঈশ্বর সকলকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন, তাই একের উপর অন্যের কর্তৃত্ব করার সুযোগ নেই। ঈশ্বর পৃথিবীতে সকলকে সমানভাবে পাঠিয়েছেন এবং জগতের সকল সম্পদ তিনি মানুষের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন। মানুষ তার যুক্তিবৃত্তির ব্যবহার দ্বারা স্বীয় প্রয়োজনে এবং আরামের জন্য যেমন সম্পত্তি ব্যবহার করবে তদ্রুপ অপরের প্রয়োজন পূরণের জন্যও সম্পত্তি সংরক্ষণ করবে।[৮২] লকের প্রাকৃতিক আইনের ধারণার সাথে তাঁর সম্পত্তিতত্ত্ব বেশ দৃঢ়ভাবে সম্পর্কিত। যেমন, লক মনে করেন 'আদি প্রাকৃতিক আইন' দ্বারা সামষ্টিক সম্পত্তিতে ব্যক্তি স্বীয় শ্রম আরোপ না করা পর্যন্ত ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে। 'আদি প্রাকৃতিক আইন' এর সাথে যদি 'যুক্তির আইন' যুক্ত হয় তাহলে ব্যক্তি স্বীয় শ্রমারোপ দ্বারা সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্থাপন করতে পারবে, স্বীয় প্রয়োজনে জীবনে সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্যবহারও করতে পারবে কিন্তু অপচয় করতে পারবে না।[৮৩]

লকের প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো জীবনের প্রতি অধিকার। তাই স্বীয় জীবন রক্ষার পাশাপাশি অপরের ক্ষতি সাধন না করাও প্রাকৃতিক অধিকারের শর্ত। এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। লকের মতে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে এর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে, তবে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি অপরের স্বার্থ সংরক্ষণে সাহায্য করা ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব।

লক প্রাকৃতিক আইনকে বলেছেন প্রজ্ঞার আইন।[৮৪] তাই মানুষের সামষ্টিক কর্তৃত্বের সাহায্যে বৌদ্ধিকতার অনুশাসনকে নিরাপদ এবং প্রতিষ্ঠা করতে চায় প্রাকৃতিক আইনের ধারাসমূহকেও।[৮৫] লকের প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈতিক মানদণ্ডের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক মানদণ্ডে তিনি কেবল প্রাকৃতিক আইন নয়,

প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ, রাজনৈতিক সমাজ সকলকে যুক্ত করেছেন, যাদের সকলকে প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে হবে। প্রাকৃতিক আইন মানার দায়বদ্ধতার মাধ্যমে লক স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা তথা চরম রাজতন্ত্রের হাত থেকে জনগণকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং সাংবিধানিক সরকারের পথে হেঁটেছেন। এ বৈশিষ্ট্য লককে হবস অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হবসের প্রাকৃতিক আইনের স্থান প্রকৃতির রাজ্যে লকের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ না হলেও হবস প্রাকৃতিক আইনের স্থলে দেখাতে চেয়েছেন এমন এক চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম শক্তি যাকে সকলে মান্য করবে।

লকের প্রাকৃতিক আইনের একটি অন্যতম দিক হলো প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। প্রচলিত ধারণার বাইরে লক প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে মূল্যায়ন করেছেন। এর দ্বারা ব্যক্তি আত্মরক্ষার অধিকার লাভ করে এবং বিশেষ প্রয়োজনে এক ব্যক্তি অন্যজনকে হত্যা করার ক্ষেত্রে বৈধতা পেতে পারে। লকীয় প্রাকৃতিক আইন প্রাকৃতিক স্বাধীনতা দ্বারা পরিচালিত হবে বিধায় ব্যক্তি ইচ্ছামতো কোনো কিছু করার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। অর্থাৎ শুরু থেকেই লকের কাছে স্বাধীনতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।[৮৬]

লকের প্রকৃতির রাজ্যে কোনো রাজনৈতিক সরকার না থাকলেও শৃঙ্খলা ছিল (যা হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায়নি) প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে প্রাকৃতিক আইন মান্য করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হতো। কাজেই প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে আইন মেনে চলার মাধ্যমে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার বাধ্যবাধকতাবোধে আবদ্ধ করার নৈতিক ক্ষমতা প্রাকৃতিক আইনের ছিল এবং লকের প্রাকৃতিক আইনে এর ক্ষমতা প্রাথমিক অবস্থা থেকে লক্ষ করা যায়। অবশ্য কেবল প্রাকৃতিক রাজ্যের জনগণই প্রাকৃতিক আইন মান্য করবে তা নয় অন্যান্য জনগণও প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য বলে লক মনে করেন। এখানে অন্যান্য জনগণ বলতে লক মূলত রাজনৈতিক সমাজের জনগণ তথা প্রকৃতির রাজ্যের পরবর্তী জনশ্রেণিকে নির্দেশ করেছেন। তাহলে এটা স্পষ্ট যে হবসীয় প্রাকৃতিক আইনের মূল আনুগত্য পোষণকারী প্রাক-রাজনৈতিক মানুষ হলেও লকীয় প্রাকৃতিক আইনে রাজনৈতিক সমাজের জনগণকেও এ আইন মান্য করার বাধ্যতাবোধের অধীনে আনা হয়েছে। প্রাকৃতিক আইনের বাধ্যতাবোধের প্রশ্নটিতে হবস ও লকের সাদৃশ্য আছে। এরা উভয়েই প্রাকৃতিক আইনের আনুগত্যের প্রশ্নে নৈতিক অথবা আইনগত বাধ্যতাবোধকে নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যে যদি আইন কার্যকর করার এবং নির্দোষীদের রক্ষণ এবং অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ না থাকত, তাহলে অন্যান্য আইনের মতো প্রাকৃতিক আইনও অর্থহীন হয়ে পড়ত।[৮৭] প্রাকৃতিক আইনের উপরোক্ত ব্যাখ্যায় লক স্পষ্টতই আইনি ক্ষমতা ও এর প্রয়োগের উল্লেখ করেছেন।[৮৮] এর দ্বারা ব্যক্তির আনুগত্যের বাধ্যতাবোধকে নির্দেশের পাশাপাশি তিনি প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের জন্য আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন বোধ করেছেন, যার অনুপস্থিতিতে এ আইন কার্যকর হতে পারে না।

প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ করার লক্ষ্যে লক শুরু থেকেই আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন বোধ করেছেন। এই কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক অধিকারধারী প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করবে এবং প্রয়োজনে শাস্তির বিধান করবে। লকীয় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ শুরু থেকে কর্তৃত্বকে সমর্থন ও স্বীকার করে নেয়। কিন্তু হবসের কাছে আমরা পাই বিপরীত চিত্র, যেখানে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাবার লক্ষ্যে উচ্চতর শক্তির প্রত্যাশা করে। এ শক্তির প্রতি জনগণের রয়েছে ভীতি, যার দ্বারা শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা করে। লকের প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের আলোচনার নিরীখে বলা যায় যদি এ আইন বলবৎ করা যায় তবে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের অন্যান্য অধিকারসমূহের সুরক্ষা বিধান সম্ভব।

হবসীয় প্রাকৃতিক আইন জীবনের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে লকীয় প্রাকৃতিক আইন সম্পত্তি ও স্বাধীনতার সংরক্ষণকে গুরুত্ব দেয়। লকীয় চিন্তায় মানব জীবনের নিরাপত্তা প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থাতে বিরাজমান ছিল। হবসীয় প্রাকৃতিক আইনকে দেখানো হয়েছে স্বীকার্য সত্যরূপে, অন্যদিকে লকীয় প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিমূলে

নৈতিকতা এবং ঈশ্বরতাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনে অপরাপর অধিকার বলতে লক সম্পত্তিকে সুরক্ষা দানের প্রশ্নে আইন ও সরকারের বৈধতা নির্ধারণ করেছেন। প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় কোনো আদর্শ প্রকৃতির রাজ্যের সুনিপুণ চিত্র দিয়েছেন তা বলা যাবে না, তবে যে চিত্র পাওয়া যায় তা আপাতগ্রহণযোগ্য। কারণ প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ আইন অমান্য করত বলে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুসংহত করার জন্য শাসকের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন লক। কাজেই লকীয় প্রাকৃতিক আইন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল সে কথা বলা যায় না। লকের প্রাকৃতিক আইন ছিলো অলিখিত। ফলশ্রুতিতে আইনের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা হতো। এধরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হতো তাহলে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করতে পারে, যা কেবল প্রকৃতির রাজ্যেই নয় উন্নত রাজনৈতিক সমাজের জন্য প্রযোজ্য।[৮৯]

লক মনে করেন প্রাকৃতিক আইন উদ্ভূত হয়েছে মানুষের ন্যায়বোধ থেকে। তাই প্রাকৃতিক আইনের সাথে মানুষের সদাচার, নীতিবোধের সম্পর্ক প্রবল। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা বিধান করবে জনগণের আইন, এমনটা আশা করেন লক। তাঁর প্রাকৃতিক আইনের ধারণা থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি মানবচরিত্রকে যুক্তিবাদীরূপে দেখেছেন বলে ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামষ্টিক স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছেন। লকীয় প্রাকৃতিক আইন হলো রাষ্ট্রীয় আইনের পূর্ববর্তী অবস্থা, এখানে স্বেচ্ছাচারিতা নেই। প্রাকৃতিক আইন একদিকে প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা দেয়, আবার অপরদিকে ব্যক্তিকে অনৈতিক আচরণ থেকে বিরত রাখে।

লকের প্রাকৃতিক আইন প্রসঙ্গে আরও বলা যায় প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন থাকার দরুন তা স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ থেকে মুক্ত। প্রাকৃতিক আইনের অনুশাসন ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলি মানতে বাধ্য করে, প্রাকৃতিক অধিকার সুরক্ষিত করে, ব্যক্তির বিবেকবোধকে শানিত করে। প্রাকৃতিক আইন যেমন মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান করে, তেমনি স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও পূর্ণ উপলব্ধিতে সাহায্য করে।[৯০] এ আইনের যথাযথ কার্যকারিতার বিষয়টি তাহলেই নিশ্চিত হয় যখন তা সকলের ক্ষেত্রে আরোপিত হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি বিধানের প্রয়োজন পড়ে। যদিও প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ এক সমান না হলেও কম-বেশি সবাই যুক্তিবাদী ছিল। তাই সকলের আচরণ সমান যৌক্তিকতার দাবীদার নয়। কেউ প্রাকৃতিক আইনকে অমান্য করার অর্থ দাঁড়ায় উক্ত ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্যের অপরাপর ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুন্নের কারণ।

প্রাকৃতিক আইন অমান্যকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য রাজনৈতিক সমাজ এবং সরকার প্রতিষ্ঠাকেই লক নির্দেশ করেছেন। শাস্তি বিধানের দ্বারা তিনি অন্য ব্যক্তিদের হুঁশিয়ার করেন।[৯১] পাশাপাশি অপরের অধিকার হরণকারীদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইঙ্গিত রয়েছে। লকের মতে প্রাকৃতিক আইনের পূর্ণ ব্যবহার ও প্রাকৃতিক অধিকারের পূর্ণ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সমাজ থেকে জনগণের জন্য রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রে পদার্পণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।[৯২]

প্রকৃতিগতভাবে সকল মানুষ সমান হলেও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সকল মানুষ সমান নয়। কারণ রাজনৈতিক সমাজে রয়েছে ধনবৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্য, শাসক-শোসিতের সম্পর্ক। প্রাকৃতিক আইনের ক্ষেত্রে নৈতিক ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায়, পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় আইনের নৈতিক আবেদন নাও থাকতে পারে। জ্ঞানতাত্ত্বিকভাবে লকের প্রাকৃতিক আইনকে বিশ্লেষণে দেখি তিনি সহজাত ধারণাকে নাকচ করে জ্ঞানকে অভিজ্ঞতানির্ভর গণ্য করেছেন। আবার রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় লক্ষ করি তিনি প্রাকৃতিক আইনের পেছনে নৈতিক ও ঈশ্বরতাত্ত্বিক ভিত্তিও দাবি করেছেন।

বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন, লকের প্রাকৃতিক আইন এবং প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কিত বক্তব্যে কোনো মৌলিকত্ব নেই, তা মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক ধারণার পুনরাবৃত্তি। মধ্যযুগে এ সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন সেন্ট টমাস একুইনাস। রাসেলের মতে, লকের প্রকৃতির রাজ্য সংক্রান্ত মতবাদ মূলত বাইবেল ও পুরাণের দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়। তাই এটি

ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে মুক্ত নয়।[৯৩] গফ মনে করেন লকের নৈতিক আইন সংক্রান্ত ধারণা বাস্তবে অধিকতর নির্বিচারবাদী এবং কম যুক্তিপ্রয়োগকারী।[৯৪]

লকীয় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় অন্য একটি দিক হলো, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের আইন হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ। প্রাকৃতিক আইনের ফলে মানুষ স্বেচ্ছায় আইন তুলে না নিয়ে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এটিকে প্রয়োগ করে। লক তাঁর প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় যখন ব্যক্তির স্বার্থ ও আনন্দকে বড় করে দেখেছেন তাহলে তাঁর অধিকার সম্পর্কিত ভাবনা কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর আত্মকেন্দ্রিক মনে হয় এবং তাহলে তার ব্যক্তিস্বাধীতার ধারণা উপযোগবাদী নৈতিকতার সাথে মেলে না। যেমন, তিনি একজন যুদ্ধবন্দীকে প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী দাসরূপে গণ্য করেছেন। এর পেছনে লকীয় যুক্তি হলো– প্রত্যেকের তার সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার স্বাধীনতা আছে, কেউ যদি এগুলোকে আক্রান্ত করে তবে ব্যক্তি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আবার প্রশ্ন থাকে, আমার কাছে একটি মুরগি আছে, যা আমার মালিকানা বা সম্পত্তি তাহলে এই মুরগিটি চুরির অপরাধে আমি কি অন্য ব্যক্তিকে হত্যার মতো শাস্তি মঞ্জুর করতে পারি? সেক্ষেত্রে তা দাস রূপে গণ্য করা উক্ত ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা প্রাকৃতিক অধিকারের লঙ্ঘন কিংবা হুমকি নয় ? এধরণের বিবিধ প্রশ্ন লকীয় প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে উত্থাপন করা যায়। যদিও লক প্রাকৃতিক আইনের সাথে নৈতিক আইনকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর মতে, নৈতিক ভালো এবং মন্দ... কিছু আইনের প্রতি আমাদের ঐচ্ছিক আচরণের সঙ্গতি এবং মতবিভেদ রূপ আচরণ। যেখানে ভালো বা মন্দ সম্পর্কিত ধারণা আমাদের কাছে এসেছে আইন প্রণেতার ইচ্ছা বা ক্ষমতা থেকে।[৯৫]

একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও লকের প্রকৃতির আইনের ব্যাখ্যা অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রমাণনির্ভর নয়, বরং বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি এই আইনের গ্রহণযোগ্যতা প্রতিপাদন করেছেন। যেমন, তাঁর মতে, প্রাকৃতিক আইন ঈশ্বরের যুক্তি ও বুদ্ধির প্রকাশ। ঈশ্বর যুক্তিবাদী এবং মানুষের অপরিহার্য গুণাবলি হলো তাঁর যুক্তিবাদিতা। প্রাকৃতিক আইনও তার যুক্তিবাদিতার প্রকাশ। তিনি তাঁর *An Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থে বলেন, প্রাকৃতিক আইন কেবলমাত্র মানবসৃষ্ট এবং প্রথাগত নয়, বরং 'we are under obligations antecedent to all human constitutions.'[৯৬] প্রাকৃতিক আইনের নিশ্চয়তার প্রশ্নে তিনি যখন বিশ্বাসের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে চান এ আইনের নিশ্চয়তার প্রশ্নে লকের অবস্থান দুর্বল মনে হয়। কারণ প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিময় শৃঙ্খলাপূর্ণ রাজ্য আর প্রাকৃতিক আইনভঙ্গকারী অসৎ লোকেদের শাস্তি প্রদানের জন্য আইন প্রয়োজন। প্রশ্ন আসে, প্রকৃতির রাজ্যের যুক্তিশীল মানুষের জন্য আইনের প্রয়োজন কি তাহলে বিশ্বাসে ভাঙ্গন তৈরি করে না? তাদের যুক্তিবাদি আচরণ কীভাবে আইনের ব্যত্যয় ঘটাতে পারে?

হবস এবং লক উভয়ের প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বে আমরা রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রের সাথে আইনের সম্পর্ক খুঁজে পাই। আইনের দ্বারা দুজনেই ব্যক্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করেছেন। ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব-এ বক্তব্যের সাথে আমরা যদি সহমত পোষণ করি তাহলে বলা যায় কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী আক্রমণকারী ব্যক্তিকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে যা প্রকারান্তরে প্রতিশোধস্পৃহা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র রাজনৈতিক আইন (পজিটিভ ল) দ্বারা প্রতিশোধ বাস্তবায়ন করে। প্রাকৃতিক আইনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এই আইন হাতে তুলে নেয় আর পজিটিভ ল বা সিভিল ল এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তা বাস্তবায়ন করে। প্রাকৃতিক আইনের সাথে রাজনৈতিক আইনের কোনো বিরোধ আছে বলে লক মনে করেন না। কারণ প্রাকৃতিক আইনের উৎস প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার কারণে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে ছিল যুক্তিবাদিতা, সহিষ্ণুতা ও অন্যান্য নৈতিক সদগুণাবলি। মানুষের মধ্যে ছিল আত্মমর্যাদাবোধ যা স্বীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতার সংরক্ষণ চায় আবার অপরের জন্যও ভাবতে শেখায়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় লক্ষ করা যায় লকের প্রাকৃতিক আইনের ধারণার সাথে নৈতিক ধারণার সম্পর্ক ব্যবহারিক জীবনে শান্তি ও সুখের অন্বেষণে। এর মাধ্যমেই নৈতিকতার মতো বিমূর্ত বিষয়টি আমাদের জীবনে মূর্ত

হয়ে ওঠে। নৈতিকতার সাথে যেমন সুখ ও শান্তির সম্পর্ক রয়েছে তদ্রুপ আনন্দ ও বেদনার সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক বিচারে ব্যক্তির এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত যা অপরের জন্য দুঃখ বা যন্ত্রণার উদ্রেক করে। সেই অর্থে ব্যক্তির অপরের অধিকার ও সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা উচিত। ঈশ্বর যেহেতু জগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন তাই এসবের ওপর প্রত্যেকের সমানাধিকার থাকা উচিত। একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ অন্যায়। ন্যায়ের বিচারে প্রতিটি মানুষ একই রকম নিয়মের অধীন। কোনো ব্যক্তি যদি আইন এবং নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে অপর ব্যক্তিও তা করতে চাইবে। এ বিচারে ব্যক্তির প্রাকৃতিক আইন মেনে চলা উচিত। এভাবেই প্রাকৃতিক আইন নৈতিকতার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। এটা স্পষ্ট যে লকের রাজনৈতিক দর্শনে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার আইন অপেক্ষা প্রকৃতি-নির্ভরশীলতা অধিক। যার বিপরীত চিত্র আমরা পেয়েছি হবস এর কাছে। উল্লেখ্য লকীয় সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা এমনকি মানবপ্রকৃতির বিশ্লেষণে প্রতিফলিত হয়েছে পুরোপুরি পিউরিটান ধর্মীয় মূল্যবোধসমূহ। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন মানুষ বিশ্বাসে বাঁচে।[৯৭] তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের ধারণাগত কাঠামো বিশ্লেষণে আমরা দেখি মানুষ তার স্বীয় ক্ষমতার বিশ্বাসের দরুন রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে স্বীয় জীবন পরিবর্তনে সমর্থ হয়েছে।

লক তাঁর *An Essay Concerning Human Understanding* গ্রন্থের প্রথম Essay' Is There a Rule of Morals, Or Law of Nature?'–তে নৈতিক বিধি বা প্রাকৃতিক আইনের সম্ভাব্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রদত্ত যুক্তিসমূহের মধ্যে পরিকল্পনার যুক্তিকে তার প্রাকৃতিক আইনের নৈতিক ভিত্তির ব্যাখ্যায় তথা প্রাকৃতিক আইনের সম্ভাব্যতার প্রশ্নে উল্লেখ করেন। তিনি পরিকল্পনার যুক্তিটিকে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন মানুষের সম্পর্ককে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার উর্দ্ধে উঠে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সামাজিক নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির দায়িত্ববোধের প্রশ্ন আসে এবং সেক্ষেত্রে সংবিধানের বাইরে কোনো পাপ-পূণ্য কিংবা সুরক্ষা ও শান্তির বিধান থাকতে পারে না যদি বিষয়টিকে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুখবাদী বা উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে।[৯৮]

লকের অষ্টম *Essay*-তে প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা হবসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মত দেখি। হবসের মতে সকল প্রাকৃতিক আইন আত্মরক্ষার স্বার্থে পরিচালিত। এই মতে আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক আইনের এই ব্যাখ্যায় নৈতিক সদগুণ নয়, উপযোগিতাই মূল বিবেচ্য। কাজের ভালো-মন্দের দিকটি মুখ্য নয়। কিন্তু লক মনে করেন সমাজ, সরকার, বাস্তব বা বস্তুনিষ্ঠ আইন (Positive law)–এ সকল কিছুর উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন, যা সকল বাধ্যতাবোধের উৎস। প্রাকৃতিক আইনের স্রষ্টা মানুষ নয়, ঈশ্বর। সেই অর্থে প্রাকৃতিক আইন ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ। লকীয় নৈতিক বিধিসমূহ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত যার উৎস বাইবেল বলে [উল্লেখ্য ষষ্ঠ ও নবম Essay- তে প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়নি]। তিনি মনে করেন।[৯৯]

লকীয় প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে এটা স্পষ্ট বলা যায়, প্রকৃতির রাজ্যে কাজের ভালো-মন্দের নৈতিক নির্দেশনা প্রদান করে প্রাকৃতিক আইন এবং সে অবস্থায় যখন কোনো সরকার বা রাজনৈতিক সমাজ ছিল না। সমাজে প্রাকৃতিক আইনই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক সমাজ, সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পজিটিভ ল' কে সম্ভবপর করে তুলেছে, উৎসাহ ও নির্দেশনা দিয়েছে।

প্রাকৃতিক অধিকারতত্ত্বে ব্যক্তির কিছু নির্দিষ্ট অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে যাকে হস্তান্তর বা ত্যাগ করা যায় না– লকের এ মতকে বার্ট্রান্ড রাসেল উপযোগবাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ দাবী করেছেন।[১০০] লকের প্রাকৃতিক অধিকারতত্ত্বটি আইনের জন্য অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে কিন্তু সামষ্টিক স্বার্থের ক্ষেত্রে এটি উপযোগী নয়। উপযোগবাদীদের জন্য প্রাকৃতিক অধিকারতত্ত্বটি খুব একটা সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। কারণ প্রাকৃতিক অধিকারতত্ত্বে ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট স্বাধীনতা ও অধিকারকে সে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে, অপরের জন্য নয়, তাহলে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের

জন্য সর্বাধিক পরিমান সুখ নীতির সাথে তা সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে। যদিও লকের নীতিবিদ্যা উপযোগবাদী কিন্তু অধিকার (প্রাকৃতিক) সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনায় উপযোগবাদী ভাবনা পাওয়া যায় না।

লক প্রকৃতির রাজ্যকে স্বাধীনতার রাজ্য বলেছেন, তবে প্রকৃতির রাজ্যের পরিচালনার জন্য আইনের শাসন তথা প্রাকৃতিক আইন বিদ্যমান ছিল। প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি ছিল প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার অনুশাসনে ব্যক্তি এটি উপলব্ধি করে যে সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান, তাই একে অন্যের জীবন, সম্পত্তি, স্বাস্থ্য এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। লকের প্রাকৃতিক আইন অপরের অধিকার সংরক্ষণ দ্বারা মানবজাতির শান্তি ও সুরক্ষায় কাজ করে। লকের প্রাকৃতিক আইন শুধু প্রজ্ঞা, শান্তি ও শৃঙ্খলার নির্দেশক নয়, পাশাপাশি তার প্রাকৃতিক আইন প্রজ্ঞার পরিচায়ক। ক্ষমতা যখন প্রত্যেকের হাতে থাকল তাহলে প্রত্যেকে পরস্পরকে শাস্তি প্রদানের সুযোগ পেল যা আবার প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। এধরণের অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে সুনির্দিষ্ট বিচারক বা বিচারকমণ্ডলীর প্রয়োজন দেখা দিল। এ বিচারক প্রকৃতির রাজ্যের সদস্যদের বা নিয়মভঙ্গকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষমতা রাখে।

লকের কাছে কার্যকারিতার বিচারে রাষ্ট্রীয় আইন অপেক্ষা নৈতিক বিধানসমূহ ব্যাপক বলে স্যাবাইন মনে করেন।[১০১] সরকারকে মান্য না করা সত্ত্বেও নৈতিক বিধানসমূহের বৈধতা ক্ষুন্ন হয় না। এগুলো বৈধ থাকে। প্রাকৃতিক আইন বা নৈতিক বিধানসমূহ সরকার তথা রাজনৈতিক সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট না হলেও এগুলোর যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে। যদিও লক কখনো কখনো নৈতিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহের সাথে ঈশ্বরকে সংশ্লিষ্ট করেছে। প্রাকৃতিক আইনের অবস্থান রাজনৈতিক সমাজের পূর্বে এবং মানুষের কাছে এ বিধানাবলী রাজনৈতিক আইন অপেক্ষা অধিক পালনীয় ছিল।

লকের রাষ্ট্রচিন্তার বিশ্লেষক এ.জে. সিমন্স লকের অধিকারতত্ত্বের সংজ্ঞায়নে বলেন লকের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনার মূল বিষয় নির্বাচন এবং সুবিধা।[১০২] লকের অধিকারতত্ত্বকে পছন্দ বা ইচ্ছার নিরিখে নির্ধারণ সম্ভব নয়। লক কিছু ক্ষেত্রে অধিকার ও কর্তব্যকে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই অধিকারের সাথে আইন, দায়িত্ব এবং বাধ্যতার ধারণা লকের বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। সিমন্স মনে করেন লকের অধিকারের ধারণায় ধর্মতাত্ত্বিক ভিত্তির বাইরে স্বতন্ত্র ভিত্তি রয়েছে।[১০৩]

লকীয় প্রাকৃতিক অধিকারতত্ত্ব মূলত নৈতিক বিশ্লেষণ। আদর্শনিষ্ঠ আলোচনার নিরিখে অধিকারতত্ত্বের আলোচনা লক করেছিলেন, কিন্তু অন্যান্য নৈতিক ও রাজনৈতিক ধারণা ও মূল্যবোধ বিশ্লেষণ লকের কাছে পাওয়া যায় না বলে কারান মনে করেন।[১০৪] আধুনিক ও সমকালীন আইন ও রাজনৈতিক বিষয় আলোচনায় আমরা লকের অধিকারতত্ত্বের কোনো দার্শনিক বিশ্লেষণ পাই না। পাই আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের সাথে প্রাকৃতিক অধিকারের সংশ্লিষ্টতা। যা মূলত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে। পক্ষান্তরে হবসের কাছে আমরা অধিকারতত্ত্বের ধারণাগত বিশ্লেষণ ও সংজ্ঞায়ন পাই। এ দিক থেকে লক অপেক্ষা হবস অধিকতর অগ্রগামী বিবেচনার দাবীদার বলে কারান মনে করেন।[১০৫]

রুশোর মত

রুশো সমাজবদ্ধ মানুষকে স্বাভাবিক মানুষ মনে করেন না। সমাজ বহির্ভূত মানুষ যারা প্রকৃতির রাজ্যে বসবাসকারী, তারাই হলো রুশোর মতে স্বাভাবিক মানুষ। সমাজবহির্ভূত অবস্থাতে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি তথা স্বাভাবিক রূপের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সমাজ ব্যক্তির জন্য শৃঙ্খলিত ক্ষেত্র, সেখানে রয়েছে স্বার্থগত বিবাদ। সমাজপূর্ব অবস্থায়

ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির কোনোরূপ দ্বন্দ্ব-বিবাদ ছিল না, ছিল না স্বার্থগত হানাহানি। তাই ব্যক্তির নিপীড়নের প্রশ্ন ছিল না।

রুশো মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যে অসাম্য ছিল তবে তা দোষণীয় নয়, কারণ এই অসাম্য নৈতিক বা প্রাকৃতিক অসাম্য নয়, সম্পত্তিকেন্দ্রিকও নয়। প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক আইনের বিষয়টি রুশোর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তি-শৃঙ্খলার অবস্থা, ন্যায়-অন্যায়ের পূর্ববর্তী অবস্থা। রুশো স্পষ্ট দাবি করেন প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের মধ্যে যুক্তির উন্মেষ ঘটেনি, তাই আইন এবং অধিকারের প্রশ্ন ছিল না। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের প্রতি তিনি যথেষ্ট নমনীয় মনোভাব পোষণ করেছেন। যার বিপরীত চিত্র আমরা পাই সমাজবদ্ধ মানুষের রাষ্ট্রের পদার্পণে। সমাজবদ্ধ মানুষের মূল্যায়নে তিনি বৌদ্ধিকতা, বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দূষেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রুশো জ্ঞান ও শিল্পকলার উদ্ভবকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু জ্ঞান ও শিল্পকলার অগ্রগতি যখন সমাজকে ধ্বংস করে 'বিপুল সামাজিক বিপ্লব' ঘটায় এবং সমতা নষ্ট করে সে বিষয়টিই রুশোর কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। রাষ্ট্র সৃষ্টির দ্বারা সাম্য নষ্ট হয়, সম্পত্তি নিয়ে কোন্দল শুরু হয়। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের মধ্যে যে অসাম্য ছিল তা স্বাভাবিক অসাম্য বা দৈহিক অসাম্য। রাষ্ট্রের উৎপত্তিতে জনগণের মধ্যে দেখা দিল রাজনৈতিক অসাম্য।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে রুশোর কোনো দৃঢ় মনোভাব পাওয়া যায় না বললে চলে। বরং বলা যায় রুশোর কাছে প্রাকৃতিক আইনের ধারণাটি গৌণ। তিনি প্রাকৃতিক মানুষকে আইন দ্বারা চালিতরূপে নয়, প্রবৃত্তি-তাড়িতরূপে চিত্রিত করেছেন। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে নিপীড়ন ছিল না, মানুষের অধিকার সম্পর্কে ধারণা ছিল না, তাই তিনি আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। স্বাভাবিক অবস্থায় (প্রকৃতির রাজ্যে) মানুষ অল্পতে তুষ্ট থেকেছে, চাহিদা ছিল সীমিত, জীবন ছিল সহজ-সরল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাবমুক্ত; পরস্পরের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, শ্রমদাসত্ব ছিল না, দারিদ্রের কষাঘাতও ছিল না। সুসম্পর্ক ছিল কিন্তু পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল না যা তার স্বাধীনতাকে হরণ করে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন অবস্থায় ছিল, ব্যক্তির চাহিদা নূন্যতম থাকায় সে অপরের সাহায্য ছাড়াও চলতে পারত। দাসত্ব না থাকায় প্রত্যেকেই স্বাধীন ও মুক্ত। এ কারণে রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাকৃতিক আইন মুখ্য নয়, গৌণ।

স্বাভাবিক আইন বা প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে হবস ও লকের ধারণার বিরোধিতা করেন রুশো। তিনি প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করেন। প্রকৃতির রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলাময় পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক আইন নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ ছিল নিষ্পাপ, তারা ভালো-মন্দ, নৈতিকতা-অনৈতিকতার উর্দ্ধে। তাদের এসব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। রুশো *ইনইক্যুয়ালিটি*- গ্রন্থে বলেন আইনের নিয়ন্ত্রণ বা বুদ্ধির বিকাশ অসৎ কাজ বন্ধ করতে পারে না।[১০৬]

রুশোর সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় আধুনিককালে রাশিয়ান দার্শনিক পিটার ক্রপোটকিন (১৮৪২-১৯২১) এর সাথে। তাঁদের চিন্তার সাদৃশ্য হলো— সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যের প্রথমদিকে মানুষ ও সমাজজীবন ছিল জটিলতামুক্ত। একের সাথে অন্যের সংঘর্ষ নয়, সংঘাত নয়, বরং সহযোগিতা, সহমর্মিতাই ছিল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। পরবর্তীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব, রাষ্ট্রের উত্থান ব্যক্তির জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে। ক্রপোটকিন মনে করেন মানুষের স্বাভাবিক জীবনে যখন কৃত্রিম ইচ্ছার অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিবর্তনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যখন বিঘ্ন ঘটে, তার প্রভাব কাটানোর জন্য বল প্রয়োগের দরকার হয়। একেই ক্রপোটকিন বলেন 'বিপ্লব'।[১০৭] রুশোর প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারবিহীন এ রাষ্ট্রের সাথে আমরা সাদৃশ্য পাই পিটার ক্রপোটকিনের চিন্তার। তাঁর মতেঃ No more laws! No more Judges!

Liberty, equality and practical human symphathy and the only effective barriers we can oppose to the anti-social instincts of certain among us.[১০৮]

পিটার ক্রপোটকিনের সাথে রুশোর চিন্তার অন্যতম সাদৃশ্য হলো রুশোর মতো ক্রপোটকিন মনে করেন রাষ্ট্র হলো কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান, এটি মানব সমাজের স্বাভাবিকতা তথা সাম্য, ন্যায্যতা, সৌহার্দ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ। অর্থনীতি তথা অর্থনৈতিক ক্ষমতা সমাজের শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি করল, সংঘাতের জন্ম দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি রূপ। রাষ্ট্র সংঘাত নিবৃত্তির পথে হাতিয়ার স্বরূপ। ক্রপোটকিনের মতে, ... সংঘাতের ফয়সালা করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় তার নাম রাষ্ট্র। একই সঙ্গে শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য বহাল হয় আইন। এই আইন স্বাভাবিক সমাজ প্রথার জায়গা নেয়। সেই প্রথা ছিল সব মানুষের, আর আইন হচ্ছে শাসক শ্রেণির স্বার্থে। শাসক, আইন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিকতার পরিপন্থী।[১০৯]

বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা ব্যক্তির অধঃপতনের জন্য দায়ী– তাঁর এই ধারণার জন্য রুশো 'দিঁজ একাডেমি' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এতে তিনি স্পষ্টভাবে বিজ্ঞান, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়সমূহকে মানুষের অধপতনের জন্য দোষারোপ করেছেন এবং খুব সরল একটি জীবন মানুষের জন্য প্রত্যাশা করেছেন। রুশোর এ ধারণার বিস্তৃত প্রকাশ ঘটে তাঁর *ইনইক্যুয়ালিটি*-তে। এতে তিনি প্রকৃতির রাজ্য এবং মানব-প্রকৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় মানুষের মধ্যে বিশেষ কোনো অসাম্য দেখতে পান না। তিনি মনে করেন অসাম্য সৃষ্টি হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে এবং এতে দেখা যায় পৌর সমাজ বা রাজনৈতিক সমাজে (Civil Society)। তিনি স্বাভাবিক অসাম্যকে যেমন– ব্যক্তির বয়স, স্বাস্থ্য, বুদ্ধিগত তফাৎ এসব অসাম্যকে দোষণীয় মনে করেন না। কিন্তু মানুষের দৈহিক অসাম্য ব্যতীত অন্যান্য অসাম্যসমূহের উদ্ভব বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির দ্বারা, যার সূত্রপাত রাজনৈতিক সমাজে। রুশো এ সম্পর্কে বলেন, প্রকৃতির রাজ্য থেকেই প্রাকৃতিক আইন গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক মানুষের ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবো ততদিন পর্যন্ত কোন আইন তাদের জন্য মূলত নির্ধারণ করা হয়েছিল বা কোন আইন তাদের জন্য সর্বোচ্চ কার্যকর ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন। আমরা যতদূর বুঝতে পারি তারা বশ্যতা স্বীকার করেছিল সচেতনভাবেই এবং তাদের এই সচেতনতা সরাসরি প্রকৃতির কাছ থেকেই এসেছিল।[১১০]

রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের গৌণ অবস্থানে আমরা এধরণের সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে মানুষ যদি সৎ ও সুশৃঙ্খল হয় তবে আইন প্রয়োজনীয় নয়। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দরুণ আইনের ভূমিকা জরুরী নয়। তথাপিও রুশো তাঁর *ইনইক্যুয়ালিটি* গ্রন্থে বলেছেন, প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃত সুখ-শান্তি সম্ভব নয়, সেজন্য সমাজে ও রাষ্ট্রে যেতে হয় । আর নৈতিকতার প্রকাশ ঘটবে রাষ্ট্রে।

রুশো ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধা, আবেগ (যা মহৎ ও পরিবর্তনশীল) এবং সদিচ্ছার মতো বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেন, গ্রহণ করেন। তিনি চিন্তাশীল ব্যক্তির মধ্যে সুকোমল মূল্যবোধ, আবেগ কিংবা নৈতিক মূল্যবোধ কোনোটিই লক্ষ করেননি। বরং ফরাসি জ্ঞানালোক যুগের দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও রুশো এ সকল সদগুণাবলি বিলুপ্তির জন্য চিন্তাশীলতা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিকে দুষেছেন। এক্ষেত্রে ফরাসি জ্ঞানালোকের লেখকবৃন্দ যেমন– ভলটেয়ার, মন্টেস্কু, দিদেরো প্রমুখের সাথে রুশোর পার্থক্য রয়েছে। যেখানে ফরাসি জ্ঞানালোক যুগের চিন্তা আবর্তিত হয়েছে প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে, সেখানে রুশোর কাছে প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতিবাদিতা, আবেগময়তা। ফরাসি জ্ঞানালোক যুগের দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন দার্শনিকদের চিন্তার বিপরীতে রুশোর চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়। জ্ঞানালোক যুগে যখন বিজ্ঞান ও শিল্পকলার জয়জয়কার তাহলে রুশোর এ সবকিছুর বিরুদ্ধে অবস্থান তাকে অন্যান্য চিন্তাবিদ অপেক্ষা স্বতন্ত্র দার্শনিক বলে মন্তব্য করেছেন পিটর নাওয়াকাওস্কি।[১১১]

রুশোর প্রাকৃতিক আইনের মূল্যায়নে আমরা বলতে পারি তিনি প্রাকৃতিক আইনের পরিবর্তে গুরুত্ব দিয়েছেন 'জন প্রজ্ঞা'কে। তিনি মানব প্রবৃত্তিকে আইনের পূর্বে স্থান দিয়েছেন। যদিও লকের প্রাকৃতিক আইনে প্রজ্ঞা এবং পর্যবেক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে, রুশোর মতো কেবল আবেগ বা হবসের মতো কেবল শক্তি নয়। রুশোর প্রাকৃতিক আইনে মানবচরিত্রের লক্ষণীয় দিক হলো মানুষের সমবেদনা বা সহানুভূতি।

রুশোর রাষ্ট্রতত্ত্বে প্রজ্ঞা অপেক্ষা বিশ্বাসকে তথা নৈতিক আবেগ-অনুভূতিকে অধিক মহত্তররূপ বিবেচনা করা হয়েছে। স্যাবাইন বলেন, 'রুশো এবং কান্ট উভয়েই যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিস্বার্থকে পরিচিত নৈতিক প্রেরণা বলে অস্বীকার করেন এবং উভয়েই দূরদর্শিতাকে নৈতিক সদ্‌গুণের তালিকা হতে বাইরে রাখেন।'[১১২] রুশো কেবল বিজ্ঞান ও শিল্পকলাকে যাবতীয় অনর্থের জন্য দুষেছেন তা নয়, তিনি সমাজে বিশ্বাস ও সদগুণ নষ্টের অভিযোগে দার্শনিকদের অভিযুক্ত করেন। তাঁর ভাষায়:

"এ সমস্ত অভিমানী এবং নিষ্ফল বক্তা (দার্শনিকগণ) ভয়াবহ আপাতবিরোধে সজ্জিত হয়ে আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি এবং সদগুণকে বিনষ্ট করতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তারা স্বদেশিকতা এবং ধর্মের যত পুরানো নামের প্রতি বিদ্রুপের হাসি হাসতে থাকেন এবং তাদের প্রতিভা ও দর্শনকে সেই সমস্ত পবিত্র বিষয়ের ধ্বংস সাধনে ও অপবাদের কাজে নিয়োজিত করেন।"[১১৩]

রুশো তাঁর *ইনইক্যুয়ালিটি* গ্রন্থে মূলত আলোচনা করেছেন কীভাবে সমাজ ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করেছে। যেসমস্ত নৈতিক গুণাবলি ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অকার্যকর হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের উদ্ভব, সমাজের উত্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পত্তির উদ্ভব ও ভাগাভাগি, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি মানুষকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। প্রযুক্তির বিকাশ এবং সম্পদের আবির্ভাব ব্যক্তির সুপ্ত নৈতিক সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করল। তাঁর কাছে ইতিহাস হলো নঞর্থক- অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির অধ:গতির বিবরণ। সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং সেই সাথে মানুষের ক্রমোন্নতির ইতিহাস রুশোর কাছে উপেক্ষিত। ঐতিহাসিক সময় মানুষের নৈতিক অধ:পতনের মাপকাঠি। সে সময় ও সংস্কৃতি ব্যক্তি ও সমাজকে করেছে অধ:পতিত।

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে রুশোর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো তিনি রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাসে প্রাকৃতিক আইনকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন। রুশোর কাছে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রাকৃতিক আইনের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়নি। থমাস কার্বন্যু বলেন, রুশোর রাজনৈতিক লেখনীসমূহ কেবলমাত্র অধিকতর আধুনিক প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের প্রতিলিপি নয়, বরং এটি প্রচলিত প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের তাৎপর্যের একটি পূনর্মূল্যায়ন। যেখানে রয়েছে মানুষের জন্য আদর্শিক ও আশাবাদী বিশ্বাস এবং মানব অস্তিত্বের আধিবিদ্যক উভয়সংকট। রুশোর নির্ভেজাল মানবিকতা মানুষের ব্যক্তিত্ববোধে যথার্থ উৎসাহ সঞ্চার করে। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো, রুশো... ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মুক্তির সাথে সেতুবন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন আইনগত ও রাজনৈতিক আদর্শের ঐতিহাসিক প্রয়োজনে।[১১৪]

প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে রুশো ভ্রান্ত মনে করেছেন। তিনি মনে করেন এ ধারণা মানব চরিত্রের সঠিক মূল্যায়ন করেনি; মানবচরিত্রের ভুল বিশ্লেষণ করেছে। সমাজপূর্ব মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ নয়, তাই আইনের প্রয়োজন নেই। সমাজবদ্ধ মানুষই দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ। সমাজে বসবাসকারী মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ, স্বার্থপর ও প্রতিযোগিতাপরায়ণ হয়ে ওঠে পরিবেশের প্রভাবে। এটা স্পষ্ট যে পরিবেশ ও সমাজে মানবচরিত্র কলুষিত ও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তাই তিনি প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনকে অনুপযুক্ত মনে করেন। তাঁর মতে, "যতক্ষণ আমরা স্বাভাবিক মানুষ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকবো, তার জীবনের মূল নিয়ম অথবা যে নিয়ম তার পক্ষে উপযুক্ত, সে সম্পর্কে নিয়ম স্থির অসম্ভব।"[১১৫] রুশোর প্রাকৃতিক আইন বর্জনের পেছনে অন্যতম কারণ হলো তিনি মনে করেন প্রাকৃতিক আইন কিংবা ঈশ্বরের ধারণা কোনোটিই ব্যক্তির সহজাত নয়, এগুলো ব্যক্তি জন্মের পর শিক্ষা লাভ করে।

ভনও মনে করেন, প্রাকৃতিক আইন বৌদ্ধিক আইন হতে পারে, কিন্তু এই বৌদ্ধিকতা থেকে এটা উপলব্ধি করা যায় যে, এই বৌদ্ধিকতার উৎপত্তি কেবল ভাবাবেগ থেকে 'যা ব্যর্থ নির্দেশ প্রদান করে'।[১১৬]

ভনের বক্তব্য থেকে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির আবেগ থেকে পরবর্তীতে তাঁর বৌদ্ধিকতার উন্মেষ ঘটেছে। ব্যক্তির আবেগ থেকে বৌদ্ধিকতায় পদার্পন অবশ্যই একটি দ্বান্দিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। প্রাকৃতিক আইনের প্রথম সূত্রটি আমরা হবসের কাছে পেয়েছি আত্মরক্ষার নীতি এবং এ নীতি ব্যক্তিকে তার স্ব-স্বার্থ সংরক্ষণে পরিচালিত করে। যদিও প্রাকৃতিক আইনের বিষয়ে রুশোর কাছে আমরা কোনো সুসংবদ্ধ আলোচনা পাই না। তবুও আমরা বলতে পারি, যদি নৈতিক আইনের উদ্দেশ্য হয় সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধান, তাহলে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে আমরা এক প্রকার প্রাকৃতিক আইনের কথা বলতে পারি। রুশো যখন প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি সামাজিক বিধি-নিষেধ, নৈতিকতার দিকসমূহের সাথে এক প্রকার বিনিময় বা আপস করেছেন বলে মনে হয়। প্রাকৃতিক আইনের ধারণা বর্জন দ্বারা তিনি স্থলাভিষিক্ত করেছেন জনগণের প্রজ্ঞাকে।

হবসের প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মতো রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অহঙ্কারী কিংবা উদ্ধত কোনোটিই ছিল না। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে শান্তি ও পরিতৃপ্তিবোধ ছিল। যদিও কখনো রুশো তাঁর লেখনীতে টেকসই জীবনের লক্ষ্যে খাদ্যকে কেন্দ্র করে আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের উল্লেখ করেছেন। এধরণের তীব্র খাদ্যসংকটের সময় প্রাকৃতিক আইন কোনো সমাধান দেবে না, বরং শক্তিই পরিত্রাণকর্তা। তাহলে কি আমরা দাবি করতে পারি প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টির কারণ গোচরীভূত না হওয়ায় মানুষ নৈতিক এবং ভালোরূপে প্রতিভাত হয়।

ইনইক্যুয়ালিটি-তে রুশো প্রাকৃতিক আইনের বৌদ্ধিক দিকটি পরিত্যাগ করেছেন, কারণ যুক্তি কোনো সুনিশ্চিত ঘোষণা প্রদানের ক্ষেত্রে অনিশ্চিত। ন্যুন "Rousseau's Theory of Natural Law as Conditional" প্রবন্ধে বলেন, প্রাকৃতিক আইনের প্রতি রুশোর বিশ্বাস প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন ছিল। কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাকৃতিক আইনকে ঈশ্বর এবং নৈতিক ফলাফলের সাথে যুক্ত করেছেন। রুশো ১৭৬৯ সালে মলটন কে লেখা একটি পত্রে বলেন- "... আপনি জড় এবং গতির সাহায্যে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আদি কারণকে অস্বীকার করেছেন, আপনি মানবজীবন থেকে সকল নৈতিকতাকে বর্জন করেছেন।'[১১৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় রুশো লক ও কান্টের মতো ঈশ্বরতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেননি। ঈশ্বরের সাথে সংশ্লিষ্ট করে নৈতিকতা সংক্রান্ত আলোচনা করেননি। বরং নৈতিকতাকে তিনি ঈশ্বর নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। এক্ষেত্রে লকের সাথে তাঁর বৈসাদৃশ্য রয়েছে। লক নৈতিকতাকে ঈশ্বরকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। যদিও এটা সত্য যে রুশো তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে নৈতিক দায়বদ্ধতার একটি বিশুদ্ধ আকারগত বিশ্লেষণ করেছেন। এমিল এবং 'Profession of Faith of the Savoyard Vicar' এ তিনি বিবেক ও নৈতিকতা সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষন করেছেন। একটি আদর্শ সমাজে ঈশ্বর কম গুরুত্বপূর্ণ হবে যদি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অপরাধীকে শাস্তি এবং সদগুণের অধিকারীকে পুরুস্কৃত করা হয়। রুশোর মতে অন্যান্য আইনের মতো প্রাকৃতিক আইনেরও কোনো অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। এ সকল অনুমোদনসমূহকে উপেক্ষা করে যদি জগতকে উহ্য রেখে বা জগতের বাইরে ঈশ্বরতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে ব্যাখ্য করা হয় তাহলে নৈতিকতার স্বীকার্য সত্য বলে কিছু থাকে না, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নৈতিকতা ম্লান হয়ে পড়ে।

রুশোর মতে মানুষের সত্যিকারের মর্যাদা নির্ভর করে তার নৈতিক স্বাধীনতার ওপর। স্বআরোপিত নৈতিক বিচারক্ষমতাকে যদি শাস্তি ও পুরস্কারের ঘেরাটোপে নির্ণয় করা হয়, নির্ভরশীল করে তোলা হয়, তাহলে নৈতিকতা

তার স্বীয় আবেদন হারায়। ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে রুশো নৈতিকতার স্বাধীনতা ও সীমা নির্ধারণ করেন। ঈশ্বরের জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে মানুষের প্রাকৃতি আইন সম্পর্কে উপলব্ধি থাকতে পারে। এটা প্রাকৃতিক এই অর্থে যে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ বিবেক এবং সহজ যুক্তির সাহায্যে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে জানতে পারে। যাই হোক প্রাকৃতিক আইনের বাধ্যতামূলক রূপটি শর্তসাপেক্ষিক। একদিকে এটি নির্ভর করে মানুষের নিরূপণযোগ্য ঘটনাসমূহের প্রয়োগের ওপর এবং অন্যদিকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর। এই উভয় প্রকার বিশ্বাস যদি অর্থহীন হয়, তাহলে প্রাকৃতিক আইনের ধারণাটি সম্পূর্ণরূপেই পুঁথিগত এবং নৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ হবে বড় জোর ভাববিলাসী।[১১৮]

রুশোর আলোচনায় আমরা প্রাকৃতিক আইনের মতো প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কেও তেমন কিছু পাই না। সম্ভবত উভয়ের আলোচনা অনুপস্থিতি দ্বারা তিনি চেয়েছেন স্বাধীন মুক্ত মানুষকে অব্যাহত রাখতে, তাকে শৃঙ্খলমুক্ত রাখতে। এর মাধ্যমে আমরা তাঁর দর্শনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাকে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর দর্শনে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী যেমন কোন সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয় তদ্রুপ সমাজ জীবনের ... আদর্শ বা নিয়ম কোনো প্রাকৃতিক আইন নয় যা প্রাকৃতিক অধিকারের ধারাকে নির্ধারণ করবে কিংবা জনগণের প্রজ্ঞা থেকেও তা উদ্ভূত হবে না।[১১৯] বরং তিনি মনে করেন সর্বোচ্চ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবে নৈতিক সত্তা এবং সর্বোচ্চ আদর্শ হবে ঐ সত্তার সাধারণ ইচ্ছা। উল্লেখ্য এখানে কোন একক ব্যক্তিসত্তা নয় সম্মিলিত সত্তাকে নির্দেশ করেছেন। বার্কারের মতে, রুশোর 'নৈতিক সত্তাকে' এবং 'সাধারণ ইচ্ছা'র ধারণা প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে অতিক্রম করে যায়।[১২০]

রুশো প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনকে অস্বীকার করলেও, এর প্রয়োজন বোধ না করলেও তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে এসে তিনি সার্বভৌমের আলোচনায় আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। রুশো তাঁর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বে বলেন আইনের প্রয়োজন ব্যক্তিকে দমনের জন্য নয় তার বশ্যতা মুক্তি ঘটানোর জন্য। রুশো কেবলমাত্র আইনের যথার্থ উপস্থিতি ও প্রয়োগ চেয়েছেন, এমন আইন যা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তি কিংবা কেবলমাত্র চার্চ-যাজকদের কাছে কুক্ষিগত থাকবে না।

ইনইক্যুয়ালিটি-গ্রন্থে আমরা সমাজবদ্ধ মানুষের আত্মপ্রকাশ দেখি। সমাজবদ্ধ মানুষ রুশোর চিন্তায় স্বার্থপর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের মধ্যে সাফল্য-ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন নেই। সফলতা-ব্যর্থতার আলোচনা শুরু হয় পৌর জীবনে, রাষ্ট্রের উদ্ভবে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল সমতা, রাষ্ট্রীয় সমাজের ভিত্তি হলো অসমতা। সফলতা-ব্যর্থতার মানদণ্ডরূপে কাজ করে সম্পত্তি। সম্পত্তি পৌর সমাজে বা রাজনৈতিক সমাজে কাজ করে পুঁজিবাদী শ্রেণির শোষণের হাতিয়াররূপে। এ সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জয়জয়কার কিন্তু এই স্বাধীনতা ব্যক্তিকে স্বাতন্ত্রবোধের পাশাপাশি দিয়েছে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। একের সফলতা অপরের ব্যর্থতারূপে ধরা পড়েছে। সম্পর্কের অসমতাও সৃষ্টি হলো। দেখা দিল ক্ষোভ, বিদ্বেষ, প্রয়োজন পড়ল নিয়ন্ত্রণের। প্রয়োজন পড়ল আইনের। অসাম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় সত্তার অন্বেষণে ব্যক্তির কাছে নৈতিকতার প্রশ্নও গুরুত্ব পেল। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে রাজনীতি ও নৈতিকতার উপস্থিতি ব্যক্তিকে গড়ে তুলল প্রকৃতির রাজ্যের অসম্পূর্ণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ মানুষে।

রুশো নৈতিকতার এবং আইনের উদ্ভব দাবি করেন সমাজে এবং এগুলো মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্য করেন। এ প্রসঙ্গে মেলজারকে স্মরণ করা যায়। তিনি বলেন:

"... It is obvious that Rousseau is filled with moral outrage at the injustice of society, and it is thought to be equally obvious that in his writings he wants it teach men what justice is and exhort them to follow it."[১২১]

আইন ও নৈতিকতা সম্পর্কে রুশোর ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি। প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তিগত নৈতিকতার বিভিন্ন দিকসমূহকে অকার্যকর, অবৈধ প্রতিপন্ন করেছে এবং রুশোর অলোচনায় আমরা এটা দেখেছি যে, তিনি মনে করেন উৎপীড়নের কারণেই সকল অসৎ গুণাবলির সৃষ্টি। রাজনৈতিক সমাজের মানুষের অন্তঃস্থিত শোষণমূলক মনোভাব, নিপীড়নমূলক মনোবৃত্তি ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ গুণাবলিসমূহ নষ্ট করে তাকে কাপুরুষ, ভীতু, প্রবঞ্চক, একাকী, নিঃস্ব করে তোলে। তাই সমাজে আইনের প্রয়োজন। আইনের শাসন ব্যক্তিকে বিপদ থেকে সুরক্ষিত রাখবে।

স্যাবাইন মনে করেন রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় বেশকিছু অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি লক্ষণীয়।[১২২] যদিও রুশো তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন এভাবে: "All my ideas are consistent, but I can not express them all at once"। সম্ভবত এ কারণে কোনো কোনো রাষ্ট্রবিশ্লেষক মনে করেন রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণাগত কাঠামো ছিল না। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা সর্বদা সম্পর্কের বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব– যেমন, মহৎ ও নীচ কিংবা আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখি, যা পরবর্তীতে তাঁর লেখনীতে দৃশ্যমান হয়। রুশো তাঁর ব্যক্তিত্বের এই স্ববিরোধিতার জন্য অবশ্য সমাজকেই দুষেছেন।

ইনইক্যুয়ালিটি-তে আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ না করলেও পরবর্তী আলোচনা সমূহে তিনি আইনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। অন্যের অধীনতা থেকে মুক্তি ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতা বশ্যতা থেকে, প্রকৃতি থেকে নয়। রুশো মনে করেন বশ্যতাই মানব প্রজাতির সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূল। তাঁর এই বক্তব্যের পেছনে স্পষ্টতই একটি দার্শনিক আবেদন লক্ষণীয়– তা হলো দৈহিক দাসত্ব অপেক্ষা আত্মার কলুষতা, বশ্যতা অধিকতর বিকৃত। যথার্থ আইনের শাসন ব্যক্তির জন্য স্বাধীনতা সৃষ্টি করে, পাশাপাশি মানুষের প্রাকৃতিক সদগুণ আত্মার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে। রুশো আইনকে মনে করেছেন 'মানব প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে মহত্তম' এবং স্বাধীনতাকে রুশো বলেছেন 'সকল ভালো বিষয়ের মধ্যে প্রথম'। আইন ব্যক্তির সব ধরণের ভালো এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে। রুশো তাঁর *Political Economy* গ্রন্থে আইনকে গুরুত্বপূর্ণ রূপে আলোচনা করেছেন এবং সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি ক্ষমতার বৈধতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরবর্তীতে *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে আইনের পক্ষে তার বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়। বার্কার রুশোর *সামাজিক চুক্তির* দর্শনকে বরেছেন 'সেতুর দর্শন'। তাঁর ভাষায়, "It marks the transition from natural law to an idealization of the national state."[১২৩] প্রাথমিক আলোচনায় যিনি আইনের বিরোধিতা করেছেন পরবর্তীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা, দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, ব্যক্তির আত্মিক মুক্তি নিশ্চিত করতে তিনি আইনের সাহায্যের ওপর নির্ভর করেছেন।[১২৪] এ গ্রন্থে রুশো আইনকে জনসম্মতির সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে একটি বৈধ রাজনৈতিক সংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্র অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে জনসম্মতির ওপর এবং সকলের মঙ্গল সাধনের ওপর। রাষ্ট্র তাঁর সদস্যদের সুপ্ত নৈতিক গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করবে এমনটা অভিমত রুশোর।[১২৫]

প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে রুশোর দ্বৈত অবস্থান আমরা বুঝতে পারি আর্নেস্ট বার্কারের বক্তব্যে। তিনি মনে করেন, রুশো প্রাকৃতিক আইনকে স্বীকার এবং অস্বীকার দুই অবস্থান থেকে গ্রহণ করেছেন।[১২৬] রুশো এর প্রয়োজন প্রসঙ্গে মনে করেন, প্রাকৃতিক আইন ও এর বিধি নিষেধ ছাড়া কীভাবে সামাজিক চুক্তির মত একটি আইনগত বিষয় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে? সে অর্থে তিনি প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। আবার কখনো কখনো প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে রুশোর অপছন্দ লক্ষ করি। যেমন, তিনি মনে করেন, জাতি আইন সৃষ্টি করে এবং আইন জাতিকে সৃষ্টি করে না। তাই বার্কার বলেন, 'He is two things in one, and he may be said both to belong and not to belong to the school of Natural Law.'[১২৭]

রুশোর কাছে রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে অরাজনৈতিক জনগণের কাছে অধিকার এবং আইন বিশেষ গুরুত্বের স্থান না পেলেও রাজনৈতিক সমাজে রুশো অধিকার এবং আইনের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর এ অবস্থান থেকে মনে হয়েছে অধিকার এবং আইন দুটোই রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয়। তাঁর পূর্ববর্তী চুক্তিবাদী হবস এবং লকের প্রাকৃতিক আইন এবং প্রাকৃতিক অধিকারের পর্যালোচনায় আমাদের মনে হয়, রাজনৈতিক সমাজেও এগুলোর যথাযথ ব্যবহার ও উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে রাষ্ট্রে। প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের প্রথাগত অবস্থানকে প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করার জন্য বা অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাজের। রাষ্ট্রে যা রূপ লাভ করে পজিটিভ ল নামে। রুশোর অ-রাজনৈতিক সমাজে জনগণের আইন ও অধিকারের ধারণা ছিলো না কিন্তু হবস ও লকের জনগণের কাছে অরাজনৈতিক সমাজে এসব বিষয়ে সচেতনাত ছিলো। হবস ও লকের জনমানসে রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বের পরিচয় এর দ্বারা মেলে, যা রুশোর রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ববর্তী জনগণের কাছে অনুপস্থিত।

তথ্যনির্দেশ

১. Joseph S. Murphy, *Political Theory : A Conceptual Analysis*, The Dorsey Press, Illinois, 1968, p. 38.

২. MR. Untersteiner, *The Sophists*, Blackwell Publishing, UK, 1954, pp. 322-24.

৩. W. Ebenstein (ed.), *The Republic* of Plato in *Great Political Thinkers: Plato to the Present*, 4th Edition, New York: Holt, Rinehart and Winston; 1969; pp. 237-239.

৪. Murphy, *Political Theory*, pp. 38-40.

৫. Thomas Aquinas, *Summa Theologica II*, a question 94, arts. 1-4 in Twenty Great Books of the Western World, W. Benton, Chicago, 1952, pp. 220-24.

৬. Aquinas, *Summa Theologica II*, pp. 220-23.

৭. Thomas E. Carbonneau, "The Implicit Teaching of Utopian Speculations: Rousseau's Contribution to the Natural Law Tradition", *Penn State Law e-library*; Vol. 3:123, 3U. Puget Sound L. Rev., 1979, p. 131. http://elibrary.law.psu. edu/fac-works

৮. Jeremiah Newman, *Conscience Versus Law: Reflections on the Evolution of Natural Law*, Franciscan Herald Press, Chicago, 1971, p. 96.

[Kant's formal distinction between law and morality consisted in characterizing legality as the "accommodation inter se of the external liberty of men in community" and morality as the "regulation intra se of the internal liberty of the individual man by way of the dictates of his private conscience."]

৯. Barker Ernest, *Greek Political Theory: Plato and His Predecessors*, Revised Edition, Barnes & Noble Inc., New York, 1947, P. 27. ["While modern thought starts from the rights of the individual and conceives the state as existing to secure the condition of his development, Greek thougth starts from the right of the state."]

১০. Mead Margaret, "Some Anthropological Considerations Concerning Natural Law", *Natural Law Forum*, Vol. 6, University of Notre Dame Law School, 1961, p. 54. ["Natural law' might thus be defined as those rules of behaviour which had developed from a species-specific capacity to ethicalize as a feature of those examples that appear in all known societies."]

১১. Edgar F. Carritt, *Ethical and Political Thinking*, Oxford University Press, 1947, p. 43.

১২. A. P. Entreves, *Natural Law: An Introduction to Legal Philosophy*, (1951) Eighth Printing, Transaction Publishers, New Jersey, 2009, p. 12. ["In order to, understand the dominance of natural law, we must interpret it psychologically, and therefore relate it to the forces that operated through its medium."]

১৩. A. P. Entreves, *The Case for Natural Law Re-Examined*, University of Notre Dame, Natural Law Forum, 1968, pp. 5-6.

১৪. Jacques Maritain, *The Rights of Man and Natural Law*, D. Anson (Trans.), Scribner, New York, 1943, p. 61.

১৫. Leo Strauss, *The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Genesis*, University of Chicago Press, Chicago,1963, Introduction.

১৬. John Austin, *Lectures On Jurisprudence Or The Philosophy Of Positive Law*, Part.1, Lec. I, Sec.2, R. Camp (ed.), Henry Holt and Company, New York, 1875, Harvard University, 2005. pp. 27-30.

১৭. Newman, *Conscience Versus Law: Reflections on the Evolution of Natural Law*, pp. 81-83.

১৮. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Martinich A. P. and Battiste B. (eds.), Ch. 14, Part 1, Broadview Edition, Canada, 2011, p. 128.

১৯. *Ibid.*, p, 128.

২০. *Ibid.*, p. 128.

২১. Strauss, *The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis*, p. 155.

২২. Jonathan P. Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised edition, Oxford University Press, 2006, p. 13.

২৩. *Ibid.*, p. 13-14.

২৪. Hobbes, *Leviathan*, p. 16.

২৫. *Ibid.*, p. 129.

২৬. *Ibid.*, pp. 128-129.

২৭. *Ibid.*, p. 129.

২৮. *Ibid.*, p. 128.

২৯. *Ibid.*, pp. 127-129.

৩০. *Ibid.*, p. 129.

৩১. *Ibid.*

৩২. *Ibid.*, pp. 134-135.

৩৩. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory,* Nelson and Sons, London, 1970, pp. 130-131.

৩৪. Hobbes, *Leviathan*, p. 131.

৩৫. *Ibid.*, pp. 131-132.

৩৬. *Ibid.*, 2011, p. 144.

৩৭. *Ibid.*, 2011, p. 144.

৩৮. Howard Warrender, *The Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Oxford University Press, London, 1970, p. 51.

৩৯. Hobbes, *Leviathan*, p.144.

৪০. *Ibid.*, p. 145.

৪১. *Ibid.*, p. 145.

৪২. *Ibid.*, p. 146.

৪৩. *Ibid.*, p. 146.

৪৪. *Ibid.*, pp. 146-147.

৪৫. *Ibid.*, p. 146.

৪৬. *Ibid.*, pp. 145-146.

৪৭. *Ibid.*, p. 147.

৪৮. *Ibid.*, pp. 146-147.

৪৯. *Ibid.*, pp. 146-147.

৫০. *Ibid.*, pp. 147-148.

৫১. *Ibid.*, p. 148.

৫২. *Ibid.*, p. 149.

৫৩. *Ibid.*, pp. 149-150.

৫৪. *Ibid.*, p. 148.

৫৫. *Ibid.*, pp. 148-149.

৫৬. *Ibid.*, p. 149.

৫৭. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes : His Theory of Obligation*, p. 74.

৫৮. Hobbes, *Leviathan*, pp. 149-150.

৫৯. *Ibid.*, p. 150.

৬০. *Ibid.*, p. 151.

৬১. Carbonneau, “The Implicit Teaching of Utopian Speculations: Rousseau’s' Contribution to the Natural Law Tradition”, *Penn State Law e-library*, p. 133.

৬২. Hobbes, *Leviathan*, p. 138.

৬৩. John Plamenatz, *Man and Society*, Vol. 1, Longmans, 1963, pp. 301-302.

৬৪. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature*, Princeton University Press, 2009, pp. 33-34. https://muse.jhu.edu/book/311551

৬৫. Eleanor Curran, “An Immodest Proposal: Hobbes Rather than Locke Provides A Forerunner for Modern Rights Theory”, Vol. 32, No. 4, Springer: *Law and Philosophy*, 2013, pp. 515-538.

৬৬. Hobbes, *Leviathan*, p. 138.

৬৭. Thomas Hobbes, *The Elements of Law: Natural and Politic,* Gaskin JCA (ed.), Reprint, Oxford University Press, 1999, p. 80.

৬৮. A.P. D'Entrves, *Natural Law: An Historical Survey*, 2nd Edition, Harper & Row, London, 1965, p. 360.

৬৯. John Locke, *Two Treatises of Government*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967.

৭০. *Ibid.*, p. 94.

৭১. Locke, *Second Treatise*, § 6.

৭২. J. W. Gough, John Locke’s Political Philosophy, Eight Edition, Clarendon Press, Oxford, 1968, p. 20-21.

৭৩. Locke, *Second Treatise*, § 8.

৭৪. *Ibid.*, pp. 96-99.

৭৫. জর্জ এইচ. স্যাবাইন (মূল), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৩৫।

৭৬. Locke, *Second Treatise*, § 12-16.

৭৭. Locke, *Two Treatises of Government*, p. 93.

৭৮. *Ibid.*, p. 96.

৭৯. *Ibid.*, pp. 95-98.

৮০. *Ibid.*, pp. 96-97.

৮১. J. W. Gough, *John Locke's Political Philosophy: Eight Studies*, Clarendon Press, Oxford, 1968, p. 21.

৮২. Locke, *Second Treatise*, p. 97.

৮৩. Gough, *John Locke's Political Philosophy: Eight Studies*, pp. 21-22.

৮৪. Locke, *Second Treatise*, p. 96.

৮৫. *Ibid.*, p. 97.

৮৬. Locke, *Two Treatises of Government*, p. 96.

৮৭. Locke, *Second Treatise*, pp. 289-291.

৮৮. *Ibid.*, § 6, 7, 8, 13.

৮৯. Locke, *Two Treatises of Government*, p. 98.

৯০. *Ibid.*, pp. 287-289.

৯১. *Ibid.*, § 7-8.

৯২. *Ibid.*, § 14-15.

৯৩. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, London, 1995, pp. 601-602.

৯৪. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, p. 9.

৯৫. *Ibid.*, p. 10.

৯৬. John Locke, *An Essay Concerning Human Understandings,* 27th Edition, Ch. XII, Thomas Davison, London, 1829, p. 191.

৯৭. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, pp. 12-13.

৯৮. Locke, *An Essay Concerning Human Understandings,* pp. 192-193.

৯৯. *Ibid.*, p. 251.

১০০. Russell, *History of Western Philosophy*, p. 606

১০১. হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, পৃ. ৪৮৯।

১০২. A. John Simmons, *Moral Principles and Political Obligations*, CH. 2, Princeton University Press, New Jersey, 1979, pp. 29-38.

১০৩. *Ibid.*

১০৪. Eleanor Curran, "An Immodest Proposal: Hobbes Rather than Locke Provides A Forerunner for Modern Rights Theory", Springer: *Law and Philosophy*, Vol. 32, No. 4, 2013, pp. 515-538.

১০৫. *Ibid.*

১০৬. Jean Jacques Rousseau, *A Discourse on Inequality*, Maurice Cranston (ed.), Penguin Books, England, 1984, Introduction.

১০৭. রাষ্ট্রচিন্তা, বর্ষ২, সংখ্যা ১, আশ্বিন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ৯৫।

১০৮. Peter Kropotkin, *Law and Authority*, Reprint in The Anarchist Reader, Creative Media Partners, LLC, 2022, p. 117.

১০৯. Peter Kropotkin, *Bio, Life and Political Ideas,* রাষ্ট্রচিন্তা, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০১৭, পৃ. ৯৮।

১১০. ড. প্রদীপ রায় (অনূ.), পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২১৬।

১১১. Piotr I. Nowakowski, "The Natural Law in Jean-Jacques Rousseau's Philosophy and its Social and Pedagogical Consequences", The Catholic University of Eastern Africa, CUEA International Symposium, Kenya, Nairobi, 2010, p. 63.

১১২. হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, পৃ. ৫৩৪।

১১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৩।

১১৪. Carbonneau, "The Implicit Teaching of Utopian Speculations: Rousseauos' Contribution to the Natural Law Tradition", *Penn State Law e-library,* pp. 138-144.

১১৫. *Discourse On Inequality,* p. 157 in রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস, নির্মল কুমার সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৩২০।

১১৬. C. E. Vaughan (ed.), *The Political Writings of Jean Jacques Rousseau,* Vols. 1, 2, John Wiley & Sons Inc., New York, 1962, pp. 444-450.

১১৭. Charles W. Hendel (ed.), *Citizen of Geneve: Selections from the Letters of Jean Jacques Rousseau,* Oxford University Press, New York, 1937, p. 367.

১১৮. John B. Noone (Jr.), "Rousseau's Theory of Natural Law as Conditional", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 33, No.1, University of Pennsylvania Press, 1972, pp. 21-22.

১১৯. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau,* Oxford University Press, London, 1982, p. XXX.

১২০. *Ibid.*

১২১. Arthur M. Melzer, "Rousseau's Moral Realism: Replacing Natural Law with the General Will", The American Political Science Review, Vol. 77, No. 3, 1983, pp. 633-651. https://doi.org/10.2307/1957264

১২২. হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, পৃ. ৫৩২-৫৩৪।

১২৩. Barker, *Social Contract: Locke, Hume, Rousseau,* p. XXXII.

১২৪. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬১-৬৫।

১২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

১২৬. Barker, *Social Contract: Locke, Hume, Rousseau,* p. XXIX.

১২৭. *Ibid.*

তৃতীয় অধ্যায়

সামাজিক চুক্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

মানুষের জীবনযাত্রাকে সুসংবদ্ধ, গতিশীল, উন্নততর, প্রতিবন্ধকতামুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্র শুধু বলপ্রয়োগ বা শক্তির প্রকাশ নয়, এর সাথে আছে ব্যক্তির যুক্তিবাদিতা, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ জীবনের অভিলাষ। নৈতিক বিবেচনাবোধ থেকে আমরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারি না। নৈতিক বিবেচনার প্রশ্নটি হলো এরকম– রাষ্ট্র একের প্রতি অপরের অনুচিত আচরণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। যদিও এটি সত্যি যে ব্যক্তির সঠিক সুরক্ষা প্রদানের বিনিময়ে রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে, সীমিত করে আইনের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা। যেমন– হবস মনে করেন মানুষ স্বেচ্ছায় বৃহত্তর শান্তির উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাধীনতা ত্যাগ করেছে। লক মনে করেন সম্পত্তির অধিকতর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে ব্যক্তি সেচ্ছায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমিত অর্থে মেনে নিয়েছে। তাই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্বও বটে। জ্যাঁ হ্যাম্পটন মনে করেন, সামাজিক চুক্তি মতবাদের দুটি রূপ রয়েছে। যার একটি বর্ণনামূলক এবং অন্যটি পরামর্শমূলক।[১] চুক্তির পরামর্শমূলক দিকটি বৌদ্ধিক সত্তারূপে মানুষের কি করা উচিত সে নির্দেশনা দেয়।[২]

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদসমূহের মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদটি আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে পরিচিতি লাভ করে ত্রয়ী চুক্তিবাদী দার্শনিক হবস, লক ও রুশোর মাধ্যমে।[৩] চুক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে হবস, লক ও রুশোর মতের ভিন্নতা থাকলেও একটি বিষয়ে তারা সহমত যে রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান কোনো ঐশী প্রতিষ্ঠান নয়, কোনো বলপ্রয়োগ বা ঐশী নির্দেশে সৃষ্টি নয়। রাষ্ট্র মানুষের পারস্পরিক চুক্তির ফলে সৃষ্ট, মানুষের ইচ্ছা এবং চাহিদার বহিঃপ্রকাশ। চুক্তিদ্বারা সৃষ্ট বলে এর আইনগত ভিত্তি ও বৈধতা রয়েছে। সেই সাথে রাষ্ট্রের রয়েছে কর্তৃত্ববাদী চরিত্র ও ক্ষমতা। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট ও মানুষ-কর্তৃক সংগঠিত এ শক্তি মানুষের সম্মতির ফল। পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ মানুষ রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংগঠনটি গড়ে তুলেছে। এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যদিও সমকালে বহুত্ববাদী চিন্তাবিদ গিয়ার্ক, ম্যাইটল্যান্ড প্রমুখ মনে করেন রাষ্ট্রের মতো আরো অনেক কর্তৃত্ববাদী সংগঠন আছে যা ব্যক্তির জীবন বিকাশে সাহায্য করে। তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও রাজনৈতিক জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্র অনিবার্য নয়।

আধুনিককালে চুক্তিবাদের যে ধারা তাতে লক্ষ করা যায় শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি শাসকের কর্তৃত্বের ভিত্তি। এতে বাধ্যতাবোধ লক্ষণীয়। শাসক ও শাসিত উভয়েই স্ব স্ব কর্তব্য পালন করে। কোনো পক্ষ বিশেষত শাসকপক্ষ যদি স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন না করে তাহলে শাসিত শ্রেণি শাসকের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করবে না। চুক্তিতে শর্ত মেনে চলার যে বাধ্যতাবোধ আমরা হবসের চুক্তিবাদে দেখতে পাই তেমনটা হবস-পূর্ব চুক্তিবাদে লক্ষ করি না। এ বিষয়টিই হবসকে সম্ভবত শঙ্কিত করে তুলেছিলো। যার দরুন হবস তাঁর সামাজিক চুক্তিবাদে শাসিতের বাধ্যতামূলক আনুগত্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। হবস-পূর্ব চুক্তির যে বৈশিষ্ট্য তাতে চুক্তি সম্পাদনকারী অন্যরাও চুক্তির শর্ত মেনে চলবে এমন নিশ্চয়তা ছিল না।

হবসের *লেভিয়াথান*

হবসীয় প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যায় আমরা এক প্রকার বলপ্রয়োগকারী শক্তির সুস্পষ্ট উপস্থিতি দেখতে পাই। হবস প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকর করার জন্য বলপ্রয়োগকারী শক্তকে হবস সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করেন, যা বৈধতা লাভ করে এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। কিন্তু হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের কেউ প্রাকৃতিক আইন ভঙ্গ করলে প্রয়োজন পড়ে অধিকতর কর্তৃত্বসম্পন্ন ও সুশৃঙ্খল একটি রাজনৈতিক সমাজ। এই রাজনৈতিক সমাজ মানুষের স্বেচ্ছাসম্পাদিত চুক্তির দ্বারা গড়ে ওঠা রাষ্ট্র। যাকে হবস বলেছেন *লেভিয়াথান* (*Leviathan*)। যার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও জনগণের সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান। হবসের সামাজিক চুক্তিবাদের বিশেষত্ব হলো তিনি জনসম্মতির ওপর বলপ্রয়োগকে বৈধতা দান করেছেন। প্রাকৃতিক আইন অমান্যকারীদের জন্য বা ভঙ্গকারীদের জন্য বলপ্রয়োগের মতো জবরদস্তিমূলক শক্তি ও কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এধরণের কর্তৃপক্ষকে সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন করে হবস সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তাঁর *লেভিয়াথান* প্রতিষ্ঠা করেন।

হবস সামাজিক চুক্তি মতবাদে জনগণের শর্তহীন আনুগত্যের ওপর রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বাত্মকবাদী আচরণকে বৈধতা দেন। এক্ষেত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করেছেন। মানবতাত্ত্বিকতা নয়, বরং জড়বাদী চিন্তা তথা জড়বাদই (materialism) তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূল ভিত্তি।[৪] একইভাবে তিনি সহজ-সরল অবস্থা থেকে মানুষ নামক যন্ত্রের জটিল অবস্থার বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন প্রকৃতির রাজ্য থেকে সামাজিক চুক্তিতে।

হবস তাঁর পূর্ববর্তী সময়ের চুক্তির কিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করেন। তিনি মনে করেন চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো বিশ্বাস। এই বিশ্বাস হলো- প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তির শর্ত মেনে চলবে, স্বীয় দায়িত্ব পালন করবে সেই নিশ্চয়তা। এ নিশ্চয়তাবোধ ব্যক্তির মাঝে বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আর এ নিশ্চয়তা তৈরির জন্য প্রয়োজন শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ। শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন তৃতীয় পক্ষ। কেউ যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তবে তৃতীয় পক্ষ শাস্তি প্রদান করবে। শাস্তির ভীতি ব্যক্তিকে চুক্তির শর্ত পালনে নিশ্চয়তা দান করে।

প্রকৃতির রাজ্য বা প্রাক-রাজনৈতিক জীবনে (মানুষের বর্বর জীবনে) যখন জীবন, সম্পত্তি ও অন্যান্য অধিকারের নিশ্চয়তা ছিলো না তখন চুক্তির দ্বারা তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটায়। মানুষ এ শক্তির কাছে জান-মালের নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। বিনিময়ে শক্তির প্রতি তারা আনুগত্য প্রদর্শন করবে। হবসের সময় থেকে লক ও রুশো পর্যন্ত চুক্তিবাদের যে ধারা তাতে স্পষ্টতই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদীরূপ এবং শক্তিভিত্তিক রাজনীতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এ রাষ্ট্র পুঁজিবাদী ধারার প্রতিনিধিত্বকারী। রাষ্ট্র এখানে সবকিছুকে বিনিময় মূল্যে দেখতে চায়। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে রাষ্ট্র দাবি করে শর্তহীন আনুগত্য ও বাধ্যবাধকতাবোধ।

হবসের চুক্তিতত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর এ চুক্তিটি একপাক্ষিক। চুক্তিটি সম্পাদিত হয় জনগণের পরস্পরের মধ্যে। রাজার সাথে প্রজার নয়, জনগণের সাথে জনগণের অর্থাৎ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের চুক্তি। জনগণের পরস্পরের সাথে সম্পাদিত এ চুক্তিতে সার্বভৌম শক্তি হলো তৃতীয় পক্ষ। সার্বভৌম শক্তি সমস্ত ক্ষমতার মালিক। জনগণ চুক্তির মাধ্যমে সার্বভৌমের কাছে চূড়ান্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে।

প্রকৃতির রাজ্যের যুদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তির মধ্যেকার ভীতি ও হতাশা থেকে উত্তরণ, নিরাপত্তার, প্রত্যাশা, উন্নত জীবন ও শান্তির অন্বেষণের লক্ষ্যে মানুষ সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করে। ব্যক্তির যুক্তিবাদিতা তাকে শান্তির অন্বেষণে চুক্তিবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করে এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তারা চুক্তিবদ্ধ থাকতে চায়। লক্ষণীয় হলো প্রকৃতির রাজ্যের একক ব্যক্তি (বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি) 'কমনওয়েলথ'– এর মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। এর মাধ্যমে (বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি) গোষ্ঠীজীবনে প্রবৃত্ত হয়। ব্যক্তির সামাজিক প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এসকল বিষয় সামাজিক চুক্তির ভিত্তি যা ব্যক্তিকে রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক সমাজ গঠনে অনুপ্রাণিত করে, ঐক্যবদ্ধ করে।

সামাজিক চুক্তি প্রকৃতির রাজ্যের প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা থেকে রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তির উত্তরণ ঘটায়। এ চুক্তি রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান ঘটায়, যা শান্তি ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে জনসাধারণকে পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে। হবসীয় চুক্তির ভিত্তি শক্তি বা কর্তৃত্ব। ব্যক্তির সমর্পণকৃত অধিকার এ শক্তির বিকাশ ঘটায়। জনসম্মতিতে এ শক্তি বিকশিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের যে গতিপ্রকৃতি তাতে দেখা যায় গোড়ার দিকে সব রাষ্ট্রই কমবেশি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী এবং কর্তৃত্ববাদী চরিত্রের অধিকারী। বুর্জোয়া সমাজ, বিপ্লব ও পুঁজিবাদী দ্বান্দ্বিকতা, ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্র বড়, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তির সত্তার ওপর সার্বভৌমের সীমা নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়সমূহ নতুনভাবে ধরা পড়েছে হবসীয় চিন্তায়।

হবসের রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্লেষণে আমরা দেখি রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির ফলে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান। এটির সৃষ্টি ও সমাপ্তি আছে। গতির নিয়মে তিনি রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে রয়েছে দ্বান্দ্বিকতা: নয়-প্রতিনয়-সমন্বয় [নয়-জনগণ; প্রতিনয়-জনগণ কর্তৃক বিরোধিতা, অযৌক্তিক আচরণ; সমন্বয়– একটি তৃতীয় শক্তির কাছে জনগণের আত্মসমর্পণ]। দ্বান্দ্বিক পরিবেশে রাষ্ট্র প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে এগিয়ে চলে একটি যন্ত্রের মতো। যন্ত্রবৎ এই প্রতিষ্ঠান একটি কৃত্রিম সংস্থা বলেই এর সমাপ্তি আছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সূত্রপাত সাধারণ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য। পরবর্তীতে এ যন্ত্র হয়ে ওঠে শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার, বুর্জোয়া সমাজের, পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি। রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে ওঠে ক্ষমতার প্রতীক এবং শাসিত বা নাগরিকের ওপর বলপ্রয়োগের অস্ত্র।

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। প্রচলিত এ ধারণার বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় হবসের চিন্তায়। মানুষ মূলত আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক, নিজের ভালো নিশ্চিত করতে গিয়ে ব্যক্তি বাধ্য হয় অপরের স্বার্থের প্রতি মনোনিবেশ করতে। হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় আমরা দেখি প্রাকৃতিক আইনের সীমাবদ্ধতা পরবর্তীতে সামাজিক চুক্তিতে রূপ নেয় এবং গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বার্থপর জনতাকে বাধ্যতামূলক আইনের অধীনে আনে। এ প্রসঙ্গে মার্কসকে স্মরণ করা যায়– 'আরো আগেকার কথা না বললেও আধুনিককালের ম্যকিয়াভেলি, হবস, স্পিনোজা, বদেন ও অন্যান্য মনীষী থেকে শুরু করে সবাই শক্তিকে ধরেছেন আইনের ভিত্তি বলে'।[৫]

হবসের রাষ্ট্রতত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ক্ষমতা। যে ক্ষমতা রেঁনেসা পরবর্তী সময়ে জাতিরাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি। এ ক্ষমতা টিকে থাকে কর্তৃত্ববাদী জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে। 'সবার সঙ্গে সবার সংগ্রাম' হবসের এ চিন্তার স্পষ্ট প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে। তাই দেশে-দেশে, কালে-কালে গণতান্ত্রিক বা অগণতান্ত্রিক প্রতিটি দেশেই ব্যক্তিক পরিমণ্ডল থেকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল– সর্বত্র মানুষ স্বীয় স্বার্থের ভিত্তি মজবুতে ব্যস্ত। রাষ্ট্রের সর্বাত্মকবাদী ভূমিকাটি সর্বত্র জোরালো। বর্তমান বিশ্বে শক্তিই রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। তাই প্রচণ্ড আধিপত্যবাদী আগ্রাসন তথা মানসিকতা স্পষ্ট। রাষ্ট্রের এধরণের একচ্ছত্র ক্ষমতায়নের রূপরেখা কয়েকশত বছর পূর্বে *লেভিয়াথান* গ্রন্থে হবস বিবৃত করেছেন, যখন তিনি রাষ্ট্রের শাসক বা কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার উর্দ্ধে রেখেছেন এবং রাষ্ট্রের কাছে বলপ্রয়োগশক্তি সার্বভৌম ক্ষমতারূপে প্রত্যর্পণ করেছেন।

হবসের সামাজিক চুক্তি প্রাক-সামাজিক এবং প্রাক-রাজনৈতিক মানুষকে একটি রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সমাজ হলো রাষ্ট্র। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ সকলের সম্মিলিত ইচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়। হবস চুক্তি বলতে বোঝান 'অধিকারের পারস্পরিক হস্তান্তর'।[৬] চুক্তির দ্বারা প্রাক-রাজনৈতিক জনগণ একটি তৃতীয় পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের অধিকাংশ অধিকার (জীবন নেওয়ার/হরণের অধিকার ব্যতীত) ত্যাগ করে। যে তৃতীয় শক্তির কাছে তারা ক্ষমতা সমর্পণ করে এই তৃতীয় পক্ষ একক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগোষ্ঠী উভয়ই হতে পারে। চুক্তির বিনিময়ে জনগণ প্রত্যাশা করে সামাজিক, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা যা তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা প্রদানে সমর্থ হবে।

সামাজিক চুক্তি দ্বারা জনগণ যে তৃতীয় পক্ষের উদ্ভব ঘটায় তা মূলত সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম শক্তি জনগণকে দিবে নিরাপত্তা, বিনিময়ে পাবে আনুগত্য। সামাজিক চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জনগণ তাদের অবাধ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করে নিয়ন্ত্রিত জীবনে প্রবেশ করে। শৃঙ্খলাপূর্ণ নিয়ন্ত্রিত জীবনই হলো হবসের মতে আইনের রাজ্য (*Lex Naturalis*)।[৭] চুক্তি সম্পাদন দ্বারা ব্যক্তি অবাধ স্বাধীনতা ছেড়ে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতায় (যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) পদার্পণ করে। আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজ্যকে হবস 'আইনের রাজ্য' বলেছেন; রাজনৈতিক পরিভাষায় এক বলা হলো 'কমনওয়েলথ', হবস যাকে বলেছেন 'লেভিয়াথান'।[৮] লেভিয়াথানের দায়িত্ব হলো শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রদান করা। এভাবেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। লেভিয়াথান জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। এটি কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। তাই হবস লেভিয়াথানকে বলেছেন 'মরণশীল ঈশ্বর' (Mortal God) যা অমরণশীল ঈশ্বরের (Immortal God) কাছেই কেবল জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ।[৯]

রাষ্ট্র মানুষের সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। রাষ্ট্র হলো তৃতীয় শক্তি– হবসের ভাষায় 'সাধারণ ক্ষমতা' (Common Power)।[১০] 'সাধারণ ক্ষমতা' ব্যক্তির জীবনকে নিরাপদ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ করে তোলে। জনগণ এধরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করে তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারা, যা তারা সমর্পণ করে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে মেনে নিয়ে এ ক্ষমতার প্রতি জনগণ শর্তহীন আনুগত্য প্রদর্শন করার মাধ্যমে গড়ে তোলে সাধারণ ক্ষমতা। হবস সামাজিক চুক্তির ভাষ্যে একে কেবলমাত্র একটি চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি। তার কাছে এটি চুক্তির চেয়ে বেশি কিছু, এই অর্থে যে এটি মানুষের মধ্যে সংঘটিত একটি সত্যিকারের ঐক্য, যে ঐক্য তাদের চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করেছে, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরকে বলতে পারে। "আমি আমার নিজেকে পরিচালনার অধিকার এবং কর্তৃত্ব সমর্পণ করছি এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর কাছে, এমতাবস্থায় তুমিও তোমার পরিচালনার সকল অধিকার এবং কর্তৃত্বমুলক কর্মকাণ্ড এভাবে (আমার মতো) ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ কর।"[১১]

সকল মানুষের ইচ্ছার সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ হলো কমনওয়েলথ। ল্যাটিন ভাষায় কমনওয়েলথকে বলা হয়েছে Civitas। যেহেতু কমনওয়েলথ সম্মিলিত ইচ্ছার প্রকাশ তাই এর মাধ্যমে মানুষ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন দেখতে চায়। এভাবে হবস যুক্তির সাহায্যে চরম রাজতন্ত্রকে বৈধতা প্রদান করেছেন। চরম রাজতন্ত্রকে বৈধতা দানের জন্য তিনি রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করেন।[১২] হবসীয় সামাজিক চুক্তিতে জনগণের ক্ষমতা সংকুচিত হয়েছে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ভীষণভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ ত্যাগ করে, শাসন এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা কমনওয়েলথের কাছে হস্তান্তর করে রাষ্ট্রকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে।[১৩]

চুক্তিবাদের মূল বিষয় হলো সম্মতি, যার সাহায্যে অধিকার সৃষ্টি হয়। রাসেল হারডিন মনে করেন হবস সরকার সম্পর্কে উপযোগবাদী এবং চুক্তিবাদী উভয় মতকে সঙ্গতিপূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্রদর্শনে উপযোগবাদী মূল্যায়ন হলো, যে সরকার-ব্যবস্থা জনগণের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করতে পারবে তা ভালো। যেমন, যা আমাদের সুখ দেয় আমরা সেটার প্রতি সম্মতি জানাই। অন্যভাবে বলা যায়, যা আমাদের জন্য সর্বোচ্চ সুখ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে তার প্রতি আমরা সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে হবস এ দুটি ধারাকে কার্যকরীভাবেই সংযুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি সার্বিক আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ (Universal egoism)–এর প্রসঙ্গ আনেন। ব্যক্তিগত পরিসরে যা কল্যাণবাদ; শক্তিশালী সরকার দ্বারা এই কল্যাণবাদ হয়ে উঠতে পারে সার্বিক কল্যাণের উৎস এবং এক্ষেত্রে তা ব্যক্তিগত স্বার্থবাদ নয়, সার্বজনীন স্বার্থবাদ বা স্বার্থচিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে।[১৪]

যদিও হবস কিছু বিমূর্ত অর্থে রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্রের (Political absolutism) প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যাশা তুলে ধরেছেন, তবে এর অসম্ভাব্যতা হবসের যুক্তির সফলতাকে ম্লান করে দেয়। লয়েড মনে করেন সার্বভৌম তথা রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্র প্রত্যাশিত এবং প্রয়োজনীয়। একে যৌক্তিক ভিত্তি প্রদানের লক্ষ্যে হবস শর্তহীন আনুগত্যের দাবি তুলেছিলেন। যেহেতু মানুষ স্বেচ্ছায় চুক্তির ফলে এই কর্তৃপক্ষ এনেছে এবং এটির প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে। তবে কারো কারো মতে হবস তার নিরঙ্কুশতন্ত্রের প্রয়োজনয়ীতা ও প্রত্যাশার বিষয়ে যথাযথ যুক্তি প্রদানে সক্ষম হননি। আবার, হবসীয় মানবচরিত্রের যে বিশ্লেষণ তাতে কোনো নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য ব্যতীত তাদের জন্য অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা যথার্থ নয়। কারণ এটা সত্য যে অনপেক্ষ বা চরম রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি সমর্পণই হবসীয় মানবচরিত্রের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সক্ষম। এ মানবচরিত্র বশ্যতা স্বীকারে যথেষ্ট নমনীয় নয়।[১৫]

কমনওয়েলথের সৃষ্টির পেছনে হবস দুটি বিষয় নির্দেশ করেছেন। প্রথমত, মানুষের শান্তিময় জীবনের উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। শান্তিময় জীবনের জন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক আইনের অনুশাসন অনুসরণ। প্রাকৃতিক আইনের প্রথম অনুশাসনে মানুষ শান্তি অন্বেষণ করে এবং অশান্তি পরিত্যাগ করতে চায়।

দ্বিতীয়ত, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভীতি দূরীরকণের জন্য কোনো পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। পদ্ধতিটি হলো সার্বভৌমের কাছে প্রাকৃতিক আইন এবং প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ সমর্পণ।[১৬] এতে করে জনগণের একাধিক ইচ্ছা একটি ইচ্ছায় পরিণত হয়– তা হলো স্বাধীনতার নিশ্চয়তা। জানমালের নিরাপত্তা প্রাপ্তি। এটি অনেকের মধ্যে একটি সত্যিকারের ঐক্য এবং তাদের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তি যার দ্বারা তারা একটি তৃতীয় পক্ষের উদ্ভব ঘটায়। এই তৃতীয় পক্ষ চুক্তির অংশ নয়, চুক্তিকারী সকল ব্যক্তি যারা চুক্তির অংশ তারা তাদের ক্ষমতা, অধিকার এর কাছে সমর্পণ করে। এই তৃতীয় পক্ষই, কমনওয়েলথ যা ব্যক্তির অধিকার বা ক্ষমতার সম্মিলিত রূপ। সম্মিলিত রূপে তা তৈরি হয় একক ব্যক্তিতে। এই ব্যক্তি বা কমনওয়েলথ তাদের রক্ষাকারী; যার কাছে তাদের অধিকার অর্পিত হয়েছে এবং যা তাদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে।

হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রকৃতপক্ষে তাঁর আনুগত্য তত্ত্বের প্রকাশ (theory of obligation)।[১৭] তাঁর এ চুক্তিমতবাদটি পুরোপুরি বাধ্যবাধকতামূলক। আবার এটিও লক্ষণীয় যে এ আনুগত্য জনগণের কাছে থেকে যখন আশা করা হয় তাহলে জনগণ পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার এ প্রক্রিয়াটিতে দুটি পক্ষ পরস্পরের সাথে যুক্ত। একপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই জনগণ, যারা আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য। আর অপর পক্ষটি যদিও চুক্তির অংশ নয় কিন্তু চুক্তি থেকে উদ্ভূত– তা হলো সার্বভৌম। ভবিষ্যতের জন্য এ দুটি পক্ষ পরস্পর এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং এ সময়ের মধ্যে তারা পরস্পরের আস্থাশীল হয়ে উঠবে। হবসীয় চুক্তিবাদ দল বা দলসমূহের ওপর এক প্রকার প্রাথমিক বাধ্যতাবোধ আরোপ করে; কারণ মূল চুক্তিটি উৎসরিত হয়েছে ভয় থেকে কিংবা কিছু অধিকতর সমর্থনযোগ্য উদ্দেশ্য থেকে। তাই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী তাদের শপথ রক্ষাকে বাধ্যবাধকতা বা দায়িত্ব মনে করেন।[১৮]

হবসীয় চুক্তিবাদ উৎসরিত হয়েছে ভয়-ভীতি থেকে যা প্রচলিত অর্থে অপ্রত্যাশিত হলেও হবসের সামাজিক চুক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই অর্থে যে, চুক্তিটিতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। বর্তমান মৃত্যুঝুঁকি এড়ানোর জন্য হবস একটি বিষয় সুস্পষ্ট করেছেন, যে সকল চুক্তি বৈধ তা মান্য করা বাধ্যতামূলক, অন্যসব নয়। যে-সকল চুক্তি অবৈধ (ab initio) তাদের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতার বা আনুগত্য প্রদর্শনের কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। যেমন, সিভিল আইনের বিরোধী কোনো চুক্তি যদি সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে তা আনুগত্য দাবি করতে পারবে না। এছাড়াও যেসব কারণে চুক্তি অবৈধ হতে পারে সেগুলো হলো– ব্যক্তির পক্ষে সম্পাদন করা অসম্ভব এমন কোনো চুক্তি, যে চুক্তি ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার হরণ করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, যে চুক্তিতে অপরপক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেনি, চুক্তির অধীন ব্যক্তি জানে না কখন আনুগত্য প্রকাশ করবে।[১৯]

সংক্ষেপে বলা যায় একটি চুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ যতক্ষণ চুক্তিটি প্রণীত হয়, আইন দ্বারা অনুমোদিত হয় এবং উভয় পক্ষ চুক্তিটিকে গ্রহণ করে। ব্যক্তির পক্ষে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ব্যক্তি তার অধিকার ত্যাগ বা অস্বীকার করতে পারে না, যদি করে তবে চুক্তি অবৈধ হবে।[২০] জর্জ ক্লোসকো রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিরূপে ন্যায়পরায়ণতার নীতি (Principle of fairness) কে গ্রহণ করেন। ক্লোসকো মনে করেন জনগণ রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগ করতে চাইলে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য, তাই সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জনগণের রাষ্ট্র প্রয়োজন।[২১]

আমেরিকান-কানাডীয় দার্শনিক ডেভিড গথিয়ার চুক্তিতত্ত্বকে প্রাথমিকভাবে নৈতিকতা মূল্যায়নে ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি তিনি চুক্তিতত্ত্বকে ব্যবহার করেছেন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং সম্পত্তির অধিকারের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে। জনগণ প্রকৃতপক্ষে সামাজিক চুক্তিতে সম্মত কিনা (অথবা তারা একটি আদর্শমণ্ডিত পরিস্থিতিতে বিদ্যমান কিনা) সে বিষয়ে গথিয়ার বিশেষ আগ্রহী নন। কিন্তু তার তত্ত্বটি এই অর্থে চুক্তিবাদী যে, রাষ্ট্র একটি নৈতিক ব্যবস্থা, এবং/অথবা সম্পত্তির অধিকারকেন্দ্রিক সরকার পর্যাপ্তভাবে ব্যক্তির সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে যাতে ব্যক্তি সম্মত হয়। এ থেকে বলা যায়, গথিয়ারের চুক্তির শর্তাবলীসমূহ প্রাকল্পিক, যদিও যে–সকল শর্তাবলী চুক্তিকে অনুপ্রাণিত করে সেসব অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং যে শর্তটি চুক্তিকে অনুপ্রাণিত করে ধরে নেওয়া যায় তা লকীয় শর্তের পূরণ।[২২]

লকের *সেকেন্ড ট্রিটিজ*

লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্য ছিলো প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা। রাজনৈতিক জীবনাচরণ ও কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি প্রকৃতির রাজ্যে না থাকলেও সামাজিক জীবনব্যবস্থা বহাল ছিলো। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিলো। লক প্রাকৃতিক আইনের সাথে রাজনৈতিক আইনের কোনো বিরোধিতাপূর্ণ সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন না। প্রাকৃতিক আইন সম্পর্কে ব্যক্তির মাঝে অভিন্ন উপলব্ধি না থাকায়, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার মতো উপযুক্ত বিচারক না থাকায়, প্রাকৃতিক আইন থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ রাজনৈতিক আইনের প্রয়োজন বোধ করে এবং সামাজিক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। মানুষ চুক্তির দ্বারা একটি অপ্রত্যাশিত/অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে এবং লক মনে করেন এটিই রাজনৈতিক আনুগত্যের ক্ষেত্র তৈরি করে। *Second Treatise* গ্রন্থে সামাজিক চুক্তির আলোচনা থেকে বলা যায় লক প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা, বিশেষত সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সৃষ্টি করেছেন।

লক সামাজিক চুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক সমাজের কাছে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করেননি। প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে জনগণ নির্দিষ্ট শাসনব্যবস্থার অধীনে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে। রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলে। ব্যক্তি এ সমাজে সম্মতি দেয় এবং চুক্তিবদ্ধ হয়। নিজের প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তি রাষ্ট্রকে এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর। অন্যথায় ব্যক্তির জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতার মতো প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ সুরক্ষিত হয় না। বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে লক রাজনৈতিক সমাজের উত্থান ঘটান ব্যক্তির অর্জিত অর্থ-সম্পদের সুরক্ষার বিবেচনায়। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের সম্পত্তি ছিলো, কিন্তু সুরক্ষিত ছিলো না বলেই প্রয়োজন পড়ে সামাজিক চুক্তি ও রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের। লকীয় সামাজিক চুক্তির ফলে জনগণের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হ্রাস পায়নি; রাজনৈতিক কর্তৃত্ব জনগণ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী নয়। রাষ্ট্র চুক্তির ফলে সৃষ্টি এবং জনগণই রাষ্ট্রের স্রষ্টা। তাই জনগণ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী।

হবসের আলোচনায় আমরা দেখেছি সামাজিক চুক্তি দ্বারা জনগণ প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করে। লকীয় চুক্তিবাদে জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক সরকার সৃষ্টি করে বটে কিন্তু এ সরকার বা কর্তৃত্বকে লক সর্বেসর্বা

করেননি। লকীয় চুক্তিতে মানুষ রাজনৈতিক সমাজ তথা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে তার প্রাকৃতিক অধিকার হস্তান্তর করেনি। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ যা হস্তান্তর করেছে তাহলো শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা। লকের সামাজিক চুক্তিতে জনগণের হাতে অধিকাংশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে (যা হবসীয় চুক্তিবাদে দেয়া হয়নি)। লকীয় জনগণ চুক্তির প্রতি কেবল অকুণ্ঠ সমর্থন, আনুগত্য জানাবে তা নয়, চুক্তি হলো পারস্পরিক।

লকীয় সামাজিক চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হলো, প্রকৃতির রাজ্যের সকল জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এমনটা লক দাবি করেন না। তিনি মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যের 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' জনগণের চুক্তিতে সম্মতি ছিলো। সংখ্যাগরিষ্ঠ শব্দটি লকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে চুক্তির বিষয়ে সকল মানুষ কখনই একমত হবে না। তাঁর মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্পই রাজনৈতিক সমাজে প্রতিপালিত হবে।[২৩] লকের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণই গুরত্বপূর্ণ। এ সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির প্রতিনিধি হলো আধুনিক সমাজের পুঁজিবাদী শ্রেণি। এ শ্রেণির স্বার্থসংরক্ষণে তিনি উদারতাবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষাবলম্বন করে তিনি গণতান্ত্রিক ভাবধারা গ্রহণ করেছেন। ক্ষমতাসীন শ্রেণি তথা বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণে লকের মতো হবসও ভূমিকা রেখেছেন।

হবস ও লক উভয়ের চুক্তিবাদে সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্র চুক্তির ফল এবং চুক্তি জনসম্মতিতে সম্পাদিত হয়েছে। হবসের চুক্তিবাদে জনগণের কাছে বিশেষ কোনো ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু লকের চুক্তিবাদে জনগণ তাদের মর্জি মতো কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একবার রাষ্ট্র গড়ে উঠলে, সার্বভৌম শক্তির উত্থান ঘটলে হবসের চুক্তিবাদে জনগণের সম্মতি পূর্বের মতো মূল্যবান থাকে না। পক্ষান্তরে, লকের চুক্তিবাদে রাজনৈতিক সমাজে জনগণের সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ থাকে। তিনি মনে করেন সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার গোড়াপত্তন হয়। সাধারণ জনগণের মাধ্যমে সৃষ্ট বিশেষ ক্ষমতা বা রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতে তিনি বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন। এই বলপ্রয়োগকারী শক্তির সাহায্যে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অপরাধীর দণ্ডবিধান এমনকি প্রাণদণ্ড দানের ক্ষমতা রাখে এবং বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করতে পারবে।[২৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লক প্রাণদণ্ডের যে বিধান দিয়েছেন তা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। লকের ভাষায়-"একমাত্র জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের জন্য ন্যূনতম শাস্তিসহ মৃত্যুদণ্ড প্রদানের আইন প্রনয়ন ক্ষমতাস্বরূপ আইন কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সমষ্টির বলপ্রয়োগ এবং বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য যে ক্ষমতা তাকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা (Political power) বলে।"[২৫]

চুক্তিবাদীদের কাছে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক শক্তি যার কাছে রয়েছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, এবং আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা। চুক্তিবাদীদের এ মতের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবারের মতের। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র হলো বৈধ সহিংসতার একক ক্ষমতা ধারণকারী। যেকোনো রাষ্ট্রেই তাই বলপ্রয়োগকারী শক্তি, নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিভাত হয়। এ কাজটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজটি সম্পন্ন করে, পরোক্ষাভাবে আত্মরক্ষার নামে ব্যক্তি কাজটি সম্পাদন করে। ভেবার রাষ্ট্রের বৈধ সহিংসতা (legitimate violence) কে স্বীকার করেছেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র তার সদস্যদের সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি সচরাচর এটি গ্রহণ করে না বা হাতে তুলে নেয় না। ভেবার রাষ্ট্রকে উল্লেখ করেন 'monopoly on violence' এর বৈধ কর্তৃপক্ষ রূপে।[২৬] যদিও ভেবারের এ আলোচনাটি অত্যন্ত রূঢ় তবু এটি নিরেট সত্যি। রাষ্ট্রের এধরণের আচরণকে গ্রহণ করার মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্রকে বৈধতা দিয়েছে।

ভেবারের এ বক্তব্য থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে রাষ্ট্রের বৈধ সহিংসতা আইন কর্তৃক স্বীকৃত। ব্যক্তি আইনের ভয়ে ভীত হয়ে অন্যায় বা বেআইনী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে চায়। হত্যা করা পাপ শুধু

এই কারণে ব্যক্তি অপরকে হত্যা করা থেকে বিরত হয়না, আইনের ভয়ে অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে ব্যক্তি এ কাজকে অপরাধ মনে করে এ কাজ থেকে বিরত হয়। এটা হলো আইনগত দিক। আর পাপ বা অন্যায়বোধের কারণে বিরত হওয়ার বিষয়টি নৈতিকতার সাথে যুক্ত। বিষয়টি আমরা আরো সহজভাবে বুঝতে পারি নৈতিক অনুশাসনের প্রতি যদি মানুষ শ্রদ্ধাশীল হয়। যদি মনে করে হত্যা একটি গুরুতর পাপ তাহলে মানুষ নির্বিচারে পশু-পাখি হত্যা করত না। ব্যক্তির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে, তাই নৈতিকতা অপেক্ষা আইন এক্ষেত্রে অধিক ভয় উদ্রেককারী। আরো বলা যায়, রাস্তায় সিগন্যাল অমান্য করা– শাস্তির মাত্রা অপেক্ষাকৃত লঘু বলেই জনগণ এ নিয়মকে অগ্রাহ্য করতে চায়। যদিও রাষ্ট্র সুনাগরিকের সংজ্ঞায় আইন মান্য করাকে একজন আদর্শ বা সুনাগরিকের গুণাবলি মনে করে। রাষ্ট্র নিজেই বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ আইনের শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দণ্ডাদেশ মওকুফের ক্ষমতা বা নাবালকের হত্যার শাস্তি ফাঁসি মওকুফ)। কাজেই আইন সর্বক্ষেত্রে সমরূপ আচরণ করে না।

এটা স্পষ্ট যে, প্রকৃতির রাজ্যে অর্থাৎ প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থায় (প্রাক-সামাজিক নয়) জনগণ সভ্য জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলো। কাজেই সভ্য জীবনের অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার অন্বেষণে লকীয় জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়নি। সম্পত্তির সুরক্ষার প্রয়োজনেই প্রাক-রাজনৈতিক জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। লকের কাছে এ কারণে জনগণের চুক্তিবদ্ধ হওয়াটা একটি মহান বিষয় এবং রাষ্ট্র সৃষ্টি ও সরকার গঠনের পেছনে এটিই জনগণের প্রধান উদ্দেশ্য।[২৭]

প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ ছিলো 'মুক্ত, স্বাধীন এবং সমান'। ব্যক্তি নিজের জীবন ও সম্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতাভোগী। প্রত্যেকে সমান, কেউ কারো অধীনস্থ নয়; প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে সকলেই সচেতন এবং পরস্পরের প্রতি প্রত্যেকে শ্রদ্ধাশীল ছিলো। এধরণের একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতিতে জনগণের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পেছনে লক তিনটি কারণের উল্লেখ করেছেন–[২৮]

ক) আইনের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব;
খ) আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য যথার্থ বিচারক বা ব্যাখ্যাকারীর অভাব;
গ) আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার অভাব।

প্রথমত, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিলো, কিন্তু আইন সম্বন্ধে মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো না। ফলে একের অধিকার কতিপয় ক্ষেত্রে অপরের অযাচিত হস্তক্ষেপে ক্ষুন্ন হতো। যে সকল প্রাকৃতিক অধিকার ক্ষুন্ন হতো তাতে উল্লেখযোগ্য ছিলো সম্পত্তির অধিকার। অযাচিত হস্তক্ষেপ ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারকে বিঘ্নিত করতো।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী ছিল না। সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী বলতে লক নিরপেক্ষ বিচারককে নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ যার যার মতো করে স্ব স্ব ইচ্ছামতো প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করায় বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কারণ প্রত্যেকে স্বীয়স্বার্থ রক্ষার্থে আইনের ব্যাখ্যা দেয়।

তৃতীয়ত, প্রকৃতির রাজ্য ছিলো একটি প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা। এখানে প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকর করার মতো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রশ্ন আসে, প্রকৃতির রাজ্যের যুক্তিবাদী, প্রজ্ঞাবান জনসাধারণ কেন অপরের সম্পত্তিতে অযাচিত হস্তক্ষেপ করবে, যেখানে লক মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যের সাধারণ মানুষ আইন সম্বন্ধে অবগত ছিল।

লকের চুক্তিবাদে চুক্তির দুটি অংশ। এক পক্ষের চুক্তি: যা সম্পাদিত হয়েছে জনগণের সাথে জনগণের। এ চুক্তি সম্পাদন দ্বারা তারা সৃষ্টি করে রাজনৈতিক সমাজ তথা সরকারব্যবস্থা।

দ্বিতীয় পক্ষের চুক্তি: এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে জনগণের সাথে সরকারের, যে সরকারব্যবস্থা প্রথম পক্ষের চুক্তির ফসল। চুক্তির দ্বিতীয় অংশের কাছে অর্থাৎ সরকারের কাছে জনগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। প্রাকৃতিক অধিকারকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে তারা প্রাকৃতিক আইনের যথার্থ ব্যবহার অনুমোদন করে রাজনৈতিক সমাজের মাধ্যমে। প্রাকৃতিক আইন কার্যকর করার অধিকার অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা লকীয় জনগণ সম্মতির দ্বারা সরকারের কাছে সমর্পণ করে, কিন্তু অন্য কোনো অধিকার সমর্পণ করেনি। তাই অধিকার সর্বান্তকরণে সমর্পণের প্রশ্ন নেই। কারণ প্রাকৃতিক আইনের অন্যতম শর্ত হলো জনগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকার হস্তান্তর করতে পারবে না। যে সকল প্রাকৃতিক অধিকার জনগণ হস্তান্তর করে সেগুলোর দ্বারা লকীয় জনগণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করে। কোনো একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর কাছে নয়, বরং সমগ্র সমাজের কাছে সম্মতির ভিত্তিতে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ ক্ষমতা হস্তান্তর করে গড়ে তোলে সরকারব্যবস্থা। আর এ কারণে লকের সরকারব্যবস্থাকে সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার (Government by consent) বলা হয়।

লক প্রবর্তিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির বিষয়টি রাষ্ট্রদর্শনে গুরত্ববহ। তাঁর এ চিন্তার সাথে গণতান্ত্রিক ভাবধারার সরাসরি সংযোগ রয়েছে ধরে নেয়া যায়। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের প্রতি লক গুরুত্ব দিয়েছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতদ্বৈততা তৈরি হলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মত মূল্যায়িত না হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। তাছাড়া ‘সকলে সমান ক্ষমতাবান ও স্বাধীন এবং ব্যক্তির উপভোগকৃত প্রাকৃতিক অধিকার অলঙ্ঘনীয়’, লকের এ নীতি গ্রহণ করতে গেলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মত সমান গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের মত যদি বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অধিকারের অলঙ্ঘ্যতা প্রমাণিত হয় না।

অবশ্য এর উত্তর লকের কাছে পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে চুক্তিবদ্ধ জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মান্য করার বাধ্যতাবোধ চুক্তির অংশে রয়েছে। জনগণ পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে এ চুক্তি মান্য করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নেওয়ার এ বাধ্যতাবোধ ব্যক্তিকে প্রকৃতির রাজ্য থেকে আলাদা করে বন্ধনমুক্ত করে।

লকের রাষ্ট্রদর্শনে আমরা দুই ধরণের সম্মতির ধারণা পাই– প্রকাশ্য সম্মতি এবং মৌন সম্মতি (Express Consent ও Tacit Consent)। ব্যক্তির রাজনৈতিক মত প্রকাশের বিষয়, সরকার গঠন, ভোট দানের বিষয়সমূহ ব্যক্তির প্রকাশ্য সম্মতির অংশ। আর মৌন সম্মতি হলো সেই সম্মতি যার দ্বারা ব্যক্তি সরকারের আইন মেনে কোনো বস্তু ভোগ বা দখল করে।[২৯] কাজেই বলা যায় লকের চুক্তিবাদে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসম্মতির ওপর। জনসম্মতি রাষ্ট্রের জন্য জনসমর্থনের কাজ করে এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বৈধতা প্রদান করে।[৩০]

প্রকাশ্য সম্মতি বলতে লক রাষ্ট্রের প্রতি রাজনৈতিক সম্মতিকে নির্দেশ করেছেন। যা একবার প্রদান করা হলে নিরন্তর চলতে থাকে এবং জনগণ অনিবার্যভাবে তার প্রতি বাধ্যতা পোষণ করে। এভাবে যে রাজনৈতিক সমাজ গঠিত হয় তা থেকে ব্যক্তি পুনরায় প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদান করতে না পারলে ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে সেই সম্মতি প্রত্যাহার করতে পারে।[৩১] মৌন সম্মতি বলতে সম্ভবত লক সম্পত্তি, ভূমি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে উপভোগের স্বাধীনতা এবং এ স্বাধীনতা উপভোগে সরকারের সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনকে নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তি যখন ভূসম্পত্তির মালিকানা দাবি করে তাহলে সে সম্পত্তি নিশ্চয়ই কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং সে সীমানায় কোনো সরকারও থাকেন।[৩২] প্রকাশ্য সম্মতি দ্বারা মানুষ সমাজের যথার্থ সদস্য হয়ে ওঠে; আর মৌন সম্মতি যেহেতু প্রকাশিত নয়, তাই ব্যক্তির সম্মতির সীমা কতদূর এবং সরকারের কাছে কতদূর সে এ চুক্তি

দ্বারা নিজেকে সমর্পণ করেছে তা স্পষ্ট নয়। জনগণ রাষ্ট্রের কাছ থেকে পরিপূর্ণ সুরক্ষা প্রাপ্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি মৌন সম্মতি প্রকাশ করে। যদিও লক মনে করেন প্রকাশ্য সম্মতিই কেবল একজন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক সমাজের পূর্ণ সদস্যে পরিণত করে; তবে এটাও সত্যি যে মৌন সম্মতি রাজনৈতিক আনুগত্য সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা এবং অন্যান্য সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি রাষ্ট্রের প্রতি মৌন সমর্থন বজায় রাখে। এধরণের মৌন সম্মতির স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় লকের চুক্তিতত্ত্বে।

লক সম্মতির ভিত্তিতে যে সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাতে সকল প্রজন্মের সম্মতির বিষয়টিকে তিনি দাবী করেছেন। তাই এক প্রজন্মের সম্মতিতে সম্পাদিত চুক্তি কিংবা সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চুক্তি পরবর্তী প্রজন্ম অনায়াসে গ্রহণ করে নেবে এমনটা লক মোটেই মনে করেন না। বরং তিনি মনে করেন ব্যক্তি তার নিজের জন্য যে চুক্তি করে, যে-সকল বিষয়ে সম্মতি জানায়, সে-সকল বিষয় ব্যক্তি মানতে বাধ্য কিন্তু কোনো চুক্তির দ্বারা ঐ ব্যক্তি তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সে চুক্তি মানতে বাধ্য করতে পারবে না। শিশুর বয়োপ্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তি স্বীয় বিবেচনাশক্তি দ্বারা তার পছন্দসই সরকারব্যবস্থা নির্বাচন করবে। উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো সরকারব্যবস্থা দ্বারা নয়। শিশু সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর সে ঠিক করবে কোন রাষ্ট্রের প্রতি সে আনুগত্য প্রদর্শন করবে। কোনো শিশু যখন বেড়ে উঠবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়োপ্রাপ্তির পর যদিও কোনো রাষ্ট্রে বসবাসের ফলে ব্যক্তির প্রাথমিকভাবে রাজনৈতিক সদস্য প্রাপ্তির অবস্থা তৈরি হয় কিন্তু তবুও ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি সরাসরি সম্মতি বা আনুগত্য প্রদর্শন না করলে সে ব্যক্তি উত্তরাধিকার বা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে বলে লক দাবী করেন। সম্মতির এধরণের বহিঃপ্রকাশ দ্বারা লক বোঝাতে চান সম্মতি ব্যক্তির স্বীয় পছন্দ। কেউ অপরের সম্মতি প্রকাশ করতে বা প্রকাশ করাতে অপরকে বাধ্য করতে পারবে না।[৩৩] লক আরো বলেন– যে জনগণ তার স্বাধীন সম্মতি সরকারের প্রতি জ্ঞাপন করেনি এধরণের সরকারের জনগণের কাছ থেকে কোনো আনুগত্য প্রাপ্তির অধিকার নেই। অন্যায়ভাবে কোনো শাসক বা বিজেতার শাসন করার কোনো অধিকার নেই যদি না জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করে। ওয়াল্ডম্যান মৌন সম্মতিকে বলেছেন "non-member consent"। নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মৌন সম্মতির ভূমিকা গৌণ, প্রকাশ্য সম্মতির ভূমিকা মুখ্য– যার দ্বারা যথাযথ বাধ্যতা পাওয়া যায়।[৩৪]

লক তার চুক্তিতত্ত্বে এর কোনো অতীত বাধ্যবাধকতা যেমন স্বীকার করেননি, তেমনি এর কোনো চুক্তির সময়কালীন বাধ্যবাধকতা প্রকাশ করেননি। যেমন লক মনে করেন মানুষ বয়োপ্রাপ্তির মাধ্যমে সরকার নির্বাচন করবে, চুক্তিতে অংশগ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন ইচ্ছার স্বাধীনতাকে তুলে ধরেছেন অন্যদিকে *প্যাট্রিয়ার্কা (Patriarcha)* গ্রন্থে ফিলমার পিতৃতান্ত্রিক শাসনের নামে যে কর্তৃত্ববাদী শাসনকে সমর্থন করেছেন তারও বিরোধিতা করেছেন।

লক মনে করেন প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন। প্রকৃতিগত কোনো শক্তিই ব্যক্তিকে পরাধীনতায় আবদ্ধ করতে পারে না। কেবলমাত্র ব্যক্তির সম্মতিই তাকে কোনো ইহজাগতিক শক্তি বা রাজনৈতিক শক্তি বা সরকারের আইনের অধীনস্থ করে রাখতে পারে। লক-বিশ্লেষক এ. জে. সিমন্স মনে করেন, এটা সত্যি যে লক ব্যক্তিগত সম্মতিকেই রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রধান ভিত্তি মনে করেছেন; তবে তিনি এও বলেন, লকের প্রাথমিক ভুলটি হলো অন্যান্য বিবিধ ক্ষেত্রে, যেমন- সুযোগ উপভোগ, কৃতজ্ঞতার বিবেচনা– এ সকল ক্ষেত্রসমূহে লক তার চুক্তির বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন।[৩৫]

লকের চুক্তির দ্বিতীয় অংশটি যেহেতু সরকারের সাথে জনগণের তাই এটিকে কখনো কখনো সরকারি চুক্তি বলা হয়। চুক্তির দ্বিতীয় অংশটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে জনগণ এক্ষেত্রে সরকার গঠন করে বটে তবে এ সরকারের ভূমিকা হবে রক্ষাকারী বা জিম্মাদারীর (Trustee)। জনগণ রাষ্ট্র নামক একটি ট্রাস্ট (Trust) বা রক্ষাকারী সংস্থা

গঠন করে এবং সরকার সে ট্রাস্ট-এর ট্রাস্টি বা জিম্মাদার। জনগণ তাদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য ট্রাস্ট গঠন করে। ট্রাস্ট চুক্তির উর্দ্ধে নয়। বলা যায় ট্রাস্ট দ্বিতীয় চুক্তির অংশ।

সামাজিক চুক্তির দ্বারা জনগণের সম্মতিতে সরকার জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। হবসীয় চুক্তিবাদের মতো লকীয় চুক্তিবাদে সরকার চুক্তির উর্দ্ধে নয়। সরকারের কাছে গচ্ছিত প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের সুরক্ষা বিধানে সরকার যদি অকৃতকার্য হয় তাহলে জনগণের পক্ষে সে সরকার পরিবর্তন করার আইনসঙ্গত অধিকার রয়েছে। জনগণের চাহিদা পূরণে অর্থাৎ প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হলে জনগণ সরকার পরিবর্তনের অধিকার রাখে, কিন্তু রাষ্ট্র ভেঙ্গে দেয় না কিংবা পরিবর্তনও করে না। কারণ রাষ্ট্র ভেঙ্গে দিলে তারা প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাবে যা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সম্ভব নয়। একবার চুক্তি সম্পাদন করলে তা বাতিল করে প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। লকীয় চুক্তিতে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়, কিন্তু হবসীয় চুক্তিবাদে রাষ্ট্র ও সরকারের ভিন্নতা স্পষ্ট নয়। প্রায় সমঅর্থে রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণাকে হবস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু লকের কাছে রাষ্ট্র ও সরকার ভিন্ন। তাই সার্বভৌম ক্ষমতা হবে রাষ্ট্রের, সরকারের নয়। সরকারের হাতে থাকবে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা। *সেকেন্ড ট্রিটিজ* গ্রন্থে সমাজ ও সরকারকে লক ভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা চুক্তির দ্বিতীয় অংশ সরকারের পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লব সমাজের বিলুপ্তি ঘটায় না।

ঠিক এখানেই হবসের সাথে লকের অমিল। হবস তাঁর সামাজিক চুক্তিতে একচ্ছত্র অনুগত্য প্রদর্শনের বাধ্যতাপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে লক বিপ্লবের অধিকার দিয়েছেন। দিয়েছেন শর্তসাপেক্ষ আনুগত্য। লকের সামাজিক চুক্তিকে তিনি কাল্পনিক মনে করেননি, তিনি এটিকে বাস্তব ঘটনারূপে গ্রহণ করেছেন। কর্তৃপক্ষ কোনো আশ্চর্যজনক ক্ষমতার মালিক নয়, ক্ষমতার মূল চাবিকাঠি জনগণ। প্রত্যেক ব্যক্তি আইন প্রয়োগের ক্ষমতা কোনো একজন শাসকের কাছে হস্তান্তর করে মাত্র, সমর্পণ করে না। বিচারক (legislative) জনগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা উপযুক্ত মনে করেন তা করবেন প্রাকৃতিক আইনের আলোকে। তাহলে আমরা বলতে পারি লকীয় প্রাকৃতিক আইন রাজনৈতিক সমাজেও কার্যকর।[৩৬] ওয়ারেন্ডার মনে করেন, প্রকৃতির রাজ্যের সমস্যা বৈধ চুক্তি নির্মাণের বাধা বা অসুবিধা নয়, বরং সময়ের পরিক্রমায় এ চুক্তির বৈধতা টিকিয়ে রাখা এর বড় অসুবিধা।[৩৭] অন্য যে কোনো আইনগত চুক্তির মতো রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদিত হয় প্রকৃতির রাজ্যে, কিন্তু এর বিশেষত্ব নিহিত থাকে যখন এটি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রদান করে এবং তা বলবৎকরণের জন্য কৌশল প্রণয়ন করে।

ব্যক্তির যুক্তিবৃত্তি বৈধতার নিয়ামক। অর্থাৎ ব্যক্তির সম্মতি বৈধতার ভিত্তি। লকের সামাজিক চুক্তির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবসের মতো অসীম নয়, রাষ্ট্র সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতা হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণের জন্য আইনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের কাজ হলো আম্পায়ারের মতো প্রদত্ত নিয়মকানুনসমূহ দ্বারা নিরপেক্ষভাবে শাসন করা এবং সকল দলের প্রতি একই রকম মনোভাব পোষণ করা। রাষ্ট্র যদি জনগণের আস্থাভঙ্গ করে, সুরক্ষা প্রদানে অসমর্থ হয় তাহলে জনগণ কর্তৃক সরকারের পরিবর্তন অনিবার্য। লকীয় চুক্তিবাদে লক্ষণীয় দিক হলো তিনি জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের স্বাধীনতা দিয়েছেন, যার বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় হবসীয় রাষ্ট্রচিন্তায়। তবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হলো হবস যেখানে ব্যক্তিমানুষ ও ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রগণ্য করেছেন, লক তাকে আরো এগিয়ে ব্যক্তিমানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষাকারী হিসেবে সরকারের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*

রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* (*Social Contract,* 1762) গ্রন্থটি রাষ্ট্রদার্শনিক চিন্তার একটি পরিণত রূপের প্রকাশ বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করেন। এ গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর জন্য কীভাবে একটি ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রুশোর সামাজিক চুক্তিতে যেহেতু মানুষ অপরের উপর কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারপ্রাপ্ত নয়, সেহেতু শক্তি কোনো অধিকারের জন্ম দিতে পারে না বলে মানবসমাজে বৈধ কর্তৃত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো চুক্তি।[৩৮]

রুশোর মতে, প্রকৃতির রাজ্য কোনো স্থির-নিশ্চল অবস্থা নয় ক্রমবর্ধমান দ্রুত পরিবর্তন-প্রক্রিয়া পরবর্তীতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে সামাজিক জীবনে পদার্পনের যে সকল লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে তা মূলত সামাজিক সংমিশ্রণ এবং যোগাযোগের দ্বারা সৃষ্ট।[৩৯] প্রকৃতির রাজ্য থেকে সমাজজীবনে উত্তরণের ক্ষেত্রে (সমাজব্যবস্থার পদার্পণের প্রাথমিক পর্যায়ে) মানুষ অনেকগুলো পর্যায় অতিক্রম করেছে। যেমন– প্রথম পর্যায়ে মানুষ পরিবার গঠন করে, পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তির মধ্যে মানবতা, সৌহার্দ্য, ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়, আবার পরবর্তীতে সম্পত্তির উদ্ভব এবং সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার ধারণা ব্যক্তির মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদিও প্রাথমিকভাবে সহজ-সরল সামাজিক অস্তিত্ব মালিকানা সংক্রান্ত মন্দ দিকসমূহকে ছাপিয়ে অধিক সুবিধা দেয়। যেমন এখানে মানুষ অপরের সাহচর্য পায়, আনন্দ উপভোগ করে, সেই সাথে কেন অন্যদের আঘাত করা থেকে ব্যক্তি বিরত থাকবে তাও সে বুঝতে পারে।[৪০]

কিন্তু মানুষের এই সুখকর অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সম্পত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে *amoure soi* এবং *amour propre* (enlightend self interest এবং selfish interest)-এর মধ্যকার দুরত্ব এত বেশি হয়ে যায় যে ব্যক্তি কেবল তার প্রয়োজনের নিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হয় না, বরং অন্যদের চেয়ে নিজেকে উর্দ্ধে রাখার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে কাজ করে। ফলে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ব্যক্তিকে অপরের উপর কর্তৃত্ব করতে এবং অপরের সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত করে, স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি করে। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কিংবা সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিটি সম্পত্তির সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, সাম্যাবস্থা, স্থিতিবস্থা নষ্ট হয়, ধনী-গরিবের লাগামহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতিগত সহানুভূতি ও ন্যায্যতার বিষয়কে দুর্বল করে দেয় এবং সে স্থানটি দখল করে অর্থলিপ্সা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অনৈতিকতা।[৪১]

রুশোর সামাজিক চুক্তির পূর্ণ ধারণা লাভ করার জন্য তাঁর *ডিসকোর্স অন ইনইকুয়ালিটি* (*Discourse On Inequality)* সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। *ডিসকোর্স অন ইনইকুয়ালিটি* এবং *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে ভিন্নমত পাওয়া যায়। *অন ইনইকুয়ালিটি*– তে রুশোর কাছে প্রকৃতির রাজ্য মানুষের আদর্শ অবস্থা, যা সমাজক্ষমতা ও রাজনীতিবর্জিত।[৪২] এ সমাজ দুর্নীতিগ্রস্থ নয়। আর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে সমাজ কলুষিত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির লালনক্ষেত্র। তিনি এ সমাজকে বর্জনের চিন্ত না করে এর রাজনৈতিক বৈধতা নিরূপণ করেন সামাজিক চুক্তির দ্বারা। সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য হলো চুক্তিবদ্ধ গোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিধান। রাষ্ট্রে ব্যক্তির জীবন কেবলমাত্র প্রকৃতির দান নয়, বরং রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির জীবন জড়িত।

রুশোর মতে, প্রকৃতির রাজ্যে বিত্তশালী জনগণ তাদের সম্পত্তি ও ক্ষমতা সুরক্ষিত করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির অংশ হিসেবে তারা সৃষ্টি করে আইন ও সরকার। জনগণের চুক্তির অংশরূপে যে আইন ও সরকারের উদ্ভব তার কাজ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইন ও সরকার প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের প্রথম পদক্ষেপ।

লক্ষণীয় হলো রুশো মানুষের জীবনে এই পরিবর্তনের দিকসমূহকে অস্বীকার করেননি। তিনি প্রকৃতির রাজ্যেও ফিরে যাননি। প্রকৃতির রাজ্যের বর্বর মানুষের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে রুশো কৃত্রিম জীবনের কৃত্রিম মানুষের কাছে অবস্থান করেন। প্রকৃতির রাজ্যের আদিম, অ-সভ্য (unpolished) জীবন ছেড়ে রাজনৈতিক সমাজে সভ্য জীবনকে রুশো গ্রহণ করেন এবং তিনি এ সভ্য জীবনকে প্রয়োজনীয় মনে করেন। এটি তাঁর চিন্তার একটি বিশেষ দিকপরিবর্তন– যে সমাজ মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে, বৈষম্যপ্রবণ করেছে সেই দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজকে তিনি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো সরকারের সঙ্গে নিজেদের শক্তিকে যুক্ত করা। দ্বিতীয় পদক্ষেপে বিত্তবান জনগণ তাদের সম্পত্তির সুরক্ষা এবং স্বীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য গরিব মানুষের সমগ্র শক্তিকে সরকারের সাথে যুক্ত করে।[৪৩] রুশোর দ্বিতীয় পদক্ষেপটি আমাদের ভাবনার স্পষ্ট খোরাক জোগায়। যেমন, এভাবে ধনীরা তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট এবং নিজেদের জীবনকে তারা অপরের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করে। আবার ধনীরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গরিব বা বিত্তহীন শ্রেণিকে হাতিয়ার রূপে গণ্য করেছে এবং স্বীয় স্বার্থ-সংরক্ষণে অধিক উদ্যোগী হয়ে আইন ও সরকারকে সুরক্ষাকবচরূপে তৈরি করেছে। কীভাবে ধনীরা গরিবদের শোষণের ওপর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে এবং তা আরো বেগবান করে তোলে। আইন, সরকার, রাজনৈতিক সমাজ, শক্তি ইত্যাদি সকল কিছু মূল্যবান হয়ে উঠেছে সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সম্পত্তিগত বৈষম্য রাজনৈতিক সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে লক্ষণীয় নয়। প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে ছিলো স্বাভাবিক বৈষম্য, আর মানুষের যুক্তিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির যত উন্মেষ ঘটেছে মানুষের মানসিকতা তত সম্পত্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব রাজনৈতিক সমাজে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেন্দ্রিক যে সমাজব্যবস্থাকে রুশো মানুষের জীবনের সকল কলুষতা, অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের মূল বলেছেন, তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন, তিনি আবার প্রয়োজন বোধ করেন সেই সমাজের। সভ্য সমাজ তথা রাজনৈতিক সমাজকে তিনি অসম বলে বর্জন করেননি। নেতিবাচক সমাজ ও সভ্যতাকে তিনি গ্রহণ করেন এবং অধিকতর শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর বৈধতা প্রদান করেন তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ দ্বারা।

রুশোর প্রকৃতির রাজ্য হবসের মতো দুর্বিষহ বা বিশৃঙ্খল ছিলো না বিধায় রুশোর কাছে তা হয়েছে রাজনৈতিক সমাজ। রাজনৈতিক সমাজে মানুষ জীবনধারণের উপযোগী অবস্থাতে ছিলো, যেখানে কোনো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, তথাকথিত সামাজিক বিধি-নিষেধ না থাকার পরও ব্যক্তির জীবন শান্তিময় ছিলো। কাজেই রুশোর প্রকৃতির রাজ্য প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা নয়; আবার হবসের মতো রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির আধার নয়, রাষ্ট্র সমাজের সাথে সংযোজিত অতিরিক্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় অংশ। তাই রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করলেও সে শক্তির নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে ছিলো। মানুষ রাজনৈতিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এভাবেই রুশো সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাজনৈতিক সরকারের সূত্রপাত করেন, রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের সম্মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টা তাকে চুক্তিবদ্ধ করে এবং একই সাথে ব্যক্তি নেতৃত্বের অধীনে আসে। এই নেতৃত্ব রাজনৈতিক সমাজের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (কোনো ব্যক্তির নেতৃত্ব নয়), যা ব্যক্তির স্বেচ্ছা সম্মতিতে সৃষ্ট এবং যা মেনে নিতে ব্যক্তি সম্মত। নেতৃত্বের অধীনতা প্রকারান্তরে শক্তির প্রতি আনুগত্য। রুশো তাই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা (যা প্রকারান্তরে রাষ্ট্র) সৃষ্টিতে মত দিয়েছেন।

রুশোর সামাজিক চুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ চুক্তির কোনো অংশের পরিবর্তন দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। এতে সমাজ অপরিবর্তিত থাকে। সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যার বিপরীত চিত্র আমরা দেখেছি হবসের কাছে, যেখানে জনগণ একবার চুক্তিবদ্ধ হলে রাষ্ট্র বা লেভিয়াথানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। এ থেকে সে বের হতে পারে না। আর রুশো বলেছেন জনগণের সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর

মতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়নি, বরং জনগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের অধিকার পেল। চুক্তির রাজনৈতিক অংশটি পরিবর্তন দ্বারা সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা রাজনৈতিক সমাজের নিরীহ মানুষের কাছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অধিকার প্রদান করে। সেই সাথে এ প্রশ্ন আসে– রাজনৈতিক সমাজের নিরীহ জনগণের মাঝে সম্পত্তি কীভাবে এবং কেন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠলো। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনকারী মানুষ কীভাবে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এভাবে প্রকৃতিবাদী রুশো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন। । *ডিসকোর্স অন ইনইকুয়ালিটি*–তে সভ্য সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় অবিশ্বাসী রুশো পরবর্তীতে *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*– এ সেই সমাজেই মুক্তি খুঁজেছেন। রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে নেন এবং জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা দেন।

হবস এবং লকের মতো রুশোও ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হয়, এ ক্ষমতা ধনী কর্তৃক দরিদ্রদের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা এবং সম্পদশালীগণ তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য বিত্তহীনদের শক্তিকে ব্যবহার করে। সামাজিক চুক্তিই মানুষের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস। রাজনৈতিক কর্তৃত্বই সমাজে ক্ষমতার জন্ম দেয়। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে সম্মতির মাধ্যমে। ক্ষমতার দ্বারা জনগণ যে সম্পত্তির সুরক্ষা আশা করে তা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির বৈষয়িক কল্যাণ, এখানে কোনো মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধ কিংবা সামষ্টিক কল্যাণ গুরুত্ব পেয়েছে এমনটা দাবি করা দুষ্কর। যদিও রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্বে আমরা এধরণের মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধ তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ করেছি।

রুশো তাঁর পূর্ববর্তী চুক্তিবাদীদের মতো সম্মতিকে সামাজিক চুক্তির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করলেও তাঁর সম্মতির ব্যাখ্যা ভিন্ন। রুশো লকের সম্মতিতত্ত্বের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে নতুন আঙ্গিকে সম্মতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবে কর্তৃত্ববাদী শক্তিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি সম্মতির প্রয়োজন মনে করেন। অবিরাম সম্মতির দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব নৈতিক বৈধতা অর্জন করে।[৪৪] রুশো লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের বিষয়টি সমালোচনা করেন। কারণ এটা স্পষ্ট যে, একজন ব্যক্তি যদি সকল মানুষের ওপর বলপ্রয়োগে সমর্থ হয় (যা আমরা হবসের কাছে দেখি) তাহলে লক যে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কথা বলেছেন তাতে সংখ্যালঘু জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা বলপ্রয়োগ বা চাপ বা কর্তৃত্বমূলক নিপীড়নের সম্মুখীন হতেই পারে। রুশো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনে সম্মতির যে সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন সামাজিক চুক্তিতে তা উত্তরণের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রুশোর এ প্রচেষ্টা তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সর্বাত্মকবাদী করে তোলে বলে জোন্স মনে করেন।[৪৫]

সামাজিক চুক্তির দ্বারা ব্যক্তি পরস্পর চুক্তিবদ্ধতার দরুন কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা তৈরি করে। তাতে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণ প্রাথমিকভাবে উদ্ভূত হয় তার স্বীয় ক্ষমতা এবং স্বীয় স্বাধীনতা থেকে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রুশো বলেছেন, প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিয়মিত শক্তিসমূহ অপেক্ষা তার বিরোধী শক্তিসমূহ অধিক হয়ে পড়ে। শক্তির অবস্থান মানবজাতির অস্তিত্বশীলতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যার জন্য মানুষ পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়, বিরোধী শক্তিকে মোকাবেলা করে। তাই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বীয় অবস্থান ধরে রাখতে না পেরে অস্তিত্বকে বজায় রাখার স্বার্থে তার চরিত্র পরিবর্তন করে। এর অংশ হিসেবে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়, রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করে। নৈতিকতার পথে অগ্রসর হয়। রুশো তাই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা (যা প্রকারান্তরে রাষ্ট্র) সৃষ্টিতে মত দেন। রুশোর মতে,

> "আমাদের এমন একটা সংস্থা তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব এবং সম্পদকে রক্ষার জন্য সমগ্র সংস্থার শক্তিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে পারি যাতে আমরা যখন সমগ্রের সঙ্গে মিলিত হই তাহলে আমরা নিজেদের সম্মতিতে নিজেদের ইচ্ছারই মাত্র অনুগত হই এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীনতা এবং শক্তি পূর্বের মতোই অক্ষত থাকে। তার কোনো ক্ষতি ঘটে না।"[৪৬]

চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। রুশো মনে করেন চুক্তির কোনো ধারার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সম্ভব নয়, কোনো পরিবর্তন আনা হলে, পুরো চুক্তিটিই অর্থহীন হয়ে উঠবে এবং চুক্তিটি তার কার্যকারিতা হারাবে।[৪৭] তাছাড়া যদি চুক্তির কোনো পরিবর্তন করা হয় তাহলে মানুষ রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পিত প্রাকৃতিক স্বাধীনতার কাছে পুনরায় ফেরত যাবে।

চুক্তির সাহায্যে ব্যক্তি তার স্বাধীনতার কিছু অংশ সংকুচিত করে অধিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশায়। চুক্তিকে রুশো মনে করেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্ন অংশ, যার দ্বারা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার স্বাধীনতাকে বিচ্ছিন্ন করে। আর তাই কোনো এক প্রজন্ম কর্তৃক অনুষ্ঠিত চুক্তি তার পরবর্তী প্রজন্ম মেনে নিতে বাধ্য নয়, চুক্তি অস্বীকার বা পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তি তার স্বীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে কিন্তু অপরের স্বাধীনতায় এমনকি তার সন্তানের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করতে বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। চুক্তি মেনে চলা বা নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, পূর্বের সরকার বহাল রাখা অথবা নতুন সরকার নির্বাচন করার স্বাধীনতা জনগণের আছে। এটাই হলো রুশোর অবিরাম সম্মতি বা নিরন্তর সম্মতি। এভাবেই সম্মতির মাধ্যমে রুশো সরকারের বৈধতা নির্ধারণ করেছেন (লক অপেক্ষা ভিন্ন আঙ্গিকে)। এ সম্মতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রচ্ছন্ন বা মৌন নয়, সুস্পষ্ট সম্মতি। সুস্পষ্ট সম্মতি জ্ঞাপন দ্বারা রাজনৈতিক কার্যকলাপে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে।

রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাভিত্তিক রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ক্ষমতার উৎসরূপে চিত্রিত করেছেন। রুশোর কাছে রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি শক্তি, শান্তি, নিরাপত্তা বা সফলতা নয় (যা হবস ও লকের কাছে মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়েছে), কেবলমাত্র সম্মতি। শক্তি, শান্তি, সফলতা বা নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রের বৈধতার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ না করার যুক্তিটিও বেশ জোরালো। শক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ধারিত হলে তা সর্বদা ক্ষমতাসীনদের পক্ষেই যাবে। আবার শান্তি ও নিরাপত্তাকেও রুশো রাষ্ট্রের বৈধতার ভিত্তিরূপে স্বীকার করেন না। যেমন, কোনো স্বৈরাচারী রাজা সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে সমর্থ হলেও স্বৈরাচারী রাজা ও তার রাষ্ট্র বৈধ হবে না (যদিও হবস এধরণের রাষ্ট্রকে বৈধ বলে স্বীকার করেছেন)। রুশো স্বৈরাচারী শাসককে বৈধ শাসক মানতে নারাজ এবং এধরণের সরকারকে তিনি যথার্থ মনে করেন না। এধরণের শাসনব্যবস্থার সাথে রুশো জেলখানার বন্দি জীবনের তুলনা করেছেন। জেলখানার কয়েদিরা শান্তি ও নিরাপদ জীবন পায় কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পায় না। তাই এ জীবন তাদের কাছে কাম্য নয়।

স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা থাকলেও রুশো এ ধরণের শাসনে শাসক-শাসিতের সম্পর্ককে তুলনা করেছেন প্রভু-দাস সম্পর্কের সাথে, জনগণ এবং শাসকের সম্পর্কে নয়। এধরণের নিয়ন্ত্রিত জনগণকে তিনি বলেছেন 'জনসমাহার', যা কোনো জনসংস্থাতে পরিণত হবে না। আর জনসংস্থাতে রূপান্তরিত না হলে এটি কোনো রাজনৈতিক সংস্থার ধারণা বা জনকল্যাণের ধারণা ব্যক্ত করে না।[৪৮] রুশো মনে করেন সম্মতি যদি ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে ভোট দানের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ইচ্ছাপ্রকাশ করবে এবং ইচ্ছাপ্রকাশ সর্বসম্মত হতে হবে। সম্মতিকে রুশো রাষ্ট্রের বৈধতার মাপকাঠি মনে করেছেন এবং নিরন্তর সম্মতি বা অবিরাম সম্মতিকে রাষ্ট্রের ভিত্তি মনে করেন। তিনি মনে করেন সামাজিক চুক্তি একবার সম্পাদিত হলে প্রজন্মান্তরে চলতে থাকবে তা নয়, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এ চুক্তির নবায়ন জরুরী। কোনো এক প্রজন্ম কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তি পরের প্রজন্মে বলবৎ থাকবে তা নয়। প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীন এবং মুক্ত। এই মুক্ত মানুষের সরকার নির্বাচনের স্বাধীনতা রয়েছে। প্রতিটি প্রজন্ম নির্ধারণ করে তারা পূর্ববর্তী প্রজন্ম কর্তৃক নির্বাচিত সরকারের অধীনে নিজেদের দেখতে চায় কিনা। এধরণের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বৈরাচারী হওয়ার আশঙ্কা কম।

রুশো লকের সম্মতিতত্ত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ বনাম সংখ্যালঘুর শাসনের যে সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন তা তাঁর নিজের ক্ষেত্রে সমাধান করেননি। প্রতি প্রজন্মের হাতে চুক্তি নবায়ন করার অধিকার দ্বারা কোনো একটি প্রজন্ম যদি

কোনো সুনির্দিষ্ট সরকার গঠনের প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে তবে কার মতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হবে? তাছাড়া তিনি যে গণতান্ত্রিক সরকারের কথা ভেবেছেন তাতেও মতের ভিন্নতা থাকে। প্রত্যেকেই কোনো সরকার গঠনে শতভাগ ঐক্যমতে আসতে পারে না। ফলশ্রুতিতে সকলের সম্মতি এবং নিরন্তর সম্মতির বিষয়টি একটি জটিলতার দিকে ধাবিত হয়।

রুশো মনে করেন নিরন্তর সম্মতি দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। ক্ষমতা সরকারের হাতে না থেকে জনগণের হাতে থাকে, জনগণ শাসকের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে না বা আবদ্ধ হয়ে পড়ে না। ক্ষমতার সংরক্ষণ দ্বারা জনগণ স্বাধীনতা উপলব্ধি এবং উপভোগ করতে শেখে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের কর্তৃত্ব ছিলো না, কারণ তাদের বৈধ ক্ষমতাও ছিলো না। সম্মতি ক্ষমতার বৈধতা তৈরি করে। রুশো মনে করেন চুক্তিই সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক কর্তৃত্বের ভিত্তি। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ তাদের পারস্পরিক আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। তাই মানুষের পারস্পরিক চুক্তি বা সামাজিক চুক্তির পরিণতি হলো রাষ্ট্র। কোনো শক্তির প্রতি আনুগত্য নয়, মানুষের ইচ্ছাতে, পারস্পরিক সম্মতিতে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। রুশো রাষ্ট্রকে কোনো আদি-অকৃত্রিম প্রতিষ্ঠান মনে করেন না। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান।

রুশো রাষ্ট্রকে কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের অতিরিক্ত অংশরূপে বিবেচনা করেছেন বিধায় জনগণ যদি কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন চায় তাহলে তারা চুক্তির রাজনৈতিক অংশ বা শর্ত দ্বারা তা করতে পারে। এজন্য সমাজ বাধাগ্রস্থ হবে না। রুশো মনে করেন সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং এ চুক্তির দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় শক্তি ও স্বাধীনতা অটুট রাখতে চায়। তাই প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়ে এমন এক শক্তিশালী সম্মিলিত শক্তির সৃষ্টি করে যা ব্যক্তির বিরোধী শক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী। ব্যক্তির পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে তোলা সংস্থা ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং সম্পদ রক্ষার জন্য কাজ করে। যদিও প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে ব্যক্তি সম্মতির ভিত্তিতে প্রদান করেছে তবে চুক্তির বিরোধিতা বা ব্যত্যয় বা সম্মতির বিচ্যুতির কারণে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা পুনরায় ব্যক্তির কাছে প্রত্যর্পিত হবে।[৪৯]

সামাজিক চুক্তির ফলে সৃষ্ট সংস্থা তাত্ত্বিকভাবে একটি ত্রুটিহীন এবং পরিপূর্ণ সংস্থা। এই সংস্থা প্রকৃতির রাজ্য বা রাজনৈতিক সমাজের জনগণের শর্তহীন সমর্পণে সৃষ্ট এবং এটি ত্রুটিহীন পরিপূর্ণ সংস্থা (যা রাষ্ট্র) যার বিপরীতে কারো ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে না।[৫০] ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার উপস্থিতি অপরাপর সদস্যদের মাঝে বৈষম্য ও বিরোধের সৃষ্টি করে। এধরণের অবস্থায় পুনরায় অরাজকতা তৈরি হতে পারে। রাষ্ট্র সেই সংস্থা যাকে সকলে মান্য করবে, এই মান্যতাবোধ দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীনতার লাগাম টেনে ধরবে। নিজের বিবেচনাকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেবে না, নিজেকে অপরের জন্য প্রতিবন্ধকতা বা বিরোধী শক্তিরূপে প্রকাশ করবে না। এর অন্যথায়, রাজনৈতিক সমাজে সংস্থা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে, স্বৈরশাসনের উদ্ভব ঘটবে এবং শাসন বৈষম্যমূলক হয়ে উঠবে।[৫১]

রুশো মনে করেন সামাজিক চুক্তির সাহায্যে সৃষ্ট সমাজ-সংস্থায় ব্যক্তি যেটুকু অধিকার হস্তান্তর করে প্রতিদানে ততটুকুই সে রাষ্ট্রের কাছে থেকে ফিরে পায়।[৫২] তাই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি কিছু হারায় না। ব্যক্তির যা আছে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সে সমাজ-সংস্থা নামক একটি উচ্চতর শক্তিকে দেয়। উচ্চতর শক্তি রুশোর রাজনৈতিক সংস্থা বা রিপাবলিক। রাজনৈতিক সংস্থাটি গড়ে ওঠে মানুষের সম্মতির ভিত্তিতে এবং সদস্যের প্রয়োজনে সংস্থাটি তার নৈতিক এবং যূথবদ্ধ শক্তিকে একত্রিত করে পাশে দাঁড়ায়। যা পরবর্তীতে 'ইচ্ছাশক্তি'-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইচ্ছাশক্তির সাথে জনগণের (যারা রাজনৈতিক সমাজে নাগরিকের মর্যাদা পেল) সমন্বয়ে গড়ে ওঠে নগর বা নগর রাষ্ট্র এবং একে আধুনিককালে বলা হয়েছে রাষ্ট্র। সামাজিক চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট সংস্থাকে রুশো নৈতিক ও সামষ্টিক সংস্থা মনে করেন। এই সংস্থাটির নিষ্ক্রিয় অবস্থা হলো রাষ্ট্র, সক্রিয় অবস্থা 'সার্বভৌম' এবং সদৃশ অন্যান্য সংস্থার

সাথে সম্পর্কিত হলে একে 'জনশক্তি' নামে অভিহিত করা হয়।[৫৩] রুশোর চুক্তির এ বিশ্লেষণ থেকে শক্তির নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের হাতে, আবার রাজনৈতিক শক্তি সামষ্টিক স্বার্থে পাশে দাঁড়ায়, রাজনৈতিক শক্তির বা সংস্থাটির একটি নৈতিক শক্তি রয়েছে। ব্যক্তি সম্মতির ভিত্তিতে যে সংস্থা গড়ে তুলেছে তাতে রয়েছে নৈতিক শক্তি ও যৌথ শক্তির প্রকাশ, যা পরবর্তীকালে সাধারণ ইচ্ছা নামে প্রকাশ লাভ করে।[৫৪] সাধারণ ইচ্ছা জনগণের সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ। এটি একটি অবিভাজ্য রাজনৈতিক শক্তি যা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সাধারণ ইচ্ছায় ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার স্থান নেই, সকল সদস্য সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য পোষণ করে।

রুশো সামাজিক চুক্তির সাহায্যে জনসম্মতি, কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা এ তিনের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন। কর্তৃত্বকে ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি প্রদান করেন জনসম্মতির দ্বারা। আবার ক্ষমতার সাথে জনগণের সম্মতি যুক্ত হয়ে তা ন্যায়সঙ্গত পরিণতি লাভ করেছে। সম্মতির দ্বারা কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতার মতো পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি ধারণার মাঝে সমন্বয় সাধনে রুশো সমর্থ হলেন। এটি রুশোর সামাজিক চুক্তির একটি বড় অর্জন ও বৈশিষ্ট্য। তিনি সম্মতির সাহায্যে কর্তৃত্বের ভিত্তি অনুমোদন করেন এবং কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত হলো স্বাধীনতা।

কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মেলবন্ধন ঘটায় ব্যক্তি কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে না এবং তার স্বাধীনতাও সে অক্ষুন্ন রাখে। হবস বা লকের চুক্তির মতো সে স্বাধীনতা হারায় না। চুক্তি ব্যক্তির মাঝে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। চুক্তির সাহায্যে ব্যক্তি পায় রাষ্ট্র। আপাতঃদৃষ্টে রুশো অসমতা-বৈষম্যহীনতার পক্ষপাতি কিন্তু তিনি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলোপন দাবি করেননি।

প্রকৃতির রাজ্যে নয়, রাষ্ট্রে রুশো নৈতিকতার জাগরণ দেখেছেন। মানুষ নৈতিকতা প্রাপ্ত হয় রাষ্ট্রে। রাষ্ট্রেই তিনি নৈতিকতার স্থান নির্ধারণ করেছেন এবং রাষ্ট্রের বৈধতা নির্ধারণে নৈতিকতাকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য উন্নত জীবনের ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা যদিও নিয়ন্ত্রিত কিন্তু তা নঞর্থক নয়, ইতিবাচক স্বাধীনতা। রুশো রাষ্ট্রে ব্যক্তির এধরণের নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলেছেন যা মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতার দ্বারা ব্যক্তি যুক্তিবৃত্তিক স্বাধীনতা উপভোগ করে, প্রকৃতির রাজ্যের স্বেচ্ছাচারি স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করে সে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দ্বারা নিজের উপর কর্তৃত্ব করে। এ স্বাধীনতা দ্বারা ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায় পৃথক করতে পারে। তাই রুশোর রাজনৈতিক মানুষ নৈতিক এবং সভ্য মানুষ বলা যায়। এখানে আবেগ অপেক্ষা যুক্তিবৃত্তির প্রাধান্য রয়েছে। প্রবৃত্তি নয়, ন্যায়বোধ গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য অবশ্য মানুষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, মানুষ আইন মান্য করবে। আইনের বিধিনিষেধ ব্যক্তির জীবনকে নাগরিকের মর্যাদায় উন্নীত করে। আইন রাজনৈতিক সমাজের ফল। আইনের বেড়াজাল ব্যক্তির স্বাধীনতাকে একদিকে সংকুচিত করে, কিন্তু আবার তাকে কর্তৃত্ববাদী নাগরিকে রূপান্তরিত করে। রাজনৈতিক সমাজের অংশরূপে নাগরিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতারও অধিকারী। প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে আইনের প্রয়োজন ছিলো না, তবে রাজনৈতিক সমাজে আইন প্রয়োজনীয়। এভাবেই প্রকৃতির রাজ্য বা পৌর সমাজের সদস্য থেকে মানুষ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক সমাজের নাগরিক। সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে নাগরিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। সাধারণ ইচ্ছা রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে বৈধতা দান করে। আবার এ কর্তৃত্বই ব্যক্তিকে মুক্তির স্বাদ দেয়। এ সমস্ত অর্জন সম্ভব হয়ে ওঠে রুশোর সামাজিক চুক্তির দ্বারা।

সামাজিক চুক্তির মূল বিষয়টিকে রুশো বিবৃত করেছেন এভাবে– "আমরা প্রত্যেকে এবং সকলে আমাদের প্রত্যেকের এবং সকলের শক্তিকে আমাদের সকলের সাধারণ ইচ্ছায় পরিচালনার অধীনে ন্যস্ত করি এবং সমগ্র সমাজসংস্থার মধ্যে তার একটি অবিভাজ্য অংশ হিসাবে আবার আমরা নিজেকে লাভ করি।"[৫৫] রাজনৈতিক সমাজের অভ্যুদয়ের দ্বারা প্রকৃতির রাজ্যের জনগোষ্ঠী নাগরিকের মর্যাদায় উন্নীত হয়। রুশোর সামাজিক চুক্তিতে জনগণের ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা পায়। তারা ক্ষমতার লাগাম টানে। শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজন পড়ে। সামাজিক চুক্তি সম্মতির ফল। এর মাধ্যমে একটি সার্বভৌম শক্তির সৃষ্টি

হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মূল মালিক জনগণ। একটি অবিভাজ্য শক্তি ব্যক্তিকে তার স্বীয় ইচ্ছায় পরিচালিত করার ক্ষমতা পায়। ব্যক্তিগত বৈষম্য ও বিরোধ থেকে মুক্তি পেতে ব্যক্তি একে মান্য করবে।

রুশোর চুক্তিবাদে স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে। তবে রাসেল মনে করেন রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় স্বাধীনতা নয়, সাম্য অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে এবং রুশো সাম্যকে স্বাধীনতার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।[৫৬] রুশোর চুক্তিবাদের সাথে হবসীয় চুক্তিবাদের সাদৃশ্য এখানে যে উভয়েই প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন রাজনৈতিক সমাজে। রাজনৈতিক সমাজের এ স্বাধীনতা জীবনযাপন যুক্তিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ নিয়ন্ত্রিত কিন্তু স্বাধীন জীবনযাপন করে। জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মাধ্যমে।

হবস এবং রুশোর চুক্তিবাদে মানুষ স্বীয় স্বাধীনতা ও স্বার্থ উভয়ের সমন্বয় করেছে। এ সমন্বয়ের লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিত শক্তি দিয়ে একটি সংস্থা খুঁজে বের করে যা ব্যক্তির জন্য সুরক্ষা এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করতে পারবে, আবার ব্যক্তি একই সাথে পূর্বের মতো (প্রকৃতির রাজ্যে) স্বাধীন থাকবে। এ লক্ষ্যে সামাজিক চুক্তি কাজ করবে এমনটাই আশা রুশো ও হবসের। তবে রুশো সামাজিক চুক্তি দ্বারা সৃষ্ট সার্বভৌম শক্তি বলতে হবসের মতো রাজা বা সরকারকে নির্দেশ করেননি, তিনি নির্দেশ করেছেন আইনগত ও সামষ্টিকভাবে সঠিক সমাজকে।

মানুষের স্বার্থপর প্রবৃত্তি দ্বারা একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় এবং একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিকভাবে নৈতিকতা বা সদগুণ প্রয়োজন। মেলজার মনে করেন, রুশোর প্রাকৃতিকভাবে ভালো মানুষ তত্ত্বের বিশ্লেষণে এটা বলা যায় যে রুশো মনে করেন কম-বেশি শোষণমুক্ত একটি সমাজ (পরিপূর্ণ শোষণমুক্ত নয়) প্রতিষ্ঠা সম্ভব সাধারণ ইচ্ছার চূড়ান্ত শাসন দ্বারা এবং এই সাধারণ ইচ্ছাই মানুষকে সদগুণাবলীসম্পন্ন রূপে গড়ে তুলতে পারে। তাই রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে আইনরূপে অভ্রান্ত বলেছেন এবং সার্বভৌমের অবশ্যই আইনের শাসনকে সুরক্ষিত করা উচিত বলে মনে করেন।[৫৭]

রুশোর সামাজিক চুক্তিতে হবসের অনুসরণে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লকের অনুসরণে ব্যক্তিমানুষের সমঅধিকার রক্ষিত হয়। এভাবে রুশো হবস ও লকের মতের সমন্বয় সাধন দ্বারা তাঁর চুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে রুশোর চুক্তির বিশেষত্ব হলো তিনি সাধারণ ইচ্ছা নামক জনসাধারণের যৌথ ইচ্ছার কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে স্থাপিত করেছেন, কোনো দল বা ব্যক্তির ওপর নির্ভর করেননি। রুশোর বিশ্বাস, বিশেষ কোনো দলের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সাধারণ ইচ্ছা কম ভ্রান্তিজনক। সম্প্রদায়ের কল্যাণ বা সামষ্টিক মঙ্গল চিন্তার লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপে তারা সহসা দুর্নীতিপরায়ন হয়ে উঠবে না।[৫৮]

রুশোর চুক্তিবাদে দেখা যায় প্রকৃতির রাজ্যের আপাত অসম অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে নিজেরা অপেক্ষাকৃত সাম্যাবস্থায় প্রবেশ করে। তাঁর মতে এই সাম্য স্থাপনে কাজ করে আইন। আইন ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যগত অসাম্য পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। তাই রুশো মনে করেন, রাজনৈতিক সমাজে মানুষের মধ্যে যে-কোনো আইনসঙ্গত ক্ষমতার ভিত্তি হতে পারে কেবলমাত্র চুক্তি।[৫৯] রুশোর সামাজিক চুক্তিতে সম্মতির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা যায়, যেহেতু মানুষ অপরের ওপর কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারপ্রাপ্ত নয়, শক্তি কোনো অধিকারের জন্ম দিতে পারে না। তাই মানবসমাজে বৈধ কর্তৃত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো চুক্তি।[৬০]

রুশো সামাজিক চুক্তিবাদে জনগণকে শক্তির বশ্যতা মানতে বাধ্য করেননি, বরং তিনি মনে করেন সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে জনগণকে শক্তির দ্বারা নয়, আইনসঙ্গত ক্ষমতার দ্বারা শাসন মানতে বাধ্য করা যায়। এক্ষেত্রে রুশোর দৃষ্টিভঙ্গি এধরণের− কোনো ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির বশ্যতা বা অধীনতা স্বীকার করে তার মানে এমন নয়

যে এধরণের অধীনতার সাহায্যে সমাজ-পরিকল্পনা সম্ভব। কারণ একের প্রতি অপরের এই অধীনতা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে না, বরং দাস-প্রভু সম্পর্ক তৈরি করে। তাছাড়া তিনি সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালেই স্পষ্ট করেছেন সংস্থা বা সমিতির সদস্যবৃন্দ সমগ্র সাধারণ শক্তি দিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলবে, যার কল্যাণে প্রত্যেকে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবে, মিলিত থাকবে, কিন্তু কেবল স্বীয় অধীনতা, বশ্যতা মানবে এবং প্রত্যেকে আগের মতোই স্বাধীন থাকবে। জনগণের সম্মিলিত সাধারণ ইচ্ছা দ্বারা গড়ে উঠবে রাজনৈতিক সংগঠন, যেখানে থাকবে সাধারণ কল্যাণ। রুশোর সামাজিক চুক্তি বিশ্লেষণে আরো বলা যায় চুক্তির দ্বারা একবার সমাজ (Community) গঠিত হলে তা হবে স্ব-পরিচালিত (self-governing), এখানে শাসক ও শোষিতের কোনো বিভাজন থাকবে না। এধরণের জীবনাচরণ ব্যক্তির সামাজিক চুক্তির সুপ্ত অভিব্যক্তি যা দ্বারা আইনসঙ্গত বা সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। রুশোর সাথে হবসের সামাজিক চুক্তিবাদের পার্থক্য এখানে যে হবস চেয়েছেন জনগণ রাষ্ট্রের একক ব্যক্তির অধীনতা স্বীকার করবে, পক্ষান্তরে রুশো চেয়েছেন জনগণ স্বীয় অধীনতা মানবে, কোনো একক ব্যক্তির নয়। তাহলে জনগণ রাজনৈতিক না হয়ে প্রভু-ভৃত্য হয়ে ওঠে। এ পর্যায়ে রুশো আইনের শাসনকে গ্রহণ করেছেন। কোনো একক ব্যক্তি দ্বারা নয়, রাষ্ট্র সাধারণ কল্যাণ সাধন করবে আইনের শাসন দ্বারা। রুশোর কাছে রাষ্ট্র সাধারণ জনগণের কল্যাণ সাধনের হাতিয়ার। রাষ্ট্র যদি উৎপীড়নমূলক ভূমিকায় আসীন হয় তাহলে সেটা হবে বিত্তবানদের ষড়যন্ত্রের ফল, যা রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুতি। রুশোর চুক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণে নৈতিকতা ও আইনের মাঝে নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। তিনি রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সংস্থারূপে অভিহিত করেছেন, আবার সেই রাষ্ট্রে জনগণকে আইনের শাসনের অধীনে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। তাহলে বলা যায় একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সফল বাস্তবায়নের জন্য জনসম্মতি, আইন এবং নৈতিকতার যথাযথ সমন্বয় অপরিহার্য।

আঠারো ও উনিশ শতকের পুঁজিবাদী অর্থনীতির জয়জয়কারের সময়কালে রুশো রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী ভিত্তির প্রতি মনোনিবেশ না করে কল্যাণমূলক বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই জনসাধারণের কল্যাণ তাঁর কাছে সর্বাগ্রে। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য হলো– এতে একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের, অপরদিকে সর্বজনীনতাবাদ (universalism) এবং সমষ্টিবাদ (collectivism)– এর সংমিশ্রণ ঘটেছে।[৬১] তিনি স্বাধীন ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, মানুষ জন্মেই সর্বত্র স্বাধীন। আবার তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতির সার্বিক পদ্ধতিতে (*Universal system of droit politique*), যা নির্ভর করে সর্বব্যাপী ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর। যদি রুশোর এ চিন্তাটিকে আমরা গ্রহণ করি তাহলে তাঁকে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার বা স্বাভাবিক অধিকারের পূজারী এবং উদারতাবাদের একজন দূত বলা যেতে পারে। কিন্তু রুশোর এসকল বৈশিষ্ট্যের বাইরে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকে বার্কার চিহ্নিত করেছেন। রুশোর কাছে চূড়ান্ত সার্বভৌম কোনো একক ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিগোষ্ঠী নয় (যা আমরা হবসের কাছে পাই)। সমাজজীবনের চূড়ান্ত আদর্শ কোনো প্রাকৃতিক আইনের বিধান নয়, বরং যা মানুষের ব্যক্তিগত যুক্তিবাদিতা থেকে উদ্ভূত প্রাকৃতিক অধিকারের পদ্ধতি। এ যুক্তিবাদিতা সর্বত্র একই রকম বলে এই পদ্ধতিটিও একই রকম।[৬২ ৫৩]

হবসের সাথে রুশোর চুক্তিবাদের সাদৃশ্য হলো উভয়ের চুক্তিতে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে সমর্পণ করে নিজেকে; প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমর্পণ দ্বারা আবার নিজেদেরকে ফিরে পায়, প্রত্যেকে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রকরূপেই থেকে যায়, কেউ কারো প্রভু হয় না। ('Each, giving himself to all gives himself to no body')। বৈসাদৃশ্য হলো হবসীয় চুক্তিবাদে একজন ব্যক্তি সেখানে ব্যক্তিগোষ্ঠীর কাছে সমর্পণ করে, সেক্ষেত্রে রুশোর ব্যক্তি কোনো একক ব্যক্তির কাছে নিজেকে তুলে না দিয়ে সমগ্র সংস্থা/সম্প্রদায় থেকে নিজের সমস্ত অধিকারসহ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে।[৬৩] রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে ব্যক্তি শর্তহীনভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যা লকের কাছে আমরা দেখেছি শর্তসাপেক্ষিকভাবে। রুশো মনে করেন ব্যক্তি শর্তহীনভাবে সমাজসংস্থার কাছে স্বীয় অধিকার সমর্পণ দ্বারা নিজেকে

সমর্পণ করেছে। তাই একের সাথে অপরের বৈষম্য থাকা সম্ভব নয়। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে প্রত্যেকে এবং সকলে সমান। কেউ অন্যের প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ দ্বারা নিজের স্বার্থ সাধন করতে পারে না। সামাজিক চুক্তি দ্বারা রুশো এভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প দেন। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সমর্পণ করে আবার তা ফেরত পায়, সঠিক স্বার্থ-সংরক্ষণ তথা বৈষম্যহীন আচরণ স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে।

সামাজিক চুক্তির দ্বারা ব্যক্তি পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা তৈরি করে। তাতে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণ প্রাথমিকভাবে উদ্ভূত হয় ব্যক্তির স্বীয় ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা থেকে। রুশো বলেছেন, প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিয়মিত শক্তিসমূহ অপেক্ষা তার বিরোধী শক্তিসমূহ অধিক হয়ে পড়ে। শক্তির অবস্থান মানব জাতির অস্তিত্বশীলতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যার জন্য মানুষ পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়, বিরোধী শক্তিকে মোকাবেলা করে। তাই প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বীয় অবস্থান ধরে রাখতে না পেরে স্বীয় অস্তিত্বকে বজায় রাখার স্বার্থে তার চরিত্র পরিবর্তন করে। তার অংশ হিসেবে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়, রাজনৈতিক সমাজে পদার্পন করে। নৈতিকতার পথে অগ্রসর হয়।

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে দুই ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ করে। যেমন– সার্বভৌমের সদস্যরূপে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের সদস্যরূপে ব্যক্তি। রাষ্ট্রের সদস্যরূপে ব্যক্তি একইসাথে সার্বভৌমেরও অংশ। রুশো সামাজিক চুক্তিতে দেখিয়েছেন সমাজে কীভাবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হতে পারে এবং সেজন্য একটি সমাজ গঠিত হওয়া উচিত। সেই সাথে কীভাবে ব্যক্তি ও সমাজের অন্যদের স্বার্থের সাথে সমন্বয় করা যায়। রুশো প্রথমেই রাজনৈতিক সমাজকে স্বৈরাচারীরূপে চিত্রিত করেননি, যদিও প্রথম থেকেই তিনি এ সমাজে ধনী-গরিবের বিভাজনকে উল্লেখ করেছেন। রুশো প্রাথমিক অবস্থায় রাজনৈতিক সমাজকে দেখেছেন– "একদিকে ব্যক্তি কিছু প্রচলিত প্রথা, বিধি-বিধান পালন করতে থাকে আবার চুক্তি সম্পাদনের অংশরূপে সামাজিক সত্তায় পরিণত ব্যক্তি পরস্পরের কাছে সমাজ প্রত্যাশা করে।"[৬৪] রুশোর কাছে সমাজে স্বৈরাচারের যে দিকটি অত্যন্ত নিন্দার্হ মনে হয়েছে তা হলো ব্যক্তির ওপর অন্যের শোষণ নয়, বরং অন্যের কাছে শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে পড়ার বা অন্যের বশ্যতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নেওয়া, এবং এ বিষয়ে ব্যক্তির অক্ষমতা।[৬৫]

রুশোর চুক্তিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ-সংস্থার সদস্যরূপে তার সকল অধিকারকে শর্তহীনভাবে সমর্পণ করেছে সমাজ-সংস্থার কাছে এবং তাই ব্যক্তির একের সাথে অপরের কোনো প্রকার বৈষম্য থাকতে পারে না। ব্যক্তির শর্তহীন সমর্পণ এবং চুক্তির ফলে বৈষম্যহীনতার সূত্রপাত একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কোনো বৈষম্য না থাকার কারণে সমাজ-সংস্থার প্রত্যেকে পরস্পর সমান, প্রত্যেকে তাদের সকল অধিকার সমর্পণ করার দ্বারা বৈষম্য থেকে মুক্ত হয়েছে। সমাজ-সংস্থার কোনো সদস্য অন্যের প্রতি বৈষম্যমুলক আচরণের দ্বারা তার প্রকৃত স্বার্থোদ্ধার করতে পারবে না। অন্যের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন দ্বারা ব্যক্তির স্বার্থোদ্ধার সম্ভব নয়, কারণ মানুষের সম্মতিতে সৃষ্ট এ সংস্থা (association) ত্রুটিহীন এবং এর বাইরে ব্যক্তির কোনো একক স্বার্থ থাকতে পারে না। রুশোর চুক্তির এ ক্ষেত্রটিতে আমরা সামষ্টিকতাবাদী রূপ পাই। এ সামষ্টিকতা ব্যক্তিস্বার্থহীন।

বলা যায়, হবসের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনা থেকে চুক্তির প্রকৃত শক্তি ও ভিত্তি ভাষা নয়, ব্যক্তির কল্পনা তথা মনস্তত্ত্ব। কারণ চুক্তির পূর্ববর্তী প্রকৃতির রাজ্যের ভয়াবহতা তাদের স্মৃতিপটে উপস্থিত; প্রাকৃতিক আইনের ব্যর্থতা ও চুক্তিভঙ্গের ভয় তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। আবার অন্যদিকে ব্যক্তি তার প্রাকৃতিক অধিকার তথা জীবন ও ক্ষমতা উভয়কে উপভোগ করার দ্বারা যে পরিতৃপ্তি বোধ করে তাও স্মরণে রাখে। এই বোধশক্তিকে হবস গুরুত্বপূর্ণরূপে দেখেছেন। বোধশক্তিই ব্যক্তিকে চুক্তির পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা বুঝতে ও তৈরি করতে সাহায্য করে। পশুপাখির সাথে চুক্তি হতে পারে না। পশুপাখির ভাষা নেই, অধিকার বোধ ও প্রয়োজনবোধ নেই।

আবার ঈশ্বরের সাথে চুক্তি সম্পাদন সম্ভব নয়। কারণ ঈশ্বর প্রত্যাদেশ দ্বারা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তির সাথে যুক্ত হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে চুক্তি গ্রহণযোগ্যতা পেল কি না তা বোঝা সম্ভব নয় বলে হবস মনে করেন।

হবসের সামাজিক চুক্তি থেকে একথা বলা যায় যে, প্রকৃতির রাজ্যের অনিরাপদ জীবন থেকে মুক্তির তাগিদ ব্যক্তিকে সামাজিক চুক্তি গঠনে অনুপ্রাণিত করেছে। তবে কেবলমাত্র শক্তি বা বলপ্রয়োগই কোনো চুক্তির টিকে থাকার ভিত্তি হতে পারে না। যদিও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, হবসের সামাজিক চুক্তির ভিত্তি হলো ব্যক্তির দৈহিক শক্তি সার্বভৌম শক্তির বলপ্রয়োগের ক্ষমতা। কিন্তু হবসের প্রাকৃতিক আইন বিশ্লেষণে বলা যায়, হবসের সামাজিক চুক্তির টিকে থাকার ভিত্তি কেবল শক্তি নয়, নৈতিক স্বার্থ ও নৈতিক বিবেচনাও সামাজিক চুক্তির টিকে থাকার ভিত্তিরূপে কার্যকর। হবসের চুক্তিতে ব্যক্তির নৈতিক স্বার্থ ও বিবেচনাবোধের সংশ্লিষ্টতা এটা প্রমাণ করে যে হবসের ব্যক্তিমানুষ কেবলমাত্র স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিকতাবোধে আবদ্ধ এধরণের দাবি ঠিক নয়। কেবলমাত্র শক্তি বা বলপ্রয়োগ সামাজিক সংহতি ও স্থিতিশীলতার নিয়ামক নয়। হবসের সামজিক চুক্তির চালিকাশক্তি ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু এ চুক্তির কার্যকারিতা ও অস্তিত্বশীলতার ভিত্তিমূলে রয়েছে নৈতিক দায়বদ্ধতা। অতএব, এ চুক্তিতে নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত।

লকের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ কর্তৃত্বমূলক শক্তির উত্থান ঘটায় চুক্তির দ্বারা এবং জনসম্মতিতে অপর ব্যক্তি কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করে। কাজেই লকীয় আলোচনায় আমরা লক্ষ করি রাষ্ট্রের ন্যায্যতার প্রশ্নে তিনি দেখালেন কীভাবে এর কর্তৃত্ব ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বায়ত্তশাসনের সাথে সমন্বিত হতে পারে।[৬৬] রাষ্ট্রের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের এই প্রশ্নে অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসনের সাথে কর্তৃত্বের সমন্বয় হলো ব্যক্তিগত সম্মতি এবং সামাজিক চুক্তি দ্বারা। এভাবেই লক সহ অন্যান্য চুক্তিবাদীগণ মনে করেন রাষ্ট্র তখন বৈধ হয় যখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নামক কর্তৃত্বমূলক শক্তি/কর্তৃপক্ষ গড়ে ওঠে।

লক জনগণের কাছে সরকার পরিবর্তনের তথা বিদ্রোহের অধিকার দিয়েছেন, যা অনেক রাষ্ট্রদার্শনিকের কাছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারক। তবে লকের জনগণ যতটা না রাজনৈতিক কারণে সরকারের পরিবর্তনে প্রয়াসী তার চেয়ে অধিক বিবেচ্য ছিল সম্পত্তির সুরক্ষায়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা ও সংরক্ষণের প্রয়াসেই জনগণকে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। লকের চুক্তিতত্ত্ব রাজনৈতিক কারণের চাইতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষার প্রচেষ্টার অংশরূপে বিশেষ গুরুত্ববহ। সম্পত্তি তথা অর্থনীতি যে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি, জনমানসের প্রকৃতি নির্ণায়ক, সরকারের ক্ষমতায়ন এবং স্থায়িত্বকাল নির্ধারক তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লকের সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব। লকের রাজনৈতিক ক্ষমতার সংজ্ঞায়নে এটা স্পষ্ট যে প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ তাদের সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করার তাগিদে সামাজিক চুক্তি করেছে।

লক মনে করেন রাজনৈতিক শক্তিরূপে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা উৎসরিত ব্যক্তির স্বেচ্ছামূলক বা স্বতঃপ্রণোদিত বাধ্যতাবোধ থেকে। স্বেচ্ছামূলক বাধ্যতাবোধ বলতে লক বোঝান ব্যক্তি স্বীয় সম্মতিতে কর্তৃত্বমূলক রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করেছে; অপরের দ্বারা ব্যক্তি নিজের ওপর রাজনৈতিক শক্তির কর্তৃত্বকে সম্মতি প্রদান করেছে। লকীয় স্বেচ্ছামূলক বাধ্যতার সাথে নৈতিকতার একটি সম্পর্ক রয়েছে বলা যায়, যেমন নৈতিকতাবোধ ব্যক্তির মাঝে স্বশাসন-আত্মনিয়ন্ত্রণের সীমারেখা তৈরি করে। ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে তার স্বেচ্ছায় সৃষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করা।

লকের রাষ্ট্রের ক্ষমতা হবসের মতো অসীম নয়, রাষ্ট্র এখানে সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতা হলো জনগণের কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণের জন্য আইনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্র যদি জনগণের আস্থা ভঙ্গ করে, সুরক্ষা প্রদানে অসমর্থ হয় তাহলে জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রে বিপ্লব অনিবার্য। লকীয় চুক্তিবাদে তিনি জনগণের হাতে বিপ্লবের ক্ষমতা দিয়েছেন, এবং সরকার পরিবর্তনের স্বাধীনতা দিয়েছেন যার বিপরীত চিত্র পাওয়া

যায় হবসীয় রাষ্ট্রচিন্তায়। তবে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হলো, হবস যে ব্যক্তিমানুষ ও ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রগণ্য করেছেন লক তাকে আরো এগিয়ে ব্যক্তিমানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষাকারী হিসেবে সমাজ ও সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির বিষয়টি রাষ্ট্রদর্শনে গুরত্ববহ। ধরে নেওয়া হয়,তাঁর এ চিন্তার সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে গণতান্ত্রিক ভাবধারার। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের প্রতি লক গুরুত্ব দিয়েছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতদ্বৈততা তৈরি হলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মত মূল্যায়িত না হওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। 'তাছাড়া সকলে সমান ক্ষমতাবান ও স্বাধীন এবং ব্যক্তির উপভোগকৃত প্রাকৃতিক অধিকার অলঙ্ঘনীয়'– লকের এ নীতি গ্রহণ করতে গেলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মত সমান গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মানার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠের মত যদি বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অধিকারের অলঙ্ঘ্যতা প্রমাণিত হয় না।

অবশ্য এর উত্তর লকের কাছে পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে চুক্তিবদ্ধ জনগণ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মান্য করার বাধ্যতাবোধ চুক্তির অংশে রয়েছে। জনগণ পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে এ চুক্তি মান্য করার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নেওয়ার এ বাধ্যতাবোধ ব্যক্তিকে প্রকৃতির রাজ্য থেকে আলাদা করে বন্ধনমুক্ত করে।

চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি তার সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। রুশো মনে করেন চুক্তির কোনো ধারার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাহলে পুরো চুক্তিটিই অর্থহীন হয়ে উঠবে। যদি এর কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা হয় তাহলে চুক্তিটি তার কার্যকারিতা হারাবে। তাছাড়া যদি চুক্তির কোনো পরিবর্তন করা হয় তাহলে মানুষ রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্যুত হবে এবং তার স্বেচ্ছায় প্রত্যর্পিত প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তার কাছে পুনরায় ফেরত যাবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এবং তার সমস্ত অধিকারকে সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় বলে রুশো মনে করেন। তাহলে বলা যায় ব্যক্তি সমতা আনয়নের জন্য নিজেদেরকে শূন্যে পরিণত করে। এ অবস্থাতে (রুশো মনে করেন) সংস্থাটি যথার্থ এবং কোনো ব্যক্তি এককভাবে কিছু দাবি করতে পারে না। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তির এ অবস্থার সাথে আমরা সাদৃশ্য টানতে পারি প্লেটোর চিন্তার, যেখানে উভয়েই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের পদানত করেছেন। এধরণের অবস্থায় আমরা রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় এক ধরনের চরম সার্বভৌমত্বের প্রকাশ লক্ষ করি। অবশ্য রুশো মনে করেন এতে ব্যক্তি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, যেখানে নাগরিকগণ অবিচ্ছেদ্য অধিকার ফিরে পায়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বার্থ যদি অভিন্ন না হয়, সাধারণ ইচ্ছা সৃষ্টি হবে না। সাধারণ ইচ্ছা যদি বোধগম্য না হয়, স্পষ্ট না হয় তাহলে সমাজ অস্তিত্বশীল হবে না। সাধারণের স্বার্থের সাথে যদি সাধারণের ইচ্ছা একীভূত না হয় তাহলে সার্বভৌম শক্তি পূর্ণ হবে না। ব্যক্তির একক আদেশ-নির্দেশ সাধারণ ইচ্ছা হবে না। কারণ তা সকলের ইচ্ছার প্রকাশ নয়, একক ইচ্ছা সার্বভৌমের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে না। সাধারণ ইচ্ছা বহির্ভূত কোনো ইচ্ছা আইনও হতে পারে না। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে বলা যায়, রুশোর চুক্তিবাদে যে চরম সার্বভৌমের প্রকাশ তাতে সামষ্টিকতার এবং পরার্থবাদিতার সংশ্লেষণ প্রতিফলিত হয়। সামষ্টিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই সার্বভৌমের শেষ কথা।

তথ্যনির্দেশ

১. Jean Hampton, "Contract and Consent", in *Companion to Contemporary Political Philosophy*, Robert E. Goodin, Philip Pettit, Thomas Pogge (eds.), Blackwell Publishing, Cambridge, 2007, pp. 382-383

২. *Ibid.*, p. 384.

৩. স্ট্যানফোর্ড এনসাইক্লোপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী সামাজিক চুক্তির প্রথম প্রকাশ পাওয়া যায় এপিকিউরাসদের কাছে। মধ্যযুগে *ওল্ড টেস্টামেন্টে* রোমান আইনের আলোচনায় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রবিরোধী আলোচনাতে সামাজিক চুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিককালে ত্রয়ী চুক্তিবাদী ছাড়াও বিচারবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের দর্শনে সামাজিক চুক্তির আলোচনা পাওয়া যায়।

৪. Samuel E. Stumpf, *Socrates to Sartre: A History of Philosophy*, 2nd Edition, McGraw-Hill Book Company, U.S.A. 1975, pp. 234-235.

৫. ননী ভৌমিক (মূল রুশ থেকে অনুবাদ), *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড ২, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭২।

৬. Thomas Hobbes, *Leviathan*, A. P., Martinich, and B., Battiste, (eds.), Revised Edition, Broadview Edition, Canada, 2011, p. 131.

৭. *Ibid.*, p. 128.

৮. *Ibid.*, p. 129.

৯. *Ibid.*, pp.159-161.

১০. *Ibid.*, pp.159.

১১. *Ibid.*, pp. 129-130.

১২. Johann P. Sommerville, *Hobbes's & Absolutism*, in *The Oxford Handbook of Hobbes* A.P., Martinich, and K., Hoekstra, (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 378-396.

১৩. Johann P. Sommerville, *Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context*, Macmillan Press Ltd., London, 1992, pp. 57-60.

১৪. Russell Hardin, "Hobbesian Political Order", vol. 19, No. 2, Sage Publications, 1991, p.156.

১৫. S. A. Lloyd, *Ideals as Interests in Hobbes's Leviathan: The Power of Mind Over Matter*, Cambridge University Press, 1992, pp. 289-321.

১৬. Hobbes, *Leviathan*, Ch. xiv.

১৭. Howard Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Clarendon Press, Oxford, 1970, p. 30.

১৮. *Ibid.*, pp. 30-31.

১৯. *Ibid.*, pp. 31-34.

২০. *Ibid.*, p. 35.

২১. George Klosko, "Multiple Principles of Political Obligation", *Political Theory*, Vol. 32, No. 6, Sage Publications Inc., Dec. 2004, pp. 4-5.

২২. Peter Vallentyne, *Contractarianism and Rational Choice: Essays on David Gauthier's Morals By Agreement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, pp. 25-28.

২৩. John Locke, *Two Treatises of Government*, Peter Laslett (ed.), Ch. VII, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1967, pp. 111-112.

২৪. *Ibid.*, Ch. viii, sec. 89.

২৫. *Ibid.*

২৬. Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised Edition, Oxford University Press, New York, 2006, p. 36.

২৭. M. F. Griffith, "John Locke's Influence on American Government and Public Administration," *Journal of Management History*, Vol. 3, No.3, Emerald Group Publishing Limited, 1997, pp. 224-237.

২৮. Locke, *Two Treatises of Government*, Ch. II, § 6, 7, 8.

২৯. *Ibid.*, §119.

৩০. Theodore Waldman, "A Note on John Locke's Concept of Consent", *Ethics*, Vol. 68, No.1, University of Chicago Press, Oct. 1957, pp. 45-50.

৩১. Locke, *Two Treatises of Government*, Ch. II, §121 p. 367.

৩২. *Ibid.*, Ch. II, §119.

৩৩. *Ibid.*, Ch. II, §116.

৩৪. Theodore Waldman এর মতে, "the major difference in the two sorts of consent is found in that to which one agrees rather than the manner in which one signifies his agreement, it would appear to be less ambiguous if that difference were emphasized by reference to the conditions of the agreement rather than to the way in which it was given. Instead, then, of referring to express and tacit

consent, it would be far less ambiguous to use some such notions as "member" and "non-member" consent." Waldman, "A Note on John Locke's Concept of Consent", *Ethics*.

৩৫. A. John, Simmons, "Tacit Consent and Political Obligation", *Philosophy & Public Affairs 5*, Vol. 5, Spring, 1976, p. 246.

৩৬. Locke, *Two Treatises of Government*, Ch. II, p. 376.

৩৭. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, p. 142.

৩৮. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau*, Oxford University Press, London, 1982, p. 173.

৩৯. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory*, Thomas Nelson and Sons Ltd., London, 1970, p. 15.

৪০. Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Maurice Cranston (trans.), Penguin Books, 1968, p. 198.

৪১. Macfarlane, *Modern Political Theory*, p. 16.

৪২. Jean-Jacques Rousseau, *Discourse On The Origin of Inequality*, Donald A. Cress (trans.), Indiana Polis, Cambridge, 1992.

৪৩. Rousseau, *Discourse On Inequality*, The Floating Press, 2009.

৪৪. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৩৬।

৪৫. W. T. Jones, *Masters of Political Thought: Machiavelli to Bentham*, Reprint Edition, Vol. 2, Houghton Mifflin Co., 1966, p. 254.

৪৬. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, পৃ. ৩৬।

৪৭. *প্রাগুক্ত*।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

৪৯. *প্রাগুক্ত*।

৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. অঃ ৫, ৬।

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬।

৫৩. *প্রাগুক্ত*।

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৫৬. প্রদীপ কুমার রায় (অনূ.), *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, খণ্ড ৩, অবসর প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৩।

৫৭. Arthur M. Melzer, “Rousseau's Moral Realism: Replacing Natural Law with the General Will”, Vol. 77, Issue. 3, Cambridge University Press, 1983, pp. 633-651.

৫৮. Ernest Barker (ed.), *Social Contract: Locke, Hume, Rousseau*, pp. 174-175.

৫৯. *Ibid.,* p. 160.

৬০. *Ibid.*, p. 173.

৬১. *Ibid.*, p. xxxi.

৬২. *Ibid.*, p. xxx.

৬৩. *Ibid.*, p. xxxiv.

৬৪. Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Maurice Cranston (trans.), Penguin Books, 1968, pp. 207-8.

৬৫. Macfarlane, *Modern Political Theory*, p. 17.

৬৬. Wolff, *An Introduction to Political Philosophy,* p. 35.

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন

আধুনিককালের পূর্বেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে সামাজিক চুক্তির ধারণা পাওয়া যায়। যেমন– *ওল্ড টেস্টামেন্টে* সামাজিক চুক্তির আলোচনা এসেছে। ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে রিচার্ড হুকার সামাজিক চুক্তির রূপরেখা প্রণয়ন করেন।[১] আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে বিশেষত ষোড়শ শতাব্দী থেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এ সময় থেকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি, বুর্জোয়া সমাজের উত্থান, বণিক বা ব্যবসায়ী শ্রেণির আর্বিভাব এবং রাজনীতিতে এ শ্রেণির প্রভাব, চার্চের তথা ধর্মের প্রভাব রাজনীতিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ সামাজিক চুক্তি মতবাদকে নতুনভাবে আলোচনায় নিয়ে আসে। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ ভিন্নভাবে আধুনিককালের চুক্তিবাদীদের লেখনীতে বিশ্লেষিত হয়েছে। চুক্তিবাদে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে আধুনিক কালের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সরকার, জনগণ, অর্থনীতি ও ক্ষমতা– এ সকল বিষয়সমূহ সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো মানুষকে বাদ দিয়ে বিমূর্ত চিন্তার পরিবর্তে আধুনিক রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে মানুষ ও ইহজাগতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষমতা। এ রাজনৈতিক ক্ষমতা কখনো সাধারণ মানুষকে নীরব প্রজা করেছে, কখনো ব্যক্তি মানুষকে করেছে বিপুল সম্পদের অধিকারী, আবার কখনো বা সাধারণের সম্মতিতে এ ক্ষমতা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে জনগণ, অর্থ-সম্পদ, রাষ্ট্রের একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায়, রাষ্ট্রের উত্থানে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারের সাথে মানুষের সচেতনতার, সম্মতির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে বিমূর্ততার পরিবর্তে মানবকেন্দ্রিকতাবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সামষ্টিকতাবাদী এবং লোকায়ত রাজনীতির চর্চা শুরু হলো।

এ অধ্যায়ে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে হবস, লক ও রুশোর মতবাদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব বিষয়ে পরবর্তীকালের রাষ্ট্রদার্শনিকদের মত তুলে ধরা হবে। তুলনামূলক এ চিত্রণে লক্ষণীয় হলো হবস ও লকের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন মূলত আত্মস্বার্থবাদিতা, পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে রূশোর রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বার্থ সামষ্টিক স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতার একটি বিশেষ স্থান লক্ষণীয়।

হবসের দৃষ্টিভঙ্গি

মানুষের রাজনৈতিক জীবনের পেছনে মূল চেতনারূপে কাজ করে শান্তি, নিরাপত্তার আকাঙ্খা এবং আত্মসুরক্ষা। বেঁচে থাকার তাগিদ ব্যক্তিকে ক্রমশ উচ্চতর জীবনব্যবস্থার দিকে ধাবিত করেছে। তাই মানুষ প্রকৃতির রাজ্য থেকে কালক্রমে রাজনৈতিক সমাজের দিকে অগ্রসর হয়েছে। রাষ্ট্রহীন অবস্থা থেকে রাষ্ট্রে পদার্পন করেছে। ব্যক্তির স্বীয় সংরক্ষণনীতি তাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, ব্যক্তি শারীরিক যে কোনো দুঃখ-যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়। আত্মসংরক্ষণের কারণে ব্যক্তির মাঝে তৈরি হয় স্বার্থ-সংঘাত। স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যক্তির অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের যে প্রবৃত্তি, তা তাকে সংঘাতের দিকে পরিচালিত করে। এধরণের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে সরকার এবং আইন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মানুষের কেন সরকার এবং আইনের প্রয়োজন? কীভাবে সরকার এবং আইন বৈধতা লাভ করে? এর উত্তরে হবস বলেন, যদি সরকার এবং আইন না থাকে তাহলে যে কোনো ধরণের কাজ অনুমোদিত হয়ে পড়ে। আর সকল কাজই যদি অনুমোদিত হয় তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করার অধিকার থাকে ও সে ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি অপরের জীবন নিয়েও যা ইচ্ছা তা করতে পারে। এভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়। যা পরিবেশকে যুদ্ধময় করে তোলে। এধরণের পরিস্থিতি থেকে নিস্তারে সরকার ও আইন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ব্যক্তির স্বীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলার সাথে আইন ও সরকার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

মানুষ তার রাজনৈতিক জীবনে স্বীয় সুরক্ষার জন্য কিছু অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হলো। রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম শর্ত হলো পারস্পরিক সমঝোতা– যা চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ক্ষমতা বা শক্তি। ক্ষমতার ভারসাম্য তথা নিয়ন্ত্রণ রাজনীতিতে মানুষের জীবনকে সন্দেহাতীতভাবে প্রভাবিত করে। হবসীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক সার্বভৌম এবং মানুষের জীবনের সকল বিষয়ের উপর সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। প্রজার প্রায় সকল সুরক্ষা বিধান করা সার্বভৌমের লক্ষ। রাজনীতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সার্বভৌম বিধায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় স্বীকৃত নয়। পক্ষান্তরে লকীয় রাষ্টব্যবস্থা যা মূলত অভিজাততান্ত্রিক এবং উদারতাবাদী, তাতে ক্ষমতার বিভাজন স্বীকৃত। যেমন– যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারব্যবস্থায় আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের এই তিনটি বিভাগের কাছে ক্ষমতা বিভাজিত।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়– সার্বভৌমের সাথে প্রজা বা নাগরিকের সম্পর্ক কেমন? প্রজার প্রতি সার্বভৌমের কোনো বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতা আছে কি? আবার প্রজারা যদি তাদের সকল অধিকার ত্যাগ করে তাহলেও কি সার্বভৌম প্রজাদের অধিকারের প্রতিনিধিত্বকারী থাকে? যদি সার্বভৌম প্রজাদের অধিকারের প্রতিনিধি হয়ে থাকে, তাদের অধিকারকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করে থাকে তবে প্রজাদের অধিকার ত্যাগের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এধরণের প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হবসের কাছে লক্ষ করা যায় নি।

হবস *লেভিয়াথান* গ্রন্থে সার্বভৌমকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী "মরণশীল ঈশ্বর"– এর সাথে তুলনা করেছেন। এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে হয়। মানুষের চরিত্র সম্পর্কে হবস যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা এরিস্টটলের মানবপ্রকৃতির বিপরীত। এরিস্টটল মানুষকে স্বভাবগতভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাণী বলেছেন, কিন্তু হবস মানুষের মাঝে চিত্রিত করেছেন স্বভাবজাত স্বার্থপরতা এবং 'নিঃসঙ্গতা'। হবসের কাছে রাষ্ট্র একটি আদি নয় বরং কৃত্রিম সংস্থা, নৈতিক নয়, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের স্রষ্টা ঈশ্বর নয়, মানুষ। বলা যায়, ঈশ্বর যেভাবে জগত সৃষ্টি করেছেন মানুষ সেভাবে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। মানুষের মধ্যে এক প্রকার অহংবোধ সর্বদা কাজ করায় মানুষ সহজে অপরকে মান্য করতে চায় না, বাধ্যতা বা কৌশলগত কারণে মানুষ অপরের প্রতি (ধৈর্যশক্তি/ কর্তৃত্বের প্রতি) মান্যতা প্রদর্শন করতে চায় না।[২] হবস সেক্ষেত্রে মানুষের আনুগত্য প্রদর্শনে এক প্রকার শক্তি বা চাপ প্রয়োগকারী ক্ষেত্র তৈরি করেছেন যাতে রাজনৈতিক সত্তারূপে মানুষ অনুগত থাকে। হবসের সার্বভৌম বা লেভিয়াথান হলো এমন এক শক্তি যা বৈশিষ্ট্যে ঈশ্বরের শক্তির সমতুল্য; যেমন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচারের ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং প্রকৃতির রাজ্যের বিপদ থেকে জনগণকে রক্ষার ক্ষমতা– এসব ক্ষমতা সার্বভৌম নামক এক রাজনৈতিক পরিত্রাতার কাছে রয়েছে যা ব্যক্তি এককভাবে নিজের জন্য করতে পারে না। এ থেকে বোঝা যায় হবস কেন সার্বভৌমকে ঈশ্বরের প্রতিভূরূপে দাবি করেছেন।[৩]

হবসের রাষ্ট্র ও মানুষের রাজনৈতিক জীবন উভয়ের সাথে ক্ষমতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ম্যাকিয়াভেলির শক্তিরাজনীতি রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বা রাষ্ট্রদর্শনে এক নতুন মেরুকরণ সূচিত করে। যার ফলে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যখন পদাপর্ণ করে তখন শক্তির প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ

করে। হবসের মতে মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। মানুষ শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে; উচ্চতর শক্তির (যা ব্যক্তির চেয়ে উর্ধ্বতন) প্রতি ব্যক্তির ভীতিমিশ্রিত আনুগত্য কাজ করে। কাজেই বলা যায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা তথা সার্বভৌম শক্তির কাছে ব্যক্তির শান্তি, আনন্দ যদি নিশ্চিত হয় তাহলে সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তির জন্য অসুবিধার না হয়ে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের আদর্শ হয়ে ওঠে। আবার বিপরীত দিকে সরকারও জনগণের জন্য এমন কোনো কাজ বা চুক্তির অনুমোদন করবে না যা শান্তি ভঙ্গ করে। হবসের রাজনৈতিক সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায় রাজনৈতিক সরকার, আইন, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্রে জনগণের পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ কিংবা নৈতিক মূল্যবোধের মতো বিষয়সমূহ বিশেষ প্রাধান্য পায়নি। বরং তাঁর দর্শনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা উহ্য থেকে গেছে।

হবসের মতে আত্মরক্ষা ও নিরাপদ জীবনের তাগিদ তথা আকুতি প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে রাজনৈতিক জীবন গঠনে উদ্ধুদ্ধ করে। এই তাগিদই ব্যক্তিকে নাগরিক জীবন তথা রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাড়িত করে। আত্মরক্ষা, স্ব-স্বার্থ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং তা নিশ্চিতকরণে সামষ্টিক ভূমিকা এ সকল বিষয় ব্যক্তিকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। আইনের প্রতি ব্যক্তির দায়বদ্ধতা ব্যক্তির স্বীয় স্বার্থেই। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং উন্নততর জীবন প্রাপ্তির লক্ষ্যে মানুষ গড়ে তোলে রাজনৈতিক সমাজ। এসব শর্ত পূরণ বা সুবিধার নিশ্চয়তা বিধানের বিনিময়ে রাজনৈতিক সমাজ বা সার্বভৌম দাবি করলো রাষ্ট্রের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য। এ সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, যা হবসের কাছে সরকারের অস্তিত্বশীলতার সমার্থক।

প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা প্রাপ্তির বিনিময়ে সার্বভৌম শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে তারা সম্মত হয়। হবস জননিরাপত্তা নিশ্চিতে অখণ্ড, অবিভাজ্য ক্ষমতাসম্পন্ন একক কর্তৃত্বশীল একটি রাজনৈতিক শক্তির কথা বলেন যাতে জনগণকে নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। হবস প্রকৃতির রাজ্যের নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির মুক্তিদাতারূপে যে লেভিয়াথান বা সার্বভৌম শক্তি সৃষ্টি করলেন সে সার্বভৌম তিনি 'মরণশীল ঈশ্বর' রূপে দাবি করলেন। 'মরনশীল' এই ঈশ্বর স্বাভাবিকভাবেই ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে । নৈরাজ্য দমনে অথবা নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তিদানে এ ঈশ্বরকে সহায়তাদানে থাকবে তরবারি ও ক্রুশদণ্ড উভয়ই।

হবসীয় রাষ্ট্র সর্বতোভাবে কর্তৃত্ববাদী কিন্তু পুরোপুরি দমনমূলক এমন দাবি করা যাবে না। কারণ কর্তৃত্ববাদী (বা কারো কারো মতে সর্বাত্মকবাদী) হলেও যে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রকৃতি হবস উল্লেখ করেছেন তাতে জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং জনগণের স্বার্থের সংরক্ষণ এর রাজনৈতিক দমন-পীড়নকে ছাপিয়ে গেছে। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ যে লক্ষ্যে আধুনিক রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করেছে তাদের সে আশা হবসের রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়েছে বলা যায়। তাঁর রাষ্ট্রের প্রকৃতি, প্লেটো বা এরিস্টটলীয় রাষ্ট্রদর্শনের মতো কেবল নৈতিকতা-নির্ভর না হয়ে শক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে। সেই সাথে রয়েছে শাস্তির ভীতি, আনুগত্য প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা। হবসীয় রাষ্ট্রদর্শনে মানুষের রাজনৈতিক জীবনে বাধ্যতামূলক কিংবা জোরপূর্বক আনুগত্য আদায়ের একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পরবর্তীতে এ ধারাটি বিস্তৃত হয়েছে, অব্যাহত রয়েছে। হবসীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে এও লক্ষ করা যায়। ধর্মের প্রভাব ব্যতিরেকে, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু বিভাজনে না গিয়েও রাজনৈতিক সদিচ্ছা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনে মূল নিয়ামক হতে পারে। ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রায় শত বছর পূর্বেই ম্যাকিয়াভেলি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দাবি করেন ইউরোপীয় রাজনীতি মূলত জাতীয় অথবা ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও স্বার্থপরতার উপর দাঁড়িয়ে আছে।[৪] ম্যাকিয়াভেলির উক্তিটির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় হবস ও লকের লেখনীতে তৎকালীন ইংল্যান্ডের জনজীবন পর্যালোচনা করলে। হবসের প্রকৃতির রাজ্যের আলোচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও ব্যক্তির ক্ষমতার মোহ কেবল প্রাক-রাজনৈতিক নয়, রাজনৈতিক সমাজেও অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে লকের রাষ্ট্রদর্শনে ক্ষমতা নয়, সম্পত্তির প্রতি আগ্রহই রাজনীতির চালিকাশক্তি হয়ে উঠলো।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং আইনের কর্তৃত্বের উপস্থিতি হবসের কাছে উপযোগবাদী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দিক থেকে গৃহীত হয়েছে, তা এই অর্থে যে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজকে স্বার্থ পূরণের একটি মাধ্যমরূপে গণ্য করে। আবার মানুষ আইনের উপস্থিতি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য মনে করে যতক্ষণ এগুলো ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে সক্ষম।

হবসের রাষ্ট্রে সামষ্টিক মঙ্গলের স্বার্থ তথা হিতবাদী চিন্তা গৌণ, বরং সামষ্টিক স্বার্থ এখানে চিত্রিত হয়েছে সকলের ব্যক্তিগত স্বার্থের যূথবদ্ধতারূপে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা মুখ্য।এ রাজনৈতিক সমাজের একটি সুস্পষ্ট প্রকৃতি হলো বিনিময় তথা সুবিধাপ্রাপ্তি। রাষ্ট্র স্পষ্টতই একটি বিনিময় সংস্থা, উপযোগবাদী সংস্থা। যেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিগত আবেগ, শ্রদ্ধা কিংবা আনুগত্য নির্দেশিত হয়েছে ক্ষমতার মানদণ্ডে, ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রশ্নে পক্ষান্তরে লকের কাছে তা মূল্যায়িত হয়েছে সম্পত্তির সুরক্ষার মানদণ্ডে।

হবসের রাষ্ট্রদর্শনে ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং সমকালীন রাজনৈতিক সমাজেও ক্ষমতা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার। ক্ষমতার প্রতীকরূপে হবস ব্যবহার করেছেন তরবারিকে। তিনি মনে করেন, তরবারি অর্থাৎ শক্তির উপস্থিতি যেভাবে মানুষের অসৎ প্রবৃত্তি, হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা অন্যান্য রিপুসমূহকে সংযত করার ক্ষমতা রাখে তা অন্যভাবে সম্ভব নয়। কাজেই তরবারি বা শক্তির ভয় ব্যতীত বা শক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোনো চুক্তি সফল হতে পারে না এবং এক্ষেত্রে চুক্তিসমূহকে তিনি 'বাগাড়াম্বরপূর্ণ'[৫] মনে করেন যা কোনো একজন ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদানেও সক্ষম হয় না।[৬] হবসের রাজনৈতিক দর্শনে শক্তি বা ক্ষমতা সরকারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। শক্তির ব্যবহার হোক বা না হোক সরকারের উপস্থিতি বা অস্তিত্বশীলতার সাথে শক্তি থাকতেই হবে।

হবসের রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিলো চরম রাজতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। তিনি তাঁর লেখনীতে রাজতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন ও তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন এবং স্টুয়ার্ট রাজাদের সমর্থন ও বিপ্লবীদের বিরোধিতা করেছিলেন। এর ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থে , যাতে তিনি চরম শাসনব্যবস্থা তথা রাজতন্ত্রকে অকুণ্ঠ সমর্থন এবং রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের বিপ্লবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। যদিও হবসের মতবাদ কালক্রমে শাসকগোষ্ঠী এবং বিপ্লবী গোষ্ঠী উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। তথাপিও স্যাবাইন মনে করেন হবসের লেখনী রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। 'ঊনবিংশ শতকে তাঁর চিন্তাধারা উপযোগিতাবাদী দর্শন ও জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বে সন্নিবেশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। হবসের চিন্তাধারা মধ্যবিত্ত উদারপন্থীদের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে ...।'[৭]

সামাজিক চুক্তির ফলে যে রাজনৈতিক সমাজের আর্বিভাব চুক্তিবাদীগণ বিবৃত এবং বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে চুক্তিবাদীদের চিন্তায় একটি অভিন্নতা লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় লোকায়াত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। রাজনৈতিক নেতা বা নেতৃত্বের রাজনৈতিক মেরুকরণ হয়। রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি দ্বারা জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। আইন, স্বাধীনতা, সমতা, অধিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায় মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চার্চকেন্দ্রিক যে প্রভাব বা রাজনীতিতে চার্চের তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের যে আধিপত্য তা এ সময় হ্রাস পায়। চার্চের আধিপত্য নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা। ধর্ম থেকে রাজনীতিকে পৃথকীকরণের যে প্রক্রিয়া ম্যাকিয়াভেলির হাত দ্বারা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় হবস, লক ও রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় সে প্রক্রিয়াটি আরো বেগবান হয়। চুক্তিবাদীগণ চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌমত্ব, সম্পদভিত্তিক পুঁজিবাদী সরকার কিংবা জনসাধারণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার সকল ক্ষেত্রেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কিংবা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে গ্রহণ করেননি। তাদের লেখনীতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ধর্মের ব্যবহার কিন্তু নিষিদ্ধ হয়নি, কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাসের ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করা হয়নি। তবে পূর্বের মতো ধর্মভিত্তিক বা চার্চকেন্দ্রিক রাজনীতির স্থলে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে বাদ দেয়া হয়েছিলো।

যদিও সমকালীন রাজনীতিতেও ধর্ম ও রাজনীতির পৃথক ব্যবহারের ধারাটি অব্যাহত আছে এমনটি দাবি করা যাবে না।

সামাজিক চুক্তিবাদের দ্বারা সৃষ্ট মানুষের রাজনৈতিক জীবনে ধর্মীয় কর্তৃত্ব হ্রাস পায় এবং মানুষ ইহজাগতিকতার দিকে ধাবিত হয়। মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়। রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা, নির্দেশনার জন্য মানুষ চার্চ বা ধর্মগুরুর মুখাপেক্ষী না থেকে সর্ম্পূণ রাজনৈতিকভাবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মার্সিলিয়াস অব পাদুয়ার দ্বারা সূচিত আধ্যাত্মিক ও ইহজাগতিক কর্তৃত্বের মধ্যেকার অর্থাৎ, এদের উভয়ের মাঝে সৃষ্ট বিভেদরেখা চুক্তিবাদীদের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা পায়। চুক্তিবাদীদের সমাজদর্শনেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন– বস্তুবাদী দার্শনিক হবসের কাছে পারলৌকিক বস্তুতে বিশ্বাস ভ্রান্তিকারক গণ্য হয়েছে। হবস রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্থলে, রাষ্ট্রের উপর চার্চের কর্তৃত্বকে একটি মৌলিক ত্রুটিপূর্ণ বিশ্বাস মনে করেন। রাজনীতিতে চার্চের স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ বা পরিচলনা-পদ্ধতি বিষয়ে হবসের আপত্তি ছিলো। জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থানের পরে মানুষের ইহজাগতিক চিন্তাভাবনা যত বেশি শক্তিশালী হলো ততই চার্চের দৌরাত্ম্য হ্রাস পেল। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেল। এরই ধারাবাহিকতায় হবসের চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম শক্তি চার্চকে নিয়ন্ত্রণ করলো, সার্বভৌমত্ব হয়ে উঠে চার্চের প্রধান। চার্চ তার স্বাতন্ত্র্য হারালো। চার্চের একচ্ছত্র ক্ষমতা লুপ্ত হলো এবং চার্চ যৌথ সংস্থারূপে গণ্য হলো। সার্বভৌমের নির্দেশে চার্চের শিক্ষাদান-পদ্ধতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হলো। তাহলে বলা যায়, এতকাল চার্চ বা ধর্মকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এসবের অধিপতিগণ ধর্মীয় বাতাবরনের দোহাই দিয়ে মানুষের ইহজাগতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে পারলৌকিকতার প্রতি তাদের অধিক মনোযোগী করে রেখেছে। এর দ্বারা ধর্মগুরুগণ জনগণকে শোষণ করে স্বীয় প্রভাব- প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে ফুলে-ফেঁপে উঠলো। যার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসেবে আর্বিভূত হলো যা লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরোপুরি রাজনৈতিক। রাজনীতি কেবল সরকার গঠন কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে বিবেকের স্বাধীনতাকে যুক্ত করে; ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বনাম নিয়ন্ত্রণবাদ বনাম সামষ্টিকতাবাদ এসকল বিষয়সমূহও রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ধারায় জয়জয়কার শুরু হয় রেনেঁসা পরবর্তী রাজনৈতিক ধারাতে। যেধারা হবস ও লকের লেখনীতেও প্রত্যক্ষভাবে প্রতিভাত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সাথে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে আত্মস্বার্থের। ব্যক্তির আত্মস্বার্থবাদী এ প্রবণতা কেবল ব্যক্তিগত জীবনেই সীমিত না থেকে তা বিস্তৃত হলো মানুষের সামষ্টিক জীবনে। তাদের জাতীয় জীবনে আত্মস্বার্থবাদী মানুষ চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন শক্তির কাছে নিজেকে নত করতে পছন্দ করলো বা বাধ্য হলো। কারণ এ শক্তি ক্ষমতার শক্তি, যা ব্যক্তিকে এবং রাষ্ট্রকে দেবে নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, অখণ্ডতা, সংহতি। চরম ক্ষমতাসম্পন্ন এ শক্তি যখন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করলো এটি তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বৈধতা দানের জন্য দ্বারস্থ হলো আইনের। আইনের দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি জনগণের আনুগত্য (স্বেচ্ছা বা বলপূর্বক যাই হোক) অর্জন করলো, আর ব্যক্তিমানুষ আত্মস্বার্থের সংরক্ষণকে জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করলো। আধুনিককালে সূচিত রাজনীতির এ ধারা সমকালীন যুগেও সমানভাবে ক্রিয়াশীল। হবসের *লেভিয়াথান* গ্রন্থের আলোকে একটি বিষয় লক্ষনীয়-তা হলো তিনি সার্বভৌমের অখণ্ডতা ও চরম ক্ষমতা সংরক্ষণের জন্য প্রজা বা নাগরিকের কাছে থেকে অকুণ্ঠ আনুগত্যের প্রকাশকে বাধ্যবাধকতা রূপে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া নাগরিকের অন্য কোনো করণীয় বা দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা তেমন লক্ষণীয় নয়।

হবসের কাছে শান্তির সাথে ক্ষমতা সম্পর্কিত এবং সে ক্ষমতা থাকবে সরকারের কাছে। সরকার তার বিরোধিতাকারী যা রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করে বা সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এমন যে কোনো বিরোধিতাকে সরকার দমন করবে, আর সেজন্য সরকারের থাকবে একচ্ছত্র ক্ষমতা। হবসীয় রাজনৈতিক মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে

স্পষ্ট বোঝা যায় যে মানুষকে যা আনন্দ দেয় তেমন জিনিসই ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে, প্রত্যাশা করে। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে তার সুযোগ-সুবিধার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। হবসীয় তত্ত্বে জনগণের কাছে বিপ্লবের যে অধিকার প্রায় অস্বীকৃত হয়েছে সেটিকে এভাবে আমরা ভাবতে পারি যে, জনগণ তাদের প্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রাপ্তির কারনে যখন আনন্দ উপভোগ করে তাহলে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কিংবা সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনে দুঃখের কারণ নয়।

রাষ্ট্রদর্শনে হবসের অবস্থানকে ল্যামপ্রেট প্লেটোর সাথে তুলনা করেছেন। যেমন– প্লেটোর মতে সর্বোচ্চ আইনের বিদ্যমানতা সর্বোচ্চ বিষয় নয়, বরং প্রজ্ঞা এবং রাজকীয় গুণের উপস্থিতিসম্পন্ন ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ।[৮] Hobbes and Hobbism এ প্রবন্ধে ল্যামপ্রেট বলেন হবস যুক্তি অপেক্ষা কর্তৃত্ববাদের উপর আস্থাশীল হয়েছেন। এভাবে তিনি রাজনৈতিক সমাজের সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছেন।[৯] হবস ও লকের রাষ্ট্রচিন্তার তুলনায় ল্যামপ্রেট বলেন, স্বৈরাচারের ভয়ে লক আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন বা বলা যায় আইনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। পক্ষান্তরে হবস নৈরাজ্যের ভয়ে আবেদন জানিয়েছেন স্বৈরাচারের প্রতি। যদিও হবস প্রচলিত আইন কিংবা প্রজা সকলকেই রাজার অনুগত করেছেন। হবস মানবপ্রকৃতিতে প্রজ্ঞার ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক জীবনাচরণ চিত্রিত করেননি। যা তাঁর তত্ত্বের একটি দুর্বলতা বলা যায়। স্পষ্টতই প্রজ্ঞার পরিবর্তে শক্তি বা ক্ষমতা যদি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে কিংবা সর্বাত্মকবাদে পরিণত হয় তবুও সেরূপ ক্ষমতাকে 'সার্বভৌম' নাম দিয়ে তার উপরই হবস আস্থা স্থাপন করেছেন। আর এধরণের ক্ষমতাকে বৈধকরণের চেষ্টা করেছেন।

হবসীয় রাষ্ট্রদর্শনে চরম ক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম শাসকের প্রতি প্রজার অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন এবং শাসকের প্রতি জনগণের নিরঙ্কুশ আনুগত্যের দাবি প্রতিফলিত। পক্ষান্তরে লকের রাষ্ট্রদর্শনে জনগণের কাছে সরকার, শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক দিকসমূহ পরোক্ষভাবে গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। এর কারণ লকীয় রাষ্ট্রদর্শনে জনগনের কাছে প্রত্যক্ষভাবে সমাদৃত ছিলো তাদের সম্পত্তির অধিকার, প্রাকৃতিক অধিকারের সংরক্ষণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারার উদগাতারূপে লকের দর্শনের যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তাকে আত্মস্বার্থবাদী বলে গণ্য করা যায়। যদিও হবসীয় রাষ্ট্রদর্শনে জনগণকে আত্মস্বার্থবাদী, স্বার্থপর, হিংস্ররূপে রাষ্ট্র বিশ্লেষকগণ এমনকি হবস নিজেও মানবচরিত্র অঙ্কনে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে মানবচরিত্র সম্পর্কে হবস অপেক্ষা লকের ধারণাকে অধিকতর উদারতাবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রূপে দেখা হয়। লকের রাজনৈতিক সমাজে জনগণের যে প্রকৃতি তাও আত্মস্বার্থবাদী । এই স্বার্থবোধ পরিচালিত ও বিস্তৃত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ ও দাবি তাকে কেন্দ্র করে। যদিও লকের রাজনৈতিক সমাজচিত্রে নৈতিকতার সুস্পষ্ট ভূমিকা তিনি উল্লেখ করেছেন। তথাপিও এ নৈতিকতা কতটা প্রকৃত অর্থে সামষ্টিক বা উপযোগবাদী তথা হিতবাদী তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ হিতবাদিতা যদি সম্পত্তির অধিকার দ্বারা নির্ধারিত হয় কিংবা উপযোগবাদিতা যদি অধিক সংখ্যক মানুষের সুখ (যে সুখ পুরোপুরি ব্যক্তিগত ও বৈষয়িক)–কে কেন্দ্র করে হয়, তাতে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি থেকেই যায়।

লকের ধারণা

লকীয় রাজনৈতিক সমাজ অধিকতর গণতান্ত্রিক, কারণ এখানে সরকার,সমাজ,রাজা, সংসদ তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। তবে বিষয়টিকে বিপরীতভাবে মূল্যায়ন করলে দেখা যায়– এ সমাজ যতটা না গণতান্ত্রিক তদপেক্ষা অধিকতর বা কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই পুঁজিবাদী এবং অভিজাতকেন্দ্রিক। এখানে জনগণের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতার দায়বদ্ধতার যে দাবিটি করা হয় তা অযথার্থ। প্রকৃত বিচারে এখানে রাজনৈতিক সমাজের ও রাজনৈতিক শক্তির দায়বদ্ধতা বিত্তের কাছে, ধনতান্ত্রিক সমাজের কাছে, আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে সেই 'ক্ষমতার কাছে'। যে ক্ষমতার কারণে হবসের দর্শন সমালোচিত হয়েছে সর্বাত্মকবাদী রূপে তা লকের দর্শনেও লক্ষ

করা যায়। যদিও এরকম প্রভেদ করা যেতে পারে যে, হবসের ক্ষমতা রাজনৈতিক এবং লকের ক্ষমতা অর্থনৈতিক। লক্ষণীয় হলো হবসের রাজনৈতিক ক্ষমতা সর্বগ্রাসীরূপে চিহ্নিত হলেও পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ, রাষ্ট্রদার্শনিকগণ লকের অর্থনৈতিক ক্ষমতার প্রতি রাষ্ট্র ও জনগণের সমর্পণে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠেন নি। লকের রাজনৈতিক সমাজে শাসক-শোষিতের বিভেদের বিষয়সমূহকে তাত্ত্বিকগণ এড়িয়ে গেছেন এবং অভিজাতগোষ্ঠী বা পুঁজিপতি সমাজ কর্তৃক রাজনৈতিক সরকারের নিয়ন্ত্রণকে চিত্রিত করা হয়েছে সামাজিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠানের পদক্ষেপরূপে।

ব্যক্তির রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণের কারনে তাদের আরাম, নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন এবং সম্পত্তির নিরাপদ উপভোগ। লকের মানব সমাজের রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ তাই বিশেষত ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলা যায়; যাতে রয়েছে ব্যক্তির স্বীয় আরাম, নিরাপত্তার অধিকতর চাহিদা, যাতে রয়েছে ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণের পাশাপাশি বৃহত্তর নিরাপত্তাবোধ, যা অপরের স্বাধীনতাকে বিঘ্নিত করে না। লকীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ছিলো আপাত শান্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ ও যুক্তিভিত্তিক। বিপ্লব বা বিদ্রোহের স্বীকৃতি প্রদান দ্বারা লক রাষ্ট্রদর্শনে সমাদৃত হয়েছেন। জনগণের অধিকারের রক্ষাকারীরূপে তিনি স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু জনগণের বিপ্লবের যে অধিকার তা রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাভুক্ত। *Second Treatise*– এর অষ্টম অধ্যায়ে লক 'রাজনৈতিক সমাজের সূত্রপাত' শিরোনামে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত, সমান এবং স্বাধীন।[১০]

সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত আত্মতৃপ্তিই লকের রাজনৈতিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। একজন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তাকে অন্যের রাজনৈতিক শক্তির অধীনস্থ রাখা যাবে না। ব্যক্তি স্বীয় সম্মতিতে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা পরিত্যাগ করে এবং অন্যের সাথে সম্মত হয়ে সুশীল সমাজে যুক্ত হয়।[১১] লকের রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করেও জনগণের স্বাধীনতা বজায় ছিলো। বলা যায়, আরও বেগবান হয়েছে। কিন্তু সাম্যভিত্তিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মনে হয় না। হবস রাজনৈতিক সমাজে সরকারের প্রতি জনঅধীনতাকে অপরিহার্য গণ্য করলেও লক সম্পদশালীর প্রতি সরকারের অধীনতাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। যে সামষ্টিক বা দলগত মানুষের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রাক-রাজনৈতিক সময়ে জনগণ রাজনৈতিক সমাজের অভ্যুদয় ঘটালো, জনগণের অধিকার ও নিরাপত্তা বিধানকে তারা সে সরকার ও সমাজের দায়িত্ব বলে মনে করলো। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে তা সকলের সরকার না হয়ে ধনতান্ত্রিক সরকারেই রূপ লাভ করে। লকের মতে,

> When any number of men have so consented to make one community or Government, they are thereby presently incorporated, and make one Body Politick, wherein the majority have a right to act and conclude the rest.[১২]

যে কোনো সংঘকে মানুষ একটি সরকার অথবা সমাজ/সম্প্রদায় গঠনে সম্মতি প্রদান করে, এর দ্বারা তারা একত্রিত হয় এবং একটি বডি পলিটিক (Body Politick) গঠন করে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তিতে বলীয়ান হয়। এ রাজনৈতিক সমাজে মানুষ নিরেট রাজনীতিনির্ভর না হয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিরাপত্তা অর্থাৎ ভোগবাদী তথা পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের রাজনৈতিক জীবনকে নির্ধারণ করেছে। প্রাকৃতিক অধিকারকে সহজাত ও অখণ্ড অধিকাররূপে দাবি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, সম্পত্তিতত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক আইনকে যুক্তকরণ- লকের দর্শনের এ সকল দিক লক্ষ করে তাকে অহংবাদী দাবি করা যায়।

হবস এবং লকের রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও মানুষের রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁদের দর্শনে ব্যক্তিস্বার্থ সামষ্টিক স্বার্থ অপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেছে। হবস ও লক উভয়ই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে গুরুত্বারোপ করেছেন। সমাজের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তির সুরক্ষা বিধানে। এ প্রসঙ্গে স্যাবাইনকে স্মরণ করা যেতে পারে–"এই দু'জনের মধ্যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য থাকার ফলে

একটি অনুমান দৃঢ়বদ্ধ হয়ে পড়ে অর্থাৎ ব্যক্তিস্বার্থ সুস্পষ্ট ও অপ্রতিরোধ্য, অপরদিকে জনস্বার্থ বা সামাজিক স্বার্থের বন্ধন শিথিল এবং অপ্রতুল।"[১৩]

পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকগণ মনে করেন লকের চিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতার যে প্রকাশ তা জনকল্যাণকর ও উপযোগবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি। কিন্তু তাঁদের চিন্তার ক্রটি হলো– লক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের সমার্থকরূপে গণ্য করেছেন তা তাঁরা স্বাভাবিক মনে করেন। তাই লকের চিন্তায় সমাজ ও সরকার ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির রক্ষাকারীরূপেই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

সরকার কিংবা সংসদ কিংবা সার্বভৌম শক্তি যে কোনোটির অবাধ ক্ষমতা এবং অবাধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লকের স্পষ্ট অবস্থান। লকের রাষ্ট্রচিন্তায় জনগণের রাজনৈতিক প্রকৃতি বিশ্লেষণে বলা যায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা শক্তিশালী হওয়ার দরুন এটি ব্যক্তির জন্য 'রাজনৈতিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ'[১৪] রূপে গৃহীত হয়েছ। এছাড়া সমাজ এবং সরকার এখানে ভিন্ন, জনগণ সমাজের অংশ। সরকার একটি ট্রাস্ট রূপে সমাজের রক্ষাকারী। তাই সরকার অপেক্ষা সমাজ শক্তিশালী। আবার এই সরকারের ক্ষমতার যে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে তাতেও শাসন বিভাগ অপেক্ষা আইন বিভাগ অধিকতর শক্তিশালী।

লকের রাষ্ট্রের প্রকৃতি আলোচনায় বলা যায় জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রটিতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে তারা গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচনা করেছে এবং সরকার, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি রাজনৈতিক ধারণাসমূহের উপর স্বল্প ক্ষমতা অর্পণ লকের রাজনৈতিক সমাজের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিপরীতদিকে জনগণের কাছে অধিক ক্ষমতা সরকারকে প্রায় ক্ষমতাহীন করে তোলে এবং সরকার পরিণত হয় 'ট্রাস্ট' বা জিম্মাদারী প্রতিষ্ঠানে। এতে সরকারের স্বাধীনতা, অধিকার সংকুচিত হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণেই সরকারের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল।

যদিও গ্রিফিথ মনে করেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় লকের প্রদত্ত সমাধান সমতা সংরক্ষণে সরকারের দায়িত্বকে যুক্ত করে। লক বলেন প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের মধ্যে সমতা ছিলো। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজিত সাম্যাবস্থাকে রাজনৈতিক সমাজে সরকারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রয়েছে। লক মনে করেন যদি সরকার সমতা বিধান করে তাহলে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে। সরকারের কাছে থেকে সংখ্যালঘুরাও সমান ব্যবহার বা বিবেচনা পেয়ে থাকে এবং এ কাজটি সরকারের দ্বারা নিশ্চিত হয় আইনের মাধ্যমে। অবশ্য সেজন্য আইনকে হতে হবে ন্যায্য ও স্পষ্ট।[১৫]

সরকার রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে জিম্মার অধীনতাপাশে আবদ্ধ হলো। লকের রাজনৈতিক সমাজে সরকার প্রকৃতপক্ষে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি, যাকে লক নাম দিয়েছেন ট্রাস্ট (Trust)। এ শক্তি সংখ্যালঘুদের নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির স্বার্থে নিবেদিত; যে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণি জনগণ রূপে চিত্রিত এবং সরকারের কাজ জনগণের কল্যাণ সাধন। লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক সমাজে আমরা নৈতিকতা এবং সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব বা কালেকটিভ পারসনালিটির উপস্থিতি দেখতে পাই না, বরং লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের এ সমাজকে বলা যায় জনসমষ্টি (aggregation)। নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বাইরে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রিক এ ক্ষমতাকে বলতে পারি জিম্মাদারী ক্ষমতা।

লকীয় রাষ্ট্রচিন্তায় জনগণের রাজনৈতিক জীবনধারায় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো– জনগণের সম্মতি, সম্পত্তির অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা; জনগণ কর্তৃক বিপ্লবের অধিকার অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করার যে ক্ষমতা লক দিয়েছেন তাতে দুটি দিক স্পষ্ট – প্রথমত, জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক জনগণের বৌদ্ধিকতা বা সরকারের কার্যক্রমের যৌক্তিকতা বিচারের ক্ষমতা। পিটার ল্যাসলেট হবসের *লেভিয়াথান* অপেক্ষা

লকের *টু ট্রিটিজ*–কে তুলনামূলক আলোচনায় এগিয়ে রেখেছেন। *টু ট্রিটিজ* গ্রন্থে এমন উপাদান রয়েছে যা লেভিয়াথানে নেই– তা হলো পলিসি (নীতি)। মানুষের কি করনীয় তা সেটির নির্দেশনা, তাদের আনুগত্যের সীমাবদ্ধতা অন্বেষণ করা এবং তাদের আচরণের সার্বিকীকরণের সম্ভাব্য সীমা নির্ণয়করণ।[১৬]

আধুনিককালের রাষ্ট্রসমূহের ধর্মীয় আধিপত্য হ্রাস পেয়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৃদ্ধি ঘটানোর যে ধারা সেক্ষেত্রে লকের রাষ্ট্রচিন্তা কিছুটা ভিন্ন। তিনি অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বৃদ্ধিতে অধিক মনোযোগী ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাটি অধিকতর প্রকাশ্য, যাতে বুর্জোয় শ্রেণির উত্থান ও বিকাশে রাষ্ট্রের ভূমিকা লক্ষণীয়। রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা কিংবা সার্বভৌমত্বের মতো বিষয়াদি গৌণ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ধারা লকের দর্শনে আমরা লক্ষ করিনি। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের কর্তৃত্ব লক্ষণীয়। তাঁর চিন্তায় নৈতিকতা এবং ধর্মের একটি শক্ত প্রভাব ছিলো যা হবসের কাছে ততটা শক্তিশালী ছিলো না। তবে ধর্মের উপস্থিতি ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনাচরণে অনুভূত হলেও রাজনৈতিকভাবে ধর্ম ব্যবহৃত হয়নি বলা চলে।

রুশোর মত

Discourse On Inequality গ্রন্থে রুশো যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অর্থাৎ স্বাধীন মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে ক্রীতদাসে পরিণত হলো, অমিয় সম্ভাবনাময় মানুষ সমাজ ব্যবস্থার নিষ্ঠুর যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে সম্ভাবনাহীন ও হতাশাগ্রস্থ হয়, সমাজই মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে। *Social Contract* গ্রন্থে তিনি সে সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে আলোচনা করেছেন। রুশো যুক্তি দিয়েছেন সমাজই মানুষকে দুর্নীতিগ্রস্থ করেছে। তিনি এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর জন্য কীভাবে একটি ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। রুশোর সামাজিক চুক্তিতে সম্মতির প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বলা যায় যেহেতু মানুষ অপরের উপর কর্তৃত্ব করার স্বাভাবিক অধিকারপ্রাপ্ত নয়, শক্তি কোন অধিকারের জন্ম দিতে পারে না তাই মানব সমাজে বৈধ কর্তৃত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো চুক্তি।[১৭]

রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের এই সুখকর অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। সম্পত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে *amoure soi* এবং *amour propre* (enlightened interest এবং selfish interest) এর মধ্যকার দুরত্ব এত বেশি হয়, যার ফলে ব্যক্তি কেবল তার প্রয়োজনের নিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি বরং অন্যান্যদের চেয়ে নিজেকে উর্দ্ধে রাখার আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে কাজ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ব্যক্তিকে অপরের উপর কর্তৃত্ব করতে এবং অপরের সম্পদ আহরণে প্রবৃত্ত করে, স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কের তিক্ততা তৈরি করে। সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কিংবা সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিটি সম্পত্তির সংঘাতে জড়িয়ে যায়। সাম্যবস্থা, স্থিতিশীলতা নষ্ট হলো, ধনী-গরীবের লাগামহীন আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতিগত সহানুভূতি, ন্যায্যতার বিষয়কে দুর্বল করে দেয় এবং সে স্থানটি দখল করে অর্থলিপ্সা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অনৈতিকতা।[১৮]

রুশো মনে করেন এ ধরণের একটি বিশৃংখলাপূর্ণ অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ধনী এবং দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণ দুর্বল, গরীব ব্যক্তিদের প্ররোচিত করে রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।[১৯] আপাতদৃষ্টে ব্যক্তি তার জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতার সংরক্ষণ খুঁজে পেয়েছে এ সমাজে। লক্ষণীয়, প্রাক-সামাজিক মানুষ যতই সরল-শান্তিপ্রিয়ভাবে বসবাস করুক, সম্পত্তির প্রতি লোভ, অপরের উপর আগ্রাসনমূলক মনোভাব তাদের ছিলো। ব্যক্তির বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং অনৈতিক অবস্থার পরিত্রানের জন্য রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রয়োজনীয় মনে করেছে।

প্রকৃতির রাজ্যে রুশোর মতে সিভিল সোসাইটির জনগণ শান্তি, নিরাপত্তার অন্বেষণ এবং সংঘর্ষ থেকে উত্তরণের লক্ষে, বিত্তশালী জনগণ তাদের সম্মত্তি ও ক্ষমতা সুরক্ষিত করার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করলো। এই চুক্তির অংশ হিসেবে তারা সৃষ্টি করলো আইন ও সরকার। কাজেই বলা যায় জনগণের চুক্তির অংশ রূপে যে আইন

ও সরকারের উদ্ভব তার কাজ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। রুশো মনে করেন শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইন ও সরকার প্রতিষ্ঠা জনগণের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর চিন্তার একটি বিশেষ দিক যে সমাজ মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, মানুষকে শৃঙ্খলিত করেছে, সে দুর্নীতিগ্রস্থ সমাজকে তিনি গ্রহণ করেন। *ডিসকোর্স অন ইনইক্যুয়ালিটি*তে সভ্য সমাজ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অগ্রসরতায় অবিশ্বাসী রুশো পরবর্তীতে *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে* সমাজে মুক্তি খুঁজেছেন। রাজনৈতিক সমাজের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে নিলেন। জনগণের হাতে সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা দিলেন। একে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ– সরকারের সঙ্গে নিজেদের শক্তিকে যুক্ত করা। দ্বিতীয় পদক্ষেপে বিত্তবান জনগণ তাদের সম্পত্তির সুরক্ষা এবং স্বীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের জন্য গরীব মানুষের সমগ্র শক্তিকে সরকারের সাথে সংযুক্ত করে।[২০] রুশোর দ্বিতীয় পদক্ষেপটি আমাদের ভাবনার স্পষ্ট খোরাক জোগায়। যেমন– কীভাবে ধনীরা তাদের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট এবং কীভাবে নিজেদের জীবনকে তারা অপরের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করে। আবার ধনীরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গরীব বা বিত্তহীন শ্রেণিকে হাতিয়ার রূপে গণ্য করেছে এবং বিত্তবানেরা স্বীয় স্বার্থ-সংরক্ষণে অধিক উদ্যোগী হয়ে আইন ও সরকারকে সুরক্ষাকবচরূপে তৈরি করেছে। কীভাবে ধনীরা গরীবদের শোষণের উপর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে এবং তা আরো বেগবান করে তোলে। আইন, সরকার, রাজনৈতিক সমাজ, শক্তি ইত্যাদি সকল কিছু মূল্যবান হয়ে উঠেছে সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, সম্পত্তিগত বৈষম্য রাজনৈতিক সমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, যা প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে লক্ষণীয় নয়। প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে ছিলো স্বাভাবিক বৈষম্য আর মানুষের যুক্তিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির যত উন্মেষ ঘটেছে মানুষের মানসিকতা তত সম্পত্তি কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব রাজনৈতিক সমাজে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে রুশো যদিও মানুষের জীবনের সকল কলুষতা, অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যের মূল বলেছেন, তীব্র সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছেন যে সমাজকে; সে সমাজের তিনি আবার প্রয়োজন বোধ করলেন। সভ্য সমাজ তথা রাজনৈতিক সমাজকে তিনি অসাম্যবাদী বলে বর্জন করলেন না। নেতিবাচক সমাজ ও সভ্যতাকে তিনি গ্রহণ করলেন এবং রাজনৈতিক এ সমাজকে তিনি অধিকতর শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করলেন এবং বৈধতা প্রদান করলেন তাঁর সামাজিক চুক্তির দ্বারা *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে*। [উল্লেখ্য হবসের কাছে যা প্রকৃতির রাজ্য তা রুশোর কাছে হয়েছে সিভিল সোসাইটি হবসের কাছে যা সিভিল সোসাইটি তা রুশোর কাছে রাষ্ট্র (state)।]

রুশোর প্রকৃতির রাজ্য হবসের মতো দুর্বিষহ বা বিশৃঙ্খল ছিলো না বিধায় প্রকৃতির রাজ্য রুশোর কাছে হয়েছে পৌর সমাজ বা সিভিল সোসাইটি। পৌর-সমাজে মানুষ জীবনধারণের উপযোগী অবস্থাতে ছিলো, কোন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, তথাকথিত সামাজিক বিধি-নিষেধ না থাকার পরও ব্যক্তির জীবন শান্তিময় ছিলো। কাজেই রুশোর পৌর সমাজ প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা। আর হবসের মতো রুশো রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির আধার নয়, রাষ্ট্র সমাজের সাথে সংযোজিত অতিরিক্ত কিন্তু প্রয়োজনীয় অংশ। তাই রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি করলেও সে শক্তির নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে ছিলো। মানুষ রাজনৈতিক শক্তি বা কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, শক্তি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রুশোর রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণে আমরা দেখি তিনিও (হবস এবং লকের ন্যায়) ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুশোর এ ক্ষমতা ধনী কর্তৃক দরিদ্রদের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা এবং সম্পদশালীগণ তাদের সম্পত্তির সুরক্ষার জন্য বিত্তহীনদের শক্তিকে ব্যবহার করে। সামাজিক চুক্তিই মানুষের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস, রাজনৈতিক কর্তৃত্বই সমাজে ক্ষমতার জন্ম দেয়। এ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে সম্মতির মাধ্যমে। ক্ষমতার দ্বারা জনগণ যে সম্পত্তির সুরক্ষা আশা করে তা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির বৈষয়িক কল্যাণ,

এখানে কোন মনস্তাত্ত্বিক ঐক্যবোধ কিংবা সামষ্টিক কল্যাণ গুরুত্ব পায়নি। এ মতের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় ক্রুমি চিন্তার । রাষ্ট্রের উদ্ভব দ্বারা জনগণের রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের এই প্রক্রিয়াকে ক্রুমি দাবি করেন 'The anti-social Contract'[২১] নামে। এটিকে সমাজবিরুদ্ধ চুক্তি বলার কারণ এই রাজনৈতিক সমাজটি গড়ে ওঠেছে ধনীদের সংকীর্ণ স্বার্থ [*amour propre* (selfish interest)] সংরক্ষণের জন্য, সকলের স্বার্থ [*amour de soi* (self-interest of all)] সংরক্ষণের জন্য নয়। তাই রুশোর এই রাজনৈতিক সমাজটি পরবর্তীতে স্বৈরাচারের দিকে ধাবিত হয় বলে ক্রুমি মনে করেন।[২২]

রুশোর সামাজিক চুক্তির বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ চুক্তির কোন অংশ পরিবর্তন দ্বারা রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। এতে সমাজ অপরিবর্তিত থাকে। সমাজ কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যার বিপরীত চিত্র আমরা দেখেছি হবস এর কাছে, যেখানে জনগণ একবার চুক্তিবদ্ধ হলে রাষ্ট্র বা লেভিয়াথানের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে। এ থেকে সে বেরোতে পারে না। আর রুশো বলেছেন জনগণের সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে, রুশোর কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর হয়নি। বরং জনগণ রাজনৈতিক শক্তি পরিবর্তনের ক্ষমতা পেল। রুশোর এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কিছুটা সাদৃশ্য পাওয়া যায় জন লকের চুক্তিবাদী ক্ষমতার। রুশোর জনগণের চুক্তির রাজনৈতিক অংশটি পরিবর্তন দ্বারা সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা পৌর সমাজের নিরীহ মানুষের (innocent) কাছে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অধিকার প্রদান করলো। সে সাথে এ প্রশ্ন আসে পৌর সমাজের নিরীহ জনগণের মাঝে সম্পত্তি কীভাবে এবং কেন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনকারী মানুষ কীভাবে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এভাবে প্রকৃতিবাদী রুশো রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন।

রাষ্ট্রীয় জীবনে পদার্পণের মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। ব্যক্তির রাজনৈতিক পরিচিতি তাকে নাগরিকের মর্যাদা দেয়। রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণের দ্বারা মানুষ যে সমস্ত সুবিধা ও অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো নৈতিক স্বাধীনতা। নৈতিক স্বাধীনতা এ কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে এটি মানুষকে স্ব-শাসিত করে, স্বীয়নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। নৈতিক স্বাধীনতা দ্বারা নাগরিক স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদন লাভ করে। নৈতিক স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ব্যক্তি প্রকৃত স্বাধীন ছিলো না। ব্যক্তি নৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি রাজনৈতিক সমাজের সাথে যুক্ত। রাজনৈতিক জীবন তথা সমাজের সাথে তার নৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত। রাজনৈতিক সমাজের যে নৈতিক অধীনতা এটিই রুশোর কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা, অন্যথায় মানুষ প্রবৃত্তির দাস। আর সাধারণ ইচ্ছার যে শক্তি রয়েছে তার সাহায্যে তা ব্যক্তি নাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে আমরা দেখতে পাই, রুশোর রাজনৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্রের যে প্রকৃতি তাতে স্পষ্টত সামষ্টিকতাবাদী প্রবণতা রয়েছে। সেই সাথে লক্ষণীয় এক ধরণের কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণ। যদিও রুশো একে সদর্থক অর্থেই বিশ্লেষণ করেছেন; সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির একক অবস্থান, স্বার্থ চরিতার্থকরণ, ব্যক্তিগত সুখ এ সকল রুশোর কাছে অর্থপূর্ণ নয়।

রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় মানুষের রাজনৈতিক জীবনে "নৈতিক স্বাধীনতা" একটি বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।[২৩] নৈতিক স্বাধীনতা সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখে। যেমন– কোনো নাগরিক যখন আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তাহলে কিন্তু ব্যক্তি নাগরিক, সামাজিক সংহতির প্রতিও একাত্মতা ঘোষণা করে, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করার দ্বারা নৈতিক স্বাধীনতা হলো মূলত ব্যক্তির স্বপরিচালিত বৌদ্ধিক আইন প্রণয়ণ, যা দ্বারা ব্যক্তি আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। নৈতিক স্বাধীনতার প্রভাবে রুশোর নাগরিক সঠিক এবং ভালো– এর মধ্যকার সঙ্গতি বিধানে সক্ষম হয়। নৈতিকভাবে স্বাধীন নাগরিক আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে কোনো বিধি-নিষেধরূপে নয় বরং সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার অংশ বলে মনে করে। নাগরিকের এধরণের আচরণকে রলস এমন আচরণ বলেছেন যা কেবল সাধারণ ইচ্ছাপ্রসূত কাজই করে না বরং স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা দ্বারাই সে কাজ করে থাকে।[২৪] তাই রলসের মতে নৈতিক স্বাধীনতা হলো রুশোর সামাজিক চুক্তির মূল বিষয়।

রুশোর নাগরিকের পক্ষে এ ধরণের আনুগত্য প্রদর্শন সম্ভব কারণ তারা আইনপ্রণেতা, আবার তারা আইন মান্যকারী। এভাবে নাগরিকেরা তাদের স্বাধীনতাকে উৎসর্গ করে ব্যক্তিসামষ্টিকতায় আবদ্ধ হয়। সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। রুশোর সামাজিক চুক্তির নৈতিকভাবে স্বাধীন নাগরিকের সাথে রলসের আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নাগরিকের সাদৃশ্য টেনে ওয়ারনার বলেন – Thus for the morally free citizen Rousseau's social contact no less than for the self respecting member of Rawls' well ordered society, the desire to live in accordance with the law and the desire to realize one's nature as free and equal are, to steal a phrase from Rawls, "practically speaking the same."[২৫]

বৌদ্ধিক স্বত্তারূপে মানুষের একটি রাজনৈতিক সমাজে বসবাসের অধিকার এবং দায়বদ্ধতা রয়েছে । রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বসবাস ব্যক্তির সুপ্ত নৈতিকতার বিকাশে যেমন সাহায্য করে পাশাপাশি এ সংস্কৃতি ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সমতা রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই বলা যায় রাজনৈতিক জীবনযাত্রা, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা মানুষকে জনবিচ্ছিন্ন করে না, বরং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্র হয়ে উঠে মানবতার সামষ্টিক কল্যাণের রক্ষাকারী ও নিশ্চয়তাদানকারী। এ প্রসঙ্গে কার্বুন্য বলেন– রুশোর লেখনীর মূল কাজ ছিলো নৈতিকতাকে অতিক্রম করে জাতির মধ্যে মানবতার ইতিবাচক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটানো।[২৬]

রুশো মনে করেন প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজ রূপান্তরের প্রক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তি রূপান্তরিত হয় ন্যায়বোধে।[২৭] রুশোর রাজনৈতিক মানুষ কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন যৌক্তিকতা দ্বারা পরিচালিত, মানুষ হিসেবে কেবল প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত নয়। রুশো রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সংস্থারূপে দাবি করেছেন। তাই মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির দায়িত্ব পালন না করে অধিকার ভোগ করা ততটা বিপদজনক নয় যতটা বিপদজনক নাগরিক হিসেবে একজন মানুষের তার দায়িত্ব পালন না করা। কারণ নাগরিকের দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় অন্যায় এবং অসামাজিক কাজ। এধরণের অন্যায় যখন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পায় তাহলে অবশ্যম্ভাবীরূপে রাষ্ট্ররও ধ্বংস ঘটে। যেমন–নাগরিকের দায়িত্ব হলো সাধারণ ইচ্ছাকে মান্য করা, সাধারণ ইচ্ছার প্রতি প্রয়োজনে নাগরিকের কাছে হতে জোরপূর্বক আনুগত্য দাবি করবে রাষ্ট্র। অর্থাৎ সাধারণ ইচ্ছার এই জোর খাটানোর যে শক্তি বা ক্ষমতা রুশো মনে করেন এটা হলো ব্যক্তিকে জোর করে স্বাধীন করার ক্ষমতা। রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যক্তিকে জোর করে স্বাধীন করার ক্ষমতা রাষ্ট্র ধারণ করবে। এ স্বাধীনতাই হলো যাবতীয় ক্ষমতার সূতিকাগার। এ প্রসঙ্গে রুশো বলেন–

সমাজ তথা সমগ্র সংস্থার এমন শক্তিপ্রয়োগের অধিকারের স্বীকৃতিই কেবল নাগরিকদের নিজেদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি তথা সম্মতিকে বৈধ করে তুলতে পারে। অন্যথায় সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাটাই পর্যবসিত হয়ে পড়ে বিপুল অনাচারের উৎসমূলক অবিশ্বাস্য একটা স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতনকারী সংস্থায়।[২৮]

হবস রাজনৈতিক সমাজের বিশেষ ক্ষেত্রে বিপ্লবের অধিকার দিয়েছেন। যেমন– যদি সার্বভৌম জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তির জীবন রাজনৈতিক সমাজের না হয়ে প্রকৃতির রাজ্যের মতো দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এধরণের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিরোধ করা কিংবা বিপ্লবের অধিকার রয়েছে; ব্যক্তির রাজনৈতিক চুক্তিটি তাহলে অকার্যকর হয়ে পড়ে।

কিন্তু রুশোর রাজনৈতিক সমাজে এধরণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ তাঁর রাষ্ট্রে সার্বভৌম কোনো একক ব্যক্তি বা রাজা নয়, যৌথ সদস্য, সামষ্টিক অংশ। সামষ্টিক অংশ বা সম্মিলিত শক্তি যাকে রুশো বলেছেন সাধারণ ইচ্ছা। সাধারণ ইচ্ছা জনগণের স্বেচ্ছা সম্মতিতে সৃষ্ট এবং সাধারণ মানুষের শক্তিতে বলীয়ান তাই একক ব্যক্তির সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা কিংবা চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকে না। যৌথভাবে জনগণ সাধারণ ইচ্ছার চুক্তি বাতিল করতে পারে। ঠিক এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিনিধিরূপে রুশোকে

আমরা গণ্য করতে পারি না। সামষ্টিক স্বার্থসংরক্ষণই হলো রুশোর রাজনৈতিক দর্শনের মূল চেতনা। পক্ষান্তরে হবসের কাছে স্বাধীনতা হলো বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি। বাহ্যিক এ স্বাধীনতাকে রুশো নৈতিক স্বাধীনতা থেকে পৃথক করেছেন। রুশো বলেন, "সমাজের বিধান মান্য করার অর্থ স্বাধীন হওয়া।"[২৯] হবস এবং লকের দর্শনের রাজনৈতিক মানুষের সাথে রুশোর রাজনৈতিক মানুষের প্রধান পার্থক্য হলো রুশোর কাছে মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ।[৩০] মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা সম্পত্তি নয়।

রুশোর মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ যদিও জ্ঞানালোক যুগের তবে তিনি জ্ঞানালোকের মূল বৃত্তি-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং নৈতিক মানসিকতাকে তথা নৈতিকতাকে মহৎ করে দেখেছেন। যদিও তাঁর পরবর্তী লেখনীতে তিনি বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন তবে সেই সাথে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং নৈতিকতার মতো মানবিক মূল্যবোধসমূহের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি পূর্ববর্তী দুজন চুক্তিবাদী অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট এবং শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণে রাজনৈতিক সরকার, সামষ্টিকতা, আইন, সম্মতি, জনগণের ইচ্ছা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তিনি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং নৈতিক মূল্যবোধসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্টেইনবার্গার বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। স্টেইনবার্গার মনে করেন হবসের মতো রুশোর রাষ্ট্রধারণা আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে মৌলিকভাবে হবস এবং রুশোর রাষ্ট্রের গঠন, ধারণা গভীর সাদৃশ্যমূলক।[৩১] যদিও রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে হবস ও রুশোর মধ্যে কিছু অভ্যন্তরীণ ধারণাগত পার্থক্য আছে, কিন্তু তবুও বলা যায় একটি রাজনৈতিক সমাজের মৌল ভিত্তির ধারণাগত দিক থেকে তাদের দুজনের মাঝে পার্থক্য নেই।[৩২] হবস ও রুশোর রাষ্ট্রসংক্রান্ত ধারণাতে একটি সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই উভয় রাষ্ট্র কর্তৃত্বমূলক হতে পারে। এ কর্তৃত্ব একক ব্যক্তির অথবা সমাজের যৌথ সংস্থার তথা সম্মিলিত গোষ্ঠীর। হবস এবং রুশোর রাষ্ট্রের যে প্রকৃতি তাতে উভয়ের প্রাতিষ্ঠানিক একটি কাঠামো এ রাষ্ট্রে লক্ষণীয় যাতে দায়বদ্ধতার একটি দিক রয়েছে।

রুশোর রাষ্ট্রদর্শনে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ও নৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ পাওয়া যায়। যা হবসের কাছে অনুপস্থিত। রুশোর রাজনৈতিক সমাজে জনগণের নৈতিক স্বাধীনতা বিশেষ গুরুত্ববহ। তাঁর নাগরিকতার ধারণাতে বিশেষ এবং সার্বিক তথা গোষ্ঠীর একটি মেলবন্ধন লক্ষণীয় যা হবসের রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্ন। রাজনৈতিক সমাজে মানুষের নৈতিক সদগুনের দিকটিকে রুশো গুরুত্বপূর্ণরূপে তুলে ধরেছেন। হবসের রাষ্ট্রে সার্বভৌমের দায়বদ্ধতা নৈতিক শক্তির কাছে। রুশোর কাছে নৈতিক স্বাধীনতা হলো এমন স্বাধীনতা যা সাধারণ ইচ্ছার সাথে যুক্ত এবং সাধারণ ইচ্ছা যৌক্তিক বিবেচনার মাধ্যমে নৈতিকভাবে ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করে। ন্যায়-অন্যায়ের সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে যুক্ত সার্বিক ভালো।[৩৩]

রুশোর রাজনৈতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে বলা যায় প্রাথমিকভাবে প্রজ্ঞার বিরোধিতা করেই তাঁর প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ। এ সমাজেও তিনি প্রজ্ঞা অপেক্ষা নৈতিক আবেগকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

লকের দর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রশস্তি উল্লেখ করা হয়েছে, বিপরীতে রুশোর দর্শনে প্রাধান্য পেয়েছে সামষ্টিকতাবাদ। শুধু সামষ্টিকতাবাদই তাঁর রাজনৈতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, এছাড়া এ সমাজের মাঝে ছিলো পারস্পরিক মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধা, সহমর্মিতার বন্ধন। যার দরুণ সম্পত্তির মালিকানা রুশোর দর্শনে গোষ্ঠীগত মূল্যে নিরূপিত হয়েছে, ব্যক্তিগত মূল্যে মূল্যবান হয়নি। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে ধর্ম কিংবা অর্থনীতি কিংবা চরম ক্ষমতা নয় , নৈতিকতা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ নৈতিকতা ব্যক্তিগত বা আপেক্ষিক নয় , সামষ্টিক মূল্যবোধসমৃদ্ধ নৈতিকতা। রুশোর রাজনৈতিক চিন্তায় দূরদর্শিতা ছিলো তবে সে কাঠামোটি রাষ্ট্র নয়, নগর রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী ছিলো। রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজ তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। সমাজ নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটাতে

পারে। নৈতিকতার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সমাজ ব্যক্তির ক্ষমতার উৎস, সমাজের মধ্যেই নৈতিকতার প্রকাশ। সমাজের বাইরে নৈতিকতার অবস্থান নেই। সমাজ ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ করে অর্থাৎ মানুষে রূপান্তরিত করে। কারণ সমাজের বাইরে মানুষের কোনো নৈতিক গুণাবলি থাকতে পারে না। সমাজের বাইরে নৈতিকতা তৈরি হতে পারে না। সমাজস্থিত সদস্যদের জোটবদ্ধতা থেকে সমাজ সৃষ্ট, সমাজের সদস্যদের এই ঐক্যবদ্ধতা কেবল বাহ্যিক নয় তার চেয়েও বেশি কিছু এটিকে স্যাবাইন বলেন "নৈতিক ব্যক্তিত্ব"।[৩৪] রুশোর রাজনৈতিক চিন্তায় যে বিষয়টি সকল লেখনীতে কম-বেশি উপস্থিত তা হলো মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সুখী এবং ভালো ; পরবর্তীতে সমাজ জীবন ব্যক্তির জীবনকে কষ্টকর ও বঞ্চিত করে। রুশো মনে করেন মানুষের প্রাকৃতিক ভালোত্ব বা সদগুনাবলিসমূহ ব্যক্তি হারায় অপর ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতার বা পরনির্ভরশীলতার ঐতিহাসিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ায়।[৩৫]

রুশোর জনগণের রাজনৈতিক জীবনাচরণে সরকারের গুরুত্ব গৌণ। কারণ সরকার সাধারণ ইচ্ছাকর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বাস্তবায়ন করে মাত্র। তবে রুশো যে কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের বিরোধিতা করেছেন। পক্ষান্তরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা পরিচালিত সরকার (প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে) সমর্থন করেছেন। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের বিরোধিতার কারণ হলো রুশো মনে করেন জনগণের সার্বভৌমত্বকে প্রতিনিধিত্ব করা যায় না।

রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থায় রুশো যে দিকটির প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন তাহলো অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি, জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ, সাধারণের অংশগ্রহণ। ব্যক্তিগত সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত হয়েছে যা দ্বারা তিনি অর্থনৈতিক শোষণের লাগাম টানার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে রেখেছেন। অর্থনৈতিক অসাম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণের সাথে রাজনৈতিক শক্তির স্বৈরাচারিতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। তাই রুশো স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন দ্বারা এমন এক রাজনৈতিক সমাজ চিত্রিত করেছেন যাতে জনগণের আনুগত্য থাকবে আবার জনগণের অংশগ্রহণও থাকবে। জনগণ আনুগত্য প্রদর্শনকারীরূপে নাগরিক, আবার সার্বভৌম শক্তিরও অধিকারী। তার রাজনৈতিক সমাজে বডি পলিটিক বা রাষ্ট্রীয় সংগঠন হলো একটি নৈতিক সংগঠন। শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে রুশো সমাজ মনে করেন না। এ জন্য প্রয়োজন আত্মিক বা মনস্তাত্বিক বন্ধন। এ বন্ধনকে কেবল অর্থনৈতিক বা কেবল রাজনৈতিক বলা যাবে না। এটি তার চেয়েও অধিক। কারণ সমাজের এ বন্ধনে যুক্ত আছে সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সংবেদনশীলতা ও মানবিক বন্ধন; নৈতিকতার বন্ধন।

রুশোর রাজনৈতিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে নয়, সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় জনগণ দ্বারা। এ সমাজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে জনগণের 'সাধারণ ইচ্ছা'র কাছে। সাধারণ ইচ্ছা একই সাথে রাজনৈতিক, আইনগত এবং নৈতিক শক্তি। তাই সাধারণ ইচ্ছা ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থবোধের দ্বারা সীমিত নয়। এ ক্ষেত্রে রুশোর সাথে পূর্ববর্তী চুক্তিবাদীদের অমিল লক্ষনীয়। হবস ও লকের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যক্তিগত স্বার্থবোধে আচ্ছন্ন। (যেমন হবসের কাছে রাজতন্ত্র এবং লকের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি।) কিন্তু রুশোর কাছে ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টির স্থান আগে। সামষ্টিক তথা সাধারণের মঙ্গল রুশোর কাছে অলঙ্ঘনীয়। সাধারণের মঙ্গলের প্রকাশ ঘটে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা এবং সাধারণ ইচ্ছাতে প্রতিফলিত হয় সমষ্টির নৈতিক চেতনা। এ অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস বা মতামত সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী হয় তবে তা গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। জন টি. স্কটের মতে প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব রুশোর রাজনৈতিক দর্শনে পদ্ধতি ও কাঠামোগত ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। রুশো ব্যক্তিগত নির্ভশীলতার এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য রাজীনতিকে ঐশ্বরিক অনুকৃতিরূপে তৈরি করেছেন। তিনি মনে করেন রুশো ব্যক্তির পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যক্তিকে আইনের ওপর নির্ভরশীল করতে চেয়েছেন।[৩৬] রাজনৈতিক সমাজ প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক আইনের অনুকৃতি; আর রুশোর মতে প্রাকৃতিক আইন হলো মূলত ঐশ্বরিক দূরদর্শিতার প্রতিফলন।[৩৭]

মেলযের,[৩৮] স্কট[৩৯] ও রাইলি[৪০] প্রমুখ রাষ্ট্রবিশ্লেষেকগণ রুশোর রাষ্ট্রদার্শনিক পদ্ধতিতে এক প্রকার ধর্মতাত্ত্বিক সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পেয়েছেন। তারা মনে করেন রুশো ব্যক্তির অপরের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তি অপেক্ষা প্রাকৃতিক আইনকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। কারণ প্রাকৃতিক আইন ঐশ্বরিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন। এক্ষেত্রে আমরা রুশোর সাথে লকের প্রাকৃতিক আইনের সাদৃশ্য খুঁজে পাই। লক প্রাকৃতিক আইনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতেও এক প্রকার ধর্মতাত্ত্বিক সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়। রুশোর লেখনীতে মানুষের রাজনৈতিক জীবন কেবলমাত্র আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক নয়, আবার যেনতেনভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকাও তাঁর সাধারণ ইচ্ছার প্রবৃত্তি নয়। এতে রয়েছে নৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও মানবিক মূল্যবোধ। রুশোর রাজনৈতিক মানুষ আত্মকেন্দ্রিক নয়, তবে আত্মসম্মানবোধক। সমতা এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন দ্বারা রাজনৈতিক জীবনের মৌল ভিত্তি স্থাপন সম্ভব বলে রলস বিশ্বাস করেন।[৪১]

সমকালের অন্যতম বিখ্যাত নীতিদার্শনিক রলসের মতবাদেও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আত্মসম্মানের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে।[৪২] রলসের বিশ্বাস আত্মসম্মানের উপায় বা শর্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারে এবং এটি রুশোর বিধান। সমতার উপর গুরুত্বরোপ এবং রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন দ্বারা রুশো এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। রলস তাঁর *Theory of Justice* গ্রন্থে বলেন "নৈতিক অনুভূতিসমূহ" সমাজে ন্যায্যতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং ন্যায্যতার মৌল ভিত্তি স্থাপনে "প্রধান ভূমিকা" পালন করে।[৪৩] রলসের এ ভাবনার সাথে আমরা সাদৃশ্য পাই ইমানুয়েল কান্টের।[৪৪] কান্টও মনে করেন একটি টেকসই ও উন্নত, ন্যায্য সমাজপ্রতিষ্ঠায় কেবল "প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি" (institutional devices) যেমন−ভারসাম্য নীতি সর্বদা কার্যকরী হবে বা তাই সর্বদা প্রয়োজনীয় তেমন নয়। সেই সাথে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সামাজিক, নৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতারও। সেজন্য নাগরিকদের মাঝে থাকতে হবে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করার প্রবণতা এবং এ প্রবণতা তৈরি করতে হলে নাগরিকদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেবল ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পূরণের উপায় হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা থেকে সরে আসতে হবে। বরং ব্যক্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এমন প্রকৃতি গড়ে তোলা যাতে মানুষ হিসেবে অপরের সাহায্য করা যায়।[৪৫] এধরণের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করতে প্রয়োজন ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে ভালো এবং ঔচিত্যের সঙ্গতি স্থাপন। রলসের এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ন্যায্যতা নাগরিকদের মাঝে এমন এক শক্তিশালী ও কার্যকর প্রবৃত্তি তৈরি করে যার দ্বারা রাষ্ট্রের নাগরিক আইন মান্য করার এক ধরণের নৈতিক ও মানসিক তাড়না বোধ করে, যা কেবল শাস্তির ভয়ে কিংবা উর্দ্ধতন শক্তির চাপের কারণে নয়।

কান্ট ও রলসের এ ধরণের আলোচনা থেকে আমরা দাবি করতে পারি রুশোর রাজনৈতিক সমাজে নৈতিক বন্ধন, সামষ্টিকতার তথা সাধারণ ইচ্ছার যে শক্তি তা রাজনৈতিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক সমাজ স্থাপনে (কেবল আত্মস্বার্থকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে) ভূমিকা রাখে। নাগরিকের অর্ন্তনিহিত উপলব্ধি যার সাথে যুক্ত হয়েছে নৈতিক অনুশাসন ও পরার্থপরতা তা একটি টেকসই সমাজ স্থাপনে অধিকতর কার্যকরী। রলস রুশোকে একজন "যৌক্তিক আশাবাদী"[৪৬] হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন; রুশো এবং রলসের চিন্তার সাদৃশ্য এখানে যে তাঁরা উভয়েই রাজনৈতিক মানুষ অর্থাৎ নাগারিকদের সম্পর্কে আশাবাদী এবং নাগরিকদের মাঝে সম্ভাবনা দেখতে পান। রলসও মনে করেন নাগরিকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রদান করা গেলে তারা ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক দায়বদ্ধতার মধ্যে সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবে। রুশোর রাজনৈতিক সমাজে একক ব্যক্তির বিরোধিতার কোনো সুযোগ নেই। কারণ ব্যক্তি আইনের প্রতি মান্যতা প্রদর্শন এবং সকলের ইচ্ছার সাথে স্বীয় ইচ্ছাকে অভিন্নরূপে প্রকাশের জন্য একত্রিত হয়েছে। যদি সে এককভাবে কোনো কিছুর বিরুদ্ধাচারণ করে তবে ব্যক্তির সে কাজ সমাজকর্তৃক গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে না।

রুশোর সামষ্টিকতার ধারণা কান্টীয় নৈতিকতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে হয়। কান্ট যেমন মনে করেন মানবজাতির সদস্যরূপে মানুষের এমনভাবে কাজ করা উচিত যেন তা সকলের জন্য আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ সকলের জন্য আদর্শ হতে পারে। রাসেল, স্যাবাইন, স্টেইনবার্গার–এর মতো বিখ্যাত রাষ্ট্র দার্শনিকগণসহ আরো অনেক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তাবিদ রুশোকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হিসেবে দাবি করেছেন। যা আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের এ বক্তব্যের সাথে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলা যায় রাজনৈতিক সমাজের উদ্ভব ও বিকাশের যে চিত্র রুশো এঁকেছেন তাতে দেখা যায় সমাজের উদ্ভব হয়েছে যৌথ স্বার্থে, কোনো একক স্বার্থ বিবেচনার ওপর নয়। রুশো যে নৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন তা বাস্তবিকপক্ষে সকলের স্বার্থকে সমর্থন করে ও সমন্বয় করেই বৈধতা লাভ করেছে। অন্যথায় এ নৈতিক স্বাধীনতার সাথে প্রবৃত্তির পার্থক্য থাকত না; রুশোর সমাজের সৃষ্টিই হয়েছে প্রত্যেক সদস্য তাদের অধিকারকে সমাজের কাছে সমর্পণ করার মাধ্যমে। রুশোর মতে– "সমাজ সংস্থায় আমরা যারা সদস্য তারা সকলে এবং প্রত্যেকে আমাদের সকল অধিকারকেই সামজসংস্থার কাছে অর্পণ করে দিয়েছি। ...., যেহেতু শর্তহীনভাবে আমরা প্রত্যেকে সমর্পিত হয়েছি সমাজসংস্থার কাছে, সে–কারণে কারুর সাথে কারুর বিন্দুমাত্র বৈষম্য থাকা আর সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে এবং সকলে প্রত্যেকের এবং সকলের সমান। "... আমাদের প্রত্যেকের এবং সকলের সমর্পণ যেহেতু শর্তহীন, সে কারণে আমাদের প্রত্যেকের এবং সকলের সমর্পণে সৃষ্ট সংস্থা তথা মানুষের সমাজ সংস্থা একটি ত্রুটিহীন পরিপূর্ণ সংস্থা এবং সে -কারণেই সংস্থার বিপরীতে আমাদের কারু কোনো নিজস্ব দাবির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।"[৪৭]

রাষ্ট্রের উদ্ভব মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রাক-সামাজিক জনগণ সামাজিক চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটায় এবং রাজনৈতিক জীবনে পদার্পণ করে। চুক্তিবাদীগণ কর্তৃক সৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা মূলত বুর্জোয়া শ্রেণিভিত্তিক বা পুঁজিবাদী এবং এখানে চার্চের বা ধর্মের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায় না। ধর্মভিত্তিক নয় লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থা অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এবং জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের জয়গান সূচিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা কর্তৃত্ববাদী হলেও ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্ম অপেক্ষা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রকাশ, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সংহতির মতো দিকগুলো জনগণের কাছে আবেদন সৃষ্টি করেছে। জীবনের নিরাপত্তা এবং সম্পত্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের প্রত্যাশায় সৃষ্ট রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতার উন্মেষ ঘটায়। রাজনৈতিক শক্তি আদেশ প্রদান এবং নির্দেশ পালনে বাধ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে। সেই সাথে নির্দেশ অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদানের অধিকার লাভ করে। রাজনৈতিক শক্তি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব জনগণের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনার বিকাশ ঘটায়। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতার যথাযথ বণ্টন কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্বশাসনের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করেছে।

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে হবস, লক ও রুশোর সামাজিক চুক্তির এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। চুক্তির ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক শক্তির বিশেষত্ব হলো- এ শক্তি জনগণকে নির্দেশ দিতে পারে, শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে জনগণকে আদেশ মানতে বাধ্য করতে পারে; সর্বোপরি আইনের ব্যাখ্যাদানকারী ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার অধিকারী। প্রশ্ন হলো, যে যুদ্ধ পরিস্থিতি, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে জনগণ চুক্তি করে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলো, তার কি কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে? আধুনিক কালে রাষ্ট্র কি জনগণকে জান-মালের নিরাপত্তা এবং সমতা ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের সক্ষম হয়েছে? আমরা দেখি রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধংদেহী মনোভাব, সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য, সাম্যের অভাব, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদি সমস্যাগুলো আজও অব্যাহত রয়েছে। সমকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিক জীবন হয়ে উঠেছে অধিকমাত্রায় আত্মস্বার্থবাদী। ফলে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে অমীমাংসিত।

তথ্যনির্দেশ

১. এ. এ. এম. আতাউল হক (অনূ.), *গেটেলের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ইতিহাস*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৮৪।

২. "All humans are guilty of pride because they are disinclined to obey legitimate authority" - Thomas Hobbes, *Leviathan,* (revised edition), A.P. Martinich & Brian Battiste (eds.) Broadview Editions, Canada, 2011, p. 19.

৩. *Ibid.*

৪. জর্জ এইচ. স্যাবাইন (মূল), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪২৪।

৫. Hobbes, *Leviathan,* Ch. 17.

৬. *Ibid.*

৭. হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, পৃ. ৪২৬।

৮. Plato, *The Statesman,* Translated by J.B. Skemp, Martin Ostwald (ed.), Bobbs-Merrill Company, Indiana Polis, New York, 1957, p. 294a.

৯. Lamprecht S.P., "Hobbes and Hobbism", The American Political Science Review, Vol. 34, No. 1, 1940, pp. 31-53.

১০. John Locke, *Two Treatises of Government*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967, § 95, p. 348.

১১. *Ibid.*, § 96, pp.348-349.

১২. *Ibid.*, § 96, p.349.

১৩. হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, পৃ. ৪৯১।

১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৯।

১৫. Mark F. Griffith, "John Locke's Influence On American Government and Public Administration", *Journal of Management History*, Vol. 3, No. 3, Emerald Group Publishing Limited, 1997, p. 231.

১৬. Locke, *Two Treatises of Government,* p. 91.

১৭. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau*, Oxford University Press, London, 1982, p. 173.

১৮. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory*, Nelson & Son, London, 1972, p. 16.

১৯. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Translated by Maurice Cranston, Penguin Books, 1968, p. 203.

২০. Jean-Jacques Rousseau, *Discourse on the Origin of Inequality*, Donald A Cress (trans.), Indianapolis, Cambridge, 1992, pp. XVII-XVIII.

২১. J. H. Broome, *J. J. Rousseau: A Study of His Thought*, Edward Arnold Ltd., London, 1963, pp. 72-90.

২২. *Ibid.*

২৩. Rousseau, *The Social Contract*, Book III, Ch. 10, p. 56.

২৪. John Rawls, *Lectures on the History of Political Philosophy,* Samuel Freeman (ed.), Harvard University Press, Cambridge MA, 2007, pp. 219-235.

২৫. J.M. Warner & J.R. Zink, "Therapeutic Politics: Rawls's Respect for Rousseau", *The Review of Politics* 78 (2016), University of Notre Dame, p. 134.

২৬. Thomas E. Carbonneau, "The Implicit Teaching of Utopian Speculations: Rousseau's Contribution to the Natural Law Tradition" 3U. Puget Sound L. Rev. 123, 1979, p. 154. http://elibrary.law.psu.edu/fac-works

২৭. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৪১।

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১।

২৯. *প্রাগুক্ত*।

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩১. Peter J. Steinberger, "Hobbes, Rousseau and the Modern Conception of the State," *The Journal of Politics*, Vol. 70, No. 3, The University of Chicago Press, 2008, pp. 595-611.

৩২. *Ibid.*, p. 595.

৩৩. রুশোর নৈতিক স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন–

Frederick Neuhouser, "Freedom, Dependence and the General Will" *The Philosophical Review*, Vol. 102, No. 3, July, 1993, pp. 363-395.

Jonathan Marks, "The Savage Pattern: The Unity of Rousseau's Thought Revisited" *Polity*, Vol. 31, No. 1 (Autumn, 1998), pp. 75-105.

৩৪. George H. Sabine, *A History of Political Theory,* Revised by Thomas Landon Thorson, 4th Edition, IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi: Oxford, 1973, p. 535.

৩৫. Arthur M. Melzer, *The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau's Thought,* University of Chicago Press, Chicago, 1990, pp. 24-29.

৩৬. John T. Scott, "Politics as the Imitation of the Divine in Rousseau's Social Contract," *Polity,* Vol. 26, No. 3, 1994, p. 2.

৩৭. Patrick Riley, *The General Will Before Rousseau: The Transformation of the Divine into the Civic,* Princeton University Press, Princeton, 1986, pp. 181-182.

৩৮. Arthur M. Melzer, *The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau's Thought,* pp. 46-49.

৩৯. John T. Scott, "Politics as the Imitation of the Divine in Rousseau's Social Contract," pp. 12-17.

৪০. Patrick Riley, *The General Will before Rousseau,* pp. 182-184.

৪১. Warner Zink, "Therapeutic Politics: Rawls's Respect for Rousseau", pp. 117-121.

৪২. "Rawls's belief that the provision of self-respect can solve the social problem is uniquely Rousseauan not only because of its emphasis on equality but also because it suggests political life can and must reconcile the conflicts between self and society at a fundamental level." - John Rawls, *A Theory of Justice,* rev. ed. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999, p. 401.

৪৩. Mary Gregor (trans and ed.), *Immanuel Kant: Practical Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 366.

৪৪. Rawls, *Theory of Justice*, pp. 348-456.

৪৫. Michael Frazer, "The Modest Professor: Interpretive Charity and Interpretive Humanity in John Rawls' Lectures on the History of Political Philosophy," *European Journal of Political Theory*, 2010, pp. 218-226. https://doi.org/10.1177/1474885109355968

৪৬. Rawls, *Theory of Justice*, pp. 348-356.

৪৭. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, পৃ. ৩৭।

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারব্যবস্থা ও সামাজিক চুক্তি

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক এবং নৈতিক মতবাদ হিসেবে আমরা সামাজিক চুক্তি মতবাদকে প্রভাবসূচক তত্ত্বরূপে চিহ্নিত করতে পারি। এ তত্ত্বে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস, বৈধতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সাম্যের ধারণা, অধিকন্তু রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশে জনগণের সম্মতির বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য হয়ে ওঠেছে। সামাজিক চুক্তিবাদীগণের মাঝে বেশ কিছু বিষয়ে যেমন সাদৃশ্য পাওয়া যায় তদ্রুপ বেশ কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও লক্ষ করা যায়। সরকারের কাছে ক্ষমতার সমর্পণ ও স্বরূপের বিষয়ে ব্যাপক মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। সরকারের চরিত্র চিত্রণেও তাদের মাঝে মেলে ভিন্নতা।

ইউরোপীয় রেনেসাঁর হাত ধরে তৎকালীন রাষ্ট্র ও সমাজদর্শনে যে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তার প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায় ত্রয়ী চুক্তিবাদীদের রাষ্ট্রচিন্তায়। ধর্মভিত্তিক, সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার স্থলে লোকায়ত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা, জনগণের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহকে উপজীব্য করে চুক্তিবাদীদের সরকার পদ্ধতি গড়ে ওঠেছে। চার্চের পরিবর্তে রাজনৈতিক চালিকাশক্তি হলো ইহজাগতিক মূল্যবোধ। এ মূল্যবোধের ধারক কখনো একচ্ছত্রবাদ, কখনো সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত সরকার, আবার কখনো সাধারণ ইচ্ছা। হবস, লক, রুশো ত্রয়ী চুক্তিবাদীর সরকার সম্পর্কিত আলোচনায় লক্ষ করা যায় তারা কম-বেশি রাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। রাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি তাদের কাছে আদৃত হয়েছে। হবস ও লকের সরকারব্যবস্থায় আমরা বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রসারে রাষ্ট্রের অত্যন্ত আগ্রাসী ভূমিকা লক্ষ করেছি। যদিও সাধারণ ইচ্ছা তত্ত্বের প্রবক্তা রুশোকে গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির একজন ধ্বজাধারীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তথাপিও তাঁর কাছে আমরা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র নয় বরং পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক সমর্থন লক্ষ করেছি। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিরূপে তিনি গণতন্ত্রকে সাদরে গ্রহণ করেননি।

সামাজিক চুক্তিবাদীদের মতে, ব্যক্তি রাষ্ট্রকে মান্য করতে বাধ্য কারণ ব্যক্তি তা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা থেকে ব্যক্তির বাধ্যবাধকতাবোধ বা আনুগত্য উৎসারিত হয় তা কিন্তু শর্তহীন বা উদ্দেশ্যবিহীন কিংবা স্বেচ্ছামূলক নয়। মানুষ কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কিন্তু চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। যেমন হবসের কাছে নিরাপত্তাপ্রসূত কারণ, লকের কাছে প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা, রুশোর কাছে সাধারণ ইচ্ছা তথা সমাজবদ্ধ রাজনৈতিক জীবনের সন্ধান। এভাবে মানুষের বা ব্যক্তির ইচ্ছার পরিপূর্ণতা সাপেক্ষে এই চুক্তি কার্যকরী হয় এবং অন্যথায় তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সব বিবেচনায় এন্থনি কুইনটন মনে করেন একটি চুক্তিতত্ত্ব কখনো অনপেক্ষ হতে পারে না। এটি কোনো স্বতঃমূল্যতত্ত্বের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছে অপরিসীম কর্তৃত্ব প্রদান করতে পারে না। কুইন্টনের মতে, Political Obligation may always lapse and the states authority be forfend it the conditions of the contract are not satisfied.[১]

সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের দুটি আপত্তি তুলে ধরেন কুইন্টন; প্রথমত অধিকাংশ জনগণ রাষ্ট্রকে মান্য করার ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট সম্মতি বা প্রকাশ্য সম্মতি প্রদান করেনি তাই কোন বিষয়টিকে মৌন প্রতিজ্ঞা রূপে তারা মান্য করে তা নির্দিষ্ট করা কঠিন। এখানে এক প্রকার উভয় সংকট রয়েছে। যেমন– যদি চুক্তিবদ্ধ কোনো কাজ যদি স্বেচ্ছামূলক না হয়, এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে থেকে যদি পরোক্ষভাবে সুবিধাপ্রাপ্তির মাধ্যমে সুরক্ষা ভোগ করে। যদি তা

স্বেচ্ছামূলক হয়, যেমন, নির্বাচনে ভোট প্রদান না করতে পারা সচরাচর একজন ব্যক্তির নাগরিক হিসেবে বাধবাধকতা থেকে মুক্তি প্রাপ্তি বোঝায় না।

হবসের ধারণা

হবসের সার্বভৌম তত্ত্বের সাথে সরকারব্যবস্থা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তাঁর মতে সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য। সার্বভৌমের পার্থক্যের ওপর তিনি সরকারব্যবস্থা এবং শাসনব্যবস্থার মাঝে পার্থক্য করেছেন। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তিন প্রকার সরকারব্যবস্থার বাইরে অন্য কোনো সরকারব্যবস্থায় যেমন-ধনিকতন্ত্র (Oligarchy), স্বৈরাচারতন্ত্র (Tyranny) তিনি বিশ্বাস করতেন না। এ ধরনের সরকারকে তিনি মানুষের মানসিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ মনে করেন। প্রকৃত বিচারে এগুলো কোনো সরকারব্যবস্থা নয় (এরিস্টটল এধরণের সরকারব্যবস্থাসমূহকে সরকারের বিকৃত রূপ মনে করেছেন)।[২] এ ধরণের সরকার সম্পর্কে হবসের ধারনা ঃ

রাজতন্ত্র যারা পছন্দ করেন না তারা একে মনে করেন স্বৈরতন্ত্র। আবার যারা অভিজাততন্ত্র অপছন্দ করেন তাদের কাছে অভিজাততন্ত্র হয়ে উঠে ধনিকতন্ত্র। গণতন্ত্রের প্রতি যারা বীতশ্রদ্ধ তাদের কাছে এ সরকারব্যবস্থা নৈরাজ্যের শামিল।[৩]

নৈরাজ্য বলতে হবস মনে করেন শাসনব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা যা প্রকৃতপক্ষে কোনো নতুন শাসন ব্যবস্থা নয়। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র এ তিন ধরনের সরকারের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ক্ষমতার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই। সকল প্রকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যও এক।

সরকারব্যবস্থা

হবস তিন প্রকার সরকারব্যবস্থার মধ্যে রাজতন্ত্রকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামষ্টিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটে। রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও রাজার সম্পদ ও গৌরব অভিন্ন। এ ধরনের ব্যবস্থায় সংসদীয় সরকারব্যবস্থার মতো অস্থিরতা বা অস্থিতিশীলতা দেখা যায় না। এ ব্যবস্থায় অধিকতর স্থিতিশীলতা দেখা যায়। এর প্রমাণ মেলে তাঁর *De Cive*[৪] এবং *The Elements of Law* গ্রন্থে। *The Elements of Law*-তে হবস বলেন, "that seeming mixture of several kinds of government, not mixture of the things themselves, but confusion in our understandings. That cannot find out reality whom we have subjected ourselves."[৫]

হবস মনে করেন রাজতন্ত্রে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতদুষ্টতা কম। রাজতন্ত্রকে সমর্থনের মাধ্যমে তিনি এক ব্যক্তির শাসন বা একক রাজার শাসনকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি একজন ব্যক্তির অধীনে চরম ক্ষমতা অর্পন করেছেন এবং তা কম বিপদজনক মনে করেন। বরং ক্ষমতা যদি একক না হয়ে একাধিক ব্যক্তির বা গোষ্টির হাতে ব্যাপৃত হয় তবে তা বিশৃঙ্খলা তৈরি করে, অর্থহীন হয়ে পড়ে। হবসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় একটি বিষয় স্পষ্ট– তিনি রাজতন্ত্র সমর্থন দ্বারা একটি বলিষ্ঠ ও সুগঠিত ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রক্ষমতা যত অধিক ব্যক্তির হাতে খণ্ডিত হবে ততই রাষ্ট্র দুর্বল হতে থাকে। তাই তিনি চরম সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেছেন। রাজতন্ত্রের প্রতি হবসের এধরণের সমর্থন রাষ্ট্রচিন্তায় একচ্ছত্রবাদ বা চরমতন্ত্র বা স্বৈরবাদ (Absolutism) নামে অভিহিত। রাষ্ট্রের চরমক্ষমতা রাজতান্ত্রিক সরকারের হাতে সমর্পণের বিষয়টিকে হবস একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তুলে ধরেছেন।

যেমন– একজন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে হলে চিকিৎসকের কাছে যেমন সর্বময় ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় তদ্রুপ প্রকৃতির রাজ্যে বর্বর জীবনব্যবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিতে হবস একক শাসকের অধীনস্থতার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই স্বৈরতন্ত্র তার কাঙ্খিত শাসন ব্যবস্থা। অসীম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকর্তৃত্বই আত্মস্বার্থবাদী মানুষকে নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দিতে পারে।

সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় হবসীয় স্বৈরতন্ত্র বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র তীব্রভাবে সমালোচিত হলেও তার তাত্ত্বিক কাঠামো ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়েছে। বুর্জোয়া মানুষ যাদের সম্পদ ও খ্যাতি অর্জনের সীমাহীন বাসনা, তা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লিপ্ত। অন্যদিকে মানবপ্রকৃতির সুরক্ষাবিধানে তাদের সম্মতিতে সৃষ্ট চরম ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তির উপস্থিতি অনিবার্য। স্বৈরতন্ত্রকে সমকালের রাষ্ট্রচিন্তায় ভয়াবহ বিপদ গণ্য করা হলেও হবসের দর্শনে তা মানুষের জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এর সাথে জনসম্মতি যুক্ত হয়ে তা বৈধতা লাভ করেছে। এ স্থানে ম্যাকিয়াভেলির সাথে তাঁর চিন্তার (হবস) স্বৈরতন্ত্র বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের তফাৎ।

গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার প্রতি হবসের সমর্থন ছিল না। যদিও তিনি *লেভিয়াথান* গ্রন্থে রাজতন্ত্রের বিকল্প রূপে গণতন্ত্রকে উল্লেখ করেছেন; তবে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে পিটিশন অব রাইটস পাস হলে তিনি থুসিডাইডিসের গ্রন্থের অনুবাদে গণতন্ত্রের প্রতি তার অসমর্থন প্রকাশ করেন। নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক ক্ষমতার প্রতি সমর্থনে তিনি উজ্জীবিত হয়েছেন টিউডর রাজাদের দ্বারা। তিনি মনে করেন টিউডর রাজা জনগণকে মধ্যযুগীয় অরাজকতা থেকে মুক্ত করে শৃঙ্খলার পথে আনতে সমর্থ হয়েছে। যা হবসকে প্রভাবিত করে।

হবস তিনি জনগণের দ্বারা বিপ্লব বা বিদ্রোহ কোনোটিই সমর্থন করেননি। তিনি জনগণের সন্তুষ্টির উপরই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জনগণ সন্তুষ্ট থাকলে বিদ্রোহ বা বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। তাই শাসকের কার্যপ্রণালী হওয়া উচিত শাসিতের সন্তুষ্টিবিধান। হবসের এধরণের চিন্তায় আমরা লক্ষ করেছি, এ কাজ করতে গিয়ে শাসক যেমন তার ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামষ্টিক স্বার্থের মেলবন্ধন ঘটাবে; পাশাপাশি জনগণও রাজার স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থরূপে বিবেচনা করবে। ফলশ্রুতিতে পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের অনুগত রূপে নিজেদের তুলে ধরতে লাগল। হবস রাজার স্বার্থকেই কৌশলে জনগণের মাধ্যমে চরিতার্থ করার পদক্ষেপ নিলেন। বিদ্রোহের আশঙ্কা রদ করার লক্ষ্যে হবস মতামত প্রকাশ ও মতাদর্শ প্রচারের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেছেন। অন্যথায় এতে গুটিকতক ব্যক্তির অতিরঞ্জিত চিন্তাভাবনা জনগণের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি করে এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অসন্তোষ প্রকাশ পাবে।

হবস অবিভাজ্য সার্বভৌমে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি প্রজাদের কাছে সরকার পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতা প্রদান করেননি। বরং প্রজারা সার্বভৌম কর্তৃক সংগঠিত কার্যাবলীসমূহ স্বীকৃতি প্রদান করে। এতে সার্বভৌম এবং প্রজার মধ্যে সম্পর্ক বৈরী না হয়ে সহযোগিতামূলক হয়ে উঠে। তাই সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো জনগণের জন্য একটি ভালো সরকার প্রতিষ্ঠা করা। ভালো সরকারের প্রকৃতি হবে এমন যাতে তার কার্যাবলী জনগণের কাছে সমাদৃত হয়। কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী যার কাছে অন্য সকল ব্যক্তিগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ সমর্পণ করেছে সে বা তারাই সরকার। সরকার যখন জনগণের কাছে থেকে সকল ক্ষমতা ও অধিকার গ্রহণ করে কিংবা প্রাপ্ত হয় তাহলে সরকার হয়ে উঠে সার্বভৌম। ভালো-মন্দ নিরুপণের কোনোটি জনগণের জন্য সঠিক বা ভুল সিদ্ধান্ত হবে, কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো শক্তির সার্বভৌমের সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা নেই।

হবস মনে করেন সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য ও অপৃথকযোগ্য। তাই রাষ্ট্রের এমন কোনো শক্তি নেই যা সার্বভৌমের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে অথবা শাস্তি দিতে পারে। হবস সার্বভৌমের কাছে এ ধরনের চরম কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন মানুষের সমাজ বিরোধী প্রবৃত্তি দমনের জন্য। সার্বভৌম পরবর্তীতে সরকারের শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মাধ্যমে তার কার্যাবলী সম্পাদন করে।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রই কেবলমাত্র রাষ্ট্রকে এবং তার সার্বভৌম শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে পারে। এজন্য প্রয়োজন ভালো আইনের। সার্বভৌম শক্তির সুরক্ষার্থে 'ভালো আইন' প্রণয়ন করতে হবে। ভালো আইন কেবলমাত্র আইন নয় তার চেয়েও অধিক। ভালো আইন দ্বারা কারো প্রতি অন্যায্যতা হতে পারে না। ভালো আইন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রণীত হবে; সার্বভৌম এধরণের আইন প্রণয়ন করবেন যা দ্বারা তার ক্ষমতা নিশ্চিত হবে। সার্বভৌমের ক্ষমতা নিশ্চিতকরণের কাজটি সম্পন্ন হবে কমনওয়েলথের জনগণ কর্তৃক। জনগণের অংশগ্রহণ রয়েছে বলে একে জনগণ অন্যায্যও বলতে পারে না। তাঁর ভাষায়, A good law's that which is *needful,* for the *good of the people,* and *withal perspieuous.*[৬]

হবসের সরকারব্যবস্থায় আইনের স্থান কিন্তু রাজা কিংবা সার্বভৌমের উর্দ্ধে নয়। কারণ এতে আইন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সার্বভৌমের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ সক্ষম হয়। সার্বভৌম বা *লেভিয়াথান* যখন তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারায় তাহলে রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

হবস রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাতে জনগণকে সরকারের ক্ষমতার উৎসরূপে গণ্য করেছেন। হবসের এধরণের ধারণার পেছনে কারণ হতে পারে এরকম যে, জনগণ প্রকৃতির রাজ্যের দুঃসহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে সরকারব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটায়। রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তাই জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। হবসের রাজতন্ত্রের এই উৎসটি আধুনিক রাজতান্ত্রিক ধারণা অপেক্ষা সে অর্থে কিছুটা ভিন্নতর। হবসের মতে, "রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায়ও ক্ষমতার চূড়ান্ত উৎস হলো জনগণ। সমস্ত রাষ্ট্রই শাসন করে জনগণ, রাজতন্ত্রেও সে হুকুম খাটায়, কেননা সেখানে সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে একজন ব্যক্তির মাধ্যমে... গণতান্ত্রিক ও আভিজাতিক রাষ্ট্রে নাগরিকরা দলবদ্ধ আর তাদের সভাই হলো জনগণ। রাজতন্ত্রে রাজাই জনগণ।"[৭] রাজতন্ত্রে রাজা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সার্বভৌম যে আইন প্রণয়ন করেন সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে জনগণ সে আইন মান্য করবে। হবসের সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌমের আদেশ-নির্দেশ অমান্য করা হলো রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা, শৃঙ্খলা বিরোধী কাজ করা। যা কার্যত রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর। জনগণ রাজার আদেশ-নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য। রাজার বিরুদ্ধাচারণের সুযোগ হবসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি জনগণকে প্রদান করেননি। জনগণ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে এ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে নিজেদের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে। বলা যায় জনগণ নিজেরাই স্বীয় স্বার্থে নিজেদের ক্ষমতা এবং অধিকার রাজতান্ত্রিক সরকারের কাছে অর্পণ করে।

রাজতান্ত্রিক সরকারে জনগণই রাজা তথা সার্বভৌমকে চরম ও সীমাহীন ক্ষমতা দিয়েছে। কেবল আত্মরক্ষার অধিকার প্রজারা নিজেদের কাছে রেখেছে। কারণ প্রাকৃতিক অধিকারের হস্তান্তর সম্ভব নয়। রাজার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো প্রজার জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা।

রাষ্ট্রের যে কোনো উপদল বেসামরিক, বেসরকারি বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনকে হবস উপদলভুক্ত করেছেন। এ সকল উপদল রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা এবং অখণ্ডতা অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থকে গুরূত্বপূর্ণ বিবেচনা করে আত্মকলহে লিপ্ত হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশ শাসনের পক্ষে শুভ নয় হবস এমন ধারণা পোষণ করেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি এথেনীয় গণতন্ত্রের অতীত ইতিহাসকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম কমনওয়েলথের জন্য হুমকিস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে হবস তৎকালীন ইংল্যান্ডের পিউরিটান বিপ্লবের অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন। তিনি মনে করেন পিউরিটানদের চিন্তাধারা ও কার্যক্রম ইংল্যান্ডের জাতীয় ঐক্য ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ছিল। এ সকল অভিজ্ঞতা থেকে হবস সাধারণ জনগণের বিচার বিবেচনায় আস্থা না রেখে সার্বভৌমের একক বিবেচনায় আস্থা স্থাপন করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের মানুষের আত্মস্বার্থবাদী প্রবণতাকে রাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির বিবেচনায় হবস গুরূত্ব দিয়েছেন বোধ হয়। যার দরুণ জনগণের যুদ্ধংদেহী, স্বার্থপর মনোবৃত্তিপ্রসূত বিচারে হবস রাষ্ট্রের ভালো মন্দ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। বৃহত্তর স্বার্থের বিবেচনা না করে আত্মস্বার্থ

তাড়িত ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করতে পারে এমন আশংক্কা থেকে হবস সম্ভবত রাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিকে সমর্থন এবং জনগণের বিপ্লবের অধিকারের বিরোধিতা করেছেন।

অধ্যাপক গেটেল হবসের রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাকে একটি চরম ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকাশ মনে করেন, যেখানে প্রাকৃতিক আইন, সামাজিক চুক্তি সকল কিছুই নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সমর্থনে হবস ব্যবহার করেছেন। হবস তৎকালীন গীল্ড, চার্চ ইত্যাদির সাহায্যে গঠিত প্রাক-টিউডর যুগের নমনীয় রাষ্ট্রের স্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, রাজতান্ত্রিক সরকার সে রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি।

হবসের রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় আরেকটি লক্ষণীয় দিক হলো তিনি ইংরেজদের রক্ষণশীল ঐতিহ্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। সামন্তবাদ ও যাজকতন্ত্রের বিরোধীতা করলেও তিনি চরম রাজতন্ত্রকে ঠিকই সমর্থন করেছেন। চরম রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় হবস ইংল্যান্ডের শান্তি, স্বাধীনতা, সংস্কৃতির বিকাশ খুঁজেছেন। একচ্ছত্র রাষ্ট্রক্ষমতার বৈধতা নিরূপনে হবস মেলবন্ধন ঘটালেন শক্তি ও সম্মতির। তাঁর ভাষায় 'একক ব্যক্তি বহু লোকের সম্মতিক্রমে যার অভিপ্রায় সবার অভিপ্রায় বলে স্বীকৃত, ফলে শান্তি ও সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তা সমাজের আলাদা আলাদা ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর হুকুম খাটাতে পারে।'[৮]

হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতা যে কেবল রাজার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এমনটা নয়। জনগণও এই ক্ষমতার পূজারী। জনগণকে যদি জীবনের নিরাপত্তা প্রদানে রাজা ব্যর্থ হয় তাহলে সে রাজার বা শাসনের বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষমতা জনগণ রাখে। সেরূপ পরিস্থিতিতে জনগণ কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত হতে পারে না। একইভাবে প্রচলিত শাসক যদি জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর কল্যাণে অসমর্থ হয়, তাদের সুযোগ সুবিধা মেটাতে না পারে তাহলে জনগণও তাদের সমর্থন পরিবর্তন করার সুযোগ রাখে।

হবস তাঁর সরকারব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের সমর্থন করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের উপর বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা। এ সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ও বিচক্ষণতার উপর তিনি আস্থাহীন ছিলেন। তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের সিদ্ধান্ত সঠিক না হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির বিরোধীতা করে হবস মনে করেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ দল বা উপদলসমূহ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এসব দল বা উপদল সমূহ রাষ্ট্রীয় কোন্দল তথা গৃহযুদ্ধের কারণ। রাজতান্ত্রিক সরকারে হবস আইনের শাসনের দৃঢ় ভিত্তি দেখতে পান কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে তিনি আইনের দৃঢ়তা লক্ষ করেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠের আইন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হবসের এ আশঙ্কাটি যে অমূলক নয় তা আমরা আধুনিককালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রতি লক্ষ করলে দেখতে পাই। আইন সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার দ্বারা বারংবার সংশোধিত হয়। কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় কল্যাণ অপেক্ষা সংকীর্ণ স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় হবস আইনকে তুলনা করেছেন ঢেউয়ে ভাসমান বস্তুর সাথে, যা ঢেউয়ের তোড়ে একদিক থেকে অন্যদিকে যায়।

হবস নীতিগতভাবে ভালো এবং মন্দ সরকারের মাঝে কোনো প্রভেদ করেননি। বরং তিনি রাজতন্ত্রের সমর্থকরূপে স্বৈরাচারকে গ্রহণ করেছেন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে, হবসের দর্শনে তিনি যে অর্থে স্বৈরাচারকে গ্রহণ করেছেন তা কিন্তু জনগণের দমন পীড়নকে সমর্থন করে গড়ে ওঠা নয়। তবে রাজার একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে রাজার বা সার্বভৌমের মূল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এধরণের রাষ্ট্রচিন্তার দরুন তার রাষ্ট্রদর্শনকে সর্বাত্মকবাদের সমার্থক রূপে গণ্য করা হয়। এবং প্রায়শই সর্বাত্মকবাদরূপে অভিহিত করা হয়।

হবস রাজতান্ত্রিক শাসনকে শ্রেষ্ঠ সরকারব্যবস্থা তথা জনগণের জন্য শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থারূপে গণ্য করেছেন। তাঁর মতে, রাজতান্ত্রিক সরকারের রয়েছে রাষ্ট্রের এবং প্রজাদের শান্তি, সমৃদ্ধি স্থাপনের ক্ষমতা, জনকল্যাণের কার্যকরী প্রচেষ্টা। রাজতন্ত্র বা একক ব্যক্তির ক্ষমতার সমর্থক হলেও তিনি (হবস) শাসক কর্তৃক জনগণের কল্যাণের বিষয়টি উপেক্ষা করেননি এবং শাসকের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধিকে করেননি। হবসের সরকার সম্পর্কিত ভাবনায় জনস্বার্থের প্রতি মনোযোগের বিষয়টি অধিকতর দৃশ্যমান হয় তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থের ত্রিশতম অধ্যায়ে। জনগণের নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, রাজনৈতিক শিক্ষা, ভালো আইনের ঘোষণার প্রচার, সমন্যায্যতা, করারোপ, যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা ও পুরস্কার, কাউন্সেলরদের বৈষম্যমূলক পছন্দ, সামরিক শাসক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তিনি এখানে আলোকপাত করেছেন।[৯] এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি ভালো সরকারের প্রয়োজনীয়তা হবসের জনস্বার্থের প্রতি বিবেচনাবোধ থেকে উৎসরিত। সাধারণ মানুষের স্বার্থচিন্তাবোধ থেকেই তিনি একটি সুষ্ঠু এবং আইনানুগ সরকারের প্রয়োজনবোধ করেছেন।[১০] অবশ্য সুসান মলার ওকিন এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন হবসের *লেভিয়াথানে* রাষ্ট্রের নাগরিকগণ এমন এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখিন যে ব্যক্তি সংসদের পরামর্শ অন্বেষণ বা মান্য কোনটি করে না, সে কমনওয়েলথ ব্যতীত নিজেকে রক্ষা এবং পরিচালনা করতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম।[১১]

হবসের দৃষ্টিতে মানুষের সমাজ বিরোধী প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে সরকার কাজ করে। যদিও হবস এক প্রকার সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকেই সরকারের এ ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন বলা যায়। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা এবং সরকারকে দেখেছেন গৃহযুদ্ধের প্রতিবন্ধক রূপে এবং তিনি সার্বভৌমকে দেখেছেন নিরঙ্কুশ সংবিধান (Absolutist Constitution) রূপে।[১২] হবসের এ মতটি মেনে নেওয়া হলে স্বৈরাচারতন্ত্রের আশঙ্কাকেও গ্রহণ করতে হয়। তবুও হবস এ ধরনের নিরঙ্কুশ সংবিধান এবং এর রূপক রূপে স্বৈরতন্ত্রকে গ্রহণ করতে সম্মত কারণ তা গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষতি থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে।

হবসের সাথে সাংবিধানিক চিন্তাবিদদের কিছু পার্থক্য রয়েছে- তা হলো হবস মনে করেন শাসকের সঠিক ভাবে সরকার পরিচালনার জন্য নৈতিক যুক্তি থাকে। সাংবিধানিকগণ যেখানে সঠিক সরকারব্যবস্থার পরিচালনার জন্য আইনের নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধতাকে ভালো শাসনের পূর্বশর্ত রূপে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে হবস নির্দেশ করেন সার্বভৌমের আগ্রহকে। শাসক বা সার্বভৌমের দায়িত্ব নিহিত থাকে জনগণের জন্য ভালো সরকার পরিচালনায়। তাই সার্বভৌমের দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনাই জনগণকে তাদের সুফল পেতে সাহায্য করে।

হবস সার্বভৌম কর্তৃত্বের গঠন এবং সরকারের আচরণকে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের প্রয়োগ এবং অধিকার এর সাথে যুক্ত করেন। যেমন সুশাসন বা যথাযথভাবে কমনওয়েলথ পরিচালনা করা প্রাকৃতিক আইনের দায়িত্ব যার জন্য শাসক ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। হবসের মতে সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনা করার মাঝে সার্বভৌমের স্বার্থ রয়েছে। সার্বভৌম তার কাছে অর্পিত সর্বোচ্চ ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহার দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থের সমন্বয় ও সংরক্ষণ করবে। রাজতান্ত্রিক শাসনে ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থ অভিন্ন হতে হবে। হবস *De Cive* গ্রন্থে বলেন– "we cannot on better condition be subject to any. Then one whose interest depends upon our safety and welfare; and this then comes to passe when we are the inheritance of the ruler; for every man of his own accord endeavours the preservation of his inheritance."[১৩]

হবস একদিকে নিরঙ্কুশতন্ত্রকে দেখেছেন জনগণের তথা নাগরিকের স্বার্থ সংরক্ষণের ইতিবাচক দিক রূপে এবং অন্যদিকে বিদ্যমান এলিট দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ দমনের হাতিয়ার রূপে। হবসের সরকারব্যবস্থার প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায় তিনি জনস্বার্থে সরকার পরিচালনা এবং সে সাথে আইনের সহায়তায় সার্বভৌমের ক্ষমতাকে শক্তিশালী

করার পক্ষপাতী ছিলেন। এটিকে আমরা তার তত্ত্বের নৈতিক ব্যাখ্যা দাবি করতে পারি। যার ভিত্তিতে হবস তার নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক সরকারকে বৈধতা প্রদান করেছেন। একটি ভালো সরকার একটি শক্তিশালী সরকারও বটে যা অধিকার সৃষ্টি করে। বমগোল্ড হবসের সরকার পরিচালনা কৌশলকে ম্যাকিয়াভেলীয় রাষ্ট্রনীতির সাথে তুলনা করেছেন। ম্যাকিয়াভেলি এবং হবস উভয়েই যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তা ছিল-আধুনিককালের গোড়ার দিকে শাসকদের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ।[১৪] তবে হবস মনে করেন কেবলমাত্র সঠিক এবং আইনগত নিয়মই ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে পক্ষান্তরে ম্যাকিয়াভেলি মনে করেন শাসকের ব্যক্তিগত কৌশল নৈপুণ্য (ছলনা-ভয়) দ্বারা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা সম্ভব।

দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ দমন হবসীয় সরকারব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় দিক। যে সকল কারণে দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ হতে পারে তন্মধ্যে রয়েছে জনগণের অসন্তোষ, উচ্চভিলাষী অভিজাতশ্রেণি এবং রাজনৈতিক সংস্থা। তিনি মনে করেন, সকল প্রজাদের উপর সমান করারোপ এবং অসন্তোষের কারণ নির্ধারণে কার্যকর প্রতিষেধক হতে পারে ন্যায়বিচার। পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভীতি উচ্চাভিলাষকে নিরস্ত করে। তাছাড়া শাসকের উচিত মিথ্যা মত এবং উপদল সমূহকে উপড়ে ফেলা। হবসীয় নিরঙ্কুশতন্ত্রকে আমরা নীতিহীন, আইনবর্জিত, অমানবিক বলতে পারি না। এখানে বিদ্রোহের দমন যেমন নির্দেশিত হয়েছে তদ্রুপ আইনের শাসন এবং জনস্বার্থ সংরক্ষণকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশেষত সমানভাবে করারোপকে তিনি উল্লেখ করেছেন দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহ নিরসনের পদক্ষেপ রূপে।

হবসীয় সরকার পরিচালনার নীতি থেকে দাবি করা যায়, তার সরকার পরিচালনার কৌশলের পেছনে কাজ করছে একটি আদর্শনিষ্ঠ ধারা যেখানে তিনি বলপ্রয়োগকারী শক্তির সাথে আইনপ্রণয়নকারী তথা আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃত্বের সংযোগ করেছেন। হবসের দর্শনে আইনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণে বলা যায় ব্যক্তির জীবনে শৃঙ্খলাবিধানে আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যক্তিক শৃঙ্খলা পরবর্তীতে রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা স্থাপন করে; আইন এবং শাস্তির ভীতি অবাধ্যতা প্রতিহত করে।

হবসের সরকারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং বাস্তবতা বিবেচনায় গণ্য করা উচিত। তিনি মনে করেন শাসক তার জনগণের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং সামাজিক বৈশিষ্ট্য গঠনে ভূমিকা পালন করেন। হবসের মতে, সর্বোচ্চ আদেশ এবং চরম ক্ষমতা অধিকাংশ মানুষের কাছে অত্যন্ত রূঢ় ও ঘৃণ্য মনে হলেও তা মূলত জ্ঞানের অভাবে বোধ হয়, যা প্রকৃতপক্ষে মানবপ্রকৃতি এবং সিভিল আইন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব এবং অংশত তাদের অক্ষমতা তথা অপরাধ থেকে সৃষ্ট, যারা মহান কর্তৃপক্ষের অধীনে থেকে তাদের ক্ষমতাকে তাদের লালসার জন্য অপব্যবহার করে।[১৫]

হবস রাষ্ট্রদ্রোহকে অসতর্ক তথা অসাবধানী সরকারব্যবস্থার জন্য প্রাকৃতিক শাস্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন অসৎ বিমোহিত প্রজাদের রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ বিচারে খুব বেশি শাস্তির মুখোমুখি করাটা উচিত হবে না। যদি শাসক নিজে তার প্রজাদের যথাযথভাবে পরিচালিত করতে সক্ষম না হয়, এক্ষেত্রে শাসকও অভিযুক্ত হতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অপরাধীর শাস্তি যদি অসঙ্গতিপূর্ণ হয় বা সার্বভৌমের অংশ থেকে দ্বন্দ্বের প্রতি কোনো মৌন সম্মতি দেওয়া হয় অথবা থাকে তাহলে প্রজার অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস পায়। কারণ এক্ষেত্রে সার্বভৌম নিজেও সে অপরাধের অংশ। আবার শাসক যদি অপরাধীর জন্য যথার্থ শাস্তি নিশ্চিত না করে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। তাতে ব্যক্তির লোভ শাস্তির ভীতি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে পড়ে; এতে আরো বেশি পাপ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এভাবে শাসক নিজেই আইনের দুর্বল প্রয়োগ এবং অপরাধীর দন্ডবিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন দ্বারা অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়।

হবস তার সরকার সম্পর্কিত আলোচনায় কেন একটি সরকার সুশাসন পরিচালনা করবে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এতে তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার্থে রাজতন্ত্রের উপর আস্থা রেখেছেন এবং রাজতান্ত্রিক

সরকারব্যবস্থা জনগণের কল্যাণ সাধনে সক্ষম এ বিষয়ে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী। হবসের সার্বভৌমত্ব এবং সরকারব্যবস্থায় বারংবার নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে সমর্থন দ্বারা তিনি ক্ষমতার বিভাজনকে অসমর্থন করেছেন, অন্যদিকে শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সমন্বিত করেছেন জনগণের স্বার্থকে। শাসকের দায়িত্ব রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এবং নাগরিকের দায়িত্ব শাসকের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা। এক্ষেত্রে শাসককে অবশ্যই তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। হবসীয় সরকারব্যবস্থায় এক প্রকার পারস্পরিকতাবোধের প্রতিফলন পাওয়া যায়। হবসের রাষ্ট্রচিন্তা সম্পূর্ণ নীতিবর্জিত কিংবা মানবচরিত্রকে কেবল আত্মস্বার্থবাদী রূপে চিত্রিত করেছেন– তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি আমাদের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। এটি সত্যি, তিনি মানবচরিত্রকে আত্মস্বার্থবাদী রূপে চিত্রিত করেছেন এবং তার এ চিত্রায়ণ কেবল কল্পনা নয়। এতে বস্তুনিষ্ঠতা আছে, তবে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বার্থবাদী কিনা তা পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে।

তাঁর সার্বভৌমতত্ত্বে এবং সরকারি ব্যবস্থায় বলপ্রয়োগকারী শক্তির উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে বটে, তবে এতে এটা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় না যে বলপ্রয়োগকারী শাসক জনগণের স্বার্থের জন্য বিচলিত হবেন না কিংবা জনগণের ভালোর জন্য চিন্তা করবে না। কেবল ক্ষমতার জন্যই হবসীয় সরকারব্যবস্থা আবর্তিত এমন দাবি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এককভাবে শাসকের ক্ষমতা নয় জনগণের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধ হয়েছে হবসের সরকারব্যবস্থায়। একটি চরম ক্ষমতাশালী *লেভিয়াথানের* যে চিত্র আমরা পাই, সে সাথে একটি কল্যাণমূলক *লেভিয়াথান* রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ রূপটি চিত্রিত হয়েছে হবসের লেখনীতে।

হবসের সরকার সম্পর্কিত আলোচনায় অভিজাতদের রাজনীতির দিকটি গুরুত্বের সাথে এসেছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র অথবা উদারতাবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভিজাত রাজনীতির কারণে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় জটিলতাসমূহ স্মরণে রাখা প্রয়োজন, যা শেষ পর্যন্ত দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। তাই হবস সাধারণ প্রজাদের স্বার্থগত দিক বিবেচনায় নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। তবে এটাও সত্যি যে, যদিও হবস তার সরকারব্যবস্থায় প্রজাদের স্বার্থের কথা, সুবিধার বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন কিন্তু প্রজাদের তিনি সব সময় অধীনস্থ রাখতেই পছন্দ করেছেন। সাধারণ প্রজা অপেক্ষা হবস অধিকতর উদ্বেগের কারণ মনে করেছেন অভিজাতশ্রেণিকে। অভিজাতশ্রেণিকে হবস সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে প্রথম ও শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতারূপে গণ্য করেছেন। তিনি মনে করেন– উচ্চাভিলাষী অভিজাত শ্রেণি একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হতে পারে। উচ্চাকাঙ্খী অভিজাতগণ প্রজাতন্ত্রের জন্য সমস্যা। অভিজাতশ্রেণির উচ্চাকাঙ্ক্ষা শাসকের প্রতি তাদের আনুগত্যপ্রবণ করে না, যা সাধারণ জনগণের কাছে থেকে শাসক লাভ করেন। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষীদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নিয়ন্ত্রণ হবসের রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম বিষয়। হবসের সরকারব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে সর্বোচ্চ সরকারব্যবস্থারূপে তিনি গণ্য করেছেন, যা দ্বারা অভিজাত শ্রেণির উচ্চাভিলাষ এবং তাদের মধ্যকার সংঘাত-সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

বমগোল্ড হবসের সরকারব্যবস্থায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছেন।[১৬] একদিকে তার রাষ্ট্রচিন্তায় রয়েছে সাংবিধানিক এবং আভিজাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অন্যদিকে হবসের আবেদন সাধারণ প্রজাদের প্রতি। যদিও তার রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতার বলয়ে সাধারণ প্রজারা পরোক্ষভাবে যুক্ত, তথাপিও তিনি তাদের সেবা তথা স্বার্থগত বিবেচনাদ্বারা তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নিয়ন্ত্রণে পক্ষপাতী। সাধারণ প্রজাদের এটা বুঝতে হবে যে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ছত্রছায়াতেই তাদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সম্ভব। এ সরকারব্যবস্থায় তারা (প্রজাগণ) বিপদমুক্ত, তবে উচ্চাভিলাষী অভিজাতগণ দুর্ভোগের শিকার হবে।

হবসের কাছে কমনওয়েলথ হলো এমন একটি রাষ্ট্র যাতে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটবে আদর্শ শর্তসমূহ দ্বারা এবং সেটা এ কারণে প্রয়োজন যে এর সাহায্য সিভিল সমাজ যথাযথভাবে পরিচালনা করা যায়। কমনওয়েলথ পরিচালনায় হবস নির্ভরযোগ্য সরকারব্যবস্থা রূপে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছে। রাজতন্ত্র হলো হবসের কাছে সেরূপ

সরকারব্যবস্থা যার সাহায্যে সার্বভৌম তার আদর্শ শাসন পরিচালিত করতে পারে। এ সরকারব্যবস্থাতে শাসকের তথা সার্বভৌমের অন্যান্য সকল বৃহৎ শক্তিসমূহের ওপর কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকে। যে কারণে হবস ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা স্বতন্ত্রীকরণ পছন্দ করেননি। শাসক যদি সামরিক ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাহলে আইনের বাস্তবায়ন বা সম্পাদনের অভাবে বিচারিক কার্যক্রম বৃথা হয়ে পড়ে। তাই তার কাছে একটি পূর্ণ ক্রিয়াশীল সার্বভৌম শক্তির প্রয়োজন। এর প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে।[১৭] হবসের সময়কালে ইংল্যান্ডে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের কারণরূপে হবস মনে করেন রাজা, লর্ড সভা ও হাউস অব কমন্সের মাঝে নিভাজিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে। যা রাষ্ট্রের পতনের অন্যতম কারণ। এ কারনে তিনি ক্ষমতার পৃথকীকরণের বিরোধী ছিলেন এবং রাজতান্ত্রিক সরকারের কাছে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার পক্ষপাতী।

গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্রে একজন শাসক তার কমনওয়েলথের সমৃদ্ধি সাধন করতে পারে তদাপেক্ষা সমাজবিরোধী কাজের দ্বারা একজন শাসক দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিরূপে অধিকতর কলঙ্কিত হতে পারেন। উল্লেখ্য, হবস সরকার পদ্ধতিরূপে গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মাঝে তেমন কোন তফাৎ দেখেননি। যা তিনি এ দুয়ের সাথে রাজতন্ত্রের মাঝে দেখেছেন। কারণ গণতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র নয় কেবল রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাতে সার্বভৌম ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে থাকে। কাজেই একজন ব্যক্তির উপস্থিতিই শেষ কথা নয়। সে সাথে একজন ব্যক্তির উপর অর্পিত সার্বভৌম ক্ষমতার প্রশ্নটি মূল বিষয়।

ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের পর মিশ্র রাজতান্ত্রিক সরকারের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় ব্রিটেনে। মারক্যুইস অব হ্যালিফ্যাক্স ১৬৮৫ সালে লিখেছেন মিশ্র রাজতন্ত্রে কর্তৃত্ব এবং স্বাধীনতা উভয়ের আনন্দদায়ক সম্মিলন ঘটেছে। যা একদিকে রাজাকে দিয়েছে আদেশ দানের ক্ষমতা, এবং প্রজাদের কাছে সে ক্ষমতা দিয়েছে যা দ্বারা তাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলো...।[১৮] করারোপ, আইন প্রণয়ণ, আইনের প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এ সকল ক্ষমতাসমূহ বিভিন্ন জনের উপর ন্যস্ত থাকে তাই মিশ্র রাজতন্ত্রে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হয় এ বিষয়ে আমরা লকের লেখনীতে বিস্তারিত দেখতে পাই। কিন্তু হবস মিশ্র রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। হবস এধরণের সরকার পদ্ধতিকে সরকারব্যবস্থা বলেই মনে করেন না। বরং তিনি এগুলোকে মনে করেন কমনওয়েলথের তিনটি উপদলের বিভাজন।[১৯] যে রাজার বা শাসকের কাছে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকে না, সীমিত ক্ষমতার অধিকারী তাকে সার্বভৌম বলা যায় না। মিশ্র রাজতন্ত্রে সরকার পরিচালনার মূল ক্ষমতা থাকে এসেম্বলির কাছে; এসেম্বলি রাজার বা শাসকের ক্ষমতাকে চাইলে সংকুচিত করতে পারে, যা রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সম্ভব নয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক সরকারে এসেম্বলি কর্তৃক তা সম্ভব।

আনুগত্যের ধারণা

হবস তাঁর সরকার-পদ্ধতিতে রাজনৈতিকভাবে প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাসমূহের সাথে সার্বভৌমের পার্থক্য করেছেন। যেমন– যদি কোনো সার্বভৌম রাজা অথবা সার্বভৌম তার ডেপুটি বা প্রতিনিধি দ্বারা অথবা অন্য কারো দ্বারা শহরের মধ্যে অথবা সার্বভৌমের সীমানার মধ্যে তার প্রজাদের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা জানার জন্য যে দায়িত্ব দেওয়া হয়, সেসব ডেপুটি একটি নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে মিটিং দ্বারা জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা তুলে ধরে, এক্ষেত্রে ডেপুটি কর্তৃক পরিচালিত কাজকে হবস মনে করেন তারা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী মাত্র, কিন্তু মূল ক্ষমতা শাসক বা এসেম্বলির কাছেই রইল। একজন ব্যক্তি বা নাগরিক প্রকাশ্য অ-সার্বভৌম প্রতিনিধিত্বশীল সংসদের আদেশের বিরোধিতা করতে পারে। অন্যথায় উক্ত প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠী সমূহের কোনো অন্যায় কাজের দায় আদেশ মান্যকারী ব্যক্তির কাছে বর্তায়।[২০]

হবসের কাছে সার্বভৌম রাজা জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র। হবসের মতে "a Common-wealth is said to be Instituted when a Multitude of men do Agree, and Covenant, every one, with every one, that to what saver man, or Assembly of Men, shall be given by the major part, the Right to present the Person of them all, (that is to say to be their Representative)."[২১]

ম্যাকফারলেন মনে করেন, হবস প্রাতিষ্ঠানিক সার্বভৌমের প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রাজাদের অধিকার ও ক্ষমতার বিপক্ষে উথাপিত দাবিসমূহ খণ্ডন করার জন্য।[২২] হবস আরো দাবি করেন রাজাদের যৌথ সংস্থা ক্ষমতায় সার্বভৌমের চেয়ে উচ্চতর এমন চিন্তা অযৌক্তিক অর্থাৎ এক্ষেত্রে তিনি অভিজাততন্ত্রকে আক্রমণ করেছেন।

হবসের সরকার-পদ্ধতি সম্পর্কিত এ যাবৎ আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি তিনি নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে, একচ্ছত্রবাদকে সর্বাগ্রে সমর্থন করেছেন। এধরণের সরকারব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হলো আনুগত্য। তাই তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে বাধ্যবাধকতাতত্ত্ব বা আনুগত্যতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তায় আনুগত্যের বা বাধ্যবাধকতার ধারণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য হবসীয় বাধ্যবাধকতার ধারণার সাথে নৈতিকতার যে একপ্রকার সম্বন্ধ রয়েছে তা আমরা এ পর্যন্ত আলোচনার বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করেছি। আনুগত্য বা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সচরাচর যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে তার চেয়ে ভিন্নভাবে হবস বাধ্যবাধকতাতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর কাছে বাধ্যবাধকতার দুটি রূপ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা।[২৩]

নিঃসন্দেহে তার বাধ্যবাধকতাতত্ত্ব ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্কের বিশ্লেষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ক্ষমতার বলয়ে রাজা এবং সার্বভৌমের প্রতি জনগণের আনুগত্য প্রদর্শনকে ব্যাখ্যা করা হলে তা হবে একপাক্ষিক। কেননা, এতে জনগণ কর্তৃক সিভিল আইনকে মান্য করার, আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিষয়টি উহ্য থেকে যায়। হবসের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় রাজা, সার্বভৌম এবং আইনের প্রতি আনুগত্যের বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত। হবসের নৈতিক বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আলোচনা লক্ষ করা যায় ওয়ারেন্ডারের লেখনীতে। ওয়ারেন্ডারের মতে– হবসের প্রকৃতির রাজ্য হলো একটি নৈতিক শূন্যতা; নৈতিক বাধ্যবাধকতার সূত্রপাত হয়েছে কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমাজে বা সিভিল সোসাইটিতে এবং নৈতিক পার্থক্যসমূহ বৈধ হয়ে উঠেছে সার্বভৌম ইচ্ছার রসায়নের দ্বারা।[২৪] পক্ষান্তরে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার উৎস ব্যক্তির ইচ্ছা থেকে। জনগণ মৃত্যুভীতি কিংবা অন্যজন কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্তির আশঙ্কা এড়িয়ে চলার অভিপ্রায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতি স্বইচ্ছায় সম্মতিপ্রদানপূর্বক আনুগত্য প্রদর্শন করে।

বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্বরূপ

হবসের রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি একদিকে, মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিতার হাত থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করে পোপ বা ধর্মযাজকের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উপর রাষ্ট্রক্ষমতা স্থাপন এবং জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার্থে রাজার চরম ক্ষমতা নিশ্চিত করেছেন। তার সরকারব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় ক্ষমতা কেন্দ্রিক সামাজিক পরিবর্তন যাতে পারলৌকিকতার পরিবর্তে ইহজাগতিক চিন্তাধারার মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ এবং রাজার ক্ষমতার মেলবন্ধন ঘটে। তবে একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে থাকে– মধ্যযুগীয় ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এবং গোঁড়ামী থেকে হবস মুক্তি পেলেও তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি ধর্মের প্রভাব থেকে কি পুরোপুরি মুক্ত হতে পেরেছেন?

অন্যদিকে রয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে একটি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ। এতে কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বুর্জোয়া গোষ্ঠী। তার রাষ্ট্রদর্শনে স্পষ্ট বুর্জোয়া প্রভাব লক্ষণীয়। হবসের কাছে রাষ্ট্র ও সমাজ

দুয়ের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। বুর্জোয়া ভাবাদর্শে প্রভাবান্বিত হবসের কাছে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যত্যাগ করে ব্যক্তির সমাজ জীবনে পদার্পন দ্বারা সম্পত্তির ধারণা শক্তিশালী রূপ পেয়েছে।

হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় যে বস্তুবাদ লক্ষ করা যায় তা একপাক্ষিক। কারণ হবসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সংগ্রাম দেখেছে; সংগ্রামের শেষে ঐক্যের যে সুযোগ বা পরিণতি সে বিষয়টাকে উপেক্ষা করেছেন হবস। হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় শ্রেণীগত ঐক্য নির্দেশিত হয়নি কারণ হবসের বস্তুবাদ ছিল পুরোপুরি যান্ত্রিক। জগতের বৈচিত্র্য, মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন সকল কিছুকে হবস ব্যাখ্যা করেছেন যান্ত্রিক গতির নিয়মের অধীনরূপে। জগতের সকল কিছুই বস্তু এবং বস্তুর সামষ্টিক প্রকাশ হলো জগত। এর বাইরে মানুষের মানবিক জীবনাচরণ, ঐক্য, সমন্বয় ইত্যাদি বিষয়াদি হবসের কাছে উহ্য থেকেছে বলে কার্ল মার্কস মনে করেন।[২৫]

হবসের সরকারব্যবস্থায় কর্তৃত্ববাদী বুর্জোয়া রাষ্টব্যবস্থার প্রকাশটিও লক্ষনীয়। যার দরুন বলা যায় হবসের সরকারব্যবস্থায় কেবল সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র, গণতন্ত্রের বিরোধিতা নয় বরং কোনো উপায়ে শক্তিশালী বুর্জোয়া সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব সে লক্ষ্যে তিনি রাজতন্ত্রকে বারংবার সামনে রেখেছেন নির্ভরযোগ্য শক্তিরূপে। বুর্জোয়া ক্ষমতা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে তিনি সম্ভবত শ্রেণীসংগ্রাম, শ্রেণীগত অনৈক্য, সামাজিক সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মৌন থেকে রাজতান্ত্রিক সরকার দ্বারা সমাধান করেছেন। তাঁর সরকারব্যবস্থায় এভাবে প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদের প্রশস্তকরণের বীজ বপন করেছেন বলে আমাদের মনে হয়। তিনি রাজতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে রাষ্ট্রের জয়গান দ্বারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার বৈধতা যেমন প্রতিষ্ঠা করেছেন একই সাথে গণতন্ত্রবিরোধী বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার ভিতটি শক্তিশালী করতে চেয়েছেন রাজতন্ত্র দ্বারা। কাজেই হবসের সরকারব্যবস্থার রাজনৈতিক দর্শন যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে বলতে পারি তার রাজতন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিল বুর্জোয়া ভাবাদর্শ।

হবসের রাজতন্ত্র সতের শতকের ইংল্যান্ডে বিদ্যমান বাস্তবতা বিচারে প্রবল শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী এবং তা থেকেই বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বেগবান হয়েছে। সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষমতাদ্রষ্টারূপে হবসকে কখনো কখনো ফ্যাসিস্ট বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন, প্রজাদের ওপর বাহিক ও অন্তঃস্থ প্রভাব; প্রজাদের যেকোন বিদ্রোহ দমন, রাষ্ট্রের জন্য যেকোন বিধ্বংসী কার্যক্রম দমনের জন্য প্রজাদের শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ, যে কোনো সভা-সমিতি বা উপদল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিচারে তাকে ফ্যাসিস্ট অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। হবস '*লেভিয়াথান*' রূপে প্রত্যক্ষ যে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্রের তাত্বিক বর্ণনা দিয়েছেন ফ্যাসিস্ট সর্বগ্রাসিতা তারই পরবর্তীকালের একটি বাস্তব রূপ– এমনটা মনে করেন রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস গ্রন্থের লেখকবৃন্দ।[২৬] অবশ্য হবসের বিরুদ্ধে ফ্যাসিজমের অভিযোগ সত্য নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন এ যুক্তিতে যে, তিনি যুক্তিবাদী এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির অনুগামী।[২৭] কোনো কোনো (যেমন আমেরিকান রাজনীতিবিদ ড. ফেলমান, আমেরিকান অধ্যাপক ম্যাকফার্সন প্রমুখ) লেখক হবসের সাথে মার্কসীয় চিন্তার কিছু সাদৃশ্য দেখাতে চেয়েছেন। যেমন– *লেভিয়াথান* সম্পর্কে হবস যেরূপ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ধারণা পোষণ করে একে সর্বাগ্রে স্থাপনের চেষ্টা করেছেন তার মতো সর্বগ্রাসী ক্ষমতার আধার রূপে কমিউনিস্ট বিরোধীগণ সোভিয়েত ব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্রকে মনে করেন। তারা উভয়ের মাঝে দেখতে পান সর্বগ্রাসী একনায়কতন্ত্র। আমেরিকান রাজনীতিবিদ ফেলমান মনে করেন, হবস এবং মার্কস উভয়েই একইরকম 'শক্তি তত্ত্বের' প্রতিনিধি।[২৮]

ম্যাকফার্সন মনে করেন, হবসীয় মতবাদে এটা লক্ষনীয় যে ব্যক্তিমালিকানাধীন রাজাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ব্যক্তিদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার্থে হবস সার্বভৌমের এমন একটা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা চিন্তা করেছেন। এমন নিরঙ্কুশ বা চরম সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করবে।[২৯]

হবসের রাষ্ট্রচিন্তার যুক্তিবাদী ধারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজ ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে হবস রাজতন্ত্রকে বিদ্যমান ক্ষমতার কাছে সমর্পন করেছেন। কোনো কোনো সমালোচকদের কাছে হবসের মতবাদ হবসবাদ বলে নিন্দা করা হয়েছে। হবসবাদ বা হবসীয় প্রবণতাকে রাষ্ট্রচিন্তায় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল আধিপত্যের প্রকাশ বলে সমালোচনা করা হয়েছে। যদিও হবসবাদ সম্পর্কিত এ অভিযোগ বা বিতর্কের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। যেখানে রাষ্ট্রকে শক্তিশালীকরণ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে হবস কর্তৃক আলোচিত দিকসমূহ আমরা হবসবাদের ইতিবাচক দিকরূপে বিবেচনা করতে পারি যা সমালোচকগণ গুরুত্ব দেননি।[৩০]

হবস যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রের মাঝে বিশেষ পার্থক্য করেননি, তদ্রুপ তিনি সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিশেষ পার্থক্য করেননি। তিনি রাষ্ট্রের ইচ্ছাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পছন্দসই ব্যক্তিকে ক্ষমতাসীন দেখতে চেয়েছেন এবং রাজতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করেছেন। হবস মনে করেন কোনো সরকার এবং সরকারে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি সার্বভৌমের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত না করতে পারে বা বাস্তবায়িত করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্র বা সমাজের অবস্থান অর্থহীন হয়ে পড়ে। হবসের কাছে এ ধরণের অবস্থা হলো 'মস্তকবিহীন' জনসমষ্টির মতো। হবসের কাছে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্র সফল একটি সরকারব্যবস্থা।

হবসের রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার ধারণাটিতে একটি উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দেখতে পাই। যেখানে জনগণ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে, বিনিময়ে সরকার দিবে নিরাপত্তা। যদি সরকার জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয় তাহলে বিদ্রোহ করতে পারে জনগণ। হবস তাঁর সার্বভৌমতত্ত্বে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা চেয়েছেন সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য। হবস মনে করেন যদি শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয় তাহলে রাজতন্ত্র অন্য যে কোনো ধরণের সরকারব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবশ্য শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষাকে যদি মাপকাঠি বিবেচনা করা হয় তাহলে এ বক্তব্য অন্যান্য সরকারব্যবস্থাসমূহে ও প্রযোজ্য হতে পারে।

লকের ধারণা

লকের সরকারব্যবস্থা হবস অপেক্ষা অধিকতর উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক। লকের সরকারব্যবস্থা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর গণতান্ত্রিক। যদিও লক সরাসরি গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার উল্লেখ করেননি তবে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলতে যা নির্দেশ করেছেন তা গণতান্ত্রিক সরকারের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লকের সরকারব্যবস্থায় জনসম্মতির ধারণা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আছে। তার সরকারব্যবস্থায় তিনি কোনো চরম বা নিরঙ্কুশ সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলেননি কিংবা সমর্থনও করেননি। লকীয় সরকারে ধারণা জনগণের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে গঠিত বলে একে সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারও বলা হয়। তার সরকার হবসের মতো ক্ষমতার একপাক্ষিক নীতিনির্ধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এ সরকারের ধরণ পারস্পরিকতা নির্ভর, জনগণ এ সরকারের মূল নিয়ামক। সরকার এখানে একটি ট্রাস্ট বা অছি বা জিম্মাদার। সরকারের সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষমতা নেই সরকার জনসিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করে মাত্র। সরকারের দায়িত্বই হলো জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা বিধান করা। লকের রাষ্ট্রব্যবস্থা বা কমনওয়েলথের মূল লক্ষ হলো কমিউনিটির স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং এখানে সরকার, কমনওয়েলথ কেউ সর্বোচ্চ ক্ষমতার (সার্বভৌম) অধিকারী নয়। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আইন সভা।[৩১] যার কাছে প্রত্যেকেই অধীনস্থ। আইনসভাই হলো সর্বোচ্চ ক্ষমতা।[৩২]

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের দ্বারা গঠিত সরকারের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে আইন প্রয়োগ করা; যে আইন দ্বারা ব্যক্তির অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা যায়। ব্যক্তির সম্মতির অধিকারকে নিশ্চিত করা যায়। লকের সরকারব্যবস্থায়

সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক আইনসভা। আইনসভার সদস্য জনগণের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত। সে অর্থে কমিউনিটিকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী দাবি করেন লক।[৩৩]

লক *সেকেন্ড ট্রিটিজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন জনগণ বা প্রত্যেক ব্যক্তি পারস্পরিক সম্মতিতে আবদ্ধ হয়ে একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অধীনে একত্রিত হলো। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন দ্বারা জনগণ সরকার নামক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করল। এভাবে ব্যক্তি সংখ্যাধিক্যের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিজেকে সমর্পণ করল। এ সম্পর্ক কোনো চাপের মুখে নয় স্বেচ্ছায়। একই সাথে স্বতন্ত্র ব্যক্তি সংখ্যাধিক্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের ইচ্ছা ও সম্মতির মাধ্যমে পৃথক পৃথক ব্যক্তি সামষ্টিকতায় আবদ্ধ হলো। অবশ্য সরকার গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জনগণের যে স্বার্থচেতনা কাজ করেছে তা হলো তাদের সম্পত্তির সুরক্ষাকরণ।[৩৪]

যে কোনো ধরণের সরকারব্যবস্থা তা রাজতান্ত্রিক বা অভিজাততান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক হোক না কেন এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। একপ্রকার বাধ্যবাধকতার অধীন থাকবে। সাধারণত এসব বাধ্যবাধকতা প্রকাশিত হয় সরকারের আদেশ নির্দেশ, আইনের অনুশাসন মান্য করার দ্বারা। সঙ্গতভাবেই এধরণের বাধ্যবাধকতা বা আনুগত্য প্রদর্শন অর্থ হলো সরকারের অধীনস্থতা গ্রহন করা। ব্যক্তি তার কিছু ইচ্ছা বা ক্ষমতা বা অধিকারকে সংকুচিত করবে বা কিছু ক্ষেত্রে ত্যাগ করে। যেমন, সরকার গঠনের দ্বারা জনগণ নিজেরা আইন প্রণয়নের অধিকার ত্যাগ করে, আবার আইনের প্রয়োগ এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের অধিকারও জনগণ নিজের হাতে তুলে নেয়া থেকে বিরত থাকে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন জনগণ মান্য করে। রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায় আইন প্রণয়ণের সময়। রাষ্ট্রকর্তৃক জনমানুষের ইচ্ছার প্রকাশও ঘটে জনগণের প্রেরিত প্রতিনিধির মাধ্যমে যা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর কাছে জনগণ আরোপ করে। সরকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি কাজ সম্পন্ন করে– আইন প্রণয়ণ, আইনের প্রয়োগ এবং আইন ভঙ্গকারীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা। আইনগত বিষয়ে সরকারের এ কার্যক্রমসমূহ লকীয় চিন্তায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে লক জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে এবং আইন বিভাগের সদস্যদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে আইনসভার অবলুপ্তির বিশেষ ক্ষমতা সীমিত পরিসরে কার্যনির্বাহী বিভাগের কাছে দিয়েছেন। লক্ষ করার বিষয় হলো, এতে কিন্তু আইনসভার সর্বোচ্চ অবস্থান নষ্ট হয় না কিন্তু কার্যনির্বাহী বিভাগের ভূমিকা গ্রহণ করে।[৩৫] জনগণের প্রকৃতির রাজ্য নামক প্রাক-রাজনৈতিক জীবন থেকে রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক জীবনে পদার্পনের পেছনে কাজ করেছিল যথার্থ রায় বাস্তবায়নের অভাব এবং অপরাধীর জন্য দণ্ডবিধানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অভাব । এ সকল দাবির পেছনে জনগণের মূল চাহিদা ছিল তাদের প্রাকৃতিক অধিকার সমূহের নিশ্চয়তা বিধান করা। সে অর্থে লকের রাষ্ট্রচিন্তায় সরকারব্যবস্থার উদ্ভব ও রূপরেখা যতটা না রাজনৈতিক তদপেক্ষা অধিকতর অর্থনৈতিক, ব্যক্তিস্বার্থ সম্পর্কিত। পরবর্তীতে আমরা দেখব লকীয় সরকারের সাফল্য নির্ধারিত হয়েছে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার সমূহ বিশেষত সম্পত্তির অধিকারের সুরক্ষার মানদণ্ডে।

হবসের সরকারব্যবস্থায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়নি কেননা হবসীয় সরকারব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি। তবে লকের, সরকার পদ্ধতি জনগণের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত এবং জনগনের সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। হবসের মতো লক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে সরকার পদ্ধতিরূপে সমর্থন করেননি। তিনি সমর্থন করেছেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে। লক আইন প্রণয়ণকে রাষ্ট্রের কাছে বিদ্যমান সর্বোচ্চ ক্ষমতা মনে করলেও একে তিনি দেখেছেন আরোপিত ক্ষমতারূপে। অর্থাৎ জনগণ কর্তৃক সরকারের উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এ ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য। সরকার সর্বদা কাজ করবে জনসন্তুষ্টি বিধানে। যদি সরকার তার আইনপ্রণয়ণকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে, জনগণের স্বার্থরক্ষায় বা লক্ষ পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকার

নামক আইনপ্রণয়ণকারী এ সংস্থাকে বিলুপ্ত অথবা পরিবর্তন করবে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের কাছে শেষ পর্যন্ত থেকে যায়।

লকের এ বক্তব্যের লক্ষণীয় দিকটি হলো মূল ক্ষমতা জনগণের হাতে সরকারের হাতে নয়। জনগণের কাছে যদি অনুভূত হয় সরকার তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার সমুন্নত রাখতে পারছে না তাহলে সরকারে কাছে প্রদত্ত স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য জনগণের কাছে বিপ্লবের অধিকার দিয়েছেন লক। লকীয় সরকারব্যবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের অধিকার, বিদ্রোহের অধিকার জনগণের রয়েছে। এক্ষেত্রে গণঅভ্যুত্থান বা গণঅসম্মতির সাহায্যে সরকার পরিবর্তন সম্ভব।

লকের রাষ্ট্রচিন্তায় সরকারের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি অধিকারবোধের জায়গাটি হবস অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। জনগণের উপর বলপ্রয়োগের এ ধারণা লকের কাছে গর্হিত অপরাধ। লকের কাছে জনগণের অধিকারের উৎপত্তিস্থল রাজনৈতিক সমাজ নয় প্রাক রাজনৈতিক সমাজ। লকীয় সরকার জনগণের উপর কর্তৃত্ববাদী প্রভু নয় সহযোগী, বিশেষত আদেশ বাস্তবায়নকারী সংগঠন মাত্র। তাই সরকার অপেক্ষা জনগণের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা অধিক। জনসম্মতির ভিত্তিতে সরকার নামক ট্রাস্ট টিকে থাকে বলে সরকার জনগণ অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী নয়। লকের সরকারব্যবস্থা যতটা না জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ তদপেক্ষা অধিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রিয়াশীলতা। যেহেতু লকীয় সরকার জনগণের সম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত তাই সরকারের কার্যাবলি জনগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। চুক্তির শর্তানুযায়ী সরকার তার দায়িত্ব যথাযথ রূপে পালন করছে কিনা তা জনগণের তদারকি করার ক্ষমতা রয়েছে। এ ধারণাটি লকের সরকারব্যবস্থায় জনগণকে সার্বভৌমের মর্যাদায় উন্নীত করে।

লকীয় সরকারব্যবস্থা তার চুক্তির মতো দ্বিপক্ষীয়। এখানে জনগণ ও সরকার পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ। যদিও জনগণই অধিকতর উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী। জনসম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত সরকারে জনগণের স্বার্থ এবং সম্মতিই মূল বিষয়। শাসক যদি একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্বারা এবং স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে অথবা বলপ্রয়োগ দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তবে তা হবে সামাজিক চুক্তির খেলাপ। জনগণও উক্ত পরিস্থিতিতে সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে না, চুক্তির প্রতিও দায়বদ্ধ থাকে না। জনগণ পুনরায় প্রকৃতির রাজ্যের সে পরিস্থিতিতে ফিরে যায় এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শক্তির ব্যবহার করতে পারে। এধরণের পরিস্থিতিকে লক মনে করেন স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী। এটি একপ্রকার যুদ্ধ অবস্থা কারণ এখানে সরকার আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ। আগ্রাসী ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অধিকার ন্যায়সঙ্গত। তাই জনগণের কাছে বিদ্রোহের অধিকার প্রদান করেন লক।

হবস মনে করেছেন তার সরকারব্যবস্থায় শাসক স্বৈরাচারী বা আগ্রাসী হতে পারে না, রাষ্ট্রের বিষয়ে জনগণের সাধারণ জ্ঞানের ভ্রান্তি থাকতে পারে কিন্তু শাসক দূরদর্শী হয়ে থাকেন। তিনি রাষ্ট্রের বিষয়ে অভ্রান্ত বিবেচনার অধিকারী। পক্ষান্তরে লক মনে করেন শাসক অপেক্ষা জনগণ অধিকতর তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শী। শাসক বা সরকারের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ণ করা, জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করা। শাসক তাঁর প্রতি অর্পিত এ সকল দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করে, পীড়নমূলক হয়ে ওঠে, জনগণের সম্পত্তি হরণ করে এবং ধ্বংস করে তাহলে শাসক জনগণকে শাসনের নৈতিক ও আইনগত বৈধতা হারায়। হবস যেভাবে শাসকের ব্যক্তিগত ও জনগণের সামাজিক স্বার্থকে সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এসবের সমন্বয়ে রাষ্ট্রের উন্নতি দেখেছেন লক তার বিপরীতটা মনে করেন।

লকীয় সরকারব্যবস্থায় জনগণের কাছে যে বিপ্লবের অধিকার তিনি প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায় এ অধিকার কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার, সংখ্যালঘুর নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপ্লবের অধিকার প্রাপ্ত কারণ তাদের সম্মতিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত। তাকে উৎখাতের ক্ষমতাও তাদের। হবস জনগণের বিচারবিবেচনার প্রতি আস্থাহীন হলেও লক

জনগণের উপর ব্যাপক বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তিনি মনে করেন জনগণ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত বলে তারা কোনো অর্থহীন বা অযৌক্তিক বিষয়ে অভ্যুত্থানে প্রবৃত্ত হবে না। লকের সরকারব্যবস্থায় যুক্তিবাদী জনপ্রকৃতি বিপ্লবের পথে হাটে যখন জনগণ তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ বিপন্ন হতে দেখে, তাদের প্রতিষ্ঠিত শাসক তাদের প্রত্যাশা পূরণে অক্ষম হয়। সরকারের কাজের বিচারক এবং শাসকের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক জনগণ, যারা শাসকের লাগামহীন ক্ষমতার রাশ টেনে ধরে। এভাবেই লকীয় সরকারব্যবস্থা শাসকের নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার পক্ষপাতী। সরকার বা শাসকের কাছে তাদের স্বার্থের প্রতিফলন তারা আশা করে। এক্ষেত্রে জনগণের কাছে রাজনৈতিক স্বার্থের বিষয়টি খুব গুরুত্ব পেয়েছে এমনটা আমদের মনে হয় না। তবে জনগণের অধিকার জনগণের হাতেই সুরক্ষিত। জনগণ তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমের ক্ষমতা যে শাসকের কাছে সাময়িক অর্পণ করেছে তা যেহেতু একটি ট্রাস্টের মতো তাই এটির যে কোনো সময় রদবদল হতে পারে। এভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ জনগণের বিপ্লব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। লকীয় সরকারব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সরকার কমনওয়েলথের পক্ষে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত একটি ট্রাস্ট বৈ অন্য কিছু নয়। ট্রাস্টের সকল ক্ষমতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুযোগ জনগণের কাছে ট্রাস্টের প্রধান দায়িত্ব জনগণের সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান।

লকের সরকারব্যবস্থায় তিনি যে বিপ্লবের অধিকার দিয়েছেন তা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে। এতে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুর কাছে নিপীড়িত হতে পারে। সংখ্যাগুরুদের দ্বারা সংখ্যালঘুরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা উপভোগে অসুবিধায় পড়তে পারে, ঠাট্টা বা তাচ্ছিল্যের স্বীকার হতে পারে। আবার সংখ্যাগুরুরা সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই একপ্রকার সুবিধাজনক বা ক্ষমতাধর অবস্থানে থাকে। লকের বিপ্লব তত্ত্বের এ দিকটি কেন্ডালের মতো বুর্জোয়া বিশ্লেষকগণ সমালোচনা করেছেন। ক্যান্ডাল মনে করেন, লকের সংখ্যাগুরু কর্তৃক বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের এক্ষমতাটি তার সমস্ত সংবিধানিক কর্মপরিকল্পনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি (kendall) লকের এ তত্ত্বকে নৈরাজ্যবাদী প্রবণতাপূর্ণ মনে করেন। একারণে যে লকীয় এ তত্ত্ব স্বাভাবিক স্বধর্মীয় ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ। এতে সকল শ্রেণির জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষিত হচ্ছে না; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে বিপ্লবের এধরণের ক্ষমতা প্রদানের পরিবর্তে ভোটের মাধ্যমে জনগণ তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। ভোটের সাহায্যে জনগণ পছন্দ, অপছন্দ প্রকাশ করে রাজনীতি, সরকার এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তন ঘটাতে পারে।[৩৬]

ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ

লকের সরকারব্যবস্থায় তিনি ক্ষমতার পুঞ্জীভবন নয় বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী। সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতাকে কেবল একটি স্থানে কেন্দ্রীভূতকরণে সরকারের মাঝে বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। লক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্থাৎ কার্যনির্বাহী ক্ষমতাকে একত্রিত না করার পক্ষপাতী।

কার্যনির্বাহী ক্ষমতা বা অভ্যন্তরীন ক্ষমতার ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত আইনের ওপর ভরসা করার মূল কারণ জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক আইনসমূহ দ্বারা জনগণের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে লকের সরকারব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বা কার্যনির্বাহী ক্ষমতার প্রয়োগক্ষেত্র সামাজিক চুক্তিবদ্ধ জনগণ। যারা তাদের সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছে এবং চুক্তিবদ্ধ জনগণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে ফেডারেটিভ ক্ষমতা আরোপিত হচ্ছে বিদেশী নাগরিক বা দেশের স্ব স্ব পরিমণ্ডলের বাইরে।

কার্যনির্বাহী ক্ষমতা ও ফেডারেটিভ ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনায় বলা যায় তাদের মাঝে যে পার্থক্য তার প্রথমটি আভ্যন্তরীন বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং দ্বিতীয়টি বহিঃরাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ণিত। ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্বের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক আছে বলে আপাত:দৃষ্টে মনে হয় না। যদিও লক আইনসভার কাছে

আইন প্রনয়ণের দায়িত্ব দিয়েছেন তবে বিশেষ ক্ষেত্রে রাজার হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতা অর্পন করেছেন। এ অধিকার শাসকের বিশেষ অধিকার। এ অধিকারের সাথে জনস্বার্থের বিষয়টি জড়িত। শাসকের কাছে অর্পিত এ বিশেষ ক্ষমতার ওপর কোন আইনি নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

বিশেষাধিকার বলতে লক বুঝিয়েছেন "This Power to act according to discretion, for the publick good, without the prescription of the Law, and sometimes even against it, is that which is called "Prerogative".[৩৭] অর্থাৎ জনগণের কল্যাণে আইনের নির্দেশনা ব্যতীত এমনকি কখনো আইনের নির্দেশনার বিপরীতে শাসকের কাজ করার যে ক্ষমতা তাকে বলা হলো বিশেষাধিকার। একজন ভালো শাসক যিনি ট্রাস্টের বিষয়ে মনোযোগী এবং তার জনগণের বিষয় সতর্ক, তার কাছে খুব বেশি বিশেষাধিকার (Prerogative) থাকে না।[৩৮]

বিশেষাধিকারমূলক ক্ষমতা মূলত উৎসারিত হয় জনগণের কাছ থেকে, যদি জনগণের মৌন সম্মতিকে নেতিবাচক ভাবে বা সদর্থক রূপে ব্যবহার করা হয়। এতে যদি ক্ষমতার অপব্যবহার হয় তবে তা প্রত্যাহার করেও নেওয়া যেতে পারে। ক্ষমতার অপব্যবহার করা এধরণের জনগণের মৌন সম্মতির দ্বারা প্রাপ্ত এই ক্ষমতাকে জনগণ সংকুচিত কিংবা স্থাপিত করতে পারে এবং জনগণ পজিটিভ লজ –এর মাধ্যমে এই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। লক কর্তৃক উল্লিখিত বিশেষাধিকারমূলক ক্ষমতায় যে বিষয়টি স্পষ্ট তাহলো শাসকের চূড়ান্ত লক্ষ হওয়া উচিত জনগণের ভালো বা কল্যাণে (Publick Good) কাজ করা। জনগণের কল্যাণে শাসকের কাছে বিধিবিধান গৌন।[৩৯] লকের এ ধরণের ক্ষমতার মূলে কাজ করেছে বিশ্বাস। এখানে তার আইনের প্রচলিত ধারণা বিশেষ একটা কার্যকর নয়। লক যখন বলেন বিশেষ ক্ষমতা হলো "the Power of doing publick good without a Rule."[৪০] তাহলে এ বক্তব্য তার উদারতাবাদী এবং যুক্তিবাদী রাজনৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে।

সরকারব্যবস্থা

লকের সরকারব্যবস্থায় যে ট্রাস্টের কাছে জনগণ তাদের সম্পত্তির সুরক্ষা চায় তা মূলত আইনের অধীনে পরিচালিত, যে আইনি ক্ষমতা জনগণই দিয়েছে ট্রাস্টের কাছে আইন প্রণয়ণের জন্য। জ্ঞানালোক যুগের অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক যখন বিশেষ ক্ষমতার প্রতি আস্থা স্থাপন করেন তাহলে এটি তার প্রচলিত রাষ্ট্রচিন্তার নতুন দিক। আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার কার হাতে থাকবে তার ভিত্তিতে লক সরকারব্যবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– গণতন্ত্র, গোষ্ঠীতন্ত্র এবং রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রকে তিনি উত্তরাধিকারমূলক অথবা নির্বাচনমূলক হতে পারে মনে করেন। তবে যেকোনো ধরণের সরকারব্যবস্থাতে শাসক অথবা জনগণ অথবা আইন প্রণয়নকারীগণ বা আইন প্রয়োগকারীগণ কেউ আইনের উর্দ্ধে নন। লকের রাষ্ট্রচিন্তায় সরকারের বৈধতার প্রশ্নটি বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে এবং বৈধতার সীমা নির্ধারণের ভিত্তি হয়েছে আইন। রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি ব্যতিক্রমহীনভাবে আইনের নিয়ন্ত্রনাধীন। আইন ক্ষমতাধর বা ক্ষমতাহীন প্রত্যেকের জন্য সমানভাবে বাধ্যতামূলক। হবস আইনকে শাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন করে জনগণের উপরই কেবল প্রয়োগ করেছেন কিন্তু লক আইনের অধীনে রেখেছেন ক্ষমতাধরদের অর্থাৎ আইনপ্রণয়ণকারী ব্যক্তিবর্গ যারা মূলত সরকারের অংশ তারাও আইনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। জনগণ যাদের কাছে আইনপ্রণয়ণের দায়িত্ব দিয়েছে তারাও আইনের জবাবদিহিতার উর্দ্ধে নয়। লক সরকারের যে তিনটি শ্রেণিকরণ উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– সরকারের তিনটি বিভাগ অস্তিত্বশীল হয় জনগণের সম্মতি দ্বারা। এই সম্মতি জনগণ প্রদান করে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতার সৃষ্টি। হবসের নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক সরকারের প্রতি লক অসমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। লক মনে করেন সমাজের ইচ্ছাক্রমে অর্থাৎ জনগণের ইচ্ছাতে শাসনের রায়

পরিবর্তিত হতে পারে; নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে তা সম্ভব নয় বলে এধরণের সরকার নাগরিক সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে লক হবসের মতো কোনো সুনির্দিষ্ট সরকারকে শ্রেষ্ঠ দাবি করেননি।

লকের রাষ্ট্রচিন্তার ধারা লক্ষ করলে মনে হয় তিনি গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আবার কখনো তিনি রাজতন্ত্রের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছেন যদিও সেটা হবসের মতো নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র নয়। এ রাজতন্ত্র অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাজতান্ত্রিক শাসনে লক মনে করেন রাজা আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবেন। রাজা আইনের প্রতিনিধি, তাই আইনানুগ বিধি বিধানের বাইরে রাজার কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা ক্ষমতা নেই, আইনের শাসনের বাইরে গিয়ে শাসক যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে চায়, তাহলে শাসক স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। সেরূপ অবস্থায় শাসক তার জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী কিংবা আইনপ্রণয়ণকারীর ক্ষমতায় থাকে না। স্বেচ্ছাচারী শাসক, যে নিজের খুশিমত চালিত হয় আইন দ্বারা নয় সে শাসক প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাহীন একজন ব্যক্তি, এধরণের ব্যক্তি জনগণের কাছে থেকে কোনো আনুগত্য বা বাধ্যতাপ্রাপ্তির অধিকার রাখে না। সে অবস্থায় জনগণ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে পারে। হবস রাষ্ট্রের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন কিন্তু লকের কাছে তা ছিল বিপরীত।

বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণিগত আপসের সন্তানরূপে বহুল পরিচিত লক। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে আধুনিককালের বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তাকে এগিয়ে নেওয়ার প্রতিফলন দেখা যায় তার সরকারতত্ত্বে। বুর্জোয়া রাজনৈতিক চিন্তা যেমন– ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বা ব্যক্তির অলঙ্ঘ্য অধিকার সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মালিকানার বৈধতা, ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ বা পৃথকীকরণ বা বিভাজন, নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমত্ব, সংসদীয় শাসন এগুলো তার সরকারব্যবস্থায় গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। লকের রাষ্ট্রদর্শনে তিনি জনগণের কাছে বিপ্লবের যে ক্ষমতা প্রদান করেছেন তা দ্বারা এবং তার সামগ্রিক রাষ্টচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আমেরিকা, হল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহ। বিশেষ করে আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক চেতনা ও স্বাধীনতার ধারণা পরিপুষ্ট হয়েছে লকীয় রাষ্ট্রচিন্তার হাত ধরে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না। সাংবিধানিক নীতিমালা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, জনগণের অভ্যুত্থানের অধিকার ইত্যাদি ধারণাসমূহ সরাসরি লকের কাছে থেকে গৃহীত। লকের জনগনের অধিকারের ধারণা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন রুশো। রুশো লকের নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমকে অধিকতর বিস্তৃত করেন এবং সার্বভৌমকে অসীম রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রুশো স্বৈরাচারী শাসকের উৎপাটনে জনগণের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়তা, তাদের সাধারণ ইচ্ছায় গুরুত্বারোপ করেছেন। লকের আপসকামী চরিত্র অনুসরণ না করে রুশো বরং বৈপ্লবিক র‍্যাডিক্যালিজমের পথে হেঁটেছেন।

বুর্জোয়া রাজনৈতিক সমাজ ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির একজন শক্তিশালী উদগাতা লক। সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণে ও সম্পত্তির সুরক্ষায় রাষ্ট্রের অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণে লকের রাজনৈতিক চিন্তা পশ্চিমা বিশ্বের বহু দেশের কাছে ভূয়সী প্রশংসার দাবীদার। তবে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণ অর্থাৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নিষ্পেষিত, শোষিত শ্রেণির রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটি লকের কাছে উহ্য। সমতা, স্বাধীনতা, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়সমূহের লকের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টত উপযোগবাদী নীতির প্রতিফলন লক্ষনীয়। তাই অধিকাংশের স্বার্থ বিষয়ে তিনি উদ্যোগী ছিলেন এবং সুখ গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর ভাবনায়। সম্পত্তির সুরক্ষা কিংবা স্বাধীনতা, সমতার বিষয়ে জনগণের আকাঙ্খা যতটা না মনস্তাত্ত্বিক কিংবা রাজনৈতিক তদপেক্ষা অধিকতর অর্থনৈতিক, ভোগবাদী। কার্ল মাকর্স সম্পত্তি সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লককে বুর্জোয়া সমাজের আইনি ধারণার ক্লাসিকাল অভিবক্তা রূপে উল্লেখ করেন।[৪১]

হবসের সরকারব্যবস্থায় আমরা শাসকের অপরিসীম ক্ষমতার যেরূপ দৌরাত্ম্য লক্ষ করি লকের কাছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখি, যেখানে লক যেকোনো ধরণের স্বৈরশাসনের বিরোধিতা করেছেন। সরকারব্যবস্থায়

অবাধ, নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা স্বৈরশাসনের জন্ম দিতে পারে। তাই জনগণ তা নিয়ন্ত্রণকারী কিন্তু হবস সরকারের এমন কোনো ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না, শাসকের বিরুদ্ধে জনগণের নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এ প্রসঙ্গে G. G Sartori বলেন, "The main burden of Locke's argument in the *Treatises of Government* is directed against arbitary rule; that is unconstitutional rule in the original sense of unlimited government which denies fundamental rights and liberties."[৪২]

লক মনে করেন স্বৈরতন্ত্র এমন এক সরকারব্যবস্থা যা মানবপ্রকৃতির বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বা একচ্ছত্রবাদের বিপরীত প্রতিযোগী ব্যবস্থারূপে তিনি সমর্থন করেছেন নিয়মতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাকে যা মূলত পরিচালিত হয় জনগণের সম্মতি দ্বারা। সম্মতিতত্ত্ব লকের কাছে নিরঙ্কুশরাজতন্ত্রের (absolutism) এর বিপরীত মতরূপে গৃহীত হয়েছে। চরম রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা বা নিরঙ্কুশতন্ত্র জনগণের অধিকার এবং স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী। এধরণের ব্যবস্থায় জনগণের ওপর কেবল কর্তৃত্বই স্থাপিত হয়।

লক নিরঙ্কুশতন্ত্রকে বিপদজনক সরকারব্যবস্থা মনে করেন এবং তিনি একে পিতৃতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার একটি রূপ মনে করেন। তাঁর এধরণের চিন্তার পেছনে পিতৃতন্ত্র তথা শাসকের একক কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা বিবেচনায় এসেছে।[৪৩] পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যের অন্যতম কারণ হলো পরিবারে বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানেরা পিতার কর্তৃত্ব মেনে নেয় সন্তানদের শৈশবস্থা থেকে তারা এক প্রকার মৌন সম্মতি প্রকাশ করার মাধ্যমে যা পরবর্তীতে তাদের বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে বজায় থাকে।[৪৪] এভাবেই পরিবার থেকেই ব্যক্তির উপর কর্তৃত্বের বিষয়টি শুরু হয় এবং পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেও অনুসৃত হয়। পরিবার থেকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ার কারণে ব্যক্তির মধ্যেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে থাকে। সরকারব্যবস্থায়ও ক্ষমতা শাসকের একক কতৃর্ত্বাধীন হয়ে পড়ে, কিন্তু যা হওয়া উচিত তা হলো শাসক তার স্বার্থসংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকে শাসনকার্য পরিচালিত করবে।

নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিরোধের জন্যই লক তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে জনগণের সম্মতিতত্ত্বের অবতারণা করেন। যদিও সকল সরকারব্যবস্থাতে স্বৈরাচারী শাসক থাকে তবে রাজতান্ত্রিক সরকারের স্বৈরাচারী হওয়া প্রবণতা অধিক। তাই লক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তাঁর সরকারব্যবস্থায় তিনি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন জনগণের অবিরাম সম্মতির বিষয়টিকে। জনসম্মতিই নির্ধারণ করবে নাগরিক তথা জনগণ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তারা কোন শাসকের শাসনাধীন ও বিধি বিধানের মাঝে থাকবে। সেক্ষেত্রে যে সকল নাগরিক বা ব্যক্তি উক্ত সরকারের প্রতি তার প্রকাশ্য সম্মতি প্রদান করেনি সে ব্যক্তি যদি উক্ত শাসন ব্যবস্থাকে অসহনীয় মনে করে তবে তার বিপরীতে মত প্রকাশ করতে পারে।

লকের সম্মতিতত্ত্বে দুই প্রকার সম্মতির উল্লেখ রয়েছে। যথা, প্রকাশ্য সম্মতি ও মৌন সম্মতি। দুই প্রকার সম্মতির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যেমন, জনগণের যে অংশ প্রকাশ্যে সম্মতি দিয়েছে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি ব্যক্ত, তাদের অবস্থানটিও স্পষ্ট। কিন্তু মৌন সম্মতি প্রদানকারী জনগণের তথা নাগরিকের ক্ষেত্রে অবস্থানটি স্পষ্ট নয়। একটি রাষ্ট্রের সকল শ্রেনি পেশার নাগরিক সমানভাবে মত প্রকাশ করতে পারে না। যেমন কোনো কোনো সমাজে বৃদ্ধ বা নারীরা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। সেরূপ পরিস্থিতিতে যারা সরাসরি সম্মতি প্রদান করেনি তাদের সম্মতি কি স্বাভাবিকভাবে মৌন রূপে গ্রহণ করা হয়? এমনও তো হতে পারে তারা প্রকাশ্য বা মৌন কোন সম্মতিই দিল না। আবার নাগরিকের কোনো অংশ, ধরা যাক– সংখ্যালঘু অংশ, বিদ্যমান সরকারব্যবস্থার বিপক্ষে। তাদের সম্মতির বিষয়টিকে প্রকাশ্যে না মৌন রূপে বিবেচনা করা হবে সে প্রশ্ন থেকে যায়। বিশেষত নাগরিকের যে অংশ বিদ্যমান শাসকের প্রতি তাদের সম্মতি প্রদর্শন করেনি কিন্তু শাসক তাদের (সম্মতি প্রদান না করা অংশের) জানমালের নিরাপত্তা বিধান করে সেক্ষেত্রে কি বিধান হবে।

যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া হয় উক্ত শ্রেণি বিদ্যমান সরকারকে তাদের জানমালের রক্ষার উপযুক্ত মনে করেনি কিন্তু শাসকের / সরকারের কাছে থেকে তারা প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা গ্রহণ থেকে কি বঞ্চিত হবে? অন্যভাবে বলা যায় সেক্ষেত্রে উক্ত শ্রেণি কি সেসব সুবিধা-সুরক্ষা বলয় বর্জন করে? একটি সমাজে বসবাসকারী নাগরিকদের সকলেই কোনো সরকারব্যবস্থার প্রতি শতভাগ একমত হবে তেমনটি নয় তাহলে ভিন্নমত পোষণকারীদের সম্মতির বিষয়টি কি উপেক্ষিত হলো না।

এধরণের বিবিধ সমস্যার পরিস্থিতিতে লকের সম্মতিতত্ত্বের গোড়ার দিকে লক্ষ করলে এর উত্তর মেলে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যের সকল সদস্য প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করেছে চুক্তিতে। একটি নতুন সমাজে পর্দাপণ দ্বারা জনগণ উপলব্ধি করে এ সমাজের যথাযথ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন পড়বে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের।[৪৫] এভাবেই সূত্রপাত হলো রাজনৈতিক সমাজের, যাতে ব্যক্তির প্রকাশ্য সম্মতি যুক্ত হয়।[৪৬] এভাবে গঠিত রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্রে সকল জনগণ না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সিদ্ধান্তে সরকারব্যবস্থা নির্ধারিত হয়। ফলে সকল জনগণের সম্মতি অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ। লকীয় চিন্তায় এটি স্পষ্ট যে রাজনৈতিক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত রূপে কমিউনিটির সদস্যপদের প্রয়োজন পড়ে এবং এ সদস্যপদ প্রাপ্তির পর তারা সম্মত হয়ে এবং একত্রিত হয়ে কমিউনিটি সৃষ্টি করে। লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের নীতির সাথে রাজনৈতিক সমাজের উত্থান এবং সরকার গঠন প্রক্রিয়ার বিষয়টি কিছুটা দ্বিধাপূর্ণ। লক বলেন, যখন কোনো সংখ্যক মানুষ তাদের ব্যক্তিগত সম্মতির ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে একটি কমিউনিটি বা সম্প্রদায় গঠন করে, তা দ্বারা তারা মূলত একটি বডি (Body)–র সৃষ্টি করল।[৪৭] একটি বডিরূপে কাজ করার ক্ষমতা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা এবং সংকল্পের দ্বারা নিরূপিত।[৪৮]

সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি লকের সমর্থন থেকে মনে হতে পারে লক গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অংশগ্রহণ দ্বারা লক গণতান্ত্রিক সরকারের নয় বরং কোনো সমাজে একত্রে বসবাসের জন্য সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সে অর্থে কোনো একক ব্যক্তির অধিকারের প্রশ্নে যদি সম্মিলিত সিদ্ধান্তের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় তবে তা সামাজিক চুক্তির সামগ্রিক ধারণার সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে ওঠে। লক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের মাধ্যমে সামগ্রিক মতের প্রকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। তবে লক সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের পক্ষে যথাযথ নৈতিক যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেননি, কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে কোন সুনির্দিষ্ট সরকারব্যবস্থার বৈধতা দিতে চেয়েছেন– এমনটা মনে করেন ম্যাকফারলেন।[৪৯]

সংখ্যাগুরুর মতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা রয়েছে সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী অন্যদের সংযুক্ত করার[৫০] , অন্যথায় সরকারের জন্য বিপ্লবের পরিস্থিতি উদ্ভূত হতে পারে। তবে লক 'মুক্ত মানুষ' (Freemen)[৫১] বলতে যে লোকদের (the people) নির্দেশ করেছেন তাতে তিনি সেই সকল মানুষ, যারা সরাসরি অন্যের অধীনস্ত তাদের মত প্রকাশের বাইরে রেখেছেন। এমন লোকের মধ্যে রয়েছে– ভৃত্য, কৃষিশ্রমিক এবং শিল্পশ্রমিক, অ্যাপ্রেন্টিস, সৈন্য, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, নারী এবং শিশু, সাধারণ নাবিক– এ শ্রেণির জনগণ। লকের এধরণের তালিকা থেকে অধ্যাপক ম্যাকফার্সন মনে করেন তৎকালীন ইংল্যান্ডের প্রতি তিনজন প্রাপ্তঃবয়স্কের একজন মুক্ত মানুষ এর ক্যাটাগরি বা শ্রেণিভুক্ত।[৫২]

লক সমর্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধারণার উপর্যুক্ত শ্রেণিকে বাদ দিয়ে যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে তা স্পষ্টত পুরুষ জনগোষ্ঠীর কাছে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণায় তিনি যখন অন্যান্য শ্রেণিসমূহকে বিভাজিত করেছেন সে সকল শ্রেণি বলতে স্পষ্টতই বিত্তহীন শ্রেণিকে এবং নারীদেরকে মুক্ত মানুষের– এর তালিকভুক্ত না করায় নারী অধীনস্থতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেখানে নারী মুক্তমানুষ নয় এবং তাদের মতামতের দিকটি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত রেখেছেন লক। সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত লকীয় সরকারের

গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই সংকুচিত হয়; বিশেষত প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বরং লক মুক্ত মানুষের তালিকা থেকে যে সকল জনগণকে বাদ দিয়েছেন তারাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ। তিনি তাদের বাদ দিয়ে ধনিক শ্রেণিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের তালিকভুক্ত করার মাধ্যমে স্পষ্টতই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থকে সংরক্ষণে এবং শক্তিশালীকরণেই কাজ করেছেন। মুক্ত মানুষ বলতে তিনি সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন অবস্থাসম্পন্ন জনগণকে নির্দেশ করেছেন। যারা মুক্ত মানুষ নয় তারা সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে কিংবা কর্মক্ষেত্রে বা দাপ্তরিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় খুব সঙ্গতভাবে উন্মুক্ত ভোট প্রদানের সময় তারা তাদের প্রভু বা মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে উদ্যোগী হতে পারে। লক বর্ণিত সরকারব্যবস্থায় সরকারের মূল কাজ সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান করা।[৫৩] এই সুরক্ষা প্রদান করতে পারে সুশীল সমাজের সম্মিলিত জনসাধারণ। যারা মনে করেন, যে কোনো রাজনৈতিক সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হলো আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা (legislative power)। সে আইন সমাজের জনগণ মান্য করতে বাধ্য। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে একে সার্বভৌম বলা যায় না। জনগণ কোনো দেশের বাধ্যবাধকতার কারণে এই আইন মান্য করে। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সার্বভৌম যতক্ষণ এটি তার কর্তৃপক্ষের সংবিধান বা শাসন দ্বারা পরিচালিত এবং এর দায়িত্বে অবহেলা করে না অথবা প্রজাদের স্বাধীনতা এবং সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে না। সর্বোচ্চ ক্ষমতা রূপে আইনসভার সদস্যদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন যেমন রয়েছে তদ্রুপ যারা আইন প্রণয়ণ করবে তারা যেন ব্যক্তিগত কারণে আইন প্রয়োগ বা বাস্তবায়নে ব্যাপৃত না হন সে বিষয়ে লক দৃষ্টি দিতে বলেন।[৫৪] এখানে লকের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রকাশ পাওয়া যায়। লকের সময়কালে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা আরোপিত ছিল রাজা বা রাজপুত্র বা ম্যাজিস্ট্রেট এধরণের কোনো একক ব্যক্তির কাছে কিন্তু লক রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার বিরোধিতা করে একক ক্ষমতা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর আরোপে বিরোধী। লক মনে করেন কমনওয়েলথের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষে আইনসভার ক্ষমতা থাকবে একক নয় যৌথ ব্যক্তিদের কাছে এবং তারা অবশ্যই যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, আইন প্রণয়ন করবেন। তবে আইনসভার সদস্যগণও আইনের উর্দ্ধে নন।

আইনবিভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জনগণের বিনা অনুমতিতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে হরণ করতে পারবে না। যদি তা করে তাহলে নির্বাহী বিভাগ জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে জিম্মাদারমূলক ক্ষমতা দ্বারা আইনবিভাগের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে। জনগণের প্রদত্ত ক্ষমতা বর্হিভূত কোন কাজ যদি আইনবিভাগ সংঘটিত করে তাহলে তার বা তাদের ক্ষমতা জনগণ প্রত্যাহার করতে পারে, আইনবিভাগকে ভেঙ্গে দিতে পারে।[৫৫] শাসন বিভাগের ক্ষমতা হলো বিশেষক্ষমতা। এ প্রসঙ্গে স্যাবাইনের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। যাতে পরিলক্ষিত হয় তৎকালীন ইংল্যান্ডের জনগণের সরকারের ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তিরূপে দেখতে চেয়েছে। স্যাবাইন মনে করেন, লকের সরকারতত্ত্ব উদারনৈতিকতাবাদের ওপর প্রভাব ফেলে। হুইপরা একদিকে ইংল্যান্ডের তৎকালীন সরকারকে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য শক্তিরূপে দেখত অন্যদিকে ইংল্যান্ডের বৃহত্তর স্বার্থ তথা রাজা, অভিজাত, যাজকগণ ও সাধারণ জনগণের স্বার্থের ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তিরূপে সরকারকে গ্রহণ করেছে।[৫৬]

লকের সরকারব্যবস্থায় প্রশংসনীয় দিক হলো আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা পৃথকীকরণ। আইন প্রণয়নকারী এবং আইন বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ যখন একীভূত হয় তারা তাদের প্রণীত আইন মেনে নাও চলতে পারে এবং আইন স্বস্ব স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লেখ্য, আইনবিভাগ দ্বারা লক সংসদ এবং শাসনবিভাগ দ্বারা রাজাকে নির্দেশ করেছেন। অবশ্য ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি থেকে তৎকালীন ইংল্যান্ডে রাজার সাথে পার্লামেন্টের সম্পর্কের দূরত্বের দিকটি দৃশ্যমান হয় এবং এ ধারাবাহিকতায় গৃহযুদ্ধের মত ঘটনার সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ বিষয়ে লক মনে করেন শাসনবিভাগ যদি সময়মতো আইনবিভাগ আহ্বান না করে তাহলে জনগণ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা রাজার উচ্ছেদ করতে পারে। লকের ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি তিনি উভয় বিভাগের মাঝে বিরোধের নিস্পত্তিকল্পে বলপ্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগকে গ্রহণ করেছেন। এবং অন্যদিকে এ দুই বিভাগের মাঝে বিরোধের আবশ্যকতাকেও লক গ্রহণ করেছেন, যা তিনি অসম্ভব বলে উপেক্ষা করেননি। তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট যে

জনগণ যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও এবং শাসক জনগণ কর্তৃক মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মনোনীত বিভাগ শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবেই।

জন ডানের মতে, "The legal concept of trust captures nicely three features on which Locke is anxious to insist: the clarity of a ruler's responsibility to serve the public good, the existence of a structure of rights external to the practical relation of ruling on which a sovereign's claim to authority must depend, and the inescapable asymmetry of power between ruler and ruled which precludes the letter from exercising direct and continuing control over the former.[৫৭]

লকের রাষ্ট্রচিন্তা ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে সামজিক কল্যাণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে একজন শাসকের আধিপত্য। একক শাসন মূলত চরম রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব এবং এধরণের একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে লক মানুষের রাজনৈতিক সমাজের পরিকল্পনার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলে মনে করেন। বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কারণ তা মানুষের যুক্তিবাদিতা ও সম্মতির পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। মানুষের সম্মতির ভিত্তিতে (যেখানে তার আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে) জনগণ সরকার গঠন করে। সেরূপ অবস্থায় চরম রাজতান্ত্রিক শাসকের একক কর্তৃত্ব শাসককে আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। এধরণের সরকারব্যবস্থায় জনগণ ক্ষমতার মালিক না হয়ে শাসকের অধীনস্থ হয়ে পড়ে, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয়। তবে এটাও ঠিক চরম রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে লক জনগণের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতি দেননি। তিনি শাসক অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা জনগণকে দিয়েছেন কিন্তু জনগণের কাছে তিনি অবাধ বা নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার অধিকার প্রদান করেননি। লক প্রকৃতপক্ষে শাসক বা জনগণ কারোরই অবাধ ক্ষমতা বা সীমাহীন ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য মনে করেননা। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের কাছে ব্যক্তি বা সংখ্যালঘিষ্ঠরা বশ্যতা স্বীকার করেছে তবে তা জোরপূর্বক নয়, চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতা বলা যায় না। লক এক্ষেত্রে সামষ্টিক স্বার্থে অর্থাৎ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে যৌথসত্তার কাছে ব্যক্তিসত্তাকে নত করেছেন। যার দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ যৌথস্বার্থের পক্ষে কাজ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে তিনি বলেন–

"সমাজ কাজ করে ব্যক্তিমানুষের সম্মতি এবং প্রয়োজন অনুসারে এবং সমাজ সংস্থা কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্ধারিত হয় বৃহত্তর শক্তি দ্বারা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি তাকে যেদিকে চালাবে সংস্থাটিকে সে পথেই চলতে হবে।"[৫৮] তাই বলা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সামষ্টিক অংশ যখন সমাজের শাসনকারী অংশ হয় তাহলে তাদের কেবলমাত্র সংখ্যা নয় বরং গুন ও পরিমাণের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করা উচিত।

এতদসত্ত্বেও লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে আমরা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বিবেচনা করতে পরি না, কারণ লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন স্বৈরাচারের আশঙ্কা মুক্ত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন স্বৈরাচারী হতে পারে, আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের কাছে ব্যক্তিকে বা সংখ্যালঘুকে নত হতে বা মেনে নিতে হবে কিংবা আত্মসমর্পণ করতে হবে লকের এমন দাবি যুক্তিযুক্ত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নীতিকে মেনে নেওয়া হলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্থানটি সংকুচিত হয়ে পড়ে।

লক কখনো আমূল সংস্কারপন্থী ছিলেন না। তিনি তৎকালীন ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মূলত বিপ্লবকে সমর্থন করেছেন। লক জনগণের কাছে বিপ্লবের অধিকার দিলেও তিনি একচ্ছত্র বিপ্লবের ক্ষমতা জনগণকে দেননি। বিপ্লবের নামে যথেছাচারিতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বৈপ্লবিক দর্শনের প্রবক্তা লক ছিলেন বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল, তবে লকের লেখনীতে বিপ্লবের নৈতিক অধিকারের সমর্থন স্পষ্ট। বিপ্লবে যে সামষ্টিকস্বার্থ সংরক্ষিত হয় তা ব্যক্তিকে নিয়েই আবর্তিত এবং তিনি বিপ্লবকে সমর্থন প্রদান দ্বারা রাজনৈতিক

নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। তিনি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধাচারণ করার অধিকার জনগণকে দিয়েছেন। লকের মতে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সমাজ দুটি ভিন্ন বিষয়। তবে ইংরেজ সমাজের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে। সরকার যদি সমাজের কল্যাণে কাজ না করে তবে সে সরকার বৈধতা হারায় এবং এধরণের সরকারকে বিলুপ্ত করার অধিকার জনগণের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত। এধরণের বক্তব্যের মাঝেই লকের মতো অন্যায়ের অবস্থান পাওয়া যায়। ন্যায়যুদ্ধে বিজয়ী শাসক পরাজিত দেশের জনগণের স্বাধীনতা ও সম্পত্তির বিরোধী কোনো অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। লক মনে করেন আক্রমণকারীর কোনো অধিকার থাকতে পারেনা। লকের এধরণের যুক্তি উপস্থাপন মূলত হবসের রাজতান্ত্রিক একচ্ছত্রতার বিরুদ্ধে অবস্থান যাতে লক দেখাতে চেয়েছেন শক্তির সফলতার ওপর সরকারের অবস্থান টিকে থাকতে পারে না। তার সাথে যুক্ত হবে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন। আবার শাসক বিজয়ী হলেও বিজিত জনগণের অধিকার পরিপন্থী কোনো কাজ শাসক করতে পারবে না।

হবসের সরকারব্যবস্থায় শক্তি রাজনীতি মুখ্য। শক্তির সাথে তিনি নৈতিকতাকে যুক্তি করেছেন। পক্ষান্তরে লক ও রুশো উভয়ের কাছে নৈতিকতার অবস্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। লকের কাছে নৈতিক বিধান হলো চিরন্তন ও স্থায়ী এবং সরকার এ নৈতিক বিন্যাসের একটি উপাদান। নৈতিক বিধান সম্পর্কে লকের এ চিন্তার পূর্বসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় প্রাচীনযুগে সিসেরো, সেনেকার লেখনীতে এবং মধ্যযুগীয় প্রাকৃতিক আইনের ধারণার সাথে। লক মনে করেন একটি সরকার ন্যায়সঙ্গত রূপে বিবেচ্য হবে তাহলে যখন তার সমাজের ও জনগণের অন্তরস্থ নৈতিক অধিকার দ্বারা স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করবে। তিনি স্বৈরাচারী সরকারকে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে একদিকে বিপ্লবের অধিকার প্রদান দ্বারা ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতার নৈতিক অনুমোদন দিয়েছেন। অন্যদিকে আইনানুগক্ষমতাও দিয়েছেন আইনসম্মত প্রতিরোধের জন্য। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় আইনসঙ্গত তথা আইনসম্মত প্রত্যয়সমূহকে ন্যায্যতা বা নৈতিক বা ন্যায়সঙ্গত প্রত্যয়সমূহের সাথে পৃথক অর্থে তিনি ব্যবহার করেননি। বরং অনেকাংশে আইন ও নৈতিকতা তাঁর কাছে সমার্থক।

সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকারের সুরক্ষা প্রদান।[৫৯] যদি সরকার তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে জনগণ তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকারের পরিবর্তন করতে পারে। সরকার পরিবর্তনে জনগণের ক্ষমতা আইনসম্মত। শাসক যদি স্বৈরাচারী হয় বলপ্রয়োগের সাহায্যে সে শাসকের উৎখাত সমর্থন করেছেন লক। আরো যেসব ক্ষেত্রে লক জনগণ কর্তৃক বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন দিয়েছেন তাতে আছে– স্বৈরাচারিতা, সংসদীয় দুর্নীতি, সংসদ ও রাজা কর্তৃক স্বজনপ্রীতি, বৈদেশিক বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকতা, সংসদে আইনসঙ্গত কোনো বিষয়ে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিষেধাজ্ঞা। তবে লক দুটি শর্তে এ অধিকারকে সমর্থন করেছেন, যাতে তাঁর নৈতিক অবস্থানের প্রকাশ পাওয়া যায়–

প্রথমত, এ বিদ্রোহ হবে অযৌক্তিক, বেআইনী ও অন্যায্য শক্তির বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহের অধিকার রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির। কোনো একক ব্যক্তি বা সংখ্যালঘিষ্টদের নয়। আমার লকের বিপ্লবের অধিকারকে নৈতিকভাবে মূল্যায়ণ করছি কারণ শাসক বা সরকার যদি রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পেছনে যে উদ্দেশ্য (রাজনৈতিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির বিষয়টি) ছিল তা থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে সরকারের নৈতিক পতন সূচিত হয়। আর নৈতিকভাবে অধঃপতিত সরকারকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অধিকার রয়েছে শক্তির সাহায্যে পরিবর্তন করার। তাছাড়া হবসের মতো লকও এ নিয়ে একমত স্বৈরাচারী শাসকের আইনগত বৈধতা নেই। আর জনগণের বেআইনী সত্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ন্যায্য। এ ধরণের প্রতিরোধ আইনসঙ্গত। বেআইনী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আইনগত অধিকার। জনগণের সরকার পতন ঘটানোর অধিকার রয়েছে কিন্তু সমাজের পতন ঘটাতে পারে না। লকের কাছে সরকার ও সমাজ ভিন্ন, সরকারের পতন হলে সমাজ টিকে থাকে কিন্তু সমাজের পতন হলে সরকারের ধ্বংস স্বাভাবিক।

হবসের কাছে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। হবসীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা শাসকের কাছে অর্পিত। শাসক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বিধায় তিনি সরকারকে চুক্তির উর্দ্ধে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু লকের কাছে সরকার চুক্তির উর্দ্ধে নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকার ভিন্ন। লকের সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। হবসের সরকারব্যবস্থায় জনগণের সম্মতিতে যখন প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে তাদের উত্তরণ ঘটে তারপর জনসম্মতি গৌন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে লকের কাছে সরকার গঠনের পরেও সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সম্মতি ও অবস্থানের গুরুত্ব হ্রাস পায়না।

আপাতদৃষ্টে লকীয় সরকারব্যবস্থাকে জনবান্ধব মনে হয় যেখানে জনসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু সে জনগণ কতটা রাজনৈতিক দূরদর্শী সে প্রশ্ন থেকে যায়? যেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিক ভিত্তি, ব্যক্তিগত উপযোগের আলোকে নির্মিত তাতে সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কল্যাণমুখী উপযোগবাদ সংকীর্ণ হয়ে উঠে।[৬০]

লক কর্তৃক সৃষ্ট রাজনৈতিক সমাজের প্রথম কাজ ছিল আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা সৃষ্টি। তবে এক্ষমতা হবসের মতো শাসকের নিরঙ্কুশ বা চরম ক্ষমতা নয়। তিনি জনগণের জীবন ও ভাগ্যের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক নন। লকের রাজনৈতিক সমাজের দ্বারা সৃষ্ট আইন প্রাকৃতিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। হবসের সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তির রাজনৈতিক সুরক্ষা। পক্ষান্তরে, লকের সরকারব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তির সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান। তাই লকের মতে ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত সংসদ সরকার ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেনি। সরকার ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার হরণ করতে পারে না। ব্যক্তির অধিকার হরণ করা হলে সেক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তনের আইনসঙ্গত অধিকার জনগণের থাকবে। এভাবেই সরকারের ক্ষমতাকে লক সীমিত করেছেন এবং জনসম্মতির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সরকার পরিবর্তনের যে অধিকার জনগণের ছিল তাকে লকের দৃষ্টিকোন থেকে আমরা স্বাভাবিক অধিকার বলতে পারি। তিনি শাসকের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রজার ইচ্ছার ওপর, জনসম্মতির উপর। জনসম্মতির নিরীখে প্রতিষ্ঠিত সমাজকে লক রাজনৈতিক সমাজ আখ্যা দিয়েছেন।

লক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। তার প্রতিফলন পাওয়া যায় সরকারব্যবস্থায় জনসম্মতির সংযোগে। কেননা যুক্তিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের রাজনৈতিক সমাজের গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। সে কারনেই তাঁর সরকারব্যবস্থায় জনগণের সম্মতি ও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চরম সার্বভৌমত্ব কিংবা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র কোনটিই নয় বরং বলা যায় জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রকাশ লকীয় চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। যদিও হবসীয় তত্ত্বেও আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে জনগণের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার আংশিক প্রকাশ দেখেছি। কিন্তু জনগণের সম্মতির মাধ্যমে পরবর্তীতে তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ জনগনের কাছে থেকে রাষ্ট্রের কাছে চলে আসে এবং রাষ্ট্র হয়ে উঠে সর্বাত্মকবাদী।

লক রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হয়েছেন, যাতে আমরা হবসীয় অসীম, চূড়ান্ত, সীমাহীন ক্ষমতার বিপরীতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক (মূলত জনগণকর্তৃক) কমনওয়েলথের চরম ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। তাই লকীয় সরকারে সার্বভৌম চরম বা অবিভাজ্য নয় খণ্ডিত। যে সার্বভৌমে রাজনৈতিক অখণ্ডতা অপেক্ষা অর্থনৈতিক ভিত্তি গুরুত্ববহ হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে। তাই কমনওয়েলথের ক্ষমতার উৎস জনগণ।

জনগণের দ্বারা সমাজ কর্তৃক সংসদের কাছে আইনপ্রণয়ণের ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। তাই সংসদ একক সিদ্ধান্তে এই ক্ষমতার কোনো সংশোধন, হস্তান্তর করতে পারে না। যা জনসার্বভৌমত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপরদিকে, সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন স্বাভাবিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। লক মনে করেন ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া সংসদ বা সরকার ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। সরকারের উদ্দেশ্যেই

ব্যক্তির সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান।[৬১] যদিও হবস বুর্জোয়া শ্রেণির একজন প্রতিনিধিরূপে মনে করেছেন ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বা সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটিকে হবস সরকারের মৌলিক, অপরিহার্য কাজ মনে করেন না। হবস ও লক এ বিষয়ে সহমত। করারোপের মতো ক্ষেত্রসূমহে সরকার একক ক্ষমতাবলে নয় জনগনের সম্মতিতেই তা বলবৎ করবে । তবে লক সম্মত্তির সুরক্ষা কে অধিক গুরুত্বপ্রদান দ্বারা বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন সন্দেহ নেই। তার সরকারব্যবস্থায় রাজনীতির দ্বারা অর্থনীতি চালিত হয়নি বরং অর্থনীতি দ্বারা রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিরূপিত হয়েছে। পুঁজিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা লক্ষ করা যায়।

রুশোর ধারণা

রুশোর সরকারব্যবস্থা বোঝার আগে তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থার ধরণ সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা ভালো। রুশোর প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের জীবনযাপন ছিল শান্তিপূর্ণ। কোনো রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণারোপ ব্যতীত প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল স্বাভাবিক। যা ছিল হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যের পুরোপুরি বিপরীত চিত্র। কাজেই হবসের কাছে যা প্রকৃতির রাজ্য রুশোর কাছে সিভিল সমাজ। হবসের কাছে যা সিভিল সমাজ রুশোর কাছে সেটা রাষ্ট্র। রুশোর কাছে রাষ্ট্র সমাজের একটি অংশ নয় বরং সমাজের বাড়তি সংযুক্তি। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় হবসের মতো শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং স্বনিয়ন্ত্রিত, স্বশাসিত, স্বচালিত সরকারব্যবস্থার প্রতি রুশো জোর দিয়েছেন। রুশোর চিন্তার এস্থানে সাদৃশ্য পাওয়া যায় লকের সাথে। লকীয় সরকারের মতো রুশোর জনগণের কাছে ছিল সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা। জনগণ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে তার চুক্তির রাজনৈতিক অংশটির পরিবর্তন ঘটাবে কিন্তু এ পরিবর্তনের দ্বারা সমাজের কোনো ক্ষতি বা ধ্বংস হয় না। রুশোর কাছে রাষ্ট্র সমাজস্থিত অংশ নয়, সমাজের অতিরিক্ত সংযোজন। রুশোর সরকারব্যবস্থায় উন্নততর দিক হলো লক তার সরকারব্যবস্থায় চুক্তির প্রাথমিক সম্মতিকে যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু রুশো মনে করেন একটি রাষ্ট্রকে নৈতিক দিক থেকে কতৃর্ত্বসম্পন্ন হতে হলে তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে বৈধ হতে হলে কেবল প্রাথমিক সম্মতি যথেষ্ট নয়। সেজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবিরাম সম্মতি, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের সম্মতিতে টিকে থাকে। লকের সরকারব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একজন ব্যক্তি শাসক যদি স্বৈরাচারী হতে পারে তাহলে সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি প্রয়োগের বিষয়টিতে লক কোনো ব্যাখ্যা দেননি। লকের সরকারব্যবস্থার এ দিকটিকে একটি ক্রুটিরূপে রুশো গণ্য করেছেন। তবে লকের বিপরীতে যে অবস্থান রুশো গ্রহণ করেছিলেন তাতে পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তার গতিধারায় রুশোর রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনো কখনো সর্বাত্মকবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে।

রুশোর সামাজিক চুক্তিতে সরকারের বৈধতা নির্ভর করে সরকারের প্রতি প্রত্যেক প্রজন্মের জনগণের সম্মতির ওপর। সরকারকে যদি একটি কর্তৃত্বরূপে গ্রহণ করি তাহলে প্রয়োজন এর প্রতি জনগণের সুস্পষ্ট সম্মতি। প্রকাশ্য সম্মতি দান এবং পুন:পুন সম্মতি অব্যাহত রাখা। এ কাজটি সম্ভবপর হবে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে। যাতে রাষ্ট্রের সকল জনগণ রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্বারা বৈধতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। সে অর্থে মনে হতে পারে রুশোর কাছে বৈধ সরকার গণতান্ত্রিক সরকার। রুশো তাঁর দূরবর্তী সময়ের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসেন। ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য, শাসকের স্বৈরাচারিতা প্রতিরোধ করার জন্য, জনগণ যাতে ক্ষমতার ক্রীড়ানকে পরিণত না হয় সেজন্য রুশো জনগণের অবিরাম সম্মতিকে গ্রহণ করেছেন।

রুশোর মতে রাষ্ট্র একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান যা এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তার বিপরীত। এরিস্টটলের কাছে রাষ্ট্র পরিবারের মতো একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান কারণ এটি মানুষের চুক্তি থেকে উদ্ভূত। চুক্তিই ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতা দেয়। এর রয়েছে কর্তৃত্ব করার অধিকার। চুক্তির সাথে যুক্ত রয়েছে সম্মতির

প্রশ্ন। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে কিন্তু জনগণ পরস্পরের উপর কর্তৃত্বপরায়ণ ছিল না। চুক্তিই রাজনৈতিক সমাজে, তথা রাষ্ট্রে মানুষের পারস্পরিক কর্তৃত্বের ভিত্তি। মানুষের চুক্তির ফল। রুশো যখন ব্যক্তির অবিরাম সম্মতিকে সরকারের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সমর্থন করেছেন।

রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার স্খলন ঘটলেও রুশো কিন্তু রাষ্ট্রের বিলুপ্তি কামনা করেননি। বরং চেয়েছেন এমন একটি সংগঠন তৈরি করতে যেখানে ব্যক্তির ধন, জীবন ও স্বাধীনতা পূর্বের মতো বহাল থাকবে। ব্যক্তির প্রাণ ও সম্পত্তি সমষ্টিগত শক্তির সাহায্যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত হবে। সামাজিকতার অংশরূপে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মতো স্বাধীনও থাকবে। সামাজিক চুক্তিতে রুশো এমনটা প্রত্যাশা করেছেন। নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে সামষ্টিক প্রয়াস যৌথবদ্ধতার পরিচায়ক। সরকার সম্পর্কিত ভাবনায় রুশোর একটি বক্তব্য স্পষ্ট। ক্ষমতার সাথে যখন জনগণের সম্মতি যুক্ত হয় তাহলে সে ক্ষমতা হয়ে উঠে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য কর্তৃত্ব। রুশো তার সরকারব্যবস্থায় জনসম্মতির দ্বারা কর্তৃত্বের এবং স্বাধীনতার মাঝে সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কর্তৃত্ব প্রদান দ্বারা বৈষম্যমূলক যে সমাজ ব্যবস্থাকে রুশো নষ্ট বা পাপ মনে করেছেন সে সমাজকে বৈধতার স্বীকৃতি দিলেন। সম্মতি এবং চুক্তির সাহায্যে রুশো স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্বের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন। রুশোর কাছে কেবল জনগণের স্বাধীনতা কিংবা সরকারের চরম কর্তৃত্ব কোনোটি এককভাবে কাম্য নয়।

ব্লাম, ডেভিড থমসন, হেনরী টোজারের মতো রাষ্ট্রদার্শনিকবৃন্দের কাছে রুশো চিত্রিত হয়েছেন একজন আধুনিক গণতন্ত্রকামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। রুশোর লেখনীতে প্রতিফলিত হয়েছে গণতান্ত্রিক জনগণের ইচ্ছা-অভিলাষ। যদিও গণতন্ত্রের ধারণা রুশোর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। তবে গণতান্ত্রিক ধারণার অধিকতর জনসংশ্লিষ্টতা প্রাপ্তি ঘটেছে রুশোর গণসার্বভৌমত্ব তত্ত্ব দ্বারা। যেমন –ডেভিড থমসন রুশোকে উল্লেখ করেছেন 'গণতান্ত্রিক বিপ্লবের' মহান দার্শনিক রূপে, যে বিপ্লবের সূত্রপাত আঠারো শতকে এবং বিক্ষিপ্তভাবে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেও পরবর্তীতে ঐতিহাসিকদের কাছে তা অধিক গোচরীভূত হয় রুশোর মাধ্যমে।[৬২]

সামাজিক চুক্তি গ্রন্থে রুশো রাষ্ট্রকে একটি প্রগতিশীল শক্তিরূপে দেখেছেন। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে তার আদিম অবস্থা থেকে প্রগতির দিকে চালিত করে। রুশো কর্তৃক রাষ্ট্রকে প্রগতিশীল উন্নততর রূপে দাবির পেছনে একটি অন্যতম কারণ হলো– রুশোর রাষ্ট্রে মানবচরিত্রের নৈতিক উত্তরণ ঘটে। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রের পরিচালনা শক্তি হবে বৌদ্ধিকতা এবং বৌদ্ধিকতার আত্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা।

বৌদ্ধিকতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের এ দুটো রূপ রাষ্ট্রকে নৈতিক দিক থেকে বলীয়ান করেছে। যে রাষ্ট্র যুক্তিবাদিতা, প্রজ্ঞা এবং জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয় না তেমন রাষ্ট্রকে রুশো স্বৈরাচারী রাষ্ট্র মনে করেন এবং এধরণের স্বৈরাচারী রাষ্ট্রকে সর্বদা আক্রমণাত্মকভাবে বিরোধিতা করেছেন। রুশো স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী শক্তির বিরুদ্ধে। যৌক্তিক বিবেচনায় এটি খুব সহজে অনুমেয় স্বৈরাচারিতার সাথে বলপ্রয়োগের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি রাষ্ট্রকে পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো থেকে দেখতে নারাজ। এ ক্ষেত্রে লকের সাথে তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। উভয়ে মনে করেন পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে যদি রাষ্ট্র সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাহলে রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে বলপ্রয়োগ বা শক্তি এবং এ শক্তি অবশ্যই জনগণের বিরুদ্ধে। রুশো রাষ্ট্রের একমাত্র ভিত্তি রূপে স্বীকার করেছেন যুক্তিসঙ্গত ইচ্ছার যৌক্তিক ভিত্তিকে।[৬৩]

রুশো রাষ্ট্রের ভিত্তি রূপে কেবলমাত্র ইচ্ছাকে পর্যাপ্ত যা যথার্থ মনে করেননি বরং যৌক্তিক ইচ্ছাকে তিনি রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে গণ্য করেছেন। রুশোর যৌক্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে সাধারণের ইচ্ছার মাঝে, যা ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে ভিন্ন। রুশোর রাষ্ট্রব্যবস্থায় তিনি যে ধরনের ইচ্ছার কথা বলেছেন। (যাকে রুশো সাধারণ ইচ্ছা বলেছেন) একে বার্কার তুলনা করেন 'দুইদিকে তীক্ষ্ম ধারালো তলোয়ারের' (a keen two-edged sword) সাথে। যার

সাহায্যে রুশো একদিকে গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন, অন্যদিকে লেভিয়াথানের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার মাধ্যমে এর ইতি টেনেছেন।[৬৪]

রুশোর চিন্তার জটিলতা হলো একদিকে তিনি তাঁর 'two edged sword'– কে ব্যবহার করেছেন প্রাথমিক গণতন্ত্রের সমর্থনে; যাতে কোনো দল, প্রতিনিধি থাকবে না এবং এধরণের গণতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের জন্য প্রযোজ্য হবে। রুশোর সরকারব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে তিনি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন কিন্তু প্রতিনিধিত্বশীল সরকারব্যবস্থা কিংবা সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু কোনো দল বা প্রতিনিধি ব্যতীত প্রাথমিক গণতন্ত্রকে বলা যেতে পারে অনির্দেশিত গণতন্ত্র। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের উপযুক্ত উদাহরণ রূপে তিনি জেনেভার নগররাষ্ট্রকে তুলে ধরেন।

হবস ও রুশোর চিন্তার গভীরে প্রবেশ করলে উভয়ের সরকারব্যবস্থায় একটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় তা হলো একচ্ছত্রবাদ। হবসের *লেভিয়াথান*–গ্রন্থে যেরূপ একক ব্যক্তির কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয়েছে যাতে আইনগত এবং নির্বাহী ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা শাসকের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে; একইভাবে রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রের পরিচালনার যে দৃশ্যপট এঁকেঁছেন তাতে ব্যক্তিগোষ্ঠীর (community of persons) কাছে সর্বাত্মক ক্ষমতা দিয়েছেন। রুশোর রাষ্ট্রব্যবস্থায় গোষ্ঠী (community) ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। এ গোষ্ঠী যারা রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনা করে। তারা সম্পূর্ণ রূপে বিধানিক, কোনো সুনিদিষ্ট কর্তৃত্বমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রুশোর আইনপ্রণয়নকারী গোষ্ঠী সরকারকে সৃষ্টি করে। সরকার এক্ষেত্রে একটি মধ্যবর্তী গোষ্ঠী রূপে কাজ করে, যার কাজ আইনের বাস্তবায়ন করা। রুশোর সরকারব্যবস্থায় সরকারের অবস্থান সার্বভৌম এবং রাষ্ট্রের মধ্যবর্তীস্থানে। রুশোর কাছে সরকার হলো ক্ষণস্থায়ী ও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী একটি কমিশন। সার্বভৌমের একক অস্তিত্ব রয়েছে। সার্বভৌম অবিভাজ্য ও হস্তান্তরযোগ্য নয়। কিন্তু সরকার সার্বভৌমের ইচ্ছার ওপর অস্তিত্বশীল। সরকারের ক্ষমতা বিভাজ্য ও হস্তান্তরিত হওয়া সম্ভব এবং তা হবে সার্বভৌমের দ্বারা। রুশোর কাছে সার্বভৌম হলো সাধারণ ইচ্ছা। তাঁর মতে, সরকারের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি, চুক্তি হয়েছে গোষ্ঠীর বা সংগঠনের বা সংঘের সাথে।[৬৫] রুশোর সরকার পদ্ধতিতে সরকার হলো একটি কমিশন এবং জনগণ হলো সংঘ বা সম্প্রদায়।

যদিও জনসমাজ সাময়িকভাবে সরকার বা কমিশন থেকে কার্যনির্বাহী ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে তবে এটি তার প্রতিনিধির কাছে থেকে বিধানিক ক্ষমতাকে বিচ্ছিন্ন করে না। অন্যথায় এটি সার্বভৌমকে বিচ্ছিন্ন করার নামান্তর, যা অসম্ভব। রুশোর এ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে লকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লক তার জনসমাজের কাছে বিধানিক ক্ষমতা দিয়েছেন। লকীয় জনসমাজ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল গোষ্ঠী আইনসভার মাধ্যমে আইন প্রণয়ণ কার্য সম্পন্ন করতে পারে। লকের *সেকেন্ড ট্রিটিজ* গ্রন্থে দেখা যায়, তিনি জনসমাজের একটি বিশেষ প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীর কাছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে রুশো এধরণের প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভারই পক্ষে নন। তিনি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। রুশো মনে করেন প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি সামন্ততান্ত্রিক সরকারের সূচনা ঘটায়। রুশোর কাছে কাউন্সেলে প্রতিনিধিত্ব এবং ভাড়াটে যোদ্ধা সমগোত্রীয়, যা আপাত দৃষ্টে স্বাধীন মনে হলেও মূলত প্রতারণামূলক। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্ত সাধনের পক্ষে। তিনি সমর্থন করেন প্রাথমিক বিধানিক মতবাদকে।[৬৬]

বার্কার রুশোকে একজন সর্বাত্মকবাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। বার্কার মনে করেন একজন যথাযথ গণতন্ত্রী রূপে রুশোর চিন্তা কিছুটা অটোক্র্যাট বা স্বৈরাচারের সমন্বয়[৬৭] কারণ রুশো অসীম ক্ষমতাধর সার্বভৌমের বিপরীতে কোনো রক্ষাকবচ রাখেননি।

রুশো সামষ্টিকের অংশরূপে ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তিকে যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু তিনি ব্যক্তির নাগরিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্বারোপ করেননি।[৬৮] এ ক্ষেত্রে রুশো অপেক্ষা লকের দৃষ্টিভঙ্গি অধিকতর উন্নততর ছিল।

রুশোর মতের অন্যতম দুর্বলতা হলো তাঁর সরকারব্যবস্থার যে কাঠামো নির্দেশিত হয়েছে তা ছোট নগররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে সামন্ততান্ত্রিক কিছু পদ্ধতি বলবৎ থাকবে। রুশো তার সরকার পদ্ধতিতে যখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সমর্থন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা তথা প্রতিনিধিত্বমূলক জনগণের বিরোধিতা করেন একে তার মতের অপরিপক্ক দিক রূপে বোধ হয়। রুশোর সরকারব্যবস্থায় তিনি হবসের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এবং লকের সীমিত রাজতন্ত্র উভয়কে বাতিল করে রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র জনগণের সক্রিয় ইচ্ছা ও সম্মতি তথা নিরন্তর বা অবিরাম সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রুশো রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং রাষ্ট্রকে ও সরকারকে জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করার মাধ্যমে একটি মজবুত ভিত্তি দান করেছেন। রুশোর নিকট রাষ্ট্র রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস এবং রাষ্ট্রের কল্যাণকামী দিকটি লক্ষণীয়। রুশোর রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। জনগণের হিত সাধনই রাষ্ট্রের মুখ্য কার্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রুশোর কাছে যে সাধারণ ইচ্ছা বা গণসার্বভৌমত্বের প্রকাশ পাওয়া যায় তাতে ব্যক্তিস্বার্থ নয় আপামর জনসাধারণের মত ও স্বাধীনতার অধিকার উচ্চারিত হয়েছে। তবে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত সমাজে সরকারব্যবস্থায় কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না রুশো তা মনে করেননি। বরং সাধারণ ইচ্ছা এ ক্ষেত্রে একটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করবে এবং অবাধ স্বাধীনতার রাশ টানবে।

রুশোর সরকারব্যবস্থার কাঠামো রূপে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছেন বটে তবে দলব্যবস্থাকে নাকচ করেছেন। প্রশ্ন আসে, দলব্যবস্থাকে বাতিল করে প্রতিনিধিত্বশীল বা জবাবদিহিতাপূর্ণ সরকারব্যবস্থার নিশ্চয়তা কতটুকু? আধুনিক কালের প্রেক্ষাপটে এটা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; একে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র তার সঠিক দিশায় চলতে পারে না।

যদিও রুশো পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অপেক্ষা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। তাঁর এধরণের চিন্তা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে কতটা গ্রহণযোগ্য তা পুর্নবিবেচনা প্রয়োজন। বিশাল জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রসমূহে, শতভাগ শিক্ষিত নয় এমন রাষ্ট্রসমূহ কিংবা শতভাগ স্বাক্ষরতাপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের জনগণ প্রকৃত বিচারবুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে যথার্থ অর্থে সক্ষম হবে কি না সেটি সম্পূর্ন সংশয়ের বিষয়। আধুনিককালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ কমবেশি পরোক্ষ গণতন্ত্রের সাহায্যেই পরিচালিত। তথাপিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের জনগণ যথার্থ রাজনৈতিক সুবিধা সম্বলিত জীবনযাপন করতে পারে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এ আলোচনার প্রসঙ্গে আমার ডেভিড থমসনকে স্মরণ করতে পারি। থমসন মনে করেন রুশোকে মূলত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নয়। রুশোর শিক্ষায় স্বাধীনতা এবং সাম্য আদর্শ রূপে অপরিহার্য, যার ওপর সরকারের নৈতিক নির্ভরতা থাকতে পারে। রুশোর কাছে রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বহ। রুশো আধুনিককালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যেকার বৈপরীত্যের সম্পর্কটিকে অবলুপ্তকরণ দ্বারা এ দুয়ের মাঝে এক প্রকার সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৬৯]

রুশোর সরকারব্যবস্থার প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায় তিনি আইন এবং সংবিধান বিষয়ে গ্রিক ঐতিহ্য ও রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গ্রিক ঐতিহ্যের প্রভাব বলতে বোঝানো হচ্ছে একজন আইন প্রণেতার ব্যক্তিগত প্রতিভার উপর গুরুত্বারোপ। রুশোর নির্দেশিত আইনসভা যে আইনসভাকে রুশো আদর্শরূপে গণ্য করেছেন তা আধুনিক কালের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রুশোর আইনসভাতে ব্যক্তির ব্যক্তিগত

ক্যারিশমার উপর গুরুত্বারোপ করলেও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপখাইয়ে নেওয়ার বিষয়ে তেমন গুরুত্বারোপ করেননি।

রুশো আইন প্রণেতারূপে বিদেশ থেকে অভিজ্ঞব্যক্তিকে আহবান করেছেন নিজদেশের আইন প্রণয়ণের জন্য। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুশোর অবস্থান আধুনিক গণতন্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয়; আবার তার উল্লিখিত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের জন্য অনুপযোগী। একটি রাষ্ট্রে কোনো আইনের পেছনে আক্ষরিক অর্থে প্রতিটি ব্যক্তির সম্মতি থাকবে এ বাস্তবতা আধুনিককালে সম্ভব নয় বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহে যেখানে জনসংখ্যা অধিক সেক্ষেত্রে কোনো আইনের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের অনুমোদন নাও থাকতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন সাপেক্ষে আইনটি অনুমোদিত হতে পারে, কিংবা গ্রহণযোগ্যতার দাবীদার। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ তাদের অধিকার হারাবে রুশোর এধরণের চিন্তা পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন।

টোজার রুশোর আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাকে বলেছেন 'স্টেরিওটাইপড', যেখানে রুশোর মতের সাথে দ্বিমত পোষন বা কিংবা বিচ্যুত হওয়া অর্থ অধঃপতন বলে গণ্য করা হয়। রুশোর কাছে তার চিত্রিত আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হওয়ায় অর্থ নাগরিকের পতন ঘটা। রুশো আধুনিক যান্ত্রিকতা বা জটিলতাপূর্ণ সমাজের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। রুশোর কাছে বহুত্ববাদী সমাজ হলো অবনত সমাজ। একটি বহুত্ববাদী সমাজে সমাজস্থিত নাগরিক পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ যাতে রয়েছে সাহায্য, সহযোগিতা, দায়িত্বপরায়ণতার মতো বিষয়সমূহ। যা সমাজকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে; প্রগতির পথে ধাবিত করে। মানুষের কাছে যা প্রগতি রুশোর কাছে তা অধঃপতন। টোজার যদিও রুশোর আর্দশ রাষ্ট্রের ভাবনয় এ সকল বৈশিষ্ট্য রুশোর সমাজে লক্ষ করেননি বিধায় রুশোর সমাজ টোজারের কাছে বহুত্ববাদী সমাজ নয়। কিন্তু আমরা মনে করি টোজারের এধরণের বক্তব্য যথাযথ নয়। হয়ত আপাতদৃষ্টে তার সমাজ কাঠামো বা সরকারব্যবস্থা 'স্টোরিওটাইপ' রূপে মনে হতে পারে কিন্তু একে একটি বহুত্ববাদী সমাজের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, রুশোর সমাজকে যদি বহুত্ববাদী রূপে গণ্য করা হয় তবে তা কি গণতান্ত্রিক অভিধা লাভ করবে? কারণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই হলো এটি বহুত্ববাদী হবে। এতে বিচিত্রতা থাকবে। একটি বহুমুখী সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তার স্বকীয় অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিরাজিত থাকবে এটি যথার্থ গণতান্ত্রিক ধারার প্রকৃতি। যদিও গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো রাজনৈতিক দল। তবে রুশো তার সরকারব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠীর উপস্থিতির বিরোধিতা করেছেন। এর পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল এদের উপস্থিতি রাষ্ট্র তথা সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে। সাধারণ ইচ্ছার প্রচার রুশো করেছেন সে সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতার অপব্যবহার সমাজের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা রুশোর সাথে হবসীয় সর্বাত্মকবাদের একপ্রকার সাদৃশ্য পাই।

হবসীয়তত্ত্বে সার্বভৌম যেরূপ একছত্র ক্ষমতার অধিকারী তদ্রুপ রুশোরতত্ত্বে সাধারণ ইচ্ছা একচ্ছত্র ক্ষমতার বাহক। যকোনো একছত্র ক্ষমতা কালক্রমে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে সম্ভবত রুশো সচেতন ছিলেন। তাই তিনি কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতার বৈধতা নিরূপণে নৈতিকতা, অবিরাম সম্মতি এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনাকে গ্রহণ করেছেন। এসবের দ্বারা তিনি সরকার ও সাধারণ ইচ্ছার পরিচালনায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এতে শক্তি রূপান্তরিত হলো অধিকারে।

শাসনব্যবস্থা

ক্ষমতার শ্রেণিকরণ সম্পর্কে রুশোর মত লকের মতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রুশো সরকারের দুই ধরণের ক্ষমতার কথা বলেছেন– আইন প্রণয়ণী ক্ষমতা (সার্বভৌম ক্ষমতা) এবং শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা। রুশো তাঁর *স্যোশ্যাল*

কন্ট্রাক্ট গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের প্রথম অধ্যায়ে সরকারের শ্রেণিকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন কোনো কাজের পেছনে দুধরণের কারণ কাজ করে– যার একটি দৈহিক কারণ এবং অপরটি নৈতিক কারণ কোনো কাজের পেছনে নৈতিক কারণ হলো ব্যক্তির ইচ্ছা এবং দৈহিক কারণ হলো ব্যক্তির শক্তি। এ দুটি কারণ সমন্বিতভাবে কোনো কার্যকে পরিচালিত করে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রসত্তার কাজের পেছনেও থাকে ইচ্ছা এবং শক্তি। ইচ্ছা এবং শক্তির সম্মিলিত প্রয়াষের দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। রুশো ইচ্ছাকে সংযুক্ত করেছেন আইন প্রণয়ণী ক্ষমতার সাথে এবং শক্তিকে যুক্ত করেছেন শাসন বিভাগের ক্ষমতার সাথে। রুশো দাবি করেন এই উভয় ক্ষমতার সম্মিলিত প্রয়াস ব্যতীত রাষ্ট্রের পক্ষে কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়।

রুশোর সরকারব্যবস্থায় জনগণ আইনসভার কর্ণধার; তাই কোনো শাসক নয়, জনগণই আইনগত শক্তির অধিকারী। আবার কোনো এক্সিকিউটিভ বডিও (শাসন বিভাগীয় গোষ্ঠী) জনগণ কর্তৃক অধিকার প্রাপ্ত রাষ্ট্রের আইনগত শক্তির অংশ নয়। প্রসঙ্গত, রুশোর কাছে আইনগত শক্তির অধিকারী জনগণই সার্বভৌম শক্তির মালিক। আইন বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ণ করা কিন্তু বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা শাসন বিভাগের। আইনের প্রয়োগ করা, বাস্তবায়ন ঘটানো সার্বভৌমের দায়িত্ব নয়, সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো আইন প্রনয়ণ ঘটানো।

সার্বভৌম শক্তি তার ইচ্ছাকে প্রকাশিত কিংবা বাস্তবায়িত করার জন্য নির্ভর করে শাসনবিভাগের ওপর। শাসনবিভাগের ক্ষমতা শাস্তি সম্পর্কীয়। সার্বভৌম শক্তির ইচ্ছাকে শাসনবিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত করার জন্য রাষ্ট্র ও সার্বভৌমের মাঝে মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন, যা বাহকের মতো কাজ করে। আর এই বাহকই হলো সরকার। কাজেই রুশোর কাছে সরকার এবং সার্বভৌম দুটো এক নয়, ভিন্ন। সরকার সার্বভৌমের একটি অংশ মাত্র যা মূলত সার্বভৌমের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে, সার্বভৌমের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। সার্বভৌম এবং জনগণের মাঝে একটি বাহনরূপে (সংস্থা) সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে একদিকে আইনের বাস্তবায়ন করা, অপরদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করা।

সরকার নামক বাহনটিকে রুশো 'সংস্থা' রূপে মনে করেন এবং সংস্থাটির কর্তাব্যক্তি হলেন রাজা। রুশোর সরকারব্যবস্থার সাথে আমরা সাদৃশ্য দেখি লকের। যেখানে লক নিজেই বলেছেন সরকার জনগণের অধীনস্থ এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, অনুরূপভাবে রুশোর সরকারও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

সরকার একটি নিয়োগপ্রাপ্ত সংগঠন। এ সংগঠনে শাসক, কর্মকর্তা, কর্মচারী থাকতে পারে; এরা প্রত্যেকেই সার্বভৌমের অধীনস্থ রূপে সার্বভৌমের কাছে থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করে। সার্বভৌম সরকারের ক্ষমতার সংযোজন-বিয়োজন ঘটাতে পারে, এমনকি সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতাহীনও করতে পারে সার্বভৌম।

রুশো সরকারের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার্পণের পরিবর্তে সরকারকে সার্বভৌমের অধীনস্থ একটি সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রুশোর কাছে সরকার সার্বভৌমের ইচ্ছার বাস্তবায়নকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা, সরকার সার্বভৌমের কাছে থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে রত। এর দ্বারা সরকার একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে সার্বভৌম, সরকার এবং নাগরিকবৃন্দের মাঝে। এভাবে সরকার প্রকারান্তরে রাষ্ট্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে রুশো মনে করেন জনগনের হাতে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা থাকলেও এর প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে অন্যত্র। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজ করে বিধি-নিষেধ এবং ব্যক্তি ও স্থান বিশেষে সে বিধি-নিষেধ কাজ করে। সার্বভৌমের ইচ্ছা আইন রূপে গণ্য হলেও সে ইচ্ছার প্রয়োগকর্তা নির্ধারণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের কাজ হলো রাজা ও প্রজার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। অবশ্য সরকারের কাজসমূহ পরিচালিত হবে জনমতের দ্বারা। সরকারের কাজে অবশ্যই জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। 'সংস্থা হিসেবে সরকার যেমন জনতা থেকে পৃথক, তেমনি সে পৃথক সার্বভৌম থেকে। ... তার অবস্থান সার্বভৌম এবং জনতা: এই দুই–এর মধ্যবর্তী স্থলে।'[৭০] যারা মধ্যস্থতাকারী বা সার্বভৌমের বাহনরূপে কাজ করবে, যাদের

উপর সরকারের দায়িত্ব ন্যস্ত হবে তারা হলো 'প্রিন্স' বা রাজা। রুশোর সরকারব্যবস্থায় সরকার লকের মতো ট্রাস্ট না হলেও একটি ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাকারী সংস্থা যার মূল ক্ষমতা সার্বভৌমের হাতে যে সার্বভৌম একদিকে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা আবার অন্যদিকে সরকার কর্তৃক যখন শাসিত হয় তাহলে সে জনগণ হয়ে ওঠে নাগরিক। এভাবে রুশোর সরকার রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে। সার্বভৌম, সরকার এবং নাগরিক তিনের মধ্যেই ভারসাম্য রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। যদি সার্বভৌম শাসন পরিচালনা করে, সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আইন প্রণয়ণ করে এবং জনগণ তা মান্য করতে অস্বীকার করে তাহলে রাষ্ট্রে আইনের শাসন রক্ষিত না হয়ে রাষ্ট্রে সৃষ্টি হবে অরাজকতা।

রুশোর সরকারব্যবস্থায় একজন নাগরিক নিজেই সার্বভৌমের অংশ আবার শাসিতের অংশ। নাগরিক যখন সার্বভৌমের অংশ তাহলে সে যৌথ সত্তা আবার নাগরিক যখন সার্বভৌমের অধীন তাহলে সে একক সত্তা, ব্যক্তি সত্তা। তবে সার্বভৌমের অংশ রূপে, সার্বভৌম শক্তির সদস্যরূপে একজন নাগরিক যখন সরকারের অধীন তাহলে কিন্তু নাগরিকের দায়িত্ব এবং আনুগত্যের অবস্থান থেকে সরে আসে না। রাষ্ট্রের একজন নাগরিক রূপে সার্বভৌমের প্রতি সে তার পূর্ণ আনুগত্যই প্রর্দশন করে। এ সম্পর্কে রুশো দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন "যেমন সার্বভৌম তেমনি শাসিত, ..., তাদের প্রত্যেকেই অপর প্রত্যেকের সমান; তারা সকলেই সমানভাবে রাষ্ট্রের সকল বিধি-বিধানের সমান বাধ্য, সমান অনুগত।"[৭১] সার্বভৌম শক্তির অংশরূপে একজন ব্যক্তি অবদান রাখে আবার সরকার কর্তৃক শাসিত হওয়ার সময় সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করে। তফাৎ হলো একজন ব্যক্তি যখন সার্বভৌমের সাথে যুক্ত তাহলে সে যৌথের অংশ আবার শাসিত রূপে সে নাগরিক রূপে বিবেচ্য।

রুশোর সরকারব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবধারা প্রতিফলিত। সেটা প্রতিনিধিত্বমূলক নয়, প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে। জনগণের সরাসরি অংশগ্রহনে যেহেতু সরকার পরিচালিত হবে তাই জনসংখ্যা যত কম হবে সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ততোধিক কার্যকর হবে। রুশো মনে করেন, 'রাষ্ট্র যত বড় হবে, স্বাধীনতা তত কম হবে।'[৭২] রাষ্ট্র যত বড় হবে তাতে জনগণের অসমতাও তত বেশি হবে। জনগণ ও রাষ্ট্রের মাঝে দূরত্বও স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। তাহলে ব্যক্তি সার্বভৌমের অংশরূপে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী আর থাকতে পারে না। সেরূপ অবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায় প্রশ্ন উঠে। রুশো তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক সরকারব্যবস্থায় পরিমাণ এবং সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন; স্বাধীনতা, সাফল্য নির্ধারণ করেছেন। এতৎসত্ত্বেও, একথা বলা যায় যে, সরকারের শক্তির মূল হলো রাষ্ট্র এবং সেক্ষেত্রে কর্মচারীর সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে কোনো পরিবর্তন আসে না। কর্মচারীর হ্রাস-বৃদ্ধি সরকারের কাজের বা শক্তির হয়ত আপেক্ষিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু তার প্রকৃত শক্তি বা নিরঙ্কুশ শক্তির কোনো পরিবর্তন ঘটে না।[৭৩] তার কাছে সার্বভৌম এবং সরকারের সফলতা প্রপ্তির জন্য ছোট আয়তনের রাষ্ট্র এবং বিশেষত ছোট জনগোষ্ঠীই অধিক অভিপ্রেত। যে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা যত অধিক সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার হুমকি তত বেশি, জনগণের স্বাধীনতা তত সংকীর্ণ। যদিও তিনি এমনটা মনে করেন না সকল রাষ্ট্রের জন্য কোনো একক সরকারব্যবস্থা, সংবিধান এককভাবে প্রযোজ্য হবে এবং তা গ্রহনযোগ্য হবে। রাষ্ট্রের আয়তনের সাথে সরকারের রূপ পরিবর্তিত হওয়া উচিত। রুশো কোনো রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত সরকার কি হবে তার নির্ধারক রূপে অনুপাতকে গ্রহণ করেছেন। যদিও এ অনুপাত কেবলমাত্র সংখ্যাভিত্তিক নয়, পরিমানগতও বটে। একটি রাষ্ট্রে কর্মচারীর সংখ্যা কম বা বেশির পরিমান নির্ধারিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। সরকার ও তার কর্মচারীর সংখ্যা হবে যেভাবে সার্বভৌমের সঙ্গে তার শাসিতের অনুপাত (জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

রুশোর কাছে সরকার একটি নৈতিক সত্তা।[৭৪] রাষ্ট্রের অধীনস্থ একটি অংশ হলো সরকার। তবে সরকার জনগণ এবং সার্বভৌম থেকে পৃথক। সরকারের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে জনগণের ক্ষমতার পুঞ্জীভূত রূপ। যদি সরকার জনগণের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে স্বীয় ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হতে চায় তাহলে সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে। সরকারের স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হওয়া তাহলে সম্ভব হবে, যখন সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর

কাছে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। সরকার তথা শাসকের ইচ্ছা যদি সার্বভৌম অপেক্ষা অধিক তৎপরতা সম্পন্ন হয় তাহলে সরকার স্বীয় ইচ্ছা (যা জনসাধারণের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়) বাস্তবায়নের জন্য জোর করে রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাছে আনুগত্য আদায় করতে চায় এবং সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রযন্ত্র সমূহকে সরকার ব্যবহার করে। এতে সার্বভৌমের সমান্তরাল আরেকটি সার্বভৌম শক্তি রাষ্ট্রে সৃষ্টি হয়ে পড়ে। এধরণের ক্ষেত্রে রুশো মনে করেন রাষ্ট্রে দুই ধরণের সার্বভৌমের সৃষ্টি হয়, যার একটি বিধিসম্মত (Dejure) এবং অন্যটি কার্যত (Defacto)। এমতাবস্থায় দুইপ্রকার সার্বভৌমের উপস্থিতি রাষ্ট্রীয় ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করে এবং এতে রাষ্ট্রের (রুশোর ভাষায় 'সমাজ সংস্থা') ধ্বংস ঘটবে।

নাগরিকের আনুগত্যের বিষয়টি সরকার এবং সার্বভৌম উভয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। রুশো সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার বিরোধিতা করছেন তবে সরকারের ব্যক্তিক অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আমরা রুশোর সরকারব্যবস্থায় দুটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি। যেমন ব্যক্তিক অস্তিত্ব যা দ্বারা তিনি রাষ্ট্র থেকে সরকারকে পৃথক করেছেন এবং সকল সদস্যের অংশগ্রহণের দ্বারা সৃষ্ট একটি চেতনা।[৭৫]

সরকার নামক এই চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে সরকারের সক্ষমতা প্রয়োজন। এই সক্ষমতার অংশ হিসেবে সরকারের থাকতে পারে- কাউন্সিল সমূহ, সংসদ, সরকারের সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা, কোনো বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা, সরকারের অধিকার এবং পদবী নির্ধারণের ক্ষমতা। এসব ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য সরকার তার ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা কর্মচারীদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারে একই সাথে তাদের সম্মানও প্রদান করে।

রুশোর সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে দুটি দিক লক্ষ করা যায়। যেমন, একদিকে সরকারের ক্ষমতা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে না এবং সরকারের ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা ভিন্ন হবে। অন্যদিকে, সরকার যেন স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় উপযুক্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। রুশোর ভাষায়– "এক কথায় ঃ অবস্থাটা এমন হতে হবে যেন সর্বদা প্রয়োজনে জনতার স্বার্থে সরকার বিসর্জিত হতে পারে, যেন সরকারের স্বার্থে জনতার বিসর্জন না ঘটে।"[৭৬] এক্ষেত্রে আমরা লকের সাথে রুশোর সাদৃশ্য পাই। তারা উভয়েই জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সরকারের কাজ হচ্ছে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। সরকার জনগণের উপর কর্তৃত্ব করবে হবসীয় এ চিন্তার বিপরীতে লক এবং রুশোর অবস্থান।

রুশোর সরকারব্যবস্থায় সরকার একটি কৃত্রিম সংস্থা এবং সরকার সৃষ্টিকারী সংস্থারূপে রাষ্ট্রও একটি কৃত্রিম সংস্থা। রাষ্ট্র কর্তৃক সরকার সৃষ্ট এবং রাষ্ট্রের অধীনস্থ হলেও সরকার একটি সংস্থারূপে যেন কর্মদক্ষ হতে পারে এবং সে প্রয়োজনে সরকারের শাসন বিভাগ, আইনবিভাগ এ সকল বিভাগসমূহ যেন কার্যপালনে সমর্থ হয় সে বিষয়েও রুশো সচেতন। লকীয় সরকারের মতো কেবলমাত্র জনগণের অধীনে রেখে কোনো ক্ষমতা সরকারকে প্রদত্ত হবে না এমন ধারণার ব্যত্যয় লক্ষ করি রুশোর কাছে। সরকারের কাছে যথার্থ ক্ষমতা প্রদত্ত না হলে সে সরকার যথার্থ কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে না এবং রাষ্ট্রের অংশরূপে উত্তম সরকারও হতে পারবে না। তবে রুশো এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, কোনো সরকারের কর্মকর্তা– কর্মচারীর সংখ্যা যত বেশি হবে সে সরকার তত বেশি দুর্বল হবে। অর্থাৎ এ কয়টি সরকার যত বেশি ক্ষমতা তার অন্তর্গত সদস্যবৃন্দের উপর প্রয়োগ করবে, তত কম ক্ষমতা সরকারের কাছে অবশিষ্ট থাকবে। সরকার জনগণের ওপর যত ক্ষমতা আরোপ করবে সরকার ততই ক্ষমতা হারাবে।

রুশো একজন রাজকর্মচারীর ইচ্ছাকে তিনটি প্রকারে বিভক্ত করেছেন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, বিশেষ ইচ্ছা এবং সাধারণ ইচ্ছা। ব্যক্তিগত ইচ্ছার লক্ষ হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা প্রাপ্তি, স্বার্থ সাধন। বিশেষ ইচ্ছার লক্ষ হচ্ছে একজন রাজকর্মচারী কর্তৃক তার শাসকের ইচ্ছা পরিপূরণ। রুশো সাধারণের ইচ্ছাকে বলেছেন 'সরকারের সম্মিলিত অস্তিত্বগত ইচ্ছা'।[৭৭] এ ইচ্ছা রাষ্ট্রের দিক থেকে বিশেষ ইচ্ছা কিন্তু সরকারের দিক থেকে সাধারণ ইচ্ছা। কারণ,

সরকারের রাষ্ট্রের অংশ। তৃতীয় ইচ্ছাটিকে রুশো সামগ্রিক বিবেচনায় সাধারণ ইচ্ছা রূপে গ্রহণ করেছেন। যা রাষ্ট্র ও সরকার উভয় পক্ষ থেকেই সাধারণ ইচ্ছা বলে বিবেচিত। এ সাদারণ ইচ্ছাটি হলো মূলত জনতার ইচ্ছা তথা সার্বভৌমো ইচ্ছা। তৃতীয় ইচ্ছাটি হলো প্রকৃত বিচারে সামগ্রিক ইচ্ছা যাতে জনগণের প্রতিনিধিত্ব ঘটে।

রুশো জনতার ইচ্ছা বা সার্বভৌমের ইচ্ছাকে সামগ্রিকতার প্রতিনিধি রূপে মূল্যায়ন করে এর স্থান সর্বাগ্রে নির্ধারণ করেছেন বটে কিন্তু প্রকৃত চিত্র হলো জনগণের এই সাধারণ ইচ্ছা রাষ্ট্রের ক্ষেত্র বিবেচিত হয় দুর্বল রূপে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা অপেক্ষা রাষ্ট্রে শক্তিশালী হয়ে উঠে ব্যক্তিক ইচ্ছা এবং সরকারের বিশেষ ইচ্ছা। বিশেষত, সরকারের দায়িত্ব যেখানে সাধারণ জনগণের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে প্রতিফলিত করা; সেক্ষেত্রে সরকারের কর্মকর্তা– কর্মচারীবৃন্দ স্বীয় ইচ্ছাকে (ব্যক্তিক ইচ্ছা) প্রকাশ করে সার্বভৌমের ইচ্ছাকে নয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির অংশীদাররূপে একজন নাগরিক বা সাধারণ জনগণের রাষ্ট্র পরিচালনায় যতটা প্রভাব রয়েছে তদাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করে যেসকল ব্যক্তি সরকার পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহনকারীরা। কারণ হিসেবে বলা যায়, একজন রাজকর্মচারী (রুশোর মতে) সরকারের কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের সাথে যেভাবে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে সার্বভৌমের সদস্যরূপ একজন নাগরিক ততটা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না।

রুশো মনে করেন একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যা যত বাড়তে থাকে তাদের জন্য সরকারের দমনমূলক শক্তি তত বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে।[৭৮] কর্মচারীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি ঘটে শাসন তত দুর্বল হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকারের শাসন কেন্দ্রীভূত হওয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যার পরিমান যত বেশি হবে শাসকের সংখ্যা যেন হ্রাস পেতে থাকে। তাহলে আমরা বলতে পারি রুশোর ইঙ্গিত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রে তিনি জনগণের সাধারণ ইচ্ছাকে সরকারের রাষ্ট্রে পরিচালনার জন্য আদর্শরূপে গ্রহণের পক্ষপাতী হলেও বৃহদায়তন জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রে তিনি সরকারের দমনমূলক শক্তির প্রয়োজন বোধ করেছেন।

রুশোর সরকারের আপেক্ষিক শক্তির ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট নয়। কারণ তিনি ঠিক কি ধরণের সরকারকে চেয়েছেন তা পরিস্কার নয়। রুশো বলেছেন, সরকারের কর্মচারীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, তত সরকারের ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। আবার কর্মচারীর সংখ্যা যদি একটি মাত্র হয়, তবে সেখানে সরকারের ইচ্ছা একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিণত হয়ে যায়। সরকারের ইচ্ছার সাথে ব্যক্তির ইচ্ছা সমার্থক হয়ে পড়ে। এসকল বিবেচনায় রুশো আইনপ্রণয়নকারীর প্রজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। রুশোর সরকারব্যবস্থায় তিনি আইন প্রণয়নকারীর প্রজ্ঞার ওপর ভরসা করেছেন এবং তার প্রজ্ঞাকে অপরিহার্য মনে করেছেন। এই প্রজ্ঞাই সরকারের শক্তির সাথে সরকারের ইচ্ছার পারস্পরিক অনুপাতের মাঝে সমন্বয় সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে। মোদ্দা কথা, আইন প্রণয়নকারীর প্রজ্ঞা রাষ্ট্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠাপূর্বক রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মঙ্গল সাধন করবে।

রুশো তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার সরকারের মাঝে যে পার্থক্য টেনেছেন তা হবস ও লক অপেক্ষা ভিন্ন। রুশো কর্তৃক সরকারের শ্রেণিকরণে লক্ষ করা যায় তিনি সাধারণ নাগরিকের সাথে সরকারী কর্মচারীর অনুপাতের ভিত্তিতে গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্র– সরকারের এ তিনটি বিভাজন নির্ধারণ করেছেন।[৭৯] তবে এ তিনটি সরকার ছাড়াও রুশো মনে করেন বাস্তবে রাষ্ট্র যত প্রকারের নাগরিক সরকারও তত প্রকার হতে পারে।

যে রাষ্ট্রে কর্মচারীর সংখ্যা সাধারণ জনগণ (নাগরিকের) অপেক্ষা বেশি সেরূপ সরকারকে গণতন্ত্র বলেন রুশো। অবশ্য সার্বভৌম সরকার নামক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সমগ্র জনতা বা প্রায় সমগ্র জনতার উপর অর্পন করতে পারে। যে রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিকের সংখ্যা সরকারী কর্মচারী অপেক্ষা অধিক সেরূপ সরকারকে তিনি বলেন অভিজাততন্ত্র। অভিজাততান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা গুটিকতক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সরকারী কার্যক্রম একজন ব্যক্তির কাছে কেন্দ্রিভূত থাকে। রাজকর্মচারীগণ একজন ব্যক্তির (যিনি রাজনৈতিক ক্ষমতার

অধিকারী) কাছ থেকে তাদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। রুশো গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মাঝে পরিমাণগত পার্থক্য স্বীকার করেননি।

হবসের রাজতান্ত্রিক সরকারের সাথে রুশো উল্লিখিত রাজতান্ত্রিক সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো সচরাচর রাজতান্ত্রিক সরকারে একজন রাজার শাসন লক্ষণীয়; পক্ষান্তরে, রুশোর রাজতান্ত্রিক সরকারে একই সাথে দুজন রাজার শাসন চলতে পারে। যা প্রকৃত অর্থে অংশীদারিত্বমূলক রাজতন্ত্র।[৮০] এধরণের রাজতন্ত্রের উদাহরণে রুশো উল্লেখ করেছেন প্রাচীন স্পার্টা, রোমান সাম্রাজ্যের। অবশ্য রোমান সাম্রাজে ক্ষেত্রে কেবল দুজন নয় আটজন পর্যন্ত সম্রাটের শাসন একই সময়ে লক্ষ করা গেছে। ব্যাপার হলো আটজন সম্রাট রাজ্য পরিচালনা করলেও সে শাসনব্যবস্থায় কোনো বিভক্তি ছিল না।

ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম সরকার গণতন্ত্র, মধ্যম আকার রাষ্ট্রের জন্য উত্তম হচ্ছে অভিজাততন্ত্র এবং বৃহৎ আকারের রাষ্ট্রের জন্যে রাজতন্ত্র।[৮১] রুশো সরকারের ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিতে সরকারের দুটি (আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ) বিভাগের মাঝে সমন্বয় সাধনের বিরূদ্ধে মত দেন। তিনি মনে করেন, আইন ও নির্বাহী বিভাগের মাঝে যদি ক্ষমতা ঐক্যবদ্ধ রূপ নেয় তবে তা হবে সরকারের অদক্ষতার উৎস। শাসক বা সরকার এবং সার্বভৌম যদি সম্মিলিত হয়ে পড়ে তবে তা রাষ্ট্রের জন্য অনভিপ্রেত হবে। রুশোর এধরণের ভাবনা থেকে এটা স্পষ্ট আইনসভা আইন প্রয়োগ করবে না; কেবল আইন প্রণয়ন করবে আর যারা আইন প্রয়োগ করবে তারা আইন প্রণয়ণ করবে না।

লকের গণতান্ত্রিক চিন্তার সাথে যদি রুশোর তুলনা করি তাহলে দেখব, রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে তিনি সরকার সংক্রান্ত যে আলোচনা করেছেন তাতে তিনি গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন আপাতদৃষ্টে এমনটা বোধ হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুশো তার পক্ষে বক্তব্যও দিয়েছেন। তথাপিও, রুশো মনে করেন যে প্রকৃত বিচারে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা কখনো সৃষ্টি হয়নি এবং তিনি এটাও দাবি করেন, এধরণের গণতন্ত্র কোথাও সৃষ্টি হবে না। এর কারণ রূপে তিনি মনে করেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তির শাসন সংখ্যালঘিষ্ট ব্যক্তি গ্রহণ করবে এটা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ।[৮২] রুশোর এধরণের বক্তব্যে আমরা স্পষ্টতই লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সাথে দ্বিমত দেখতে পাই। রুশো সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক শাসনের বিপক্ষে উল্লিখিত সীমিত অর্থে গণতন্ত্রকে সমর্থন করেন। এতে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ এবং দ্রুততার সাথে কর্ম সম্পাদন সম্ভব হবে। যেমন– ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ। এধরণের রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক তার সকল প্রতিবেশি সম্পর্কে অবগত থাকে। তাছাড়া সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেন হয় সহজ সরল এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহকে বাদ দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক সরকারের আলোচনায় রুশোর যে বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য তাহলো রুশো মনে করেন রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্পদের পরিমাণ যেন অসম না হয়। অর্থাৎ তাদের সম্পদ এবং তা থেকে সৃষ্ট পদমর্যদার মাঝে যেন সমতা থাকে। পাশাপাশি তিনি রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিলাসী জীবনযাত্রাতে নিরূৎসাহিত করেছেন। অবশ্য এর মধ্যেকার সম্পর্ক বেশ স্পষ্ট। বিলাসিতার সাথে বিত্তের একটি সরাসরি সংযোগ রয়েছে। বিত্ত এবং বিলাসী জীবন অসমতার জন্ম দেয়। বিলাসী প্রকৃতি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণির নাগরিকের মাঝে আরো বিশৃঙ্খলা, অধঃগতি তৈরি করে। যা কালক্রমে নাগরিকের ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে; রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখে ঠেলে দেয়।

বিলাসিতা ধনিক শ্রেণিকে আরো বিত্তের বৈভবে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে দরিদ্র শ্রেণিকেও করে তোলে লোভাতুর, সম্পদ বা বিত্তের প্রতি আকৃষ্ট করে। উভয়ক্ষেত্রেই নাগরিকদের বিকৃতি ঘটে। বিকৃতির কারণে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিজীবন থেকে নাগরিকের বিচ্যুতি ঘটে। নাগরিকের স্বার্থসিদ্ধির কারণে বা বিত্ত বৈভবের লোভে

রাষ্ট্রকে বিক্রি, বিনিময়ে দ্বিধা করে না। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হলে ব্যক্তির সামাজিক জীবন হুমকির মুখে পড়ে। রাষ্ট্র থেকে নাগরিকের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। আবার ব্যক্তিগত বিচারে ব্যক্তি বিত্তের কাছে দাস হয়ে পড়ে, প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরের দাসে পরিণত হয়, এতে সকলে পরিণত হয় সকলের ইচ্ছার দাসে। মানুষ তার অন্তরের স্বাধীনতা হারায়।

গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সফলতার জন্য এ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং সাহসের প্রয়োজন। এ ব্যবস্থা অন্য যেকোনো সরকার পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর সামাজিক অস্থিরতা এবং অর্ন্ত:কোন্দলের মধ্যে দিয়ে ধাবিত হয়। এ ব্যবস্থার সাফল্য বা অস্তিত্ব নির্ভর করে নাগরিকের আত্মসচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় অনুমানের উপর। এ সরকার পদ্ধতিতে নাগরিকদের স্বাধীনতা যেমন আছে তেমনি প্রয়োজন নাগরিকের সজাগ দৃষ্টি। রুশো যেরূপ গণতন্ত্রের কথা বলেছেন এবং এ পদ্ধতির যে সমস্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করেছেন তাতে এ পদ্ধতির বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব তা প্রশ্নসাপেক্ষ। এটি অনেকটা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণার মতো। রুশো অবশ্য নিজেও এর ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। তিনি বলেন, "দেবতাদের জাতি বলে যদি কোনো একটি বস্তু থাকত তবেই মাত্র গণতন্ত্র সম্ভব হতঃ দেবতাদের গণতন্ত্র! একেবারে ত্রুটিশূন্য এমন সরকার– ব্যবস্থা মানুষ নামক প্রানীর জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়।"[৮৩]

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমাদের এ দাবি অত্যুক্তি হবে না যে রুশো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থার সফলতা এবং প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা নির্দেশপূর্বক এ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন বা জোরালোভাবে সমর্থন করেননি। আদর্শ রূপে গণতন্ত্র রুশোর কাছে কখনো কখনো গ্রহণযোগ্যতা পেলেও সরকার পদ্ধতিরূপে এটি তাঁর কাছে ছিল অসমর্থিত।

রুশো আদিম সমাজব্যবস্থায় যেমন উত্তর আমেরিকায় আদিবাসীদের সরকারব্যবস্থায় অভিজাততান্ত্রিক পদ্ধতির উল্লেখ দেখতে পান। এধরণের শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল পরিবারের কর্তাগণ রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী নিয়ে পরিবারে পারস্পরিক আলোচনা করত। বয়সে নবীনগণ অভিজ্ঞ বা প্রবীণদের শাসন মেনে নিত। কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবে যে অসাম্য সৃষ্টি হলো তা প্রাকৃতিক অসাম্য অপেক্ষা অধিক। প্রতিষ্ঠানের তৈরি অসাম্যের ফলে বয়স বা অভিজ্ঞতা পপেক্ষা গুরুত্ব পেতে লাগল সম্পদ এবং ক্ষমতা। এমতাবস্থায় অভিজাততন্ত্র একপ্রকার বাছাইমূলক রূপ লাভ করল। কালক্রমে ক্ষমতাও সম্পদের মত এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হতে থাকল। এতে কিছু পরিবার পরিচিতি লাভ করল অভিজাত বা 'প্যাট্রিশিয়ান' বলে এবং সরকারব্যবস্থা হয়ে উঠল বংশগত। রুশো অভিজততান্ত্রিক সরকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন– প্রকৃতিগত, বাছাইমূলক এবং বংশমূলক।[৮৪] প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত– এধরণের অভিজাততন্ত্র আদিম অধিবাসীদের মাঝে দৃশ্যমান হয়। বাছাইমূলক– এধরণের অভিজাততান্ত্রিক সরকারকে তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম বা সেরা সরকার রূপে গণ্য করেছেন। এবং বংশগত (এ ধরণের অভিজাততান্ত্রিক সরকারকে তিনি নিকৃষ্টতম সরকার মনে করেন)।

রুশোর অভিজাততান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় তিনি বাছাইমূলক অভিজাততন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। সে সাথে সম্পদ ও ক্ষমতার মাধ্যমে এ বাছাইকরণ হলেও ক্ষেত্রবিশেষে একজন বিত্তহীন ব্যক্তির কাছে শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে। এতে জনগণের মাঝে সম্পত্তিই উত্তমতার পরিচায়ক এ ধারণার ব্যত্যয় ঘটে।

বাছাইমূলক অভিজাততন্ত্রে কেবলমাত্র সম্পদ এবং ক্ষমতা নয় সেখানে গুণগতদিক থেকে বাছাই করার সুযোগ থাকে। এ ধরণের সরকারের কাছে সততা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এ জাতীয় সদগুণাবলি সমূহের সমাহার ঘটে বলে মনে করেন রুশো; তাই এধরণের শাসক জনগণের সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। উত্তম সরকারও শাসকরূপে বাছাইমূলক অভিজাততান্ত্রিক সরকারকে রুশো উল্লেখ করেছেন। এধরণের পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো সকল নাগরিককেই শাসক রূপে গ্রহণের পরিবর্তে বাছাইকৃত ব্যক্তিবর্গের কাছে শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ

সরকারব্যবস্থায় যে কোনো বিষয়ে দীর্ঘসূত্রিতার পরিবর্তে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। শৃঙ্খলা ও অধ্যাবসায়ের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। এ ধরণের সরকারব্যবস্থা একদল অপরিচিত সাধারণ প্রতিনিধির পরিবর্তে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক সিনেটরের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সুনাম অন্যান্য বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের কাছে উজ্জ্বল হতে পারে। এভাবেই রুশো বাছাইমূলক অভিজাততান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারব্যবস্থার গুনগান করেছেন।[৮৫]

অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থনে রুশো দাবি করেন, "প্রাজ্ঞরা যদি নিজেদের স্বার্থের বদলে জনসাধারণের স্বার্থে শাসনকার্য পরিচালনা করে তবে অভিজাততন্ত্রই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যবস্থা।"[৮৬] বাছাইমূলক অভিজাততন্ত্রেও সফলতার শর্ত উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন–

এ সরকারব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণির মধ্যে সহনশীলতা এবং দারিদ্র শ্রেণির মধ্যে সন্তোষের ভাব থাকে। অভিজাততান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সাম্যের দাবির পরিবর্তে শৃঙ্খলাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন রুশো।

ধনসম্পদের অসাম্য থাকলেও রুশো এরিস্টটলের মতো মনে করেন না ধনিক শ্রেণিরই রাষ্ট্র পরিচালনায় থাকা উচিত; বিত্তবানদের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পিত হওয়া উচিত। এবং তিনি বিপরীতভাবে মনে করেন বিত্তহীন বা দরিদ্র ব্যক্তির কখনো শাসকের দায়িত্ব পাওয়া উচিত। এতে সাধারণ জনগণ একথা উপলব্ধি করতে সমর্থ হবে যে, কেবলমাত্র ধন-সম্পদই কোনো ব্যক্তির উত্তমতার একমাত্র পরিমাপক নয়।

রাজতান্ত্রিক সরকারের চরিত্র বিশ্লেষণে তিনি আইনকে এ সরকারের হাতিয়ার রূপে গণ্য করেছেন । আমরা জানি, রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির বা রাজার কাছে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তিনি তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করার আইনগত অধিকার লাভ করেন। রাজা যদিও রাষ্ট্রের বা সার্বভৌম শক্তির পক্ষ থেকে ন্যায় কাজ করে এবং আইনের দ্বারা রাষ্ট্রে ঐক্যবিধানে চেষ্টা করেন। অবশ্য রাজতান্ত্রিক সরকার বৃহাদাকারের রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত।[৮৭]

গণতান্ত্রিক এবং অভিজাততান্ত্রিক উভয় ব্যবস্থায় কিন্তু কোনো একক ব্যক্তির কাছে নয় যৌথ সত্তার কাছে ক্ষমতা থাকে কিন্তু রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তির কাছে শাসনভার থাকে বিধায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় তার কাছে। জনসাধারণের ইচ্ছা বা শক্তির রাষ্ট্রীয় রূপ এবং শাসকের ইচ্ছা বা শাসনের ব্যক্তিরূপ একত্রিত হয়ে যায় রাজার কাছে। এতে সকল কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ও পরিচালিত হয় একই অভিমূখে। ফলে রাজতান্ত্রিক সরকারে সরকারের জন্য হুমকিসৃষ্টিকারী, ক্ষতিকারক বা ধ্বংসাত্মক এমন কোনো মত, পথ গড়ে উঠতে দেওয়া হয় না। সে অর্থে রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাকে রুশো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যবস্থা মনে করেন। কারণ এতে একজন ব্যক্তি অপর সকলের ইচ্ছার উপর আধিপত্য বিস্তার করে যা অন্য কোনো ব্যবস্থায় সম্ভব না। অবশ্য এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রের জন্য সুখকর নয়। কারণ একজন ব্যক্তির / শাসকের শক্তির যত বৃদ্ধি ঘটে রাষ্ট্রের শক্তি তত দুর্বল হতে থাকে, নষ্ট হতে থাকে। হবস একমাত্র চরমরাজতান্ত্রিক সরকারকে অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন করেছিলেন, লক বা রুশো কেউই এধরণের চরম রাজতন্ত্রকে ে নে নিতে পারেননি। হবস মনে করেন, জনগণের পছন্দমত শাসন পরিচালনার জন্য বিপ্লব এড়ানোর জন্য রাজার কাছে চরম ক্ষমতা উত্তম।

রাজতান্ত্রিক সরকারের বড় অসুবিধা হলো এর স্থিরতা বা ধারাবাহিকতার অভাবের আশঙ্কা।[৮৮] যেমন – একজন রাজা যখন মৃত্যুবরণ করেন অন্য একজন রাজা তাহলে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় তাহলে রাজার নির্বাচন নিয়ে অনেক সময় যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ভূত হয় তাহলে এর ধারাবাহিকতা হুমকির মুখে পড়ে। মধ্যবর্তী সময়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিগণের লোভ, দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, বিদেশী শক্তির হাতে ক্ষমতা যেতে পারে। একপর্যায়ে রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় সবকিছু টাকার বিনিময়ে

ত্রয় বিক্রয় হয়। রাজার ছেলে রাজা হবে বা রাজপরিবার থেকে রাজ উত্তরারিধকারী নির্বাচিত হবে এধরণের ভাবনার ফলে অনুপযুক্ত ব্যক্তি রাজক্ষমতায় আসীন হয়ে পড়ে।

যদিও রুশো মনে করেন একটি অবিমিশ্র সরকার সর্বোত্তম সরকার, কারণ এটি সরল এবং জটিলতাহীন তবে এ ধরণের সরকার পাওয়া দুরূহ। তাছাড়া সব দেশের জন্য সব রকমের সরকার উপযুক্ত নয়। একেবারে ত্রুটিহীন এবং সর্বোত্তম সরকার কোনটি এ প্রশ্নে সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না। জাতির পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী উত্তম সরকার বিভিন্ন হতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, মন্টেস্কুর মতে , স্বাধীনতা (Liberty) সকল দেশের লোকদের পক্ষে সমানভাবে ভোগ করা সম্ভব না । একটি দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিষয় এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।[৮৯] একটি উন্নত দেশের মানুষের স্বাধীনতা উপভোগের মাত্রা আর অনুন্নত দেশের মানুষের স্বাধীনতার উপভোগের পরিধি এক হয় না।

জনগণের উপর সরকার যত বেশি বোঝা ন্যস্ত করবে, যতটা মাশুল আদায় করবে, যার বিনিময়ে তেমন কিছু বা পর্যাপ্ত পরিমাণে সুবিধা জনগণ ফেরত পায়না তত বেশি জনঅসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এভাবে জনগণের সাথে সরকারের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। রুশো বলেন, গণতন্ত্রে জনতার মাথার উপরের বোঝা সবচাইতে কম, অভিজাততন্ত্রে তার চাইতে অধিক এবং রাজতন্ত্রে সেবোঝা সবচাইতে অধিক ভারী। একারণে বলা যায় রাজতন্ত্র কেবলমাত্র একটা সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেই উপযুক্ত; অভিজাততন্ত্রের উপযুক্ত হচ্ছে মাঝামাঝি ধরণের রাষ্ট্র...। গণতন্ত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র আকারের রাষ্ট্রের এবং দরিদ্র প্রকারের মানুষের।”[৯০] রুশো হবসের রাজতান্ত্রিক সরকার সমর্থনের বিরোধিতা করে বলেন, রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনকল্যাণ ও ব্যক্তিকল্যাণ পরস্পর পরিপূরক; এদের একটির শক্তি বৃদ্ধি পেলে অপরটির শক্তি হ্রাস পায়। রাজতান্ত্রিক সরকার (স্বৈরাচারী সরকার) জনগণের মঙ্গলার্থে শাসনের বদলে তার শাসন জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি করে।

সরকার, সার্বভৌম ও সামাজিক চুক্তি

সরকারের বিশেষ ইচ্ছা সার্বভৌমের সাধারণ ইচ্ছার সাথে যত বিরুদ্ধবাদক হয় সংবিধানের তত অবনমন ঘটে। রাজা তথা সরকারের ভূমিকা হয়ে উঠে নির্যাতনকারীরূপে সার্বভৌমের তথা যৌথ ইচ্ছার বিপক্ষে। এধরণের অবস্থার সামাজিক চুক্তির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। এভবে সরকারের সাথে সাধারণ জনগণের এ দূরত্ব সার্বভৌমকে ধ্বংস করে। খুব স্বাভাবিকভাবে সার্বভৌমের অনস্তিত্ব সরকারকে বিলুপ্ত করে। কাজেই শাসক যখন রাষ্ট্রকে সঠিক বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত না করে, স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিজেকে সার্বভৌম মনে করে তাহলে রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য এমনটা মনে করেন রুশো। যখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা শাসকের কাছে চলে আসে তাহলে শাসক–শাসিতের সম্পর্ক হয়ে উঠে প্রভু-ভৃত্যের মতো। এ শাসক তাহলে একজন স্বৈরাচারী রাজা। শাসক যখন স্বৈরাচারী এবং কর্তৃত্ববাদী আচরণ করে জনগণের সাথে তাহলে সামাজিক চুক্তিরই বৈধতা থাকে না। সেটা হয়ে পড়ে অর্থহীন। সামাজিক চুক্তি বাতিল হয়ে গেলে জনগণের আনুগত্যের প্রশ্নটিও বৈধতা হারায়। এভাবে বলা যায় শাসক সার্বভৌম ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার দ্বারা স্বীয় নৈতিক অধিকার হারায়।

একজন রাজা সর্বদাই স্বৈরশাসক হবেন তা অনিবার্য ভিত্তিতে দাবি করা যাবে না, বিশেষত রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠবেন তাহলে যখন তিনি আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে রাজ্য শাসন করেন। এধরণের বক্তব্যের প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি হবসের রাজতান্ত্রিক সরকারে। যেখানে তিনি স্বৈরাচারী রাজাকে মর্যাদা দেননি কিন্তু রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রয়োজন বোধ করেছেন। আবার একই ভাবে প্রাচীনকালে রাষ্ট্রদার্শনিক এরিস্টটলের ‘নিকোম্যাকিয়ান

এথিক্স’ গ্রন্থেও অষ্টম পুস্তকের দশম অধ্যায়ে লক্ষ করা যায় এরিস্টটল স্বৈরশাসক (Tyrant) এবং রাজার মধ্যে পার্থক্য টেনেছেন। স্বৈরশাসক শাসন করে স্বীয় স্বার্থে এবং রাজার শাসন প্রজাদের স্বার্থে।

রুশো ‘Tyrant’ এবং ‘Despot’ এ দুয়ে মাঝে তফাৎ দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতার জবরদখল এবং সার্বভৌম ক্ষমতার জবরদখলের মাঝে পার্থক্য টেনেছেন। রাজকীয় ক্ষমতার জবরদখলকারী হলেন স্বৈরশাসক; যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার জবরদখল করে তিনি ডেসপট। একজন স্বৈরশাসক আইনসঙ্গতভাবে শাসন করার বিধি ভান করে, আইনকে লঙ্ঘন করে শাসন করে। আর ডেসপট নিজেকে আইনের উর্দ্ধে স্থাপন করে। রুশোর মতে, “টাইরান্ট’ ডেসপট হতে পারে না; কিন্তু ‘ডেসপট’ সর্বদাই ‘টাইরান্ট’।[৯১]

রুশো ‘ডেসপট’ বলতে যা নির্দেশ করেছেন তা মূলত হবসীয় সরকারব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। হবসের নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক সরকারে রাজা আইনসঙ্গতভঅবে শাসন করতে পারেন অথবা আইনকে লঙ্ঘন না করে শাসন করতে পারেন কিন্তু হবসীয় শাসক যে আইনের উর্দ্ধে সেটা বলা অত্যুক্তি হবে না। কারণ হবস যখন বলেন, রাজা একজন ‘মরণশীল ঈশ্বর’ যিনি তার কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করেন না বা কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন, প্রয়োজনে তিনি ‘অমরনশীল ঈশ্বর (imortal God)’ এর কাছে জবাবদিহি করতে পারেন। রুশোর কাছে রাষ্ট্র একটি জৈবিক প্রতিষ্ঠান। তিনি রাষ্ট্রের সাথে মানবদেহের সাদৃশ্য টেনেছেন। মানুষের যেমন মৃত্যু ঘটে তদ্রুপ রাষ্ট্রেরও ধ্বংস ঘটে। রুশোর এধরণের মতকে জৈব মতবাদ বলা যায়। তবে রাষ্ট্র যতদিন টিকে থাকবে ততদিন একটা উত্তম সংবিধানের মাধ্যমে তা পরিচালিত করা উচিত। যদিও উত্তম সংবিধান বা সর্বোত্তম সংবিধানেরও শেষ আছে।

হবসের সাথে রুশো এ বিষয়ে সহমত যে রাষ্ট্রের মূলগত অস্তিত্ব এর সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। তিনি আইন বিভাগকে বলেছেন হৃৎপিণ্ড বা রাষ্ট্রের হার্ট, নির্বাহী বিভাগকে রাষ্ট্রের মাথা বা মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক যেহেতু দেহকে পরিচালিত করে সে অর্থে নির্বাহী বিভাগ সরকারের অন্যান্য বিভাগসমূহেকে পরিচালিত করে। তবে রুশো নির্বাহী বিভাগ অপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন আইন বিভাগকে। আইন বিভাগ হৃদপিণ্ড এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হলে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, রুশো নির্বাহী বিভাগকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্কের স্থান দিলেও এর বিকল্প পথ দেখতে চেয়েছেন সেটা কতটা যৌক্তিক। তিনি মনে করেন মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্থ হলেও মানুষ যেমন মৃত্যুবরণ করে না তদ্রুপ রাষ্ট্র। কিন্তু প্রশ্নটা হলো, যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণহীন তার শরীর কতটা নিয়ন্ত্রণাধীন? অনুরূপভাবে, নির্বাহী বিভাগ যদি দুর্নীতিগ্রস্থ হয়, আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা না থাকে তাহলে কেবল আইন প্রণয়ন দ্বারা রাষ্ট্র টিকতে পারে না। যদিও রুশো দাবি করেন রাষ্ট্রের অস্তিত্বশীলতার জন্য বা রাষ্ট্রকে জীবিত থাকতে হলে আইনই শেষ কথা নয় বরং রাষ্ট্র টিকে থাকে তার আইনগত শক্তিতে।[৯২]

রুশোর আইনগত শক্তিকে যদি বৈধ রূপে গণ্য করি তাহলে একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কা থেকে যায়। কোন শাসক কৌশলে বা বলপ্রয়োগের দ্বারা আইনকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করে আইনগত শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের উপর আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

যেহেতু সার্বভৌম অবিভাজ্য তাই রুশো সার্বভৌমের কেবল মধ্যবর্তী বা প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেননি। তিনি কোনো ‘ডেপুটি’ বা জনতার কোনো প্রতিনিধিত্ব এবং সে ডেপুটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ –কোনটিকেই স্বীকার করেননি। এক্ষেত্রে লকীয় সরকার পদ্ধতির সাথে রুশোর চিন্তার সুস্পষ্ট তফাৎ লক্ষণীয়। লক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারব্যবস্থা সমর্থন করেছেন এবং সার্বভৌমকে প্রতিনিধিত্বমূলক ভাবে দেখেছেন। লকীয় সরকারব্যবস্থায় সার্বভৌমের রূপ ও প্রকৃতি হবস এবং রুশোর মতো অতটা জোরালো নয়। *স্যোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের তৃতীয় পুস্তকের ১৫তম অধ্যায়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বভৌমকে রুশো মনে করেন আধুনিককালে প্রতিনিধিত্বের

ধারণাটি এসেছে মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা থেকে। প্রাচীন গ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গ্রিক জনগোষ্ঠী সরাসরি নগররাষ্ট্র পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করত।[৯৩] তাঁর মতে, জনতা যে বিধান নিজেরা ঘোষণা করে না, সে বিধানের কোনো বৈধতা নেই। প্রতিনিধিত্বমূলক সার্বভৌমের বিরোধিতা করে রুশো বোঝাতে চান জনগণ ততক্ষণ স্বাধীন যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা সংসদ সদস্য নির্বাচন করে। কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে জনগণের স্বাধীনতা থাকে না, দাসত্বে আবদ্ধ হয়। এতে জনগণ আর সার্বভৌম থাকে না।

রুশো সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ এ দুটি বিভাগকে স্বতন্ত্র ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠায় জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, নির্বাহী ক্ষমতা আইনগত ক্ষমতা থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। তবে লকের সাথে রুশোর একটি বিষয়ে অমিল যাতে আমরা হবসের সাথে রুশোর সাদৃশ্য পাই– যেমন লক চরম বা চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতা যাকে সবাই মান্য করবে, যা অপরিবর্তিত, অবিভাজ্য– এধরণের বদ্ধ ধারণা পোষণ করেননি বরং লক তার সরকারতত্ত্বে দেখানোর চেষ্টা করেছেন সরকার এবং সার্বভৌম উভয়ই বিভাজ্য ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। পক্ষান্তরে হবসের কাছে একক অবিভাজ্য সার্বভৌমের যে ধারণা তার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় রুশোর।

তবে রুশোর সরকারব্যবস্থার সাথে আইনের সুদৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সরকার পরিচালিত হবে 'নির্ধারিত আইনের ভিত্তিতে' এবং আইন তৈরির কাজ করবে সার্বভৌম। জনগণ সরকারের পরিচালিত করার জন্য প্রতিনিধিগণ মনোনীত করবে। এ সকল প্রতিনিধিগণ আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সরকার শাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। রুশো 'সরকার গঠন প্রসঙ্গে'[৯৪] আলোচনায় যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো কিভাবে একই জনগণ আইনের প্রণয়নকারী এবং পালনকারীতে পরিবর্তিত হয় বা ভূমিকা পালন করে। সরকার আদৌ তৈরি হওয়ার পূর্বে সরকার গঠন করার একটি সরকারী সিদ্ধান্ত কেমন করে গৃহীত হতে পারে এবং জনতা, যে চরিত্রগতভাবে সার্বভৌম তথা শাসক এবং শাসিত, সে নিজেই কেমন করে আইন ঘোষণাকারী এবং আইনের পালনকারীতে পরিণত হতে পারে।[৯৫] এর উত্তরে রুশো বলেন বাহ্যত পরস্পরবিরোধী কাজটি সম্পাদিত হয়, হঠাৎ করে যখন সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়। সাধারণ জনগণ থেকে বিশেষে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ সার্বভৌম, আইন থেকে আইনের প্রয়োগকারীতে পরিণত হয়। এধরণের একটি সম্পর্কের দ্বারা সার্বভৌম জনগণ রাষ্ট্রের নাগরিক থেকে পরিণত হয় শাসন কার্য বাস্তবায়নকারীতে অর্থাৎ নির্বাহী ক্ষমতাধিকারী।

রুশো আইন ও শাসন বিভাগের এ ধরণের পরিবর্তনের দৃষ্টান্তস্বরূপ তৎকালীন ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের উল্লেখ করেছেন যেখানে সংসদের নিম্নকক্ষ সমস্যার আরো বেশি সমাধানের প্রয়োজনে নিজেদের গ্রান্ড কমিটিতে পরিণত করেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ গ্রান্ড কমিটিতে নিজেদের রূপান্তরের দুটি ব্যাপার লক্ষণীয় – প্রথমত সার্বভৌম জনগণ যারা আইন প্রণয়নকারী, সিদ্ধান্ত গ্রহনকরী তারা নিজেদের নির্বাহী কমিটিতে / গ্রান্ড কমিটিতে পরিণত করল। গ্রান্ড কমিটি বা নির্বাহী কমিটি তাদের কাজের রিপোর্ট প্রদান করে 'হাউজ অব কমনস' এর কাছে।[৯৬] হাউজ অব কমনস বা সাধারণ পরিষদ সার্বভৌম রূপে গ্রান্ড কমিটি কর্তৃক যে সকল কাজ সম্পাদিত হত তা সম্পাদন করছে। পুরো প্রক্রিয়াটিকে গণতান্ত্রিক সরকারের সুবিধারূপে মনে করেন যেখানে কোনো অস্থায়ীরূপে গঠিত সরকারকে কাজ আইনানুগভাবে গঠিত সরকার পালন করে।

রুশোর সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা রয়েছে। সরকারের নির্বাহী বিভাগ জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী মাত্র, জনগণের প্রভু নয়। তাই জনগণের অধিকার আছে নির্বাহী বিভাগের সদস্যদের নিয়োগ বা বরখাস্ত করার। জনগণের ইচ্ছাই এখানে মুখ্য। নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে মান্য করা, পাশাপাশি জনগণ তাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছে তা যথাযথভাবে সম্পাদন করা। সরকারের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক এ দায়িত্ব পালন হবে শর্তহীন, প্রশ্নব্যতিরেকে। রুশো নির্বাহী বিভাগকে জনগণের কাছে শর্তহীন, প্রশ্নাতীত দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন এবং জনগণের আদেশ নির্দেশ মান্য করার বাধ্যতা দিয়েছেন। এখানে যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে আসে

তা হলো যে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, স্বাধীন, তারা কি আবার অধীনতার বন্ধনে আবদ্ধ হলো না? জনগণের একটি অংশ অপর অংশের আজ্ঞাধীনে রূপান্তরিত হওয়ার দ্বারা জনগণের সে অংশটি কি তাদের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা হারাল না?

সরকার ও রাষ্ট্রের পার্থক্য

রুশো স্পষ্টভাবে সার্বভৌম বা রাষ্ট্র এবং সরকারের পার্থক্য করেছেন। তার কাছে রাষ্ট্র হলো সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি সামগ্রিক কমিউনিটি এবং তা কাজ করে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সাধারণ ইচ্ছা দ্বারা। আর 'সরকার' হলো সার্বভৌমের ইচছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য একক ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তি সমষ্টি। সরকার কোনো সামাজিক চুক্তিতে সৃষ্ট নয় ডিক্রি দ্বারা সৃষ্ট যার কাজ আইনের প্রণয়ন নয়, প্রয়োগ করা। যে সকল ব্যক্তির উপর এই ক্ষমতা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় এজেন্ট বা অফিসার, যৌথবদ্ধভাবে বা সম্মিলিতভাবে এদের বলা হয় বিচারিক।

যদিও রুশো নির্বাহী বিভাগের এধরণের আচরণ দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন জনগণ সরকার গঠন করে তাই জনগণ কর্তৃক নিযুক্ত সরকারের সাথে তারা চুক্তিবদ্ধ নন সে সরকার বংশগত রাজতান্ত্রিক কিংবা অভিজাততান্ত্রিক যা হোক। বরং জনগণ তাদের ইচ্ছামত সরকারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে রুশোর ভাষায় "জনতা প্রভু, তার নিযুক্ত সরকার তার কর্মচারী।"[৯৭] রুশো যখন জনতাকে প্রভু বলে সম্বোধন করেন ও এত কিন্তু প্রকারান্তেরে এক কর্তৃত্ববাদী ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রভু-কর্মচারীর এ সম্পর্ক গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় যত সমানাধিকার তথা সমতা, ন্যায্যতার বুলি আওড়ানো হোক না কেন প্রকারান্তারে তা স্তরায়িত সমাজেরই প্রতিফলন মাত্র।

সরকার পরিবর্তনের বিষয়ে হবস, লক ও রুশো সহমত পোষণ করে বলেন জনগণের স্বার্থের বিরোধী না হওয়া পর্যন্ত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন কাম্য নয়। রাষ্ট্র শাসনের জন্য সরকারের নির্বাচিত রূপকে সর্বদা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন রুশো। তিনি কোনো বেসামরিক তথা সুশীল সমাজ কিংবা সামরিক শক্তির কাছে রাষ্ট্রক্ষমতার ভার অর্পণ করতে চাননা। তাছাড়া রাষ্ট্রের সুশাসনের ব্যাপারে সরকারের স্বৈরাচারিতা প্রতিরোধকল্পে জনগণকে কোনো গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের প্রতি যেমন সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তেমনি শান্তি রক্ষার্থে ও আইন ভঙ্গকারীর প্রতি অতি নমনীয়তা প্রদর্শন উচিত হবে না। রুশো পূর্ববর্তী দুইজন চুক্তিবাদী (হবস ও লক) অপেক্ষা সরকার পরিবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন, সেটা হবে জনগণের ভোটে।

রুশোর সরকারব্যবস্থায় জনগণ ও সার্বভৌম ক্ষমতা অভিন্ন। রাষ্ট্রে যে কোনো মৌলিক বিধি বিধান, এমন কি সামাজিক চুক্তির মত বিধানকেও সার্বভৌম তথা জনগণ পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী নাগরিক তার সে আনুগত্যের ব্যত্যয় ঘটাতে পারে। নাগরিক তার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ও প্রাকৃতিক সম্পত্তির প্রতি অধিকার পুনরায় ফেরত নিতে পারে। এধরণের বক্তব্যে মনে হতে পারে একজন নাগরিক তার স্বীয় ইচ্ছামত চুক্তি লঙ্ঘন করতে পারে বিংবা চুক্তির বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। এর প্রতি উত্তরে রুশোর অভিমত "... সম্মিলিত নাগরিকরা সম্মিলিতভাবে যে কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম, সে কাজ বিচ্ছিন্নভাবে একজন নাগরিক সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, এমন কথা আদৌ ভাবা যায় না।"[৯৮] এর অর্থ হলো জনগণ সরকারের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের বিষয়ে সম্মিলিত মতের বাইরে গিয়ে এককভাবে অবস্থান নিতে পারে না। নাগরিকের যৌথাবস্থাই তাদের শক্তির উৎস। কারণ নাগরিকের সম্মিলিত ইচ্ছাসমষ্টি মূলত একটি মাত্র ইচ্ছাকেই প্রকাশ করে।

তবে রুশো সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণার পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। সচরাচর মনে করা হয় যে রুশো সাধারণ ইচ্ছার সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা সাদৃশ্যময়, অভিন্ন। কিন্তু তার লেখনীতে ঠিক এমনটা প্রমাণ মেলে না যেখানে তিনি সাধারণ ইচ্ছার সাথে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার ভিন্নতা দেখেছেন। সাধারণ ইচ্ছাকে বুঝতে বা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা ভুল হতে পারে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবজ্ঞা করার দুঃসাহসও দেখাতে পারে।[৯৯]

রাষ্ট্র বলতে রুশো বুঝিয়েছেন সমগ্র গোষ্ঠীকে যা রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালনা করে। এটি কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের সম্মিলন নয়। রাষ্ট্রের নৈতিক দিক রয়েছে। রাষ্ট্র একই সাথে প্রাকৃতিক তথা স্বাভাবিক এবং নৈতিক আবেগের সাথে যুক্ত। রুশোর কাছে রাষ্ট্র সমাজের কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন নয়, বরং রুশোর কাছে রাষ্ট্রের ধারণাটি ব্যবহৃত হয়েছে রাজনৈতিক সম্প্রদায়, অথবা সামগ্রিক অর্থে সমাজ সংস্কৃতির সমার্থক রূপে। যদি এধরণের বক্তব্যকে গ্রহণ করা হয় তাহলে রুশোকে সর্বাত্মকবাদের অভিযোগ থেকে যেমন অব্যাহতি দেওয়া যায় একই সাথে রাষ্ট্রের জৈব মতবাদের সমর্থকরূপে আমরা তাকে পাই। প্লেটোর মতো রুশো সমাজ এবং রাষ্ট্রের মাঝে তফাৎ দেখেননি, বরং তিনি যে মৌলিক ভিত্তির পার্থক্য টেনেছেন তা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর রাজনৈতিক সমাজের অবস্থান।[১০০]

রুশো যে ধরণের সরকারব্যবস্থার সমর্থন করেছেন একে বলা যায় 'অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (participatory democracy)'।[১০১] রুশোর এধরণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, তাঁর এ রূপ সরকারব্যবস্থায় ব্যক্তির একক সত্তা হিসেবে অংশগ্রহণের বিষয়টি অধিকতর স্পষ্ট বিশেষত রাজনৈতিক আলোচনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একই সাথে ভিন্নমত পোষণকারী বা সংখ্যালঘুদেরও সুযোগ থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, রুশোর মতে সার্বভৌম ক্ষমতার সকলের যে নির্বাহী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্ভব নয় এ বিষয়টিকে একটি প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বিচার করা উচিত। কারণ স্বাভাবিকভাবে জনগণের প্রত্যেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় না। কিন্তু যদি আমরা সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি বাদ দিই তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তির আইন বিভাগীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে নিয়ন্ত্রিত করার কোনো কারণ থাকতে পারে কি। যদি রুশোকে অনুসরণ করি তাহলে সম্ভবত সকল নাগরিকেরই প্রশাসন পরিচালনার সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অংশগ্রহণ থাকা উচিত। প্রশাসন বিশেষত যখন রুশো মনে করেন যুদ্ধ ঘোষণার মত কাজ হলো শাসন বিভাগের, সার্বভৌমের নয়।

রুশোর প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মতো এধরণের ব্যবস্থাতেও প্রশ্ন আসতে পারে এ ব্যবস্থা বর্তমানে বাস্তবায়নযোগ্য কি না। বাস্তবতা বিচারে বলা যায় রুশো বর্ণিত সরকারব্যবস্থার সীমাবদ্ধ অতিক্রম করে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন সম্ভব, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার দ্বারা, প্রযুক্তিগত সহায়তার দ্বারা সকল ব্যক্তির গণজমায়েতের প্রয়োজন অপরিহার্য আজ আর নয়। ব্যক্তিই প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা তার মত অংশগ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারে। এতে ব্যক্তি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন মত প্রদান করতে পারে তেমনি অন্যান্য যে সকল বিষয়ে ব্যক্তির মত গ্রহণ প্রয়োজন বা যেসব বিষয় বিশেষত জীবনকে প্রভাবিত করে তেমন বিষয়সমূহেও তার বাসা বা কর্মস্থলে থেকেও মত প্রদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাগরিকের দায়িত্ব

রুশো মনে করেন শাসনব্যবস্থা বা সরকার পরিচালনার জন্য বিশেষ ধরণের ব্যবস্থার বা অনুশীলনের প্রয়োজন।[১০২] প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে আদর্শ রাজার জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু প্লেটোর মতো রুশো এটা মনে করেন না যে এধরণের প্রশিক্ষণ গুটিকতক মানুষের পাওয়া উচিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকে যদি

যথার্থ শিক্ষা লাভ করে তবে তারা দক্ষতার সাথে সার্বভৌমের অংশ হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে। সার্বভৌম প্রত্যয়টিকে রুশো ব্যবহার করেছেন সামষ্টিক নাগরিকদের উপর যাদের নিজেদের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। যা হোক রুশোর গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় তিনি নাগরিকের শিক্ষার উপর বেশ গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে রুশোর নাগরিকদের তিনি যে শিক্ষা দান করার কথা বলেছেন তা যেন সমাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে না হয়।[১০৩] নাগরিকত্ব বলতে রুশো মনে করেন সক্রিয় জনসেবা। সরকারি কাজের পাশাপাশি জনগণকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিকের আইনসভা সৃষ্টিতে ভূমিকা থাকে।[১০৪]

সাধারণ ইচ্ছা এমন নীতি প্রণয়ণ করে বা গ্রহণ করে যা সকলের অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের স্বার্থের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কাজেই সাধারণ ইচ্ছার সাথে সাধারণ স্বার্থ যুক্ত থাকে। তাছাড়া রুশো নিজেই বলেছেন সাধারণ ইচ্ছা অবশ্যই 'general in its object as well as its essence'.[১০৫] এতেই বোঝা যায় সাধারণ ইচ্ছা সকল নাগরিকের স্বার্থের সাথে সমানভাবে যুক্ত এবং প্রযোজ্য এটি বিষয়গত হবে না নৈর্ব্যক্তিক হবে সাধারণ ইচ্ছার কাছে রুশো সরকার পরিচালনার্থে কেবল আইন প্রণয়ণের ভার দিয়েছেন যাতে সকল নাগরিক এ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হতে পারে। অন্যদিকে নির্বাহী আদেশ সমূহ জারি হয় একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কর্তৃক কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি গোষ্ঠীর জন্য। তাই এ ক্ষেত্রে আপামর সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের সাথে যুক্ত হতে পারে না। তবে রুশো কর্তৃক উল্লিখিত আইন প্রণয়ণে সাধারণ ইচ্ছার সক্রিয় অংশগ্রহনের একটি অর্ন্তনিহিত তাৎপর্য হলো এধরণের আইনের দ্বারা জনগণের কাছে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা রয়েছে কোনো অত্যাচারী রাজাকে ভোট না দেওয়া অথবা অপ্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন না করা অন্যথায় এধরণের আইন দ্বারা জনগণই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এভাবেই সরকার পরিচালনার অংশরূপে আইন প্রণয়ণকারী জনগণ সার্বভৌমের ইচ্ছার প্রতিফলন সংরক্ষণ উপযোগী আইন প্রণয়ণ দ্বারা গণ-সংশ্লিষ্ট সরকারে যুক্ত থাকে।

এবার আসা যাক, আইনের বাস্তবায়ন তথা প্রয়োগ প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে রুশোর জবাবটি গুরুত্বপূর্ণ, তাঁর মতে আইনের প্রয়োগ ঘটানো বা আইনকে কার্যকর করার দায়িত্ব সার্বভৌমের নয়। এ কাজ হলো সরকারের শাসন বিভাগের। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হলো, তাহলে কি রুশো সরকারের শাসন বা নির্বাহী বিভাগকে সার্বভৌমের অংশ মনে করেননি? এ বিভাগের জনগণ সাধারণ ইচ্ছার অংশ নয়, প্রতিনিধিত্ব করে না? সকল জনগণ যদি আইন প্রণয়ণে অংশ নেয় তবে আইন প্রয়োগের জনগণ নিশ্চয়ই আইন সভার মধ্যে থেকে নির্বাচিত কোনো গোষ্ঠী নয় কি? যদি তা না হয় তাহলে এ গোষ্ঠী সাধারণ ইচ্ছার বাইরে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী কি? তাহলে এ গোষ্ঠী বা নির্বাহী বিভাগ কি বিশেষ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী?

অবশ্য শাসন বিভাগের এধরণের অবস্থান প্রসঙ্গে রুশোর মত হলো– আইন সভার মতো সকল সদস্যের অংশগ্রহণে শাসন বিভাগের কার্যাবলী গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত করার বিষয়টি অনেকটা হাস্যকার; উদ্ভট। জনগণের এধরণের সামগ্রিক অংশগ্রহণের পরিবর্তে তিনি গণতন্ত্রের এক বিশেষ ধরণের রূপকে সমর্থন করেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন নির্বাচিত অভিজাততন্ত্র (elected aristocracy)। রুশো দাবি করেন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানীদের উচিত অধিকাংশ জনগণকে পরিচালনা করা, যখন এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে তারা তা করবেন অনেকের কল্যাণের স্বার্থে, স্বীয় লাভের জন্য নয়।[১০৬]

রুশোর চিন্তার এ স্থলে আমরা প্লেটোর সাথে তাঁর পার্থক্য লক্ষ করি। রুশোর শাসকের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা নেই, কিন্তু প্লেটোর দার্শনিক রাজা আইন প্রনয়ণ করতে পারেন। রুশো যখন বলেন সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তিরই অনেককে পরিচালনা করা উচিত। এস্থানে কিন্তু রুশো উল্লিখিত সরকারব্যবস্থায় আমরা এক প্রকার সংরক্ষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করি। সে সাথে লক্ষ করি সরকারের সীমাবদ্ধতা যাতে সরকার আইন তৈরি করবে না বাস্তবায়ন করবে অথবা তদারকি করবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে রুশোর কাছে সরকার ও সার্বভৌম ভিন্ন। আবার প্রশ্ন থেকে

যায়, যখন রুশো বলেন সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার আছে। এধরণের একটি সুনির্দিষ্ট কাজ ও ঘোষণার অধিকার তিনি সরকারকে দিয়েছেন (যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে)। আইন প্রনয়ণের দায়িত্ব প্রাপ্ত নয় সার্বভৌম। সার্বভৌম সার্বিক পরিস্থিতি সরকারের কাছে ছেড়ে দিতে পারে, সরকার নির্ধারণ করবেন কোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধ ঘোষনা করা যাবে।

সার্বভৌমের কাছে আইনগত ক্ষমতা ছাড়া কোনো ক্ষমতা না থাকার দরুন সার্বভৌমকে তার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতে হয় আইনের দ্বারা। আইন বলতে রুশো যা বুঝিয়েছেন তা হলো সাধারন ইচ্ছার যথাযথ প্রকাশ। জনসম্মিলন বা সম্মিলিত জনগোষ্ঠীই সার্বভৌমের অস্তিত্বের ধারক-বাহক।[১০৭] ভলফ মনে করনে, এভাবেই সমকালীন গণতন্ত্র থেকে রুশোর পদ্ধতি ভিন্ন।[১০৮]

রুশোর সরকারব্যবস্থা প্রণীত হত জনসম্মিলনে (popular assemblies), কোন সংসদে নয়, যার বিপরীত চিত্র আমরা লক্ষ করি সমকালীন গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিতে। বলা বাহুল্য, রুশোর এধরণের জনসম্মিলনীতে সাধারণ ইচ্ছার আর্বিভাব হয়। যদিও রুশোর জনগণের সম্মিলন সম্পর্কে জনাথন ভলফ সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১০৯]

রুশোর সাধাাণ ইচছা (assembly of people) এর মাধ্যমে সরকারের আইন প্রনয়ণে আমরা প্রাথমিকভাবে একটি রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সুপ্ত প্রয়াস লক্ষ করি। এ সকল জনগণ কেবল আত্ম স্বার্থবোধে তাড়িত না হয়ে একটি সার্বিক ইচ্ছার অধীনে সকল ব্যক্তি সমভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। প্রণীত আইনের সাহায্যে সকল জনগণ সমানভাবে প্রভাবান্বিত হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো শ্রেণি বৈষম্যের প্রশ্ন থাকেনি। শ্রেণি বৈষম্যের প্রশ্নটিকে রুশো নিজেই রুদ্ধ করেছেন। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রে কোন বড় ধরণের অসাম্য থাকবে না। কোনো নাগরিক এতটা ধনী হবে না যাতে সে অন্যকে ক্রয় করতে যাবে আবার এতটাও দরিদ্র হবে না যাতে সে অন্যের কাছে নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।[১১০] তাঁর এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে শ্রেণি বৈষম্য সাধারণ ইচ্ছার অসম্ভাব্যতা সৃষ্টির কারণ হতে পারে, সে শ্রেণি বৈষম্যেরই তিনি অবলুপ্তি চেয়েছেন। রুশোর উপযুক্ত বক্তব্যে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রসঙ্গে আমরা ভোটের বিষয়টির সংযোগ পাই যাতে জনগণ অতি ধনী বা দরিদ্র হয়ে ভোট ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা স্বীয় নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত না হয়। যদিও একটি শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় রুশো *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেননি তবে এটা স্পষ্ট যে গণতন্ত্রের জন্য শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

রুশো সাধারণ ইচ্ছার অসফলতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে দোষারোপ করেন না বরং বৃহৎ সংগঠনের বিপক্ষে ছোট সংগঠন ও ষড়যন্ত্রকে দায়ী করেছেন। একটি উদাহরণের সাহায্য বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়– ধরা যাক, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০০ কর্মচারী রয়েছে। তাদের মাঝে ১০ লক্ষ টাকা এক হাজার জন কর্মচারীর মাঝে ভাগ করে দেওয়া হবে। এক হাজার কর্মচারীর প্রতিনিধিত্বকারী একটি ট্রেড ইউনিয়ন না হয়ে একাধিক হয়ে থাকলে উক্ত সংখ্যক কর্মচারী একাধিক ইউনিয়নে বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে একেকটি ট্রেড ইউনিয়ন সমগ্র এক হাজার জনের প্রতিনিধিত্ব না করে একশ জনের জন্য নাম প্রস্তাব করে তাহলে প্রাপ্তির সংখ্যাটা ভিন্ন হবে এবং অবশ্যই সকলের স্বার্থ রক্ষিত না হয়ে একটি গোষ্ঠী লাভবান হবে অন্যেরা বঞ্চিত হবে, এধরণের পরিস্থিতির দায় নিশ্চয় ট্রেড ইউনিয়নের যারা কর্মচারীদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করে এবং আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে তাদের।

এ দৃষ্টান্তটিকে যদি রাজনৈতিক সমাজে ভোটদান প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করি তালে একটি স্বার্থান্বেষী সুবিধাভোগী গোষ্ঠী (interest group) পাই। জনগণ ভোট প্রদানের সময় যখন সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য কাজ করে, ভোট দেয়; তাহলে সে আর সাধাণ ইচ্ছার প্রকাশ করে না, বিশেষ ইচ্ছার হয়ে কাজ করে। এভাবেই রুশো তার

সরকারব্যবস্থায় কোনো রকম উপদল (section), রাজনৈতিক দল ইত্যাদি নিষিদ্ধ করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন বিশেষ ইচ্ছা যদি সাধারণ ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে তাহলে ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা সামষ্টিক স্বার্থ বাধা প্রাপ্ত হয়।

কেন জনগণ সাধাণ ইচ্ছার প্রতি আস্থাপোষন করে, শ্রদ্ধাশীল হবে, সাধারণ ইচ্ছাকে ভোট দেবে স্বীয় স্বার্থের বিপরীতে। এ প্রশ্নের সমাধানকল্পে রুশো যে কয়টি প্রস্তাব দিয়েছেন তাতে অন্যতম হলো নাগরিক সদগুণ সৃষ্টির জন্য শিক্ষা, পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের লালন এসবের দ্বারা একটি দৃঢ় সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব যা সাধারণ ইচ্ছাকে শক্তিশালী করতে পারে। রুশোর সরকারব্যবস্থায় সাধারণ ইচ্ছার এধরণের সর্বব্যাপক উপস্থিতি দেখে সচরাচর একে সর্বাত্মকবাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রূপে গণ্য করা হয়। এধরণের অভিযোগের উত্তরে বলা যায়– রুশো হয়ত ধরে নিয়েছেন যে সমাজের মধ্যে জনগণকে একত্রিত করার জন্য প্রজ্ঞা ও ঐতিহ্য এর বন্ধন রয়েছে তা সাধারণ ইচ্ছা কর্তৃক প্রনীত এই আইনকে গ্রহণে সহায়ক। শিক্ষা এক্ষেত্রে সমাজের মাঝে ঐক্যবদ্ধকরণ ও আকারগত ভিত্তি প্রদানের সূত্ররূপে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তিগোষ্ঠীর উপর একই কৃত্রিম আদেশ চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে।

দ্বিতীয়ত, রুশো সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার জন্য প্রস্তাব করেন নিয়ন্ত্রণারোপ এবং সিভিল ধর্মের। সামাজিক অনুভূতিসমূহ ব্যতীত একজন মানুষ সুনাগরিক এবং বিশ্বস্ত প্রজা হতে পারে না।[১১১]

রুশো মনে করেন গণনৈতিকতার সাথে সমন্বিত রেখে জনগণকে কাজে উৎসাহিত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এর ভূমিকা হবে জনগণকে নৈতিকভাবে কাজ সম্পাদনে উৎসাহিত করা। নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হবে ব্যক্তির নৈতিক জীবন বিধান তৈরিতে সহায়ক শক্তি রূপে। এটি কোনো ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য আরোপিত হবে না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, রুশোর নিয়ন্ত্রণারোপের উদ্দেশ্য জনগণকে অ-সামাজিক আচরণ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করা। নিয়ন্ত্রণারোপের মাধ্যমে রুশো চেয়েছেন সামাজিক বা জনগণের নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে।

রুশোর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে তিনটি দিক রয়েছে।[১১২] প্রথমত, নাগরিকের ধর্মের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত যাতে নাগরিকের স্বীয় কর্তব্যেও প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়,

দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে ধর্মীয় বৈচিত্র্য গৃহীত হবে। অন্যথায় ধর্ম নাগরিকেদের একটি অংশকে অপর অংশের শত্রুতে পরিণত করে, যা সামাজিক শান্তি বিনষ্টের কারণ হবে।

সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ব্যক্তিগত নৈতিকতার কারণেও প্রত্যেক ব্যক্তির সিভিল ধর্মের সাথে যুক্ত থাকা উচিত।

রুশো হবসের মতো অখণ্ড সার্বভৌমে বিশ্বাসী, যা লকীয় চিন্তার বিপরীত। রুশোও মনে করেন, সার্বভৌম ক্ষমতা হলো একক এবং অবিভাজ্য। সার্বভৌম ক্ষমতা যদি বিভক্ত করা হয় তবে তা ধ্বংস হবে। একটি নগর একটি জাতির মতো অন্যের অধীনস্থ হতে পারে না। নগর বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে আনুগত্য এবং স্বাধীনতার ওপর। যদিও রাষ্ট্র এবং নাগরিকের অনুপাত সম্পর্কে রুশোর ভিন্ন মত রয়েছে। তথাপিও রুশো মনে করেন একাধিক শহরকে একটি নগর বা নগররাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত করা সবসময় ক্ষতিকারক। বৃহদায়তনের ক্ষেত্রে কোনো একটি শহরকে রাজধানী করার পক্ষাপাতী নন রুশো। তিনি কোনো একটি বিশেষ রাজধানীর পরিবর্তে বিভিন্ন নগর বা শহরগুলো হতে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সম্পাদনে মত দেন। তার মত আধুনিককালের রাষ্ট্রসমূহের নগরায়নের বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাশাপাশি রাষ্ট্রের সকল মানুষকে নিয়ে কর্মযজ্ঞে এগিয়ে যেতে হবে। রুশো একটি শক্তিশালী সরকারের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন– রাষ্ট্রের জন্য জনসংখ্যার ঘনত্বের সমবন্টন এবং রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অংশে মানুষের জন্য যথার্থ জীবন এবং প্রাচুর্যের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমেই একটি জাতি, একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সুশাসিত হতে পারে।"[১১৩]

সাধারণ জনগণের কাছে যখন সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে তাহলে সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং কোনো এক অত্যন্ত সাধারণ নাগরিকও নির্বাহী ক্ষমতাবলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সরকার নাগরিকের সম্মিলিত অভেদ্য ধর্ম যা রাষ্ট্রের অভেদ্য বর্ম তাকে অস্বীকার করতে পারে না, বরং সরকার তাহলে সম্মিলিত জনতার ভয়ে ভীত। বিপরীতদিকে, জনতা যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, ভীরু এবং দুর্বল হলে সরকার জনগণ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী এবং স্বৈরাচারী হয়ে থাকে। জনগণের প্রতিরোধহীনতা জনতাকে অক্ষম করে তোলে। জনগণের শক্তির অক্ষমতা দুর্বলতার রেশ বহন করে রাষ্ট্র তথা সার্বভৌম শক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। এতে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটে বা ধ্বংস হয়।

রাষ্ট্রের জনগণ যদি রাষ্ট্রের সুরক্ষার প্রশ্নে এগিয়ে না আসে, সরকারের কাছে অর্থ মুখ্য হয়ে ওঠে তাহলে অলসতা এবং অর্থশক্তি এ দুয়ে মিলে রাষ্ট্রকে একটি বিষয়যোগ্য বস্তুতে বিবেচনা করে। অলস নাগরিক কালক্রমে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। রুশো মনে করেন একটি প্রকৃত স্বাধীন দেশে নাগরিকগণ নিজের হাতেই কাজ করে, অর্থের বিনিময় তারা কাজের চিন্তা করে না। দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির জন্য অর্থপ্রদানের বদলে দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থপ্রদানকে তারা উত্তম বলে মনে করে।'[১১৪] রুশোর এ বক্তব্যে তিনি প্রকারান্তরে কোনো দেশের ট্যাক্স বা কর সংক্রান্ত বিষয়ের ইঙ্গিত করেছেন। তার কাছে স্বাধীনতার জন্য ট্যাক্স প্রদান অপেক্ষা শ্রম প্রদানের বিধান কম ক্ষতিকর। একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রের জনগণের কাছে যৌথস্বার্থই মুখ্য বিবেচিত হয়। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে তারা যৌথ দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী হয়। ব্যক্তি স্বীয়চেষ্টায় কেবল স্বীয়সুখ অন্বেষেন না করে সকলের ইচ্ছার প্রতিফলনে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। জনগণের এ যৌথবদ্ধতার বোধটি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখে যা রাষ্ট্র এবং সার্বভৌমের জন্য মঙ্গলজনক। সরকারের প্রতি যদি জনগণের এ যৌথবদ্ধতা না থাকে তাহলে তারা সরকারের কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে না। সরকার কর্তৃক এমন কোনো পরিস্থিতিরি উদ্ভবের ফলে জনগণ যদি মনে করে তাদের সাধারণ ইচ্ছার কোন মূল্য নেই সরকারের বিশেষ ইচ্ছা বা ব্যক্তিস্বার্থ অপর সকলের স্বার্থকে অবজ্ঞা করে তাহলে জনগণ সে সরকারের ডাকে যোগদানের আগ্রহ হারায়। রাষ্ট্রের বিষয়ে নাগরিকের এই নির্লিপ্ততা থেকে মনে হয় রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থের বিষয়ে তার কোনো দায়দায়িত্ব বা করণীয় নেই, তাহলে রাষ্ট্রের ধ্বংস শুরু হয়। নাগরিকের এধরণের আচরণ দেশপ্রেমিক নাগরিকের আচরণ নয়। নাগরিকের দেশপ্রেম যত বিলুপ্ত হবে আত্মস্বার্থবোধ তত তীব্র ও শক্তিশালী হবে।[১১৫] আবার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বৈধ সরাসরি উদ্দেশ্যমূলক পরিপ্রেক্ষিতে যাতে বৃহত্তর অর্থে সমাজ উপকৃত হয় বা সার্বিক জনকল্যাণের গুরুত্বপূর্ণ শর্তরূপে কাজ করে।[১১৬]

গণতন্ত্রের সমর্থক ধারাটি মনে করে গণতন্ত্র হলো সরকারব্যবস্থা পরিবর্তনের শান্তিপূর্ণ উপায়। যে সরকারের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অসন্তুষ্ট এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় জনগণ কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সরাসরি উপলব্ধি অপেক্ষা সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টির বিচারে পরিবর্তন ঘটায়। যেমন– হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদানটি গুরুত্ব পেয়েছে যার ব্যর্থতা সরকার পরিবর্তন ঘটায়। যদিও সমকালীন রাষ্ট্রচিন্তায় হবস বা লকীয় সরকার ও রাষ্ট্র চিন্তার কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। যেমন– রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়টি মুখ্য থাকে না যখন রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। যেটা এনকাউন্টার কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ হত্যা বিভিন্ন রূপে হতে পারে। সামজিক চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট রাজনৈতিক সমাজে সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রের হাতে আইন প্রনয়ণ ও প্রয়োগের ক্ষমতা আসে। তবে পরবর্তীকালে বিশেষত বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র সরকার বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো রক্ষকগোষ্ঠী সমূহও জনজীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নে স্বচ্ছ ও দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি।

তথ্যনির্দেশ

১. Anthony Quinton (ed.), *Political Philosophy*, Oxford University Press, London, 1969, p. 12.

২. Ernest Barker, *The Politics of Aristotle*, The Clarendon Press, Oxford, 1961.

৩. Thomas Hobbes, *Leviathan*, A. P. Martinich, and B. Battiste (eds.), Revised Edition, Part II, Ch. XXV, Broadview Press, Canada, 2011.

৪. Thomas Hobbes, *De Cive: On the Citizen*, R. Tuck and M Silver Thorne (Edts. and Trans.), Cambridge University Press, Cambridge, Reprint, 2003, p. 150.

৫. Thomas Hobbes, *The Elements of Law: Natural and Politic,* Gaskin JCA (ed.), Reprint, Oxford University Press, 1999, p.90.

৬. Hobbes, *Leviathan*, Ch. 30, p. 296.

৭. ননী ভৌমিক (অনূ.), *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, খণ্ড ২, আধুনিক কাল, অবসর প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭৩।

৮. *প্রাগুক্ত*।

৯. Hobbes, *Leviathan*, Ch. 30, "of the office of the Sovereign Representative", pp. 286-302.

১০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন,

Michael Oakeshott, "Introduction to Leviathan" in *Hobbes On Civil Association*, University of California Press, Berkeley, 1975, pp. 62-63.

Howard Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Clarendon Press, Oxford, 1957, pp. 180-88.

A. E. Taylor, "The Ethical Doctrine of Hobbes", in K. C. Brown (ed.), *Hobbes Studies*, Harvard University Press, Cambridge, 1965, pp. 45-49.

১১. Susan Moller Okin, "The Sovereign and His Counsellors': Hobbes's Reevaluation of Parliament" in *Political Theory,* Deborah Baumgold,1982, p. 101.

১২. Absolutist Constitution হল- এমন সংবিধান যাতে সার্বভৌমের ক্ষমতা জনগণকে রক্ষা করতে যথেষ্ট।

১৩. Hobbes, *De Cive*, Ch.18, p. 140.

১৪. Deborah Baumgold, *Hobbes Political Theory*, Cambridge University Press, New York, 1988, p. 106.

১৫. Hobbes, *De Cive*, Vol. 17, p. 102.

১৬. Baumgold, *Hobbes Political Theory*, p. 124.

১৭. Hobbes, *Leviathan*, Ch. 30.

১৮. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory*, Thomas Nelson & Sons Ltd., 1971, p. 221.

১৯. Hobbes, *Leviathan*, p. 176.

২০. Macfarlane, *Modern Political Theory*, p. 222.

২১. *Ibid.*

২২. *Ibid.*

২৩. Howard Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, pp. 57.

২৪. *Ibid.*, pp. 5-6.

২৫. Karl Marx & Frederich Engels, *Collected Works*, Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1975, P. 128-129.

২৬. ননী ভৌমিক (অনূ.), *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, পৃ. ৭৬।

২৭. *প্রাগুক্ত*।

২৮. D Fellman, *Ideology and Modern Politics*, New York, 1971, pp. 28-29.

২৯. C.B. McPherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, Reprint, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 100-101.

৩০. বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, “Hobbes and Hobism”, Sterling Lamprecht, in *The American Political Science Review*, Vol. 34, 1940, p. 31.

৩১. John Locke, *Second Treatise*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967, §§ 149, p. 384.

৩২. *Ibid.*, §§ 150, p. 385.

৩৩. Locke, *Second Treatise*, §§ 149.

৩৪. *Ibid.*

৩৫. *Ibid.*, §§ 156. p. 389.

৩৬. Willmoore Kendall, *John Locke and the Doctrine of Majority-Rule*, University of Illinois Press, Urbana, 1959, pp. 89-131.

৩৭. Locke, *Second Treatise*, §§ 160, p. 343.

৩৮. S. 164.

৩৯. Locke, *Second Treatise*, Ch. XIV, §§ 164, p. 395.

৪০. Locke, *Second Treatise*, §§ 165, p. 396.

৪১. Karl Marx, *Capital*, Vol. 4, Theories of Surplus-Value 3, Part -1, 1975, p. 367. (রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস, পৃ, ১০১, আধুনিককাল)

৪২. G. G. Sartori, "Constitutionalism: A Preliminary Discussion", *American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4, 1962, p. 224

৪৩. *Ibid.*, §§ 75, p. 336.

৪৪. Locke, *Second Treatise*, §§ 76, p. 336.

৪৫. *Ibid.*, §§ 95,97, 98, pp. 349-351.

৪৬. *Ibid.*, §§ 99, pp. 351.

৪৭. *Ibid.*

৪৮. *Ibid.*, §§ 96, pp. 349-350.

৪৯. Macfarlane, *Modern Political Therory*, Nelson, 1972, p. 227.

৫০. Locke, *Second Treatise*, §§ 95, pp. 348-349.

৫১. ii, S. 99.

৫২. C. B. Macpherson, Op. Cit. in Macfarlane, p. 227.

৫৩. Locke, *Second Treatise*, § 94, pp. 347-348.

৫৪. S. 143.

৫৫. Locke, *Second Treatise*, § 156, pp. 389.

৫৬. জর্জ এইচ. স্যাবাইন (মূল), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯৬।

৫৭. John Dunn, *Rethinking Modern Political Theory*, Cambridge University Press, New York, 1985, p. 51.

৫৮. *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), পৃ. ৪৯৫।

৫৯. Locke, *Second Treatise*, § 94, 78, 79.

৬০. বরং আমরা এতে লক্ষ করি এক প্রকার Worse-off principle। এ নীতির প্রবক্তা Tom Regan, ...the worse-off principle states that, when individuals involved are not harmed in a comparable way given a certain course of action, be should mitigate the situation of those who would be worse-off।

৬১. Locke, *Second Treatise*, § 94, 95.

৬২. William T. Bluhm, *Theories of the Political System; Classics of Political Thought and Modern Political Analysis*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1965, pp. VI, 502

৬৩. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau*, Oxford University Press, London, 1982, p. XXXII.

৬৪. *Ibid*, p. XXXIII.

৬৫. J. J. Rousseau, *The Social Contract*, Book III, Ch. 16.

৬৬. Ernest Berker, p. XXXVI.

৬৭. p. XXXVIII.

৬৮. *Ibid*.

৬৯. David Thomson, "Rousseau and the General Will" in David Thomson (ed.), *Political Ideas*, Ch. 7, Penguin Books, Harmondsworth, 1969, pp. 100-102.

৭০. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৯।

৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

৭২. *Ibid*., p. 88.

৭৩. *Ibid*., p. 93.

৭৪. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, পৃ. ৮৯।

৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

৭৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।

৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০।

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৮৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৮৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।

৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০।

৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-১২৯।

৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০-১৩২।

৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১।

৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

৯৯. Social Contract, Cranston (trans.), III, p. 154.

১০০. Joseph S. Murphy, *Political Theory A Conceptual Analysis*, The Dorsey Press, Illinois, 1968, p. 99.

১০১. অংশগ্রহণমূলক রাজণীতির তাত্ত্বিকগণ মনে করে সকল বিষয়ে সক্রিয় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণই সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সমতা অর্জন করতে পারে। এর সমর্থকগণ মনে করেন যখন ব্যক্তি তার জীবনযাপনের প্রতিটি পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, মতপ্রকাশ করতে পারে তাহলে সে সত্যিকারের স্বাধীন। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বেচ্ছায়, স্বতঃফূর্ত অংশগ্রহণ করে এবং এরূপ অংশগ্রহণ সামাজিক চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

১০২. Jean-Jacques Rousseau, *The Collected Works of Rousseau: Discourse On Political Economy*, Jean Seine (trans.), United States, 2023, p. 149.

১০৩. Jonathan Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*, Revised edition, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 78.

১০৪. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, পৃ. ৯৮।

১০৫. *The Social Contract*, Bk. II, Ch. 4, p. 205.

১০৬. *Ibid.*, p. 242.

১০৭. *Ibid.*, Bk. III, CH.12 p.261.

১০৮. Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*, p. 80.

১০৯. *Ibid*.

১১০. *The Social Contract*, Bk. II, Ch. 5, p.225.

১১১. *Ibid.*, Bk. IV, Ch. 8. P. 307.

১১২. Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*. p. 84.

১১৩. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, পৃ. ১২৪।

১১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

১১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

১১৬. *প্রাগুক্ত*।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সার্বভৌম ক্ষমতা

হবসের তত্ত্ব

হবসের রাষ্ট্রদর্শনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হলো সার্বভৌমত্ব। তার মতে, সার্বভৌম শক্তি ব্যতীত কমনওয়েলথ কেবল একটি চুক্তি মাত্র যা সারসত্তাহীন এবং তা টিকে থাকতে পারে না। সার্বভৌমতত্ত্ব দ্বারা তিনি কমনওয়েলথের প্রকৃতি বিশ্লেষণের পাশাপাশি মানুষের জন্য এটি অপরিমেয় সুবিধার উৎস তা উল্লেখ করেছেন। তিন ধরনের সরকারব্যবস্থার (যথা– রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র) যেকোনো প্রকার ব্যবস্থায় কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন যাতে তা রাষ্ট্রের জনগণের ওপর একটি ব্যাপক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে জনগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারকে পরিত্যাগ বা হস্তান্তর করে এর কর্তৃত্বকে নিজেদের ওপর স্বীকার করে নিয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতার কর্তৃত্বের কারণে প্রকৃতির রাজ্যের একক সত্তা সামষ্টিক সত্তায় একত্রিত হয়েছে এবং 'কমনওয়েলথ' এ পরিণত হয়। কমনওয়েলথকে হবস রাষ্ট্র অথবা রাজনৈতিক সংগঠনরূপে উল্লেখ করেছেন। যার সার্বভৌম প্রতি একক ইচ্ছার সম্মিলিত প্রকাশ দ্বারা জনগণ তার চরম আনুগত্য প্রকাশ করে।[১]

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের বিষয়বস্তু হলো সার্বভৌমের প্রতি জনগণের আনুগত্য এবং দায়বদ্ধতা। সার্বভৌমের জনগণের প্রতি কিছু কর্তব্য রয়েছে। যার সাহায্যে সার্বভৌম জননিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে কাজ করবে। সার্বভৌমের যে ক্ষমতা তা মূলত শাসকের ক্ষমতা। কমনওয়েলথের সুরক্ষার স্বার্থে সার্বভৌমের কাছে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে যার সাহায্যে সার্বভৌম শক্তি তার প্রজাদের পরিচালনার একচ্ছত্র ক্ষমতা লাভ করে। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে প্রাকৃতিক আইনের সম্পর্ক রয়েছে। প্রাকৃতিক আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শান্তির অন্বেষণ এবং সার্বভৌম ও শান্তিপূর্ণ কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতার প্রয়োগ। সার্বভৌমের কাছে জনগণ তাদের অধিকাংশ প্রাকৃতিক অধিকার হস্তান্তর করেছে ব্যক্তিসত্তারূপে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতার হস্তান্তর ব্যক্তিকে সমষ্টিতে (multitude) রূপান্তর করলো এবং গড়ে তুললো কমনওয়েলথ বা *bodies politic* বা *লেভিয়াথান*। কমনওয়েলথের প্রতি রাজনৈতিক জনগণ তাদের একক ইচ্ছা যা পরবর্তীতে সার্বভৌমের ইচ্ছায় রূপান্তরিত হলো, চরম আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হলো।[২]

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বটি রাষ্ট্রচিন্তার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এতে হবস রাজনৈতিক ক্ষমতা, এর বিস্তৃতি, প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি আলোচনা করেছেন কমনওয়েলথের প্রকৃতি, মানবজীবনে এর প্রভাব তথা প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়সমূহ নিয়ে।

ব্রিটিশ আইনজ্ঞ ও দার্শনিক হার্ট এর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Concept of Law* – তে আইন এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের একটি সুন্দর বিবরণ লক্ষ করা যায়–

সমাজ জীবনে যে সকল ঘটনাবলি ব্যক্তি, সম্পদ এবং প্রতিজ্ঞার জন্য প্রয়োজনীয় এবং তাদের পারস্পরিক সুবিধাসমূহ অবশ্যম্ভাবী; অধিকাংশ লোকেরা তা দেখতে পায় এবং এ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে তারা তাদের ক্ষণস্থায়ী স্বার্থকে বা স্বল্পমেয়াদী স্বার্থকে উৎসর্গ করে। সমাজে ব্যক্তিরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তা মান্য করে; কেউ বিচক্ষণ হিসাব কষে তা মান্য করে আবার তারা যা ছাড় দেয় ততটা মূল্যমান তারা লাভ করে; আবার কেউ কেউ স্বার্থের ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়ে কেবলমাত্র অপরের কল্যাণে মান্য করে; আবার কেউ নিয়মটিকে মান্য করে এজন্য যে এর প্রতি তারা শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং তাদের আদর্শ খুঁজে পায়। অপরদিকে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের বোঝাপড়াও নয় কিংবা ইচ্ছার

ভালোত্বের শক্তিও নয় যার ওপর বিবিধ মানুষের আনুগত্য নির্ভর করে। একই রকম মানুষ কর্তৃক তা শেয়ার করা হয়েছে। সকলেই তাদের তাৎক্ষণিক স্বীয় স্বার্থের পরিতৃপ্তি সাধনে প্রলুব্ধ হয়। যখন কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের অভাবে ব্যক্তি শাস্তি এবং চিহ্নিত হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যায় তাহলে ব্যক্তি প্রলোভনে নিমজ্জিত হয়। কোনো সন্দেহ নেই পারস্পরিক ক্ষমার সুবিধাতে প্রতীয়মান হয় যে স্বেচ্ছায় বলপ্রয়োগকারী বা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় সহায়তাকারী ব্যক্তির সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবে অপকারীর মিশ্রনের চেয়ে বেশি। হ্যাঁ খুব ছোট বা নিবিড়ভাবে বয়ন করা সমাজসমূহে ভিন্ন কেউ বাধ্যতা প্রদর্শন না করে সুবিধা নিতে চেষ্টা করে তাহলে কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বলপ্রয়োগ দ্বারা তা নিবৃত্ত না করা হয় তবে সেরূপ ক্ষেত্রে বশ্যতা স্বীকার করা সম্পূর্ণ একটি র্নিবুদ্ধিতামূলক কাজ করে। অনুমোদন কেবলমাত্র আনুগত্যের সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, পাশাপাশি তাদের জন্য একটা নিশ্চয়তাস্বরূপ যারা স্বেচ্ছায় পালন বা মান্য করে। এধরণের অবস্থায় যুক্তি যা দাবি করে তা হলো একটি বলপ্রয়োগকারী ব্যবস্থায় ঐচ্ছিক সহায়তা।[৩]

হবসের পূর্বে মধ্যযুগে পোপ, ক্যাননিস্টগণ পোপদের কর্তৃত্বের এবং তাত্ত্বিকগণও আইনগত ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এতে গির্জায় পোপদের স্থান নির্ধারণ হয় সেন্টপিটার ও ভিকার অব ক্রাইস্টের পরে এবং পোপদের গির্জার সর্বোচ্চ বিচারক বলা হয়। পরবর্তীতে ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী আইনজ্ঞ, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক জ্যাঁ বোঁদা তার গ্রন্থে সার্বভৌমের মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করেন। বোঁদার মতে সর্বাপেক্ষা উচ্চ, চরম এবং শাশ্বত চিরস্থায়ী ক্ষমতা নাগরিক এবং প্রজাদের ওপর দেশের মঙ্গল, সমৃদ্ধি আইনের দ্বারা বাধাহীন এবং অন্য যে কোনো আদেশ প্রদানকারী শক্তি অপেক্ষা বৃহত্তম। ফ্রান্সের ক্যাথলিক এবং হিউগনোজের মধ্যকার তিন দশকব্যাপী বিস্তৃত গৃহযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে জ্যাঁ বোঁদা সার্বভৌমকে সর্বোচ্চ আদেশ প্রদানকারী শক্তিরূপে বিবেচনা করলেন।[৪] এক্ষেত্রে হবসের সাথে আমরা বোঁদার সাদৃশ্য লক্ষ করি। হবস তার সার্বভৌমতত্ত্বে সার্বভৌমকে যে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছেন। হবসের মনস্তত্ত্বে প্রভাব বিস্তার করেছিল ইংল্যান্ডের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। যার দরুন হবস এমনটা মনে করতেন যে গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা সার্বভৌমের উপস্থিতি এবং ক্ষমতা অধিক সন্তোষজনক।

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বের। উভয়ের কাছে সার্বভৌমের আদেশই আইন। এই আইনি নির্দেশ বা আদেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করতে হয়, এর কোনো যাচাই বাছাই করা যাবে না। তাদের উভয়ের চিন্তায় সার্বভৌমের আইনগত তত্ত্বের আইনি দিকের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সার্বভৌমের আদেশরূপে জনগণ এই আদেশকে মান্য করতে বাধ্য। এর বিপরীত চিত্র পাই লকের কাছে। হবসীয় সার্বভৌমে তিনি যে আইনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সে আইন অবশ্যই রাজনৈতিক সমাজে সৃষ্ট। এতে প্রাকৃতিক আইনের কিছু সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তবে গুরুত্ব নির্দেশিত হয়েছে সিভিল আইনের ওপর। সিভিল আইনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা হলেও হবস নৈতিক এবং ঈশ্বরতাত্ত্বিক দিকসমূহের সাথে সার্বভৌমের দায়বদ্ধতার সম্পর্ক টেনেছেন।

হবস মনে করেন সার্বভৌম রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আইন প্রণেতা এবং রাষ্ট্রের প্রজারা এই আইনের অধীন। কিন্তু সার্বভৌম নিজে এ আইনের উর্দ্ধে। একজন রাজা ঈশ্বরের অংশ রূপে ঈশ্বরের কাছে তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ। *লেভিয়াথান* হলো মরণশীল ঈশ্বর যা অমরণশীল ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ।[৫] হবসের সার্বভৌম অবিভাজ্য, অহস্তান্তরযোগ্য অপরিসীম ক্ষমতার আধার। সার্বভৌম কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ (absolute) শাসক এবং একমাত্র আইনপ্রণেতা। সার্বভৌমের প্রতি প্রজাদের আইনগত কোনো দায়বদ্ধতা নেই। তাই সার্বভৌমকে দোষারোপ বা অভিযুক্ত করা যায় না, আবার প্রজারা সার্বভৌমের শাস্তি বিধানও করতে পারবে না। কারণ সার্বভৌমের প্রতি স্বীকৃতি ও সম্মতি জ্ঞাপন দ্বারা জনগণ সার্বভৌমের সকল প্রকার কাজের স্বীকৃতি প্রদান করলো। হবসের মতে সার্বভৌমের

ব্যাপ্তি এত বিশাল যে জনগণের পক্ষে একে কল্পনা করা অসম্ভব এবং সেটা তিন ধরনের সরকারব্যবস্থার যে কোনোটিতেই।[৬]

হবসের রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আনুগত্য বা বাধ্যবাধকতা তথা দায়িত্ব (Obligation)। দায়িত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আইন এবং চুক্তি। আইন হলো এমন হাতিয়ার যার সাহায্যে দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর আরোপ করা যায়। আর চুক্তি হলো তেমন হাতিয়ার যার সাহায্যে দায়িত্ব ব্যক্তি নিজের ওপর তুলে নেয়।[৭] হবস ভালো আইন তৈরির বাধ্যবাধকতাকে সার্বভৌমের অন্যতম দায়িত্ব নির্দেশ করেছেন। ভালো আইন বলতে তিনি বোঝান যা জনগণের প্রয়োজনে সহায়ক। জনগণের জন্য ভালো আইনের ধারা হবে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত, যা জনগণকে ঐচ্ছিক কার্যাবলি থেকে বিরত না করে জনগণকে এমন কাজের নির্দেশনা দেবে যাতে ব্যক্তি তার ইচ্ছা বা চাহিদার কারণে স্বীয় ক্ষতির কারণ না হয়।[৮]

সার্বভৌমের আইন প্রণয়ণ ও বাতিল করার অসীম ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌম প্রণীত আইনের সাথে অন্যান্য আইনের কিছু পার্থক্য রয়েছে। আইনের বাধ্যতামূলক তথা অনুজ্ঞাসূচক দিকটির দায়বদ্ধতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলা যায় হবস সিভিল আইনকে সার্বভৌমের প্রজ্ঞা বা যুক্তির ইচ্ছামূলক প্রকাশ মনে করেন। সার্বভৌম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারক এবং আইনের ব্যাখ্যাকারী।[৯] হবস বিশ্বাস করতেন আইনের ব্যাখ্যার সাথে আইনজ্ঞদের তত্ত্বের কোনো যৌক্তিক বিরোধিতা থাকতে পারে না। আইন প্রণয়ণের সময় কেবল বিবেচ্য হওয়া উচিত সার্বভৌমের ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্য; আইনজ্ঞের যুক্তি, যৌক্তিক আইনি ভাষ্য, নীতিদার্শনিক কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তিগত যুক্তি নয়। প্রথা এবং দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে আইনের ওপর কর্তৃত্ব অর্জিত হয়, এবং শুধু সুকৌশলে স্বীকৃতি দ্বারা তা আইনে পরিণত হয়ে উঠে।[১০] হবস তার পূর্ববর্তীকালে আইনজ্ঞদের সিদ্ধান্তে গড়ে ওঠা আইনের সমালোচনা করে বিখ্যাত ইংরেজ আইনজ্ঞ বিচারক স্যার এডওয়ার্ড কোকের মতের বিরোধিতা করেন। কোক মনে করেন আইনের জন্য স্বাভাবিক প্রজ্ঞা বা যুক্তি নয় বরং “artificial perfection of reason” – এর প্রয়োজন, যা দীর্ঘদিনের গবেষণার অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়ের সাহায্যে গড়ে উঠে। কোকের এধরণের মতের সাথে ভিন্নতা পোষণ করে হবস আইনকে সার্বভৌমের প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করেছেন। কারণ হবসের মতে আইন যদি ভ্রান্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ইচ্ছা কেবল ভুল রায়কে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে।[১১]

হবস তার আইন সম্পর্কিত ধারণায় একজন লিগ্যাল পজিটিভিস্ট হলেও সার্বভৌমের সরকার ও আইন সংক্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড সমূহকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[১২] জর্জ ডিউক তাঁর প্রবন্ধে হবসের প্রাকৃতিক আইন এবং সার্বভৌমের আদর্শনিষ্ঠ দিকটি বিশ্লেষণে মনে করেন, যদিও হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাকৃতিক আইনের সাথে প্রত্যক্ষবাদী চিন্তার অংশত সমন্বয় হয়েছে, তবুও এর জন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং সত্যের অধিকতর স্বতন্ত্র তত্ত্ব প্রয়োজন।[১৩] তিনি মনে করেন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে আইনের নৈতিক প্রয়োগ ও বিবেচনা দ্বারা হবসের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশের একটি সমন্বয়মূলক অবস্থান স্বীকার করা সম্ভব।[১৪]

হবসের সার্বভৌমের ব্যাখ্যায় তৎকালীন ইংল্যান্ডের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে আইন দ্বারা সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদত্ত হয় এবং পার্লামেন্টের সম্মতিক্রমে রাজা কর্তৃক জনগণের ওপর ট্যাক্স আরোপ করা হতো। সার্বভৌম জনগণের চিন্তা ও মতামত নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাখে। হবস মনে করেন, শান্তি এবং ঐক্যের জন্য মানুষের সুচিন্তিত মত তাদের সুশাসিত কাজের প্রতি চালিত করে। সার্বভৌমের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী অথবা তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে এমন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিতর্ক ও চিন্তাভাবনা তা যতই মুক্তচিন্তার প্রতীক হোক সেসব বিষয়ে হবস ভীত ছিলেন। তাই তিনি এ সকল বিষয়কে অপছন্দ করতেন। সার্বভৌম তার চরম ক্ষমতার সাহায্যে শান্তির জন্য যে মত সহায়ক বা যা প্রতিবন্ধক তা নির্ণয় করে এবং সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখে। ত্রয়ী সামাজিক চুক্তিবাদীদের আলোচনায় আমরা লক্ষ করি জনগণের সম্পত্তির অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হয়। হবসীয় সার্বভৌমের জনগণের

সম্পত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে যার সাহায্যে সার্বভৌম জনগণের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে, জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করতে পারে এবং তা ট্যাক্সের ক্ষমতাকেও লঙ্ঘন করতে পারে।

হবসের সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে গির্জা ও পাদ্রী, ধর্ম এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে রাষ্ট্রের ও সার্বভৌমের অধীনস্থ করেছে। তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থের তৃতীয় অংশে 'On the Christain commonwealth' এ সংক্রান্ত আলোচনা পাওয়া যায়। এতে দেখা যায় খ্রিষ্টীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চার্চ কোনো স্বাধীন ও স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান নয় বরং কমনওয়েলথের অংশ। তিনি একে বর্ণনা করেছেন, "but two words, brought into the world to make men see double and mistake their lawful sovereign."[১৫] জাগোরিন সন্দেহ করেন হবসীয় সার্বভৌম কেবলমাত্র একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসকই নয় পাশাপাশি খ্রিস্টীয় গির্জার সর্বোচ্চ যাজক, যে কর্তৃত্বের দ্বারা অন্য সকল যাজক, ধর্মশিক্ষক এবং গির্জায় কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়োগপ্রাপ্ত হত।[১৬]

হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের একটি লক্ষণীয় দিক হলো– যদিও তিনি চার্চ এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার ভিন্ন পরিসীমা নির্ধারণ করেছেন তথাপিও তিনি ঈশ্বরের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক এমন কোনো বিধানকে আইনে সম্পৃক্ত করেননি। বরং তিনি মনে করেন মানুষ যেভাবে ঈশ্বরের বিধি-বিধান মান্য করবে একই রকম আবেগ-আনুগত্য থেকে তারা সার্বভৌমের আইনি নির্দেশ মান্য করবে। ঈশ্বরীয় ও বাইবেলের নির্দেশনাকে সার্বভৌম তার আইন প্রয়োগকারী কর্তৃত্ব দ্বারা সিভিল আইনে নির্দেশিত করেছেন। খ্রিস্টীয় বিশ্বাস অনুসারে মানব মুক্তির জন্য দুটি বিষয় প্রয়োজনীয়, যথা– বিশ্বাস এবং আনুগত্য। হবস বিশ্বাস ও আনুগত্যকে ঈশ্বরের পরে সার্বভৌমের জন্য নির্দেশ করেছেন। জনগণ ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে কমনওয়েলথের কল্যাণে সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত আইন মেনে চলবে। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জনগণকে এটি বিশ্বাস করতে হবে যে সার্বভৌম ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত এবং ঈশ্বর সার্বভৌমকে প্রেরণ করেছেন। সার্বভৌমকে বিশ্বাসের দ্বারা সার্বভৌম মানুষের কাছে শাশ্বত জীবন বয়ে আনতে পারে।[১৭] জাগোরিন মনে করেন, এধরণের বক্তব্য দ্বারা হবস যিশু একমাত্র পরিত্রাতা এমন খ্রিষ্টবিশ্বাসের স্খলন ঘটিয়েছেন, যা পরিত্রাণ সম্পর্কে খ্রিস্টীয় মতবাদের বিভাজন ও বিতর্ককে উস্কে দেয়।[১৮]

বাধ্যবাধকতা বা আনুগত্য এবং সুরক্ষার মধ্যকার পারস্পরিকতার স্পষ্ট অনুমোদন হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[১৯] হবসের ভাষায় "the end of obedience is protection"। জনগণকে নিরাপত্তা বিধানের প্রাকৃতিক অধিকারটি যখন সার্বভৌমের কাছে সমর্পিত হয় অত:পর সার্বভৌমের অবর্তমানে (কোনো চুক্তির সাহায্যে) সে অধিকারটি বিলুপ্ত হয় না। হবসের মতে জনগণ যেহেতু প্রাথমিকভাবে সার্বভৌমকে মান্য করতে চুক্তিবদ্ধ তা শেষ পর্যন্ত উপযোগিতা এবং ব্যবহারিক প্রজ্ঞার, তথা যুক্তির ওপর নির্ভর করবে। কোনো আবেগ বা ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা বা উত্তরাধিকারের ওপর নয়।[২০] হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের যে অনিবার্য দায়িত্ব জনগণের প্রতি আরোপিত তা হলো তারা একান্ত এবং ব্যক্তিগত রায় থেকে সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।[২১] হবসের মতে একজন সার্বভৌম রাজার অধিকার অন্য কোনোভাবে খর্ব হয় না। যদিও বা প্রজাদের দায়বদ্ধতা বা আনুগত্য খর্ব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের অবস্থা বিবেচনা করা যেতে পারে [*লেভিয়াথানে* তিনি স্মরণ করেন **১৬৫১** সালে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে রাজাকে পরাজিত এবং দণ্ডারোপ করার পরে রাজা এবং হাউস অব লর্ডস বিলুপ্ত হয়ে একটি নতুন রিপাবলিকান সরকার যাকে বলা হয় কমনওয়েলথ গঠিত হয়]। হবস সার্বভৌমের সুরক্ষা প্রদানের ক্ষমতার ওপর আনুগত্যকে নির্ভরশীল করেছেন এবং জনগণ তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ আদেশ (command) হলো সার্বভৌম। সে অর্থে বলা যায় সার্বভৌম জনগণের ভালো এবং সুবিধা দ্বারা সামগ্রিকভাবে স্বীয় ভালো নির্ধারণ করেছে।[২২] হবস মনে করেন জনগন যখন সার্বভৌমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তাহলে তারা মূলত একজন বিজয়ী শাসকের কাছে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য

অধিকার প্রত্যর্পণ করে, যে শাসক তাদের শান্তি প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি যুদ্ধের সময় জনগণের সুরক্ষার বিষয়টি ভাবনায় রাখবেন। হবসের মতে একজন প্রজা একজন বিজেতার কাছে তার স্বাধীনতা সমর্পণ দ্বারা এবং অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশের ম্যাধমে একজন সার্বভৌমের তথা বিজেতার প্রতি নিজের আনুগত্য বা দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে হবসের স্পষ্ট সতর্কবাণী হলো শাসকের প্রতি শাসিতের যে সমর্পণ তা মূলত শাসকের প্রতি ভবিষ্যৎ আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা। শাসকের অতীত কর্মকাণ্ডের অনুমোদন এ সমর্পণ বা সম্মতি দ্বারা জনগণ দেয় না। হবস মনে করেন পৃথিবীতে এমন কমনওয়েলথ দুস্প্রাপ্য যেটার সূত্রপাতকে বিবেকের দ্বারা বৈধতা দেওয়া যায় এবং কোনো রাষ্ট্রের ধ্বংসের মূল সূত্র হলো যখন একজন শাসক কেবল ভবিষ্যৎ আনুগত্যের প্রশ্নে সন্তুষ্ট না থেকে তিনি অতীতে যে সকল কাজ করেছেন তার অনুমোদন প্রত্যাশা করেন। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে একজন শাসক তথা সার্বভৌমের কৃতিত্ব ও আনুগত্য দাবির মূল সূত্র হলো জনগণের সুরক্ষা প্রদান।[২৩] হবস সার্বভৌমতত্ত্বে সার্বভৌমের চরম ক্ষমতার সমর্থন করেছেন রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং জনগণের সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানে। সার্বভৌমের তার প্রজাদের প্রতি কোনো চুক্তিভিত্তিক দায়বদ্ধতা ছিল না। তিনি সার্বভৌমের ক্ষমতাকে লকের মতো ট্রাস্টের সাথে তুলনা করেননি। সার্বভৌমের উদ্দেশ্য হলো জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সেটা করার জন্য সার্বভৌম প্রাকৃতিক আইনের প্রতি অনুগত এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ। জ্যাগোরিন মনে করেন, হবসীয় সার্বভৌমের প্রাকৃতিক আইনের প্রতি সম্পর্ক আইনি নয় বরং নৈতিক দায়বদ্ধতার।[২৪]

প্রশ্ন হতে পারে, হবসের সার্বভৌমের পেছনে কি কেবল মাত্র আত্মসংরক্ষণের অভিলাষই ছিল নাকি তার পাশাপাশি আরো কিছু ছিলো। এটা সত্য যে মৃত্যুভীতি থেকে মুক্তি পেতে জনগণ স্বীয় জীবনের নিরাপত্তার অন্বেষণে কমনওয়েলথ গঠন করেছে; যা কমনওয়েলথের প্রধান উদ্দেশ্য ও কারণ রূপে কাজ করেছে। তবে মানুষ কেবলমাত্র তাদের নিরাপত্তা নয়, সরকার গড়ে তুলতে এবং যতটা সম্ভব মানবীয় পরিস্থিতি আনন্দের সাথে বাঁচার জন্য স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়েছিল। মানুষের উপযোগী এবং পরিতৃপ্ত জীবনধারার চাহিদা তাদের কমনওয়েলথ সৃষ্টিতে যুক্ত করেছে। (এ প্রসঙ্গে হবসের প্রকৃতির রাজ্যের চিত্র স্মরণ করা যায়। যেখানে মানুষ সভ্যজীবনের কোনো কিছু পেত না। যেমন – কৃষি, শিল্প, নৌ-চালনা, সময়ের জ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের ধারণা তথা জ্ঞান ছিলো না।)

জর্জ এইচ স্যাবাইন হবসের সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেন– হবসের বিশ্লেষণ অনুসারে, লোকসমাজ হলো কল্পিত বস্তু মাত্র; সদস্যদের সহযোগিতা ব্যতীত এর কোনো অস্তিত্বই নেই; সদস্যগণ পৃথকভাবে যেসব সুবিধা ভোগ করে, সেগুলি এই সহযোগিতার ফলশ্রুতি এবং ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু কিছু ব্যক্তি সার্বভৌম ক্ষমতাকে রূপায়িত করতে পারে তাই সমাজের সৃষ্টি। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে হবস উপসংহার টেনে ছিলেন যে সকল প্রকার সরকারের ক্ষেত্রেই অধীনতা অপরিহার্য। এই সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থন ব্যতীত চুক্তি, প্রতিনিধিত্ব, দায়িত্ব প্রভৃতির ধারণা নিরর্থক। অতএব এগুলি রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বৈধ, কিন্তু রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নয়।[২৫]

স্যাবাইন এখানে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে চিত্রিত করেছেন সামষ্টিক কল্যাণে নিয়োজিত কিন্তু সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এতে একটি গোষ্ঠী কমিউনিটিতে রূপ লাভ করে। অপরদিকে ব্যক্তি তার স্বীয় পরিতৃপ্তি সাধনে রত। তাই সমাজের স্বার্থপর মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় আইন ও সরকারের অনুশাসন মেনে চলে এবং স্বীয় মঙ্গল প্রত্যশা করে। স্যাবাইন আরো মনে করেন, হবস সুস্পষ্টভাবে কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রমানসমূহ হাজির করেন।[২৬]

হবসের সামষ্টিক কল্যাণ চিন্তার অনুরূপতা লক্ষ করা যায় তাঁর *The Elements of law* গ্রন্থে। যাতে তিনি বলেন, সার্বভৌম এবং প্রজার সুবিধা একসাথে চলে।[২৭] জনগণের সুবিধার্থে আইন পরিচালনা করার অর্থই হলো সার্বভৌমের সুবিধার্থে পরিচালনা করা। সার্বভৌম রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে সকল সাধারণ আইন প্রণয়ণ করে

তা মূলত জনগণের ভালোর লক্ষ্যে প্রচেষ্টা। হবসের সার্বভৌম সম্পর্কিত আলোচনাতে এটি প্রতীয়মান যে, তিনি মনস্তাত্ত্বিক আত্মবাদের পক্ষে ছিলেন না তাই ব্যক্তিগত স্বার্থ তার কাজের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না। সার্বভৌম প্রজাদের আনন্দ বা মঙ্গল কামনার দ্বারা স্বীয় সুবিধা অন্বেষণ করে। তার মানবপ্রকৃতির চরিত্র বিশ্লেষণ ও সম্বন্ধ বিচার দ্বারা কিছু ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তার পরার্থবাদী ধারাটিকে অস্বীকার করা যায় না। জনগণের মঙ্গল কামনা তথা সুবিধা, আনন্দের বিষয়টি সার্বভৌমকে জনগণকে ভাবিত করে যাতে একপ্রকার নৈতিক সংযোগ রয়েছে। যা আইন প্রণয়ণের সাথে জড়িত। হবসীয় কমনওয়েলথ সার্বভৌমের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। আর প্রজাদের দায়িত্ব হলো আনুগত্য প্রদর্শন করা। এভাবে সার্বভৌম এবং প্রজাদের ভালো-মন্দের বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

হবসের *De Cive* গ্রন্থেও কাছাকাছি বক্তব্য পাওয়া যায়।[২৮] সার্বভৌম সিভিল আইনের অধীন নয়। সার্বভৌম যতটা সম্ভব দায়বদ্ধ থাকবে যথার্থ প্রজ্ঞার ওপর। হবস মনে করেন যথার্থ প্রজ্ঞা নৈতিক এবং ঐশ্বরিক আইনের মতো কাজ করে। এর বিপরীতে যদি সার্বভৌম কাজ করেন তাহলে তা হবে একদিকে প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন আবার মানুষের শান্তি প্রচেষ্টার বিরোধী। হবস মনে করেন, রাজা প্রাকৃতিক আইনের বাধ্যতার কারণে প্রজাদের মঙ্গলার্থে প্রচেষ্টা চালাবে। এ থেকেই প্রতীয়মান যে হবস সার্বভৌমের দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে তাকে সিভিল আইনের উর্দ্ধে রাখলেও একে প্রাকৃতিক আইন এবং ঐশী আইনের অধীন রেখেছেন। *এলিমেন্টস অব ল* গ্রন্থে যখন সার্বভৌম ক্ষমতার কার্যকলাপ জনগণের কষ্টের কারণ হয় এতে প্রাকৃতিক আইন এবং ঐশী আইন ভঙ্গ হয়; এবং সার্বভৌমের দায়িত্ব এর বিপরীত কাজ করা।[২৯]

তবে সার্বভৌমের কাছে এধরণের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকার প্রদানের সীমাবদ্ধতা হলো এর ফলে সার্বভৌম শাসক সর্বদা আইন তথা নৈতিকতার প্রতি অনুগত নাও থাকতে পারেন এবং তিনি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক অপকর্ম করতে পারেন। এধরণের সরকারের উদাহরণ রূপে জ্যাগোরিন উল্লেখ করেছেন একনায়ক হিটলার, মুসোলিনী, স্টালিন, মাও-সে-তুঙ সহ অনেক এশিয়ান আফ্রিকান স্বৈরশাসকের।[৩০]

অবশ্য হবস নিজেই উল্লেখ করেছেন, যে সার্বভৌম শাসক কেবল নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে ভাবে এবং প্রজাদের হিত অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ ও সম্পত্তিকে ক্ষমতার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করে সে ধরণের শাসককে স্বৈরশাসক নামে অভিহিত করাটা যথার্থ হবে। যে রাজা বৈধভাবে ক্ষমতায় আসার পরও যথার্থভাবে প্রজাদের সুবিধাদি নিশ্চিত করতে অক্ষম তেমন সরকার যদি রাজতান্ত্রিক হয় তবুও এধরণের সরকারকে হবস স্বৈরশাসক মনে করেন এবং এর বিরোধিতা করেছেন।

সার্বভৌমের নৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিষয়ক আলোচনা থেকে লক্ষ করব ন্যায্যতা বা ন্যায় (Equity) এবং সমতার সাথে সার্বভৌমের সম্পর্ক। হবস স্পষ্টভাবে ন্যায্যতা এবং সমতাকে সমার্থকরূপে গণ্য করেছেন। যা অনেকটা রলসের বন্টনমূলক ন্যায্যতার সাথে সাদৃশ্যমূলক। হবস আরো বলেন, equity, justice, and honour, contain all virtues whatsoever। হবসীয় প্রাকৃতিক আইনের ধারণায় ন্যায় হলো সমতার একটি বিধি। এ বিধি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি নিজের জন্য ততটা অধিকার গ্রহণ করতে পারবে যতটা সে অন্যের জন্য নিশ্চিত করতে পারবে। হবসের এ ধারণাটা সমতার ধারণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। হবস মনে করেন প্রাকৃতিক আইন ও নৈতিক আইন উভয়ই একই। উভয়েই মানুষের শান্তির জন্য কাজ করে। একইভাবে সমতা বিনয়, বিশ্বাস, মানবতা, করুনার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি সমতাকে বাইবেলীয় নির্দেশের সাথে যুক্ত করেন। বাইবেলে বলা হয়েছে প্রতিবেশীর প্রতি সেরূপ ভালোবাসা প্রদর্শন করো যেরূপ তুমি নিজেকে ভালোবাসো। হবস মনে করেন কমনওয়েলথের নাগরিক মাঝে মাঝে সার্বভৌমের তথা আইনের বিরুদ্ধে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে তবে তা সিভিল বা বেসামরিক অধিকারের বিরুদ্ধে নয় প্রাকৃতিক সমতার বিরুদ্ধে। হবস প্রাকৃতিক সমতা শব্দদ্বয়কে একটি

বিশেষ ধরণের ন্যায়পরতা অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন– বিচারকদের সমতার প্রতি দায়বদ্ধতার অর্থ হলো বিভিন্ন দলসমূহের মাঝে সমানভাবে বিচার করা অথবা প্রাকৃতিক সমতা হলো ট্যাক্সের বোঝা সমভাবে আরোপ করা।

হবসের প্রাকৃতিক আইনের আলোচনায়ও সমতার গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। এতে তিনি সর্বদাই প্রাকৃতিক আইনের সাথে সমতাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন এবং তিনি মনে করেন সমতা হলো প্রাকৃতিক আইন। একজন সাবভৌম সর্বদা ন্যায় তথা ন্যায্যতার বা সমতার প্রতি মনোযোগী হবেন যা প্রাকৃতিক আইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ন্যায্যতার প্রতি সার্বভৌমের শ্রদ্ধাশীল হওয়া একজন শাসক হিসেবে তার প্রজাদের জন্য স্বস্তিদায়ক হবে তা বলা যায়। এধরণের সার্বভৌম শাসক প্রজাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি মনোনিবেশ করবেন। *লেভিয়াথান* এর সিভিল আইনের আলোচনায় হবস এ আইনের সাথে সমতার সমন্ধ বিচারে বিচারক এবং আইন প্রণেতাদেরও সংযুক্ত করেছেন।[৩১] তিনি মনে করেন একজন ভালো বিচারকের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রাকৃতিক আইনের মূলনীতি তথা সমতার যথার্থ উপলব্ধি। একজন বিচারক এবং আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সমতা। যেখানে আইনের যথার্থ বা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে একজন বিচারকের দায়িত্ব হলো প্রাকৃতিক আইন অনুসরণে ব্যাখ্যা প্রদান করা।

মাইকেল সেভেল মনে করেন, হবসকে আইনগত প্রত্যক্ষবাদী কিংবা প্রাকৃতিক আইনের পুন:আবিষ্কারক রূপে যে দ্বৈতবাদী দ্বান্দ্বিক চরিত্রে চিত্রিত করা হয় তা যথাযথ নয়। সেভেলের মতে, হবস প্রত্যক্ষবাদী আইনি ধারার ধারায় একজন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারকারী এবং প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[৩২] সেভেল হবসের প্রাকৃতিক আইন তত্ত্বের একপ্রকার আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। সাধারণ আইনশাস্ত্রের অবস্থান থেকে তিনি দাবি করেন, হবসের প্রাকৃতিক আইন প্রকৃত অর্থেই সিভিল আইনের একটি আদর্শনিষ্ঠ ভিত্তি প্রদান করে এবং প্রাকৃতিক আইন সার্বভৌমের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ক্ষমতার ওপর নৈতিক বাধ্যতা স্থাপন করে।[৩৩]

একথা বলা যায় ন্যায্যতার পরিপূর্ণ প্রকাশ পায় যখন মানুষকে সমতার ক্ষেত্রে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে ন্যায়বিচার এবং নৈতিক প্রজ্ঞা, নৈতিক মূল্যবোধ, যা থেকে একজন সার্বভৌম বা কোনো সিভিল আইনও মুক্ত নয়। হবস যখন প্রাকৃতিক সমতার কথা বলেন, তার মধ্যে অবশ্যই ন্যায় এবং ঔচিত্যের নৈতিক এবং বৌদ্ধিক ধারণা কাজ করে। ন্যায়পরতা এবং ঔচিত্যের এ ধারণা সার্বভৌমের কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদের মাঝে একপ্রকার সদর্থক অনুরণণ জাগিয়ে তোলে, যাতে হবসের মতো একজন সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রদার্শনিকও চূড়ান্ত বিচারে কেবল ক্ষমতাকে নয় বরং নৈতিক বিচারমূলক ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সমতার নীতি হবসের রাষ্ট্রদর্শনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে বলে মনে করি। হবসের সার্বভৌমে অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা এবং অনপেক্ষ রাষ্ট্রের ধারণার বিশ্লেষণে বলা যায় সমতার নীতির দ্বারা তিনি এমন এক ধরণের নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছেন যেখানে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তাকে নিয়ন্ত্রহীন বা নিরঙ্কুশ বলা যাবে না। এ নীতির দ্বারা তিনি সার্বভৌম ও রাষ্ট্রের নৈতিক নিয়ন্ত্রণের সীমারেখা টেনেছেন।

হবস লেভিয়াথানে বলেছেন, একজন সার্বভৌম রাজা অথবা সার্বভৌম সংসদের কোনো বৃহত্তর অংশ তাদের আবেগের তাড়নায় তাদের স্বীয় বিবেকের বিপরীতে কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে, যা প্রাকৃতিক আইনের ও বিশ্বাসের ব্যত্যয়। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় এটি বলা যেতে পারে, সার্বভৌম কর্তৃক প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন এবং ন্যায়-নৈতিকতা বিরোধী আচরণে কোনো শক্তিমত্তার প্রয়োগ দ্বারা হবস সার্বভৌমকে বৈধতা প্রদান করেননি। সার্বভৌমের সর্বাত্মকবাদীরূপ নির্মাণের পরও তিনি নৈতিকতা, সমতার মতো মানবতাকেন্দ্রিক ধারণাসমূহকে খাটো করে দেখেননি। তিনি সবসময় বিশ্বাস করতেন বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ অপেক্ষা একজন সার্বভৌমের ভুল শাসনও ভালো।

যদিও হবস জনগণকর্তৃক বিপ্লবকে সমর্থন করেননি (সম্ভবত তাঁর সময়কালে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে)। তথাপিও সার্বভৌম সম্পূর্ণভাবে জবাবদিহি মুক্ত তেমনটা মনে হয়না। যেমন– তিনি সার্বভৌম তথা লেভিয়াথান নামক মরণশীল ঈশ্বরকে জবাবদিহিতার অধীন করেছেন অমরণশীল ঈশ্বরের কাছে। জনগণের চুক্তির অংশ নয় বলে সার্বভৌম জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ নয় তবুও সার্বভৌমের ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধতার বিষয়টি তিনি ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। লক্ষণীয় হলো বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ দ্বারা হবস তার রাষ্ট্রদর্শনকে ব্যাখ্যা করলেও সার্বভৌমতত্ত্বে তিনি ঈশ্বর নির্ভরশীলতা এড়িয়ে যেতে পারেননি। এটি তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন বৈশিষ্ট্য।

সার্বভৌমতত্ত্বে হবস বিপ্লবের বৈধতা প্রদান করেননি। তিনি এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক শাস্তি বিধানের ওপর নির্ভরশীল করেছেন। যেমন– সার্বভৌম যদি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে তার জন্য কৈফিয়ত দিবে ঈশ্বরের কাছে এবং ঈশ্বর তার শাস্তির বিধান করবে। হবস যদিও একটি বিপ্লবকালীন যুগের মানুষ ছিলেন তথাপিও হবস শর্তহীন ও ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজতান্ত্রিক শাসনে আস্থা রেখেছেন।

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা এবং অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রজাসাধারণ যেন সার্বভৌমের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রদর্শন করে। এধরণের আনুগত্য প্রদর্শন দ্বারা জনগণ সার্বভৌমের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রকাশ করে এবং এক প্রকার বাধ্যবাধকতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। অবশ্য সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের প্রাক্কালে হবসের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেকে (চুক্তিবদ্ধ) যেন চুক্তির শর্ত মেনে চলে। শর্তের মান্যতার জন্য জনগণের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন জরুরি ছিল। কেননা জনগণ একদিকে জীবনের নিরাপত্তা চায় এবং অপরদিকে একটি উন্নত জীবনযাপন করতে চায়।[৩৪] এ উভয় প্রত্যাশা তারা রাখে সার্বভৌমের কাছে। সার্বভৌম চুক্তির বর্হিভূত অংশ হিসেবে একটি তৃতীয় শক্তিরূপে আর্বিভূত হয়ে জনগণকে এ বিশ্বাস প্রদানে কাজ করে। সামাজিক চুক্তির সাহায্যে মূলত সার্বভৌম শক্তির উত্থান ঘটে। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রদানবকে তিনি *লেভিয়াথান* নামে অভিহিত করেছেন। প্রাকৃতিক আইন ছাড়াও রাজনৈতিক আইনের সাহায্যে একটি কৃত্রিম পদ্ধতির দ্বারা প্রজাদের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করবে এমন প্রত্যাশা হবসের।[৩৫] আর *লেভিয়াথান* হলো সে কৃত্রিম ব্যবস্থার মূর্তরূপ। *লেভিয়াথান* বলতে হবস মূলত বুঝিয়েছেন সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র (যাকে তিনি জলদানবের সাথে তুলনা করেছেন)।

যদিও সার্বভৌমের প্রচলিত ব্যাখ্যাবিশ্লেষণসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাবি করা হয়েছে হবস সার্বভৌমের জন্য জনসাধারণের কাছে শর্তহীন আনুগত্য কামনা করেন এবং সার্বভৌম জবাবহিদিতার উর্দ্ধে। এ ধরণের বক্তব্যে দ্বিমত পোষণের সুযোগ রয়েছে বলে আমরা মনে করি। হবসীয় সার্বভৌমের কাছে জনগণ কিছু প্রত্যাশা করে (শান্তি ও নিরাপত্তা) যার বিনিময়ে তারা সার্বভৌমের কাছে আনুগত্য প্রদর্শন করবে। আবার শর্তহীন আনুগত্যের অংশরূপে সার্বভৌমের প্রজাদের প্রতি স্বেচ্ছাচারিতা বা যথেচ্ছাচারের সুযোগ নেই। কারণ জনগণের চুক্তি থেকে এটির (সার্বভৌম) উদ্ভব এবং এর মধ্যে রয়েছে এক প্রকার নৈতিক আবেদন বা মূল্যবোধ। ফলশ্রুতিতে সার্বভৌম এক প্রকার যৌক্তিক এবং নৈতিক অনুশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যদিও হবসের সার্বভৌতেত্ত্বের উদ্দেশ্য জনগণের মাঝে কোনো নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা নয়। তথাপিও জনগণের নিরাপত্তাহীনতায় এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে নৈতিকতা হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।[৩৬] সার্বভৌমের নৈতিক মূল্যবোধ ধারনের পেছনে প্রাকৃতিক আইনের একটি ভূমিকা রয়েছে বলে মনে হয়। আরো বলা যায়, শর্তহীন আনুগত্যের দাবি দ্বারা সার্বভৌম জনগণের ওপর যা খুশী আরোপ করেন না কিংবা চাপিয়ে দেয় না। যেমন– করারোপের ক্ষেত্রে এটি জনগণের ইচ্ছা ও সক্ষমতার দিকসমূহের প্রতি লক্ষ রাখে। জনগণের কোনো স্বাধীনতা কিংবা মূল্য এখানে রক্ষিত হয়নি এমন দাবি যথার্থ নয় বলে আমরা মনে করি। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থেই জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুন এবং আদেশ-নির্দেশ পালন (যে সকল আদেশ-নির্দেশ সবসময় জনহিতার্থে সার্বভৌম দেবেন এমনটা হবস মনে করেন) সুবিধাজনক।

তাই সার্বভৌম এখানে এককভাবে লাভবান নয় এবং একক সুবিধাভোগী কোনো গোষ্ঠীও নয়। হবস সার্বভৌমতত্ত্বে স্পষ্টই দাবি করেছেন যে যদি রাজা বা শাসক জনগণের কল্যাণে কাজ না করে কিংবা অন্যায়ভাবে কিছু জনগণের ওপর চাপিয়ে দেন তবে সেরূপ স্বৈরাচারী শাসককে তিনি সমর্থন করেননি।

সার্বভৌমের অন্যতম দায়িত্ব হলো যথাযথ শাস্তির বিধান করা এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।[৩৭] শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য হবে প্রতিশোধ নেওয়া নয় বরং সমাজের ভালো তথা মঙ্গল সাধন। যার দ্বারা অন্যায়কারীর সংশোধন করা যায় অথবা অন্যেরা তাকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। তাছাড়া প্রাকৃতিক আইনের বিধি অনুযায়ী কোনো অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে তার প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকে বিচার করতে হবে। মোট কথা হবসের রাজনৈতিক চিন্তায় যেরূপ রক্ষণশীল কঠোর সর্বাত্মকবাদী রূপের পরিচয় আমরা পূর্বে জ্ঞাত হয়েছি তার তুলনায় শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়ে হবস উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেছেন। হবসীয় সার্বভৌমের কিছু ক্ষেত্রে রায় প্রদানের বা ক্ষমতা ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার সাথে পরবর্তী চুক্তিবাদী রুশোর সাথে সাদৃশ্য পাই। তারা উভয়েই মনে করেন জনগণকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষমতা শাসকের থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে জনগণ মৃত্যুদণ্ডদানকারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবে।

সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ বা শাসক যদি কমনওয়েথের কোনো প্রজাকে সার্বভৌম শক্তির দ্বারা মৃত্যুদণ্ড দেয় তা হবে প্রাকৃতিক আইনের পরিপন্থী কাজের জন্য। সার্বভৌম জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার অধীন না হলেও তার কৃতকর্মের জন্য সার্বভৌম অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে দায়ী থাকবে।[৩৮] সার্বভৌমকে খুশীমত যা ইচ্ছা কাজ করার স্বাধীনতা প্রজারা প্রদান করেছে তাই তারা সার্বভৌমের কাছে জবাবদিহি চাইতে পারে না। সার্বভৌম ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ এজন্য যে, এ শক্তি ঈশ্বরের অধীনস্থ। প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা আবদ্ধ বিধায় কোনো অন্যায় করা সার্বভৌমের জন্য নিষিদ্ধ।[৩৯] সার্বভৌমের এধরণের কাজ ঈশ্বরের কাছে প্রাকৃতিক আইনের বিধানের পরিপন্থী। কারণ প্রাকৃতিক আইন ন্যায়ের অনুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। সার্বভৌমতত্ত্বের এ আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, হবস রাজনৈতিক বাধ্যতামূলক শক্তিরূপে সার্বভৌমকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ঈশ্বর এবং নৈতিক বিধানাবলী তথা নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সার্বভৌমের জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতা বহাল রেখেছেন। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষরূপে সার্বভৌম রাজনৈতিক শক্তির উৎস। জনগণের কাছে তিনি দায়বদ্ধ নন। সার্বভৌমের খুশীমত কাজ করার ক্ষমতাকে হবস বলেছেন অনৈতিক কিন্তু বেআইনী নয়। যে অনৈতিক কাজটি সার্বভৌম সংঘটিত করে প্রজার ওপর কিন্তু প্রজা সার্বভৌমের কৃতকর্মের কৈফিয়ত দাবী করতে পারে না। সার্বভৌম কৈফিয়ত দিবে ঈশ্বরের কাছে। হবসের চরম সার্বভৌমতত্ত্বে আইনসঙ্গত এবং নৈতিক কার্যাবলী এ দুয়ের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষণীয়। সার্বভৌম কোনো বেআইনী কাজ করতে পারেন এমনটা হবস কোথাও উল্লেখ করেননি। সার্বভৌমকে তিনি নৈতিকতার দায়বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন তা প্রতীয়মান হয় যখন তিনি ঈশ্বরের কাছে সার্বভৌম এবং তার কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহিতার প্রশ্ন রেখেছেন।

হবস দুধরনের সার্বভৌমের উল্লেখ করেছেন। যথা, অর্জিত সার্বভৌমত্ব এবং প্রতিষ্ঠানগত সার্বভৌমত্ব।[৪০] অর্জিত সার্বভৌমত্বকে প্রকৃত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বলা যায়। এধরণের সার্বভৌম ক্ষমতায় স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের বিষয় থাকে। সে সাথে থাকে সবল-দুর্বল, শাসক-শাসিত, ক্ষমতাবান-ক্ষমতাহীন শ্রেণি সম্পর্কের রূপ। অর্জিত সার্বভৌমের উদ্ভব হয় যুদ্ধ অথবা বল প্রয়োগের দ্বারা। এখানে যুদ্ধ (প্রকৃতির রাজ্যের যুদ্ধাবস্থা) বা বলপ্রয়োগকারী শক্তি জনগণের কাছে উচ্চতর শক্তিরূপে প্রকাশ পায়, যাতে জনগণ ভয়ে অর্থাৎ নিজেদের সুরক্ষার জন্য এই সার্বভৌমের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে এবং সার্বভৌমের বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রতিষ্ঠানগত সার্বভৌম শক্তির উত্থান ঘটায় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ নিজেদের রক্ষার জন্য তৃতীয় শক্তির কাছে নিজেদের সমর্পণ করে। প্রাতিষ্ঠানিক বা প্রতিষ্ঠানগত সার্বভৌম বলতে হবস বুঝিয়েছেন– যখন একটি নির্দিষ্ট

সংখ্যক বা কিছু সংখ্যক হবু নাগরিক পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হয় তাদের ওপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য। এ সব ক্ষেত্রে সার্বভৌম নিজে চুক্তির কোনো অংশ নয়। হবস দৃঢ় ভিত্তির ওপর এটা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, প্রজারা সার্বভৌমের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারেনা। কারণ সার্বভৌম যখন ব্যক্তি তাহলে সে ব্যক্তি প্রজাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত। সরকার গঠিত হওয়ার পরও শাসক প্রজাদের সাথে কোনো চুক্তি করলে তা হবে অর্থহীন। শাসক প্রজাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটায়। বিনিময়ে প্রজারা শাসকের ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য। হবস মনে করেন, সার্বভৌমের যেহেতু উদ্ভব ঘটেছে জনগণের চুক্তির মাধ্যমে সেহেতু জনগণের মধ্যে সার্বভৌমের কোনো একক বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকতে পারে না। সার্বভৌম জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়। সাধারণ প্রজা সার্বভৌমের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে বা নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য।[৪১]

প্রাতিষ্ঠানিক সার্বভৌম এবং অর্জিত সার্বভৌমের মধ্যে তফাৎ হবসের কাছে গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচিত হয়নি। উভয় ক্ষেত্রে জনগণ সার্বভৌমের কাছে শাস্তি প্রদানের অধিকার প্রদান করেছে। সার্বভৌম শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে বিচার ও বিবেচনা প্রয়োজন তা করবে এবং সিদ্ধান্ত দিবে। যে কোনো বিবাদ মীমাংসা কিংবা আইন প্রণেতারূপে সার্বভৌম চূড়ান্ত বিচারক। শান্তি কিংবা যুদ্ধের সময় সার্বভৌমের একক অধিকার রয়েছে মাজিস্ট্রেট, মন্ত্রী কিংবা কমান্ডার ঠিক করে শাস্তি এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য।[৪২]

উভয় সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে সম্মতি ব্যতীত সার্বভৌমের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। জনগণ তাদের প্রদত্ত সম্মতি এবং চুক্তিবদ্ধতার মাধ্যমে সার্বভৌমের কাজের এক ধরনের কর্তৃপক্ষ হয়। হবসের মতে, সার্বভৌম (the people অর্থেও হবস নির্দেশ করেছেন) কোনো বিশেষ সদস্য বা প্রজার প্রতি (কমনওয়েলথের) আঘাত দিতে পারবে না। সার্বভৌম কর্তৃক যদি প্রজা আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে তা প্রত্যেক প্রজার ইচ্ছায় হয়েছে ধরে নিতে হবে এবং তাই প্রজারাও অন্যায়ের জন্য সমভাবে দোষী।[৪৩]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্টত দাবি করা যায়, সার্বভৌম তার কাজের জন্য প্রজাদের কাছে দায়বদ্ধ নয়, কোনো জবাবদিহিও করবে না। সার্বভৌম তার কাজের জন্য দায়ি থাকবে তার বিবেকের কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে; যদি সে প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন ঘটায়। এর দ্বারা সার্বভৌমের যে বিষয়টি লক্ষণীয় তাহলো– জনগণ কর্তৃক সার্বভৌমকে দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি যা সার্বভৌমকে অধিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন করে তোলে।

এভাবে সার্বভৌমনামক যে শক্তির উত্থান ঘটে তা এক প্রবলপরাক্রমশালী রাজনৈতিক শক্তি, একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ শক্তি তথা প্রতিষ্ঠানটি এতটা বৃহত্তর যাকে জনগণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে আবার একে ভয়ও করবে। ভয় মিশ্রিত আনুগত্য থাকবে। সার্বভৌম শক্তিকে তিনি উচ্চতর শক্তি বা কমনওয়েলথ বা রাষ্ট্র বা *লেভিয়াথান* নাম দিয়েছেন। এক্ষেত্রে হবসীয় সার্বভৌম শক্তির মাঝে আমরা এক প্রকার মিশ্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি– সার্বভৌম জনগণের কাছে ভয়ের প্রতীক আবার জনগণের ইচ্ছা, সংগ্রাম, ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক। প্রাচীন যুগের বিখ্যাত রাষ্ট্রদার্শনিক কৌটিল্যের শাসক চরিত্র হবসের প্রবল পরাক্রমশালী ক্ষমতার এবং শাসকের সাথে আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। বিশেষত কৌটিল্য এবং হবস উভয়েই চরম ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্র পরিচলনা করার পক্ষপাতী এবং সে সাথে উভয়ের রাষ্ট্রচিন্তায় পাওয়া যায় নৈতিক ভিত্তি; যেখানে লাগামহীন ক্ষমতা স্থিত হয়েছে। অবশ্য এর দ্বারা আমরা চরমক্ষমতার একপ্রকার মৃদু নমনীয়তার লক্ষণ দেখি।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় হবসও ম্যাকিয়াভেলির মতো একটি শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বৈধতা দিয়েছেন। হবস ও ম্যাকিয়াভেলি উভয়েই কর্তৃত্ববাদী জাতীয় রাষ্ট্র (যার মূল ভিত্তি শক্তি) সমর্থন করেছেন। তবে তফাৎ হলো হবসের রাষ্ট্র শক্তিভিত্তিক হলেও তার উৎস জনগণের সমর্থন। হবসের দর্শনে আনুগত্য কেবল বলপ্রয়োগ নয় বরং এর জবাবদিহিতা রয়েছে ঈশ্বরের কাছে যা ম্যাকিয়াভেলির কাছে অনুপস্থিত। ম্যাকিয়াভেলির শক্তিরাষ্ট্র জনগণের আনুগত্যের ভিত্তিতে নয় শাসকের কৌশল ও শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কোনো জবাবদিহিতা (সেটি

ইহজাগতিক বা পারলৌকিক) নেই, শাসকের কোনো নৈতিক মূল্যবোধও লক্ষনীয় নয়। শাসকের ক্ষমতাই ম্যাকিয়াভেলির কাছে শেষ কথা। পক্ষান্তরে হবস কেবল ক্ষমতাতে আবদ্ধ না থেকে সার্বভৌমের এ ক্ষমতাকে জনগণের আনুগত্য তথা সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা দ্বারা শক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন। সার্বভৌম কমনওয়েলথের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। হবস সার্বভৌম ক্ষমতার কোনো বিভক্তিকরণ পছন্দ করেন না। সার্বভৌমের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের লক্ষে হবস কমনওয়েলথের মাঝে অন্য যেকোনো ধরণের সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি কামনা করেছেন। একটি সমাজে তিনি একটি মাত্র সার্বভৌম এবং প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, তা হলো কমনওয়েলথ বা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রতি জনগণ যেরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করবে সেরূপ আনুগত্য অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রদর্শিত হলে তা হবে রাষ্ট্রের জন্য, সার্বভৌমের জন্য অনভিপ্রেত এবং অগ্রহণযোগ্য।

এরিস্টটল যদিও বিভিন্নরকম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতার পক্ষে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু হবস তেমনটা মনে করেননি। কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও হবস রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের অস্তিত্বকেও এধরণের প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন। বলা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি সমর্থন দ্বারা হবস রাজতান্ত্রিক তথা একদলীয় সরকারব্যবস্থাকে সার্বভৌমের ক্ষমতার জন্য যথার্থ মনে করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হবস ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য সামাজিক সংগঠন (অ-রাজনৈতিক হলেও) সমূহকেও ক্ষমতার বলয়ের বর্হিভূত মনে করেন না। কেননা ক্ষমতার জন্য এদের আর্বিভাব। তাই এগুলো কখনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারীও হতে পারে। হবস মনে করেন, সার্বভৌমের অনুমতি ব্যতীত অপর কোনো প্রতিষ্ঠান বা প্রতিনিধির অস্তিত্বশীলতা গ্রহনযোগ্য নয়। তাঁর মতে, সমাজে একটিমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন থাকবে, তা হলো রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের মধ্যে অন্য যেকোনো প্রকার সংগঠন যা নাগরিকদের কাছে আনুগত্য দাবি করে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে হবস বলেছেন উপদল (Faction)।[৪৪] এধরণের উপদল এর তালিকায় কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক সংগঠন, বেসরকারী সংস্থা ইত্যাদি থাকতে পারে, যা নাগরিকের আনুগত্য দাবি করে। সেরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ জনগণ যদি কেবলমাত্র সার্বভৌম ব্যতীত অন্য কারো কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তা রাষ্ট্রক্ষমতাকে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্থ করে। কারণ আনুগত্য প্রাপ্তির ফলে এ সকল উপদল অধিকতর ক্ষমতা লাভ করতে মরিয়া হয় এবং কালক্রমে তা রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে হুমকিরূপে প্রকাশিত হয়। এ সকল ক্ষেত্রে হবসের চিন্তা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় গির্জা বা পরবর্তীতে বিবিধ বনিক সম্প্রদায়, যেমন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা আধুনিককালে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহের খবরদারিবর সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ, যা পরবর্তীতে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী হয়ে ওঠে।

হবসের সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি দিক চিহ্নিত করা যায়। যার এক দিকে আছে সার্বভৌমের অধিকার ও কর্তব্য এবং অন্য দিকে আছে প্রজাদের অধিকার ও কর্তব্য। হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের ধারণায় আমরা যে চরম সার্বভৌমত্বের প্রকাশ দেখি তাতে নাগরিকের অধিকার এবং সার্বভৌমের দায়িত্ব উভয়ের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক।

এ সম্পর্কে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে সামাজিক চুক্তিবাদের আলোচনায় লক্ষ করেছি নাগরিকের পারস্পরিক দায়িত্ব কর্তব্যের রূপরেখা। যেমন– হবসীয় চুক্তিতে আঘাত বা ক্ষতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। হবস আঘাত বলতে বুঝিয়েছেন কোনো কাজের অন্যায্যতা। উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রভু যখন তাঁর ভৃত্যকে কোনো আগন্তুককে অর্থ দিতে বলে কিন্তু ভৃত্য যদি কাজটি না করে তাহলে সে প্রভুর প্রতি আঘাত করলো, কারণ প্রভুকে মান্য করতে সে পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ। পক্ষান্তরে ভৃত্যটির দ্বারা আগন্তুকের যে ক্ষতি হলো আগন্তুকের প্রতি ভৃত্যের কোনো দায়বদ্ধতা

নেই তাই আগন্তুক ভৃত্যের দ্বারা আহত হলো না।আগন্তুকের সাথে যেটা ঘটল সেটাকে আমরা ক্ষতি (damage) বলতে পারি।[৪৫]

হবস মনে করেন যদি চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের কেউ আঘাতের সম্মুখীন হয় (সার্বভৌমের দ্বারা) তাহলে সেটি হবে চুক্তির লঙ্ঘন। রাজনৈতিক চুক্তির অংশরূপে সার্বভৌম নাগরিককে আঘাত করতে পারে না, অথবা নাগরিকের ক্ষতির কারণ হতে পারে না। নাগরিক সার্বভৌমের এমন কোনো আইনকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না যে আইনটি তার বিরুদ্ধে। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তি যদি শাস্তি প্রাপ্ত হয় তবে তা হবে সার্বভৌমের ওপর অর্জিত দায়িত্বের ব্যত্যয় এবং প্রাকৃতিক আইনের লঙ্ঘন। এমনটা করা হলে তা হবে ব্যক্তির প্রতি নয় ঈশ্বরের প্রতি আঘাত। ওয়ারেন্ডার মনে করেন, হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের এ চরিত্রটিকে বলা যায় দায়বদ্ধতা তথা জবাবদিহিতার হস্তান্তর, যা স্বীকৃতি দ্বারা গড়ে ওঠেছে। এই স্বীকৃতিই হবসের রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা তত্ত্বের ভিত্তি গড়ে তুলেছে বলে ওয়ারেন্ডার মনে করেন।[৪৬] এ বক্তব্যে যে দিকটি লক্ষণীয় তা হলো তিনি হবসের চরম সার্বভৌমকে জবাবদিহিতার অধীনে আনলেন। প্রজাদের কাছে থেকে সার্বভৌমের আনুগত্য দাবি এবং প্রজাদের দ্বারা সার্বভৌমের দায়িত্ব পালন দ্বারা এ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা হয়।

হবসের কাছে সার্বভৌমের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় এর দুটি অর্থ পাওয়া যায়। এক অর্থে অধিকার বলতে হবস বুঝিয়েছেন স্বাধীনতা এবং সেই সাথে বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি, যাকে তিনি ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক চুক্তির দ্বারা প্রকৃতির কিছু অধিকারের হস্তান্তর। অন্য অর্থে হবস অধিকার বলতে বোঝান– কোনো কিছুর প্রতি দায়বদ্ধতা এবং একইসাথে অপরের প্রতি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করা। হবস সার্বভৌমের অধিকার প্রদানের পাশাপাশি তাকে দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ক্ষমতার স্থায়িত্বের লক্ষে রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো শান্তি অন্বেষণ এবং প্রজাদের অধিকার সংরক্ষণ করা। পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি হয়ে হবস সার্বভৌম কর্তৃক দায়িত্বের যে সীমারেখা নির্দেশ করছেন তাতে করারোপ পদ্ধতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তির অর্থ সম্পদের পরিবর্তে দ্রব্যের উপযোগিতার আলোকে করারোপের এ সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রে শান্তিস্থাপন ও ব্যক্তির সমতা প্রতিষ্ঠার একটি নতুনতর পদক্ষেপ বলা যায়।

হবসের সার্বভৌমত্বের পর্যালোচনায় সার্বভৌম এবং জনগণ উভয়পক্ষের মধ্যে এক প্রকার পারস্পরিক দায়বদ্ধতা লক্ষণীয়। এ দায়বদ্ধতার সম্পর্কে–সার্বভৌমের প্রতি প্রজাদের দায়িত্ব রয়েছে, অনুরূপ-প্রজাদের প্রতি সার্বভৌমের দায়িত্ব রয়েছে। সার্বভৌমের কিছু অধিকার রয়েছে প্রজাদের ওপর বিপরীতক্রমে প্রজাদের কিছু অধিকার রয়েছে সার্বভৌমের ওপর। কাজেই সার্বভৌমের প্রতি একচ্ছত্র এ ক্ষমতা ও আনুগত্য লাভের প্রশ্নটি এখানে ভিন্ন মাত্রা লাভ করলো বলে মনে হয়। সার্বভৌমের কিছু নির্দিষ্ট অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে। ফলে নাগরিকবৃন্দ যে কোনো সময় সার্বভৌমকে শাস্তির সম্মুখীন করতে পারে না। সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো শান্তি, সুরক্ষা তথা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষে আভ্যন্তরীণ বা বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সার্বভৌম ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। সার্বভৌম সিভিল আইনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এর সাহায্যে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বভৌম ধর্মানুষ্ঠান পালন, সিভিল আইন প্রণয়ণ, নাগরিকের সম্পত্তি রক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহে বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ, শুনানি এবং সিদ্ধান্ত প্রদান দ্বারা বিতর্কের অবসান ঘটাতে পারে। তাছাড়া সার্বভৌম অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সশস্ত্র বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান, করারোপ করতে পারে।[৪৭]

প্রজাদের ওপর করারোপ করার ক্ষমতা হবস অপেক্ষা লকের দর্শনে ভিন্নতর। লকীয় রাষ্টচিন্তায় সার্বভৌম নয় সরকার করারোপ করে এবং অবশ্যই জনগণের সম্মতিতে সরকার তা করতে পারে। জনগণ নির্ধারণ করে কি পরিমান ট্যাক্স তারা দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু হবসের ক্ষেত্রে সার্বভৌম এককভাবে করারোপের ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া

হবসের সার্বভৌম কাউন্সিলর, প্রশাসক, অফিসার, মন্ত্রী-কে নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখে। এ থেকে সার্বভৌমের চরম ক্ষমতার আরেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে জনগণ নয় সার্বভৌম সরাসরি প্রতিনিধি, সরকারী প্রশাসক নির্বাচন করে। তাছাড়া সার্বভৌম সিভিল আইনের সাহায্যে নাগরিকের পুরস্কার ও শাস্তি বিধান করতে পারে; প্রয়োজনীয় আইনের অভাব বোধ করলে নতুন আইন সৃষ্টি করতে পারে; যে আইন কমনওয়েলথের নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক এবং যে আইন রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্মান ও মর্যাদা বিধান করে।[৪৮]

সমতার প্রশ্নে হবস মনে করেন সার্বভৌম আইনের সাহায্যে প্রজাদের সম্পত্তির অধিকারের নিষ্পত্তি বিধান করবে। সমানভাবে কমনওয়েলথের ভার অর্থাৎ ট্যাক্স আরোপ করবে[৪৯] (সমানভাবে বলতে আর্থিকভাবে সমান করারোপ নয়। বরং সুবিধাভোগী এবং সুবিধাবঞ্চিতদের মাঝে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে কর বন্টন করা)। এই করারোপের ক্ষেত্রে প্রজাদের মাঝে সুবিধার তারতম্য হতে পারে। কারো অধিক বা কম সম্পত্তি থাকতে পারে, কেউ বেশি ভোগ বা ব্যবহার করবে, কেউ কম করবে কিন্তু তথাপিও এ নিয়ে ব্যক্তির মাঝে কোনো অসন্তোষ, অশান্তি থাকবে না। এ প্রেক্ষিতে হবস উল্লেখ করেন পরোক্ষ করারোপের পদ্ধতি। যার সাহায্যে সমানুপাতিক হারে সম্পদের ভিত্তিতে নয় বরং প্রজারা কোনো দ্রব্যের মাধ্যমে গৃহীত উপযোগের দ্বারা যে সুবিধা ভোগ করে তার ভিত্তিতে করারোপ করতে পারেন সার্বভৌম।

এছাড়াও সার্বভৌম মুদ্রা প্রবর্তন, নবজাতক উত্তরাধিকারীর সম্পত্তির অধিকার অপরের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু প্রজাদের সংরক্ষণের নিরাপত্তা বিধানে সার্বভৌমের শক্তিরূপে অত্যাবশ্যকীয় অধিকারসমূহ সর্বদা শর্তরূপে অপরিবর্তিত থাকে। হবস মনে করেন সার্বভৌমের সৃষ্টি করা হয়েছে প্রজাদের স্বার্থে, সার্বভৌমের স্বীয় স্বার্থে নয়। প্রজাদের প্রতি সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো তাদের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। সার্বভৌম কর্তৃক প্রজাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ও সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। সার্বভৌম সার্বজনীন আইনের বিধান দ্বারা প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। হবসের কাছে নিরাপত্তার বিধান কেবলমাত্র জনজীবনের সংরক্ষণ নয় এর পাশাপাশি ভালোভাবে বাঁচার উপায়।[৫০] এ কাজটি করতে সার্বভৌম প্রাকৃতিক আইনের বাধ্যবাধকতার দরুন কেবল ব্যক্তি জীবনের সংরক্ষণকে নির্দেশ করেন না পাশাপাশি মানুষের জীবনের অন্যান্য পরিতৃপ্তি সাধন করে থাকেন। যেমন– বিপদ ব্যতীত বা কমনওয়েলথের ক্ষতি না করে একজন মানুষ বা তথা বৈধ শ্রম দ্বারা কোনো কিছু অর্জন করতে পারে।

সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো স্বীয় ক্ষমতা এবং অধিকারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা। যা দ্বারা সার্বভৌম তার শাসিতদের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হবে। এর অংশ হিসেবে সার্বভৌম অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শান্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনে অর্থের বিনিময়ে পর্যাপ্ত সশস্ত্রবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় শাসক সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হবেন। বরং শাসক অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করবেন। সার্বভৌমের দায়িত্ব সম্পর্কে হবস যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হলো যখন নাগরিকদের সুরক্ষার্থে অন্যান্য বৈশ্বিক ঝামেলা এড়াতে যে ধর্মটিকে সার্বভৌম সর্বোত্তম মনে করবেন সে ধর্মটিকে প্রতিষ্ঠা করবেন।[৫১] আধুনিককালে ম্যাকিয়াভেলি রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করেছিলেন এবং তিনি নাগরিকের স্ব ধর্মবিশ্বাসের ওপর ধর্মপালনের সুযোগ দিয়েছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় হবস যদিও কর্তৃত্ববাদী জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন সে সাথে সার্বভৌমের কাছে ধর্মীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বর্তেছে রাষ্ট্রের সুরক্ষার অংশরূপে। সুরক্ষা ও জবাবদিহির প্রশ্নে শাসক (যাকে হবস সার্বভৌম বলেছেন) ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

ওয়ারেন্ডার মনে করেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হবসীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ লেইসে-ফেয়ার নীতিকে প্রয়োগ করে না।[৫২] তবে হবসের শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় সবল এবং অলসদের কাজ করতে বাধ্য করা হবে এবং দুর্বল ও

দরিদ্রেদের রাষ্ট্রকর্তৃক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা হবে। হবস রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের দুর্ঘটনা বা দুর্যোগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দাতব্য সেবার ব্যবস্থা করা বা সাহায্য করাকে সমর্থন করেন না। বরং সে সকল জনগণের জন্য কমনওয়েলথের আইন দ্বারা প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্র গ্রহণ করবে।[৫৩] হবসের এধরণের পদক্ষেপে এটা প্রতীত হয় যে তাঁর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে বিত্তহীন শ্রেণির সুরক্ষার ব্যবস্থা সীমিত পরিসরে হলেও রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্র কেবল আনুগত্য আশা করে না, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রজাদের প্রতি সদয় ও মানবিক আচরণও করে থাকে।

সার্বভৌম তথা শাসকের দায়িত্ব হলো ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা করা এবং সেক্ষেত্রে তার প্রজারা যেন কোনো বৈষম্যের স্বীকার না হয় তা তদারক করা। এ ক্ষেত্রে হবসের সার্বভৌমের ভূমিকা প্রশংসনীয়, যাতে রাষ্ট্রের সকল প্রজার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সার্বভৌম তার ক্ষমতার দ্বারা সকল শ্রেণির জনগণের ন্যায়পরতা বিধানের চেষ্টা করবে। ন্যায়পতার নিশ্চয়তা দ্বারা সার্বভৌম জনগণ বা প্রজা সাধারণের ক্ষতির দিকটির প্রতি লক্ষ রাখবে যাতে তারা ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।

হবসের সামাজিক চুক্তিবাদের আলোচনায় আমরা লক্ষ করি রাজনৈতিক সমাজের গোড়াপত্তনের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় জনগণ তাদের কিছু অধিকার ত্যাগ করে। কিন্তু সকল প্রকার অধিকার ত্যাগ করেনি। যে সকল অধিকার তারা ত্যাগ করেনি তার মধ্যে ছিল নিজেকে পরিচালনা করার অধিকার, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া অধিকার, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন– বাতাস, পানি ইত্যাদি উপভোগ করার অধিকার– এ জাতীয় বিভিন্ন অধিকার, যা ছাড়া একজন মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।

সার্বভৌম যদি তার নাগরিককে উপযুক্ত অধিকার সমূহের বিরোধী অধিকার ত্যাগ করার কোনো নির্দেশ দেয়, যেমন– ব্যক্তির নিজেকে আঘাত বা হত্যা করা অথবা অপরের আক্রমণ প্রতিহত না করা অথবা জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অধিকার উপভোগে বাধা দেয় তাহলে বুঝতে হবে সার্বভৌম ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অমান্য করছে। হবস মনে করেন কোনো অভিযুক্ত প্রজা তার দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নয় যতক্ষণ না সে ক্ষমার নিশ্চয়তা পায়। হবসের এ বক্তব্যটি দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, জনগণ সার্বভৌমকে আঘাত করার অধিকার দেয় না অথবা ব্যক্তির নিজেদের শরীরের পরিচালনার অধিকার তার রয়েছে– যা মূলত ব্যক্তির প্রাকৃতিক স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। হবস মনে করেন দুটি ক্ষেত্রে একজন সার্বভৌমের আদেশ অমান্য করলেও তা অন্যায় হবে না–[৫৪]

১. ব্যক্তি যখন নিজেকে মৃত্যু ঝুঁকিতে দেখে সে অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করা একজন ব্যক্তির অধিকার রয়েছে;
২. ব্যক্তি কিছু কিছু কাজ করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে (যেমন– অপরকে হত্যা না করা, অপমানজনক ও বিপদজনক কোনো কাজে রত না হওয়া ইত্যাদি)। যদি না ব্যক্তির এধরণের অস্বীকৃতির ফলে একটি রাজনৈতিক চুক্তি সমাজের ধ্বংসের কারণ হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির উক্ত কোনো কাজের অস্বীকৃতি যদি সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয় তবে ব্যক্তি সার্বভৌমের আদেশ অমান্য করতে পারে।

একজন সার্বভৌমের প্রতি তার নাগরিকের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান যতক্ষণ সার্বভৌম ব্যক্তির সুরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে একজন ব্যক্তির আনুগত্য হ্রাস পেলেও সার্বভৌমের অধিকার অক্ষুন্ন থাকে। সার্বভৌমের অধিকার ব্যক্তির আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ এবং শাস্তি প্রদানের দ্বারা সিভিল আইন মান্য করার আনুগত্য সৃষ্টি করে। সিভিল আইনের এধরণের অনুশাসন মান্য করার পেছনে ব্যক্তির যেমন নিরাপত্তার অন্বেষণ থাকে তদ্রুপ থাকে শাস্তির ভীতি। এতে মানুষ স্বীয় স্বার্থে আইন মান্য করে অন্যথায় আইন ভঙ্গের দায়ে শাস্তির মুখোমুখি হবে। সিভিল আইন সার্বভৌমের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিরূপে কাজ করে– যার দ্বারা রাষ্ট্রের নাগরিককে কোনো কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করা যায়। সার্বভৌমের উপস্থিতিতে

হবসের সান্তনা এরকম যে, সার্বভৌমের ক্ষমতার ব্যবহার গৃহযুদ্ধের চেয়ে কম ক্ষতিকারক অথবা আরো গভীরভাবে বলা যায় সার্বভৌমকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।[৫৫]

যদি জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বভৌম ব্যর্থ হয় তাহলে জনগণ আইন অমান্য করবে, বিপরীতক্রমে জনগণের দায়বদ্ধতা বজায় থাকবে। কাজেই এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলা যায় যে হবসের সার্বভৌমতত্ত্বে দায়বদ্ধতার দ্বারা নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয় না বরং বলা যায় নিরাপত্তাহীনতা দায়বদ্ধতাকে বাতিল করে বা ব্যর্থ করে দিতে পারে।[৫৬]

হবস চুক্তিবাদের প্রচলিত ধারণার সাথে হবসের মতের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণত চুক্তি সম্পাদিত হতো শাসক এবং শাসিতের মাঝে। উভয় পক্ষ কিছু নির্দিষ্ট শর্ত, বিধিমালার আলোকে কার্যপরিচালনা করতো। আবার এসব শর্ত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভঙ্গও করা যেত। চুক্তিবাদের এ সকল পূর্ববর্তী ধারণার বিপরীতে হবস ভিন্নমত পোষণ করেন। হবসের মতে রাজনৈতিক চুক্তি শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনো শর্তের অংশ হতে পারবে না। শাসক জনগণের চুক্তির মাধ্যমে গঠিত ও সৃষ্ট ব্যক্তির সমাহার, যা চুক্তিবদ্ধ জনগণের বা চুক্তি স্বাক্ষরকারী গোষ্ঠীর অংশ নয়। সার্বভৌম জনগণের সম্মিলিত চুক্তির প্রকাশ। সার্বভৌমের প্রকাশে জনগণ রাজনৈতিক পরিচয় প্রাপ্ত হয়। হবস রাজনৈতিক কর্তৃত্বরূপে জনগণ এবং ব্যক্তি গোষ্ঠীরূপে জনগণের মাঝে পার্থক্য করেন।[৫৭]

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের অন্যতম মুখ্য বিষয় হলো দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। জবাবদিহিতার বাইরে হলেও সার্বভৌমের জনগণের নৈতিক অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি নেই। সার্বভৌমের প্রজারূপে হিসেবে, রাষ্ট্রের সভ্যরূপে একজন নাগরিক যদি অপর নাগরিককে আঘাত করে, যদি চুক্তি বা প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ আনা যায়, কিন্তু সার্বভৌমের সকল প্রজা যদি এধরণের করে তাহলে বলা যায় সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য যা সার্বভৌমের জন্য নাগরিকের পক্ষে চুক্তির মূলশর্ত তা বিলুপ্ত হয়েছে। তাছাড়া যদি প্রাকৃতিক আইনের আলোকে বিচার করা হয় সেখানে প্রাকৃতিক আইনের প্রথম সূত্রটিই হলো শান্তি অন্বেষণ করা। সার্বভৌমের প্রতিষ্ঠা করা হয় শান্তি অন্বেষণের লক্ষ্যে। সার্বভৌমের বিলুপ্তি সমাজকেই বিলুপ্ত করে দিবে। সকল নাগরিক যদি চুক্তির অবলুপ্তিতে একমত হয় তাহলে প্রাকৃতিক আইনের তৃতীয় শর্ত অনুযায়ী সার্বভৌমের কোনো নৈতিক দায় থাকে না। এর দ্বারা সার্বভৌমের প্রাতিষ্ঠানিক দিক তথা প্রাতিষ্ঠানিক সার্বভৌমকে নির্দেশ করা হয়েছে। কাজেই প্রাকৃতিক আইনের শর্তসমূহের আলোকে যদি বিচার করা হয় তাহলে বলা যায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে সাধারণ দায়বদ্ধতা তার আলোকে নাগরিকদের সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত।

যদিও হবস মনে করেন সকল প্রজা সার্বভৌমের বিরুদ্ধে একত্রিত হবে– সকল নাগরিক বা প্রজার পক্ষ থেকে সার্বভৌমের প্রতি এমন আচরণ হওয়াটা প্রায় অসম্ভব। এক্ষেত্রে সংখ্যাধিক জনগণ যদি সার্বভৌমের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় তা শেষ কথা নয়, সংখ্যাধিক জনগণের বাইরেও কিছু জনগণ থাকতে পারে যারা অধিকাংশের মতের সাথে এক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ নাও করতে পারে। এধরণের অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে সার্বভৌমের অবস্থান কি হতে পারে? সার্বভৌমের অধিকার যদি কেবল মাত্র চুক্তির উপরে নির্ভরশীল হয় যা নাগরিকদের পরস্পরের মাঝে সংঘটিত হয়েছে, তাহলে সার্বভৌমের আধিপত্য থেকে খর্ব হতে পারে। হবসের মতে নাগরিকদের পরস্পরের দ্বারা সম্পাদিত চুক্তির প্রতি বাধ্যতার পাশাপাশি অতিরিক্ত বাধ্যতার বিষয়টিও জড়িত। হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য হলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধতার দরুণ সৃষ্ট সরকার ও সার্বভৌমের অধিকার কেবলমাত্র আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। জনগণের প্রতি আদেশ দাতারূপে সার্বভৌমের একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে সমস্ত অধিকার ব্যক্তি কেবল স্বীয় সুযোগ-সুবিধার জন্য ভোগ করতো তা পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুযোগ-সুবিধা থেকে সার্বিক সুবিধায় রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধাকে ব্যক্তি চুক্তির মাধ্যমে সাধারণের সুবিধায় রূপ দিলো। সামাজিক চুক্তির দ্বারা জনগণ পরস্পর স্বীয় অধিকার সমর্পণ দ্বারা সার্বভৌমের আদেশ মান্য করতে সম্মত হলো। অবশ্য পরবর্তীতে হবস

সার্বভৌমের প্রতি দায়বদ্ধতার শর্তকে বিস্তৃত করেছেন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার (Sufficient security) মধ্যে।[৫৮] যা পূর্বের মতো প্রাকৃতিক আইনের কেবলমাত্র প্রথম সূত্রটিতে সীমাবদ্ধ রইলো না। 'পর্যাপ্ত নিরাপত্তা' শব্দদ্বয়ের সাথে আইনের একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। যেমন– যথাযথ নিরাপত্তা প্রাপ্তির জন্য ব্যক্তির অবশ্যই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। কেবলমাত্র চুক্তিতে সরাসরি অংশগ্রহণকারী সদস্য মাত্র নয় বরং এর বাইরেও যারা চুক্তির মাধ্যমে সুবিধাভোগী শ্রেণি কিন্তু সরাসরি যারা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি তারাও সার্বভৌমের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। হবস সার্বভৌমকে কেন চুক্তির বাইরে রাখলেন তার একটি কারনে হতে পারে তিনি সার্বভৌমকে চুক্তির উর্দ্ধে রেখে তাকে দায়মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের এ যাবৎ আলোচনায় লক্ষ করা যায় কেবলমাত্র নির্দেশ প্রদান এবং জীবনের নিরাপত্তা বিধানই সার্বভৌমের একমাাত্র দায়িত্ব নয়। নিরাপত্তা বিধানে কেবলমাত্র জীবনের রক্ষণাবেক্ষণই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি জীবনের অপরাপর পরিতৃপ্তি বিধান ও ভালোভাবে জীবনযাপনও গুরুত্ব পেয়েছে সার্বভৌমতত্ত্বে। সার্বভৌমের দায়িত্বের বিস্তারিত আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়ে সার্বভৌমের ভূমিকা, প্রজার উন্নতি ও নিরাপত্তাবিধানে সার্বভৌমের বাধ্যবাধকতা, আইনের সমপ্রয়োগ এবং প্রজার স্বাধীনতার সংরক্ষণ।

লকের ধারণা

জন লকের কাছে টমাস হবসের মতো কোনো সুসংবদ্ধ সার্বভৌমতত্ত্ব পাওয়া যায়নি বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৫৯] তাঁর সার্বভৌমতত্ত্ব হবসের মতো খুব একটা সুস্পষ্টও নয়। লকীয় সার্বভৌমতত্ত্বে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে কার কাছে– এটি কি জনগনের কাছে নাকি রাজার কাছে নাকি পার্লামেন্ট বা আইনসভার কাছে তা সুস্পষ্ট করতে পারেনি বলে মনে হয়। তাঁর সার্বভৌমের আলোচনায় তিনি কখনো এই ক্ষমতা জনগণের কাছে আবার অংশত এই ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছে অর্পণ করেছেন এমনটা মনে হয়। যেমন, লক তাঁর *Second Treatise On Civil Government* গ্রন্থের ১৪৯নং অনুচ্ছেদে সার্বভৌম শক্তি আইনসভার কাছে সমর্পণ করেছেন।[৬০] তার মতে, একটি সুগঠিত কমনওয়েলথে সার্বভৌম শক্তি থাকবে কেবলমাত্র আইনসভার কাছে। বলা যায় আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সকলেই আইনসভার অধীনস্থ।

পরবর্তীতে তিনি আইনসভার কাছ থেকে সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করেন জনগণের হাতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো – যেহেতু আইনসভা কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এটি একটি আস্থাভাজন শক্তি (Fiduciary power), সেহেতু সার্বভৌমের মূল ক্ষমতা থাকবে জনগণের হাতে। জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদানের ফলে জনগণ চাইলে আইনসভার সংশোধন অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের পরিবর্তন, পরিবর্ধন তথা ক্ষমতাচ্যুতি ঘটাতে পারে। আইনসভা যদি জনগণের বিশ্বাস অর্জনে ব্যর্থ হয় বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে, জনগণের চাহিদা পূরণ করতে না পারে অথবা জনগণের লক্ষ পূরণে সফল না হয় তাহলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুন জনগণ আইনসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।[৬১] লক প্রথমে আইনসভাকে কমনওয়লথের সার্বভৌম শক্তির অধিকারী বলেছেন। আবার, পরবর্তীতে দাবি করেন, জনগণ আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারে কারণ জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

সামাজিক চুক্তির ফলে লকের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ যে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তুলেছিল – সে সমাজে সরকার ছিল মূলত অর্থাৎ অছি বা জিম্মাদার। এই ট্রাস্টি সরকারের সাথে এর কোনো চুক্তি হয় নি, কিন্তু তবুও জনগণ এধরণের ট্রাস্টকে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে ভেঙ্গে দিতে পারে। এ যখন অবস্থা এতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি হবসের মতো লক সার্বভৌমের চরম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

সার্বভৌমের প্রকৃত দাবীদার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বা বিভ্রান্তি নিরসনে লকের কাছে সার্বভৌম ক্ষমতার দুটি ধাপ লক্ষ করা যায়। প্রথম ধাপে আছে আইনসভা। আইনসভাকে তিনি প্রথমেই গ্রহণ করেছেন একটি আস্থাভাজন শক্তিরূপে। আইনসভার কাজ স্বাভাবিকভাবেই জনগণের আস্থা রক্ষা করা। জনগণের আস্থা রক্ষিত না হলে অর্থাৎ কোনো কারণে চুক্তি ভঙ্গ করলে কিংবা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গ করলে কিংবা প্রতিশ্রুত শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ আইনসভার আস্থা হারায় এবং তাহলে জনগণ আইনসভাকে ভেঙ্গে দিতে পারে। কাজেই এটি স্পষ্ট যে আইনসভা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে জনগণ দ্বারা, জনপ্রতিনিধি বা সরকার দ্বারা নয়। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বে সার্বভৌম ক্ষমতার একক অধিকারী হবেন রাজা। আর লকের কাছে জনগণ বা সমাজ (Community) স্থায়ীভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধারণ করবে। জনগণকে তাদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের মতো প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করা হলে আইনসভা তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব কিংবা চুক্তির শর্তভঙ্গের মতো অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে বলে লক মনে করেন।[৬২] যদি এমনটা করা হয় তাহলে জনগণ তা প্রতিহত করবে এবং এর অংশরূপে জনগণ আইনসভা ভেঙ্গে দিতে পারে। কাজেই কোনো একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংস্থা বা গোষ্ঠীর কাছে নয় বরং সমগ্র জনগণ তথা সমাজের ওপর লক সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন বলা যায়।

আইনসভা যদিও কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর তবে এটা কোনো ব্যক্তির জীবন ও ভাগ্যের বা জীবিকার ওপর চরম স্বেচ্ছামূলক বা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না।[৬৩] তাই কমনওয়েলথে আইনসভা সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সংস্থা হলেও স্বেচ্ছাচারী হতে পারবে না। আইনসভার কাজ গঠনমূলক হবে ধ্বংসাত্মক নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লক সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং আইনসভার উৎসকে সমার্থকরূপে ব্যবহার করেছেন।[৬৪] আইনসভার উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান করা। প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ ক্ষুন্ন হলে আইনসভার প্রয়োজনীয়তা বা কার্যকারিতা দুটোই ক্ষুন্ন হয়। এ সকল অধিকার রক্ষার্থে আইনসভা বিচারকদের রায়, প্রথা, পক্ষ, ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠিত আইন দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করবে। আইনসভার সদস্যগণ জনগণের মধ্যে থেকে আগত। তাই সমাজের সাধারণ জনগণের যেসকল ক্ষমতা নেই (অপরের জীবন ও সম্পত্তি হানি করা) তেমন ক্ষমতা আইনসভার সদস্যবৃন্দের থাকবে না। বিচারকের রায় ইত্যাদির পাশাপাশি লক আইনসভার পরিচালনার জন্য লিখিত আইনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আইনসভাকে লক সর্বোচ্চ শক্তি এবং আস্থাভাজন সংস্থা বলেছেন আবার তিনি লিখিত আইন বা সংবিধান দ্বারা এর কার্যাবলি পরিচালনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আইনসভাকে লিখিত আইনের দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করা মূলত সংবিধানের সাহায্যে পরিচালনাকে নির্দেশ করা হয়েছে।[৬৫] তাই একে সংবিধানতন্ত্র বলা যায়।

লিখিত আইনের প্রতি লকের গুরুত্বারোপের কারণ স্পষ্ট। কারণ প্রকৃতির রাজ্যের আপাত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যে জিনিসটির অনুপস্থিতি ব্যক্তির শান্তিময় স্বাভাবিক জীবনের ছন্দপতন ঘটায়, জীবনকে অশান্ত করে তোলে তা হলো কোনো সুস্পষ্ট আইনের অভাব। এবং সে আইনের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী। আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সর্বোপরি প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রাপ্তির আশায় লকীয় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ রাজনৈতিক সমাজের উত্থান ঘটায়। লিখিত আইন এবং আইনসভা উভয়ই লকের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়সমূহ প্রকৃতির রাজ্য এবং রাজনৈতিক সমাজের মাঝে পার্থক্য তৈরি করে। আইনসভার অনুপস্থিতি প্রকৃতির রাজ্য ও রাজনৈতিক সমাজ তথা সিভিল সোসাইটির জন্য পার্থক্যসূচক ভূমিকা রাখে। একারণে লকের রাজনৈতিক চিন্তায় বা রাষ্ট্রদর্শনে সংবিধান পদ্ধতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তদ্রুপ ব্রিটেনের সাংবিধানিক রাজনৈতিক চিন্তার পটভূমিতে এর ভূমিকা সুদূরপ্রসারী।

লক সাধারণ জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতাকে অর্পণ করে আইনসভার কর্তৃত্ব হ্রাস করেছেন। এতে আইনসভার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। একে সার্বভৌম ক্ষমতার বিভক্তি না বলে জনগণের কাছে হস্তান্তর বলা যায়।

আইনসভার মূল কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োগ করা। আইনসভার এ দায়িত্ব হস্তান্তরযোগ্য নয়। কমনওয়েলথের জনগণ আইনসভার কাছে আইন প্রণয়ণের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। জনসাধারণের অনুমতি সাপেক্ষে এ দায়িত্ব আইনসভা হস্তান্তর করতে পারে, অন্যথায় নয়।[৬৬] এজন্য আইনসভা জনগণের আস্থাভাজন সংস্থা তথা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। আইনসভার রদবদল তথা পরিবর্তনের ক্ষমতা লক জনগণের কাছে সমর্পণ করেছেন বলে জনগণ যেকোনো সময় আইনসভার পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিংবা ভেঙ্গে দিতে পারবে সে সকল ক্ষেত্রে লক জনগণকে সতর্ক করেছেন। যদিও আইনসভার মেয়াদকাল এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনগণের (সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী) ওপর তবুও জনগণ যথেচ্ছাভাবে আইনসভা ভেঙ্গে দিতে কিংবা সদস্যদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেনা। (বলা বাহুল্য, লক পূর্বেই মত প্রকাশ করেছেন আইনসভার সফলতা নির্ভর করে প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা দানের ওপর, অন্যথায় আইনসভা জনগণের কাছে তার বৈধতা হারায়।)

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে লকের সার্বভৌমতত্ত্বের অন্যতম পার্থক্য হলো– হবস জনগণের পরিবর্তে একক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের একটি সার্বভৌম ক্ষমতা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে লক রেখেছেন জনগণে হাতে। লকের সার্বভৌম চিন্তায় রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সংহতি রক্ষা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার সুরক্ষা। হবসের কাছে সার্বভৌমের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষা। পক্ষান্তরে হবস লকের মতো প্রাকৃতিক অধিকার সংরক্ষণে সার্বভৌমকে সুস্পষ্ট বাধ্যবাধকতার অধীন না করলেও হবস জনগণের বা প্রজাসাধারণের আঘাতের বিষয়টি বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন।

লকের সার্বভৌমতত্ত্বে স্পষ্টতই জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার সংরক্ষণের নামে পুঁজিবাদী স্বার্থ সংরক্ষণেই লক অধিকতর উদ্যোগী হয়েছেন বলে আমরা মনে করি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ দ্বারা রাজনৈতিক গতি প্রবাহ নির্ধারণ করেছেন। হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বের প্রাণশক্তি হলো ঐক্যবদ্ধতা। সামাজিক চুক্তির দ্বারা জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সার্বভৌম শক্তির সৃষ্টি করেছে। পক্ষান্তরে লকের সার্বভৌমতত্ত্বের প্রাণ হলো জনগণের সম্মতি। তাছাড়া হবসীয় সার্বভৌমতত্ত্বে শক্তির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে যা লকের সার্বভৌমে গুরুত্বপূর্ণ নয়। হবসীয় সার্বভৌমে জনগণ তাদের অধিকার সমর্পণ করেছে সার্বভৌমের কাছে কিন্তু লকীয় সার্বভৌমে জনগণ তাদের অধিকার নিজেদের কাছে রেখেছে। নিজেদের শাসনভার পুরোপুরি অপরের ওপর সমর্পণ করেনি। হবসীয় সার্বভৌমে শাসকের কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয় পাশাপাশি নৈতিক বাধ্যবাধকতাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লকীয় বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্র হলো অর্থনৈতিক।

প্রশ্ন আসতে পারে, জনগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করেও লক আইনসভাকে এত গুরুত্ব প্রদান করেছেন কেন? এর পেছনে একটি কারণ প্রতীত হয়, জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা। তাছাড়াও লক তৎকালীন ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে এটি মনে করেন যে শাসন পরিচালনার পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ণ ক্ষমতাটি সর্বোচ্চ এবং বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আইনবিভাগ কর্তৃক আইনপ্রনয়ণে শাসনবিভাগ অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তিনি শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ উভয় বিভাগের ক্ষমতাকে সীমিত করেছেন। কোনো প্রকার স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা উভয় বিভাগ কিংবা জনগণ কাউকে দেননি লক।

লক লিখিত আইনের ওপর তথা সংবিধানতন্ত্রের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তাৎক্ষনিকভাবে আইনবিভাগ কর্তৃক কোনো নির্দেশ জারী (decree) বা বলবৎ করার মাধ্যমে শাসন করাকে সর্মথন করেননি।[৬৭] যেহেতু এক্ষেত্রে আইন লিখিত নয় তাই আইনবিভাগ চাইলেই বিনা অনুমতিতে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে জনগণের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অধিগ্রহণ করতে পারে না। আইনবিভাগ তার ক্ষমতা অপর কোনো সংস্থা বা ব্যক্তির কাছে সমর্পণ করতে পারবে না। এভাবে জনগণ তথা সমাজ আইনবিভাগের হাতে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয় তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। লকের কাছে আইনসভা হলো জিম্মাদারমূলক (Fiduciary) সংস্থা। সার্বভৌম ক্ষমতা

জনগণের হাতে থাকার দরুন আইনসভা তার ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা এবং দায়িত্বের পরিপন্থী কোনো কাজ করলে জনগণ আইনসভাকে পরিবর্তন করতে পারে।[৬৮] আইনসভার কাজ যেখানে আরোপিত বা জিম্মাদারমূলক শাসনবিভাগের কাজ সেক্ষেত্রে বিশেষাধিকারমূলক যা আইনসভার ওপর নির্ভরশীল। শাসন বিভাগের কার্যাবলী আইনসভার ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা বিশেষ ক্ষমতা (Prerogative) আইন দ্বারা সীমিত হয়ে পড়ে।[৬৯] লক বিশেষ ক্ষমতা বলতে বোঝান, বিশেষ ক্ষমতা হলো কোনো নিয়মব্যতীত জনগণের ভালো করার ক্ষমতা, আর কিছু নয়।[৭০] আইনসভা ও শাসনবিভাগের মাঝে স্বাধীনতা বজায় রাখার স্বার্থে ক্ষমতার আংশিক পৃথকীকরণ দেখা যায়। আইনসভা লকের সার্বভৌমতত্ত্বে একটি ট্রাস্ট (Trust) রূপে ক্রিয়াশীল বলা যায়। আইনসভাকে পূর্ণ স্বাধীনতা না দেওয়ার পেছেনে লকের মনে কাজ করেছে ইংল্যান্ডের তৎকালীন পার্লামেন্টের কিছু অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা।[৭১] তিনি লক্ষ করেছেন রাজা জনগণের কাছ থেকে পার্লামেন্টের মাধ্যমে প্রাপ্ত চরম আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপ্লবের সূত্রপাত করেছেন। হবসের কাছে রাজার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার চরম রূপ পরিলক্ষিত হলেও লকের কাছে তা বিপরীত রূপ লাভ করেছে। লকের কাছে জনগণ কর্তৃক বিপ্লবের নৈতিক অধিকার সমর্থিত হয়েছে। হবসের কাছে আইনসম্মত ও নৈতিক প্রত্যয় দুটি ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও লকের কাছে এ সকল প্রত্যয় মোটামুটি একই অর্থ বহন করে। যা আইনসম্মত তা নৈতিক ও তা সঠিক। লক মনে করেন স্বাভাবিক আইন, রাষ্ট্রীয় আইন ও নৈতিক আইন একই সমগ্রের অংশ থেকে উদ্ভূত এবং এমন কিছু মৌলিক আইন রয়েছে যা আইনসভা কর্তৃক সৃষ্ট নয়।[৭২] তাই বিপ্লবোত্তর পার্লামেন্টে ইংরেজ আইনের বেশ কিছু রীতিনীতি অবলুপ্ত হলেও নৈতিক সীমাবদ্ধতাসমূহ বহাল ছিল। স্যাবাইন মনে করেন, 'সম্ভবত আমেরিকায় সাংবিধানিক বিধান ও বিধিবদ্ধ আইনের সঙ্গে সাধারণ আইনও গনভোটের দ্বারা প্রণীত বিশেষ আইনের পার্থক্য ছিল লকের চিন্তাভাবনার কাছাকাছি।'[৭৩]

আমরা সচরাচর মন্টেস্কুকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তারূপে জেনেছি। কিন্তু **১৮৩৬** সালে জার্মান লেখক কার্ল আর্নেস্ট জ্যাকে (Carl Ernst Jarcke) মন্টেস্কুর পরিবর্তে জন লককে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা উল্লেখ করেন।[৭৪] সে সূত্রে মন্টেস্কুকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিষয়ে লকের কাছে ঋণী বলা যায়। লক আইনসভার ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, "সকল কমনওয়েলসমূহের প্রথম এবং মৌলিক পজেটিভ আইন হলো আইন প্রনয়ণের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা যা কেবলমাত্র কমনওয়েলথের সর্বোচ্চ ক্ষমতা হবে না সে সাথে হবে পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় যা সমাজ বা জনগণের হাতে একবার প্রতিস্থাপিত হয়েছে।[৭৫]

লক তার সার্বভৌমতত্ত্বে আইনসভা কিংবা শাসনবিভাগ কারো কাছে অপরিসীম ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেননি।[৭৬] তিনি ক্ষমতার এ ধরণের ব্যবহারকে স্বৈরাচারী (arbitrary power) বলেছেন এবং এ ধরণের একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রয়োগ তিনি সার্বভৌমের হাতে দেননি। লকীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে সার্বভৌমের কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলেনি যদিও বিভিন্ন আলোচনায় তিনি প্রসঙ্গক্রমে সার্বভৌম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সতের শতকের ইংল্যান্ডের সংসদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। যদিও গৃহযুদ্ধের দ্বারা হাউস অব কমনস ডি ফ্যাক্টো সার্বভৌমের প্রয়োগ করে। তবে লকের সময়কালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে রাজার ক্ষমতা হবসীয় সার্বভৌম ক্ষমতার মতো অবিভাজ্য বা চরম ছিল না।

লকের রাজনৈতিকতত্ত্বের প্রভাব কেবল ইংল্যান্ডের নয় রুশোর মাধ্যমে তা ফ্রান্সেও, স্যামুয়েল এডামসের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকার কলোনীসমূহে, থমাস জেফারসন দ্বারা আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে এর প্রভাব বিস্তৃত হয়।[৭৭]

জনগণ সকল অধিকার ভোগ করতে পারত কারণ তাদের প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক অধিকার ছিল। জনগণের কাছে শাস্তির অধিকার থাকলেও শাস্তি প্রদানে তারা কিছু অসুবিধার সুম্মখীন হলো। লক্ষ করার বিষয় হলো প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের অধিকার রাজনৈতিক সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়, তাই লকীয় সার্বভৌমতত্ত্বে

সরকার বা আইনসভা সেসকল অধিকার হরণ করতে পারে না। লক সার্বভৌম সম্পর্কিত আলোচনায় মূলত আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এর বাইরে তিনি আরো একপ্রকার বিভাগের কথা বলেছেন তা হলো ফেডারেটিভ বিভাগ। যা মূলত বাহ্যিক সম্পর্কসমূহ নিয়ে কাজ করে। ফেডারেটিভ বিভাগকে লক ততটা গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেননি যা তিনি আইনসভা ও শাসনবিভাগের ক্ষেত্রে করেছেন। তিনি এ দুটো বিভাগকে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত মনে করেছেন।

লকের সার্বভৌমতত্ত্বে আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু সার্বভৌমই নয় কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আইনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[৭৮] তাঁর কাছে আইন কেবলমাত্র যুক্তির ফল কিংবা ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। মাঝে মাঝে লক প্রাকৃতিক আইনকে প্রজ্ঞা বা যুক্তিরূপেই চিহ্নিত করেছেন। তিনি আইনকে মানুষের যৌক্তিক প্রকৃতির সাথে সম্প্রীতিপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। লক হবস ও অস্টিনের মতো প্রাকৃতিক আইন কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ মনে করেননি। তিনি মনে করেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অবশ্যই যৌক্তিক হবে। কাজেই যা কিছু ভালো নয় তা ঈশ্বর পছন্দ করেন না। লকের কাছে প্রাকৃতিক আইন ও নৈতিকতা সমান্তরালে চলে। নৈতিক প্রবৃত্তি, কোনো জিনিসের প্রকৃতি এবং শাশ্বত আইন এগুলো মানুষের অসৎ ইচ্ছার দ্বারা গৃহীত হওয়া উচিত নয়। লকের কাছে প্রাকৃতিক আইন কেবলমাত্র নৈতিক বিধি নয়, এটি সত্যিকার অর্থে বাস্তবিক আইন। তাই এই আইন যে কোনো মানুষ, আইনপ্রণেতা বা যে কারো কাছে শ্বাশ্বত আইন রূপে গৃহীত।[৭৯]

লক একটি রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে সার্বভৌম রূপে চিত্রিত করতে চান না, এতে তিনি স্বৈরাচারের আশঙ্কা করেন। রঘুবীর সিং মনে করেন, লকের আইনসভার চূড়ান্ত ক্ষমতার অপসারণ কিংবা পরিবর্তনের ক্ষমতা জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা জনসার্বভৌমত্ব দ্বারা করা হয় এমন ভাবনা ভুল।[৮০] লক মনে করেন যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান তাহলে জনগণ এই ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান তাহলে আইনসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যদিও লক কমিউনিটির ওপর কিছুটা আধিপত্য দিয়েছেন, তবুও দুটো ক্ষেত্রের মাঝে তিনি পার্থক্য করেছেন। তিনি মনে করেন, 'In Loke's scheme of social organization community is in no way the final arbiter.'[81] এ বক্তব্যের সাথে আমরা সাদৃশ্য টানতে পারি বার্কারের মতের। বার্কার মনে করেন, লকের সার্বভৌম চিন্তায় চূড়ান্ত সার্বভৌম হলো প্রাকৃতিক আইন। বার্কারের মতে, "when the community acts in the last resort, in some rare and great event of oppression, as master of its own fate, it acts in the name, and on behalf, of this final majesty."[82]

হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে লকীয় সার্বভৌম চিন্তার মূল তফাৎ হলো – হবস পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ধারাকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর কাছে সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। রাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হবসের কাছে চরম ক্ষমতার সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং এ ক্ষমতার একমাত্র অধিকারি রাজা তথা রাষ্ট্র বা *লেভিয়াথান*। জনগণের কাছে শাসকের তেমন দায়বদ্ধতা ছিলো না।

পক্ষান্তরে লকের সার্বভৌম সম্পর্কিত বিশ্লেষণে আমরা রাজা বা শাসকের জবাবদিহিতা দেখতে পাই। শাসক জনগণের কাছে তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে । বলা যায়, শাসক জনগণ অপেক্ষা শক্তিশালী নয়। লকের দর্শনে রাষ্ট্র কিংবা শাসক নয় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক। লকের সার্বভৌম চিন্তার চালিকা শক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা। অর্থনীতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা, জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান সার্বভৌমের কাছে জনগণের চাহিদা। এছাড়াও, লকের রাষ্ট্রচিন্তায় আমরা লক্ষ করি সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ। এতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থের সম্প্রসারণ অবশ্যই রয়েছে। তবে সরকারের

জবাবদিহিতা রয়েছে সাধারণ জনগণের প্রতি। জনগণের সামষ্টিক অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ঈশ্বরতাত্ত্বিক চিন্তাধারার সরাসরি সমর্থক হলেও লক সার্বভৌমের যুক্তিবিচারে ঈশ্বরকেন্দ্রিকতা যুক্ত করেননি, যেটা হবসের কাছে পাওয়া যায়। লক তাঁর সার্বভৌম চিন্তায় জনগণের হাতে সরকারব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষমতা দিয়েছেন। এতে জনগণের সংশ্লিষ্টতা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি জনগণের ক্ষমতায়নের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। এতে সার্বভৌম ক্ষমতা যদি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে তাহলে জনগণের হাতে বিদ্রোহের তথা রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে হবস সরকার পরিবর্তনের ক্ষমতা জনগণের কাছ থেকে দূরে রেখেছেন।

বার্কার লকের সার্বভৌমতত্ত্ব সম্পর্কে বলেন – "His thought turns less on sovereignty than on the rights of the individual and the limits set by those rights to the sovereign, whoever he may be."[৮৩] অর্থাৎ লকের চিন্তা সার্বভৌমের প্রতি স্বল্প মনোযোগী এবং ব্যক্তির অধিকার প্রশ্নে অধিক আলোকপাত করেছে। বার্কারের মতে, লকের সার্বভৌম ক্ষমতা মূলত কোনো আইনসভা বা কোনো জনসমাজের হাতে নয় বরং সার্বভৌম ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রণ রয়েছে প্রাকৃতিক অধিকারসমূহকে ধারণকারী প্রাকৃতিক আইনের পদ্ধতির মধ্যে।[৮৪] বার্কারের এই বক্তব্যকে যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তাহলে এটা লক্ষ করা যায়, লক প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাকৃতিক আইনের পদ্ধতিকে মূল ক্ষমতাশালী অর্থাৎ আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। লকের আলোচনায় প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণার সাথেই মূলত সার্বভৌমতত্ত্বের ক্ষমতা সংযুক্ত।

লকের সার্বভৌম চিন্তায় সংসদীয় ব্যবস্থার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার প্রশ্নে সংসদকে লক দায়বদ্ধ করেছেন যা তার সার্বভৌম চিন্তার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পক্ষান্তরে সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা তথা সাংবিধানিক এবং সংসদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোনো পদক্ষেপ হবসের কাছে তার সার্বভৌমতত্ত্বে লক্ষ করা যায় না।

লক সার্বভৌমের প্রতি জনগণের দায়বদ্ধতা অপেক্ষা জনগণের কাছে সার্বভৌমের জবাবদিহিতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সিভিল আইন অপেক্ষা প্রাকৃতিক আইনের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। লকীয় চিন্তায় সার্বভৌমের সাথে জনগণের সংশ্লিষ্টতা এবং মিথষ্ক্রিয়ার সম্পর্ক লক্ষণীয়– যাতে পারস্পরিক মতের বিচার বিবেচনার প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু হবসীয় চিন্তায় এর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। এখানে জনগণের মিথষ্ক্রিয়া অপেক্ষা কর্তৃপক্ষের নির্দেশরূপে সার্বভৌমের আদেশ আর্বিভূত হয়েছে। হবসের অনুরূপ সার্বভৌমের সংজ্ঞায়ণ লক্ষ করি অস্টিনের কাছে। তিনি মনে করেন, আইন হলো সার্বভৌমের আদেশ। হবসীয় ও অস্টিনীয় উভয় সার্বভৌমতত্ত্বে আইনের উৎস রূপে গৃহীত হয়েছে সার্বভৌমর আদেশ এবং তা অনপেক্ষ, অবিভাজ্য। এর প্রতি রয়েছে জনগণের শর্তহীন আনুগত্য। অবশ্য এ বিষয়টিও স্বীকার করতে হবে – হবসীয় ও অস্টিনীয় সার্বভৌমে আমরা সার্বভৌমের প্রতি জনগণের আনুগত্য প্রদর্শন পাশাপাশি জনগণের প্রতি সার্বভৌমের আদেশ পালন করার দায়বদ্ধতা লক্ষ করেছি।[৮৫] হবসীয় তত্ত্বে স্পষ্টতই বল প্রয়োগের ব্যাপার লক্ষণীয়। লকের তত্ত্বে বলপ্রয়োগ নয় বরং জনগণের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক লক্ষণীয়, অবশ্য যদিও পারস্পরিক বলা হচ্ছে তবে শেষ পর্যন্ত জনগণের হাতে ক্ষমতা নিহিত থাকে, তাই একে অংশত পারস্পরিক বলা যায়। জনমতের প্রতিফলন বা জনগণের ইচ্ছার মূল্যায়ন হয়েছে লকের কাছে।

হবসের সার্বভৌম ঈশ্বরের কাছে দায়বদ্ধ কিন্তু লকীয় সার্বভৌম জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। হবসীয় তত্ত্বে আমরা আধুনিককালের নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রের বীজ নিহিত দেখি। যেখানে রাজতান্ত্রিক নিরঙ্কুশতা ও স্বৈরতন্ত্র (absolutism) একীভূত হয়ে পড়েছে। হবসের নিরঙ্কুশবাদের বিপরীতে লকের কাছে পাওয়া যায় সংবিধানতন্ত্র। হবসীয় সার্বভৌমের একটি পরিমার্জিত রূপ প্রকাশ পায় লকের চিন্তায়। রাজার হাত থেকে সংসদ অতঃপর জনগণের

কাছে সার্বভৌম ক্ষমতা চলে আসে। লকের সার্বভৌম চিন্তায় অপেক্ষাকৃত অধিক গণতান্ত্রিক ধারা লক্ষণীয়। লকের সার্বভৌমে সংসদের কাছে যে সার্বভৌম ক্ষমতা তা হলো নামমাত্র সার্বভৌম (De facto sovereignty)।

হবস তাঁর সার্বভৌমের জবাবদিহিতায় নির্ভর করেছেন ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু লক তাঁর সার্বভৌমতত্ত্বে একপ্রকার আপেক্ষিক সার্বভৌমের কথা বলেন। যা "সম্ভাব্য" এবং "বাস্তবিক" সার্বভৌমরূপে বিভক্ত। জেন্সার মনে করেন, লকের এধরণের সার্বভৌমে নিহিত রয়েছে ঈশ্বরের রাজ্যের এডেনীয় বিবরণে।[৮৬] তিনি আরো বলেন, কোনো মৌলিক, একক চুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় "সমাজে" বিভক্ত হয়ে পড়ে যখন সেটি আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে। এ ধরণের কার্য সম্পাদন দ্বারা সমাজ প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়ের সম্ভাব্য সার্বভৌমকে প্রকাশ করে। এভাবে সমাজে কালক্রমে পৌর আইন, সরকার, কমনওয়েলথের মতে বিষয়সমূহ গড়ে ওঠে এবং এসব দ্বারা বাস্তবিক সার্বভৌমত্ব প্রকাশ পায়।[৮৭] জেন্সারের এ বক্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি প্রকৃতিক রাজ্যের যে বর্ণনা আমরা লকের কাছে পেয়েছি তাতে সম্ভাব্য সার্বভৌমত্ব এবং আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় বাস্তবিক সার্বভৌমত্ব চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে।

রুশোর মত

অন্যান্য চুক্তিবাদীদের মতো রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বের সূত্রপাত সামাজিক চুক্তি থেকে। তাঁর সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে আংশিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় লকের। প্রাথমিকভাবে এরা উভয়েই জনগণের কাছে সার্বভৌম ক্ষমতাকে ন্যস্ত করেছেন। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বের সাথে সাধারণ ইচ্ছার একটি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক আছে। রুশোর মতে একটি সামাজিক সংস্থারূপে রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে। এ সংস্থাটির রয়েছে নৈতিক শক্তি এবং সামষ্টিক শক্তি।[৮৮] উভয় শক্তির সাহায্যে এ সংস্থাটি জনগণের শক্তিকে সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করে। রুশোর মতে, "রাষ্ট্রের সার্বভৌম হচ্ছে একটি সম্মিলিত বা যৌথ সত্তা। এই সত্তার মধ্যেই সার্বভৌমের অস্তিত্ব। এটাই হচ্ছে সার্বভৌমের মূর্ত প্রতীক। সার্বভৌম যৌথ।"[৮৯] এভাবে সমাজসংস্থা জনগণের ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে নতুনরূপ বা অস্তিত্ব লাভ করে। প্রাচীনকালে সমাজসংস্থাটি পরিচিত ছিল নগররাষ্ট্র (city state) নামে। নগর বা সিটি নামক সমাজসংস্থাটিকে রুশো আধুনিককালে রাজনৈতিক সংস্থা (Republic) নামে অভিহিত করেন। রুশো মনে করেন, রাজনৈতিক সংস্থাটিকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় মানুষ 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করে; ক্রিয়াশীল অবস্থাতে এই রাজনৈতিক সংস্থাই রাজনৈতিক জনশক্তিতে পরিণত হয়।[৯০] রুশোর বক্তব্যে লক্ষণীয় হলো রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম একই রাজনৈতিক সংস্থার প্রতিফলন হলেও এ দুটি প্রত্যয়ের মাঝে তিনি মাত্রাগত পার্থক্য টেনেছেন। সার্বভৌম রাষ্ট্রের সক্রিয়রূপ। রাষ্ট্র যখন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে তখন সার্বভৌমের শক্তি দৃশ্যমান হয়। রাষ্ট্রকে রুশো রাজনৈতিক সংস্থার 'নিষ্ক্রিয় অবস্থা' বলেছেন। এ বিষয়টি ভাবার অবকাশ রয়েছে। নিষ্ক্রিয় অবস্থা (রাষ্ট্র) এবং সক্রিয় অবস্থার (সার্বভৌম) পৃথকীকরণ রুশোর কাছে কিরূপ তা লক্ষ করার বিষয়।

সার্বভৌম সম্পর্কে রুশোর মত ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় প্রথম থেকেই রুশোর কাছে সমাজ একটি সংস্থা। এ সংস্থার অর্ন্তভূক্ত বিভিন্ন সক্রিয় সংগঠন থাকলেও একমাত্র সমাজ নামক সংস্থাটিকেই তিনি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী করেছেন। কারণ এর পেছনে রয়েছে সাধারণ জনগণ, যারা সমাজ নামক রাজনৈতিক সংস্থার সদস্যরূপে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। নাগরিকদের সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রনামক সংস্থার সৃষ্টি। নাগরিকগণ সার্বভৌম শক্তির অংশীদার বা বাহক। নাগরিকগণ যখন সমাজের বিধি বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তারা হয়ে ওঠে শাসিত।

রুশো সমাজসংস্থার (রাজনৈতিক) প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী নাগরিকদের শাসিত বলেছেন আবার এদের হাতেই তিনি সার্বভৌম শক্তি সমর্পণ করেছেন। তাঁর এ ভাবনাটি হবস এবং লক অপেক্ষা তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

হবসের তত্ত্বে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে, লকের তত্ত্বে সে ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকলেও তারা সরকারের সাথে টাস্ট্রির সম্পর্কে আবদ্ধ। যেখানে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটা মুখ্য। আর রুশোর কাছে জনগণ সরকার কর্তৃক শাসিত আবার এই শাসিত জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার ধারক ও বাহক। তাদের 'গণসম্মতি' বা 'সাধারণ ইচ্ছা' সার্বভৌম ও তার ক্ষমতার উৎস এবং ভিত্তিরূপে কাজ করে। শাসিত জনগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারা প্রত্যেকে স্ব স্ব ইচ্ছাকে একটি সম্মিলিত ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে যাকে বলা যায় সাধারণ ইচ্ছা এবং জনগণ নিজেদেরকে সমাজসংস্থার (পরবর্তীতে যাকে রুশো রাজনৈতিক সংস্থা বলেছেন) একটি অবিভাজ্য অংশ রূপে লাভ করে। এভাবেই রুশো হয়ে উঠেন তৎকালীন সতের এবং আঠারো শতকে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সে বহুল আলোচিত গণসার্বভৌমত্ব শব্দটির প্রকৃত উদগাতা। অবশ্য সাধারণ জনমানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রুশো, হবস ও লকের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। হবস ও লক সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণিকে প্রাধাণ্য দিয়েছেন তাদের লেখনীতে। অন্যদিকে রুশো সার্বভৌমতত্ত্বে সাধারণ জনগণের সংশ্লিষ্টতা প্রাধান্য দেবেন তা স্বাভাবিক। গণসার্বভৌমত্বের এ ধারণায় জনগণের অংশগ্রহণ তাদেরকে একদিকে ক্ষমতার বলয়ে স্থাপিত করে তাদের ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে সাথে জনগণও তাদের সাধারণ ইচ্ছা সমাজ, রাষ্ট্র তথা যে কোনো যৌথ সংস্থার ভিত্তি সেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে বিচারে তার সার্বভৌমতত্ত্বকে যথার্থই গণসার্বভৌমত্ব (Peoples Sovereignty) বলা যায়।

রুশো সার্বভৌমতত্ত্বে মানুষের স্বাধীনতা দিয়েছেন। আবার একই সাথে সমাজে ও রাষ্ট্রে মানুষের স্বাধীনতার মাঝে নিয়ন্ত্রণের অধীনতা, দায়িত্ববোধের অধীনতা, কর্তব্যের প্রতি দায়বদ্ধতা, সঠিকভাবে, সচেতনভাবে বয়ে নিয়ে যাওয়ার দ্বারা একক ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক বা যৌথ ব্যক্তি সত্তা কীভাবে গণতান্ত্রিক উন্নতির কারিগর হতে পারে সেটা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগরিকদের ক্ষমতা অসীম নয়। আবার রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্কেরও কোনো সীমাবদ্ধতার সমর্থক নন। রুশো মনে করেন, নাগরিক রূপে প্রত্যেকই নিজের জীবনে স্বাধীন কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের অধীন।[৯১]

রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে একদিকে সার্বভৌমের স্রষ্টা ব্যক্তিক মানুষ বা নাগরিক এবং অপরদিকে নাগরিক কর্তৃক সৃষ্ট সার্বভৌম সংস্থারূপে রাষ্ট্র। সার্বভৌম সংস্থারূপে একটি রাষ্ট্র তার স্বীয় অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ক্ষুন্ন করে অপর কোনো বৈদেশিক শক্তি বা রাষ্ট্রের অধীনস্থ হতে পারবে না। এতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম সংস্থার রূপ এবং অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। তদ্রুপ সার্বভৌম শক্তির স্রষ্টা জনগণের অস্তিত্ব শৃঙ্খলবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাহলে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা হারায়, অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

আবার, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীরূপে একজন ব্যক্তি দু'ধরনের ভূমিকা পালন করে। একদিকে রাজনৈতিক সংস্থার সভ্যরূপে ব্যক্তি তার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ এবং অন্যদিকে রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক সংস্থাটির প্রতি ব্যক্তির কিছু দায়িত্বও রয়েছে।[৯২] রুশো নাগরিকের যে দায়িত্ব উল্লেখ করেছেন তাতে একজন নাগরিকের তার প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন। এটি আমরা হবস বা লকের সার্বভৌম চিন্তায় দেখি না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের দায়িত্ব-কর্তব্য উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু নাগরিকের সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদাররূপে অন্য নাগরিকের প্রতি কোনো দায়িত্বের উল্লেখ দেখা যায় না। রুশোর সার্বভৌম নাগরিকের প্রতি আনুগত্য আশা করে কিন্তু আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে না, যার বিপরীত রূপ পেয়েছি হবসের কাছে। হবসীয় সার্বভৌমের আদেশ নাগরিকের লঙ্ঘন করার অধিকার নেই। রুশোর রাষ্ট্র একটি সম্মিলিত নৈতিক সত্তা যাকে তিনি মনে করেন জৈব সত্তা এবং সার্বভৌম ইচ্ছার দ্বারা ব্যক্তির একক ইচ্ছার সংমিশ্রণ ও প্রতিফলন ঘটে। সার্বভৌমত্বও যেহেতু সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ এবং এটি সর্বদা অভ্রান্ত, বিশুদ্ধ এবং অপরিবর্তযোগ্য বিধায় জনগণের

কোনো নৈতিক ও আইনগত অধিকার নেই সার্বভৌমকে অমান্য করার।[৯৩] যদিও রুশোর আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে এর ব্যত্যয় লক্ষণীয়।

এভাবে রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে রাষ্ট্র এবং নাগরিক পারস্পরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। রাষ্ট্র তার সার্বভৌম সংস্থার সদস্যরূপে কোনো নাগরিকের ওপর যখন আক্রমণ হয় তা প্রতিহত করতে কাজ করবে। এ আক্রমণ বা আঘাত কোনো একক সদস্যের ওপর ঘটলেও তা মূলত রাষ্ট্রের ওপর আঘাত। বিপরীতভাবে রাষ্ট্র যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে সে আঘাত সংস্থার সভ্য বা সদস্যরূপে প্রতিটি সদস্যদের আহত করে। এভাবেই রাষ্ট্র তার দায়িত্বের কারণে পরস্পরকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে।

হবসের সার্বভৌমতত্ত্ব ছিল একতরফা। এখানে সার্বভৌমের প্রতি ব্যক্তি বা নাগরিকের দায়িত্ব একপাক্ষিক। পক্ষান্তরে লক ও রুশোর সার্বভৌমতত্ত্ব দ্বিপাক্ষিক যাতে ব্যক্তি ও সার্বভৌম পারস্পরিকতায় আবদ্ধ। আবার লকের সাথে রুশোর সার্বভৌমের চিন্তায় তফাৎ হলো লকের সার্বভৌমতত্ত্বে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা না থাকলে সার্বভৌমের অস্তিত্ব নিরর্থক। পক্ষান্তরে রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে ব্যক্তি বা নাগরিক এবং রাষ্ট্র উভয়েই সার্বভৌমের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। জনগণের কাছে সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সার্বভৌম সংস্থারূপে রাষ্ট্রের অবস্থানও গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র জনগণের প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষার দ্বারা সার্বভৌম অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বাধ্যতাও নাগরিকের রয়েছে। এভাবে ব্যক্তি মানুষ সামষ্টিকতার অংশ হয়ে ওঠে। সার্বভৌম সংস্থারূপে রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট স্বার্থসমূহ উপভোগের জন্য জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়।

রুশোর সাথে হবস ও লকের চিন্তায় যে সাদৃশ্য লক্ষণীয় তা হলো সার্বভৌম শক্তি সামাজিক সত্তার ফলে জনগণ কর্তৃক সৃষ্ট এবং জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সার্বভৌমের মূল কাজ। ফলে সার্বভৌম সংস্থা তার সদস্যদের (নাগরিকের) স্বার্থবিরোধী বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু সমপন্ন করতে পারবে না। পাশাপশি সার্বভৌম সংস্থারূপে রাষ্ট্র তার সদস্যদের ওপর আঘাত হানতে পারবে না। রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে রাষ্ট্র জনগণের ওপর চড়াও না হয়ে, প্রতিপক্ষের বা বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে সমান তালে নাগরিকের সাথে চলবে। রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের ওপর আঘাত গ্রহণযোগ্য নয়। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বের এ বিষয়টি বাংলাদেশ বা বিশ্বের নিরিখে বিচার করি তাহলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গুম, খুন, ক্রসফায়ার অথবা রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক কৃষাঙ্গ, আদিবাসী হত্যা ইত্যাদি বৈধতা পেতে পারে না।

শাসিত এবং সার্বভৌম উভয়ের স্বার্থ সাদৃশ্যমূলক হলেও প্রজারা ও নাগরিকগণ সর্বদাই শাসক এবং সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। যে জনগণ সম্মিলিতভাবে সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে সার্বভৌম শক্তিকে সৃষ্টি করেছে নাগরিকরূপে ব্যক্তির ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছা বা সম্মিলিত ইচ্ছার সাথে সম্পূরক নাও হতে পারে, ভিন্ন হতে পারে। এমনকি ব্যক্তিগত স্বার্থ সামষ্টিক স্বার্থের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। রুশো মনে করেন, 'ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তির অস্তিত্বের একটি সার্বভৌম মূল্য আছে,' এবং 'রাষ্ট্র একটি নৈতিক সংস্থা'।[৯৪]

একজন মানুষ নাগরিকরূপে দায়িত্ব পালন না করেও ব্যক্তি হিসেবে তার অধিকার ভোগ করতে পারে। তবে নাগরিক কর্তৃক দায়িত্ব পালন না করাটা রুশো মনে করেন 'অসামাজিক কর্ম' এবং এর ফলশ্রুতিতে যে অন্যায় সংঘটিত হয় কালক্রমে সে অন্যায় রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারে। এতে মানুষ পূর্বের অবস্থায় ফেরত যায়। তাই রুশোর মতে, রাষ্টের এমন ক্ষমতা থাকা গুরুত্বপূর্ণ যার সাহায্যে ব্যক্তি যদি সাধারণ ইচ্ছাকে অমান্য করে তবে তাকে সাধারণ ইচ্ছার অনুগামী করে তুলতে পারে। এ পর্যায়ে রুশো প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির ওপর বলপ্রয়োগ বা বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ জোর খাটানোকে সমর্থন করেছেন। এ কথার অর্থ হচ্ছে: "প্রয়োজন হলে ব্যক্তিকে

জোর করে স্বাধীন করার ক্ষমতা রাষ্ট্র ধারণ করবে।"[৯৫] রুশোর মতে, "সাধারণ ইচ্ছাকে যে মান্য করতে অস্বীকার করবে তাকে সাধারণ ইচছার অনুগত করার ক্ষমতা সমগ্র সমাজ সংস্থা ধারণ করবে।"[৯৬]

রুশোর এ ধরণের বক্তব্য 'প্রয়োজন হলে ব্যক্তিকে জোর করে স্বাধীন করার ক্ষমতা রাষ্ট্র ধারণ করবে' কারো কারো কাছে স্ববিরোধী বোধ হতে পারে। তাঁর মতকে যদি আমরা একটু ভিন্নভাবে দেখি তবে তাঁর চিন্তার মহত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। যেভাবে পিতামাতা তার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে জোর করে বা শাসনের মাধ্যমে তার জীবনকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করার চেষ্টা করে এবং ভিত তৈরি করে দেয়; তদ্রুপ ব্যক্তির ক্ষমতা উপভোগের এবং উপলব্ধির জন্য জোর করে স্বাধীনতা প্রদানকে রুশো সমর্থন করেছেন। এ থেকে রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বা পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কের মাঝে একপ্রকার অধিকারবোধের প্রকাশ পায়। রুশো বলেন, 'সমাজ তথা সমগ্র সংস্থায় এমন শক্তি প্রয়োগের অধিকারের স্বীকৃতিই মাত্র নাগরিকদের নিজেদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি তথা সম্মতিকে বৈধ করে তুলতে পারে। অন্যথায় সমান রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই পর্যবসিত হয়ে পড়ে বিপুল অনাচারের উৎসমূলক অবিশাস্য একটা স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতনকারী সংস্থায়।'[৯৭] পূর্ববর্তী আলোচনায় হবসীয় সার্বভৌমকে আমরা বলপ্রয়োগকারী শক্তির দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেছি। রুশোর কাছেও আমরা বলপ্রয়োগকরী শক্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। তবে পার্থক্য হলো হবসীয় সার্বভৌমে বলপ্রয়োগ জনগণকে অবদমিত করে আর রুশোর সার্বভৌমে বলপ্রয়োগ জনগণকে স্বাধীন হতে বাধ্য করে। এ স্বাধীনতা অবশ্যই সর্বদা রাজনৈতিক হবে এমনটা দাবি করা যায় না। এটি হতে পারে ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক। রুশোর কাছে সার্বভৌমের শক্তি প্রয়োগ রাষ্ট্রকে স্বৈরাচারী হওয়া তথা নির্যাতনকারী হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে।

রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্ব রাষ্ট্র এবং সাধারণ ইচ্ছার সাথে যৌথভাবে সম্পৃক্ত। সাধারণ ইচ্ছাকে আমরা সার্বভৌম বলতে পারি। সাধারণ ইচ্ছার একটি কল্যাণমূলক দিক রয়েছে যার সাহায্যে এটি রাষ্ট্রস্থিত বিভিন্ন শক্তিসমূহকে একত্রিত করে মঙ্গলসাধনের জন্য পরিচালিত করে। সমাজস্থিত শক্তিসমূহকে রাষ্ট্র একত্রিত করতে পারে কারণ এদের ঐক্যের সূত্র হলো এগুলোর অভিন্ন স্বার্থ। রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো অবস্থাতেই তার সার্বভৌমকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌমের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌম হচ্ছে একটি সম্মিলিত বা যৌথ সত্তা।[৯৮] রুশো মনে করেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছার প্রয়োগ। সাধারণ ইচ্ছাই রাষ্ট্রস্থিত সকল শক্তিকে মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে পারে। মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এবার আসা যাক, রুশো সার্বভৌমের যৌথ অস্তিত্ব বলতে কী বুঝিয়েছেন। রাষ্ট্রসংস্থার নিয়ন্ত্রণ ঘটে থাকে ইচ্ছা এবং শক্তির দ্বারা। এখানে ইচছাকে তিনি বলেন সংস্থার আইনগত শক্তি এবং বাস্তবায়নের ব্যাপারটিকে সংস্থার শাসনিক শক্তি রূপে অভিহিত করেছেন।[৯৯] বলতে পারি রুশো আইনগত শক্তি এবং শাসনিক শক্তির সম্মিলিত রূপ বা যূথবদ্ধতাকে সার্বভৌমের যৌথ অস্তিত্ব মনে করেন। সার্বভৌমের ক্ষমতা চরম। পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় হলেও সার্বভৌম যেহেতু যৌথ অস্তিত্ব তাই সার্বভৌম তথা সাধারণের সম্মতি তার ক্ষমতার যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে সে সীমানাকে সে অতিক্রম করে না এবং করতে পারে না। শাসিতের চাইতে একে পৃথক করে অন্যের ওপর অধিকতর ভার যদি চাপিয়ে দিতে চায় সার্বভৌম, তাহলে এধরণের কর্ম সম্পাদন দ্বারা সার্বভৌম তার সাধারণ চরিত্র হারিয়ে বিশেষ চরিত্রের রূপ ধারণ করবে এবং তার অধিকার হারাবে।[১০০]

জনগণের ইচ্ছা যাকে সাধারণ ইচ্ছা বলা হচ্ছে একে রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, বরং রাষ্ট্র থেকে তার শক্তি বিচ্ছিন্ন হতে পারে এমনটা অভিমত রুশোর। রাষ্ট্র থেকে শক্তিকে পৃথক করার প্রয়াস বা সুযোগ যা হবসের কাছে সম্পূর্ণভাবে অকল্পনীয় তা সম্ভবপর হতে দেখি রুশোর কাছে। রুশো জনগণের ইচ্ছাকে সার্বভৌমের সাথে অবিচ্ছেদ্য করেছেন (লক্ষ রাখতে হবে লকের মতো প্রত্যেক ব্যক্তির একক ইচ্ছাকে নয়)।

জনসাধারণের সামষ্টিক ইচ্ছাই রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ।[১০১] সামষ্টিক ইচ্ছার সাথে সর্বদা প্রতিটি ব্যক্তির ইচ্ছা অভিন্ন হবে এমনটা রুশো মনে করেননি। তিনি এক্ষেত্রে সচেতনভাবেই সাধারণ ইচ্ছার বা সামষ্টিক ইচ্ছার সাথে ব্যক্তিগত ইচ্ছা তথা একক ইচ্ছার তফাৎকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন কখনো কখনো ব্যক্তির ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং অভিন্ন। আবার কখনো ব্যক্তির একক ইচ্ছার সাথে সাধারণের ইচ্ছা অভিন্ন। যদি ব্যক্তির ইচ্ছার সাথে সাধারণের ইচ্ছা ভিন্ন হয় তবে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় বিশেষ ইচছা। সেক্ষেত্রে রুশো স্পষ্টতই সাধারণ ইচ্ছা যাকে তিনি সার্বিক ইচ্ছা বলেছেন তার প্রতি সমর্থন করেছেন।[১০২] তিনি মনে করেন সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ সমতা বা সাম্য। এ ইচ্ছার মাঝে আছে সার্বিক কল্যাণের আবেদন। তাই এর লক্ষ সকলের অভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন। পক্ষান্তরে ব্যক্তিক ইচ্ছা যাকে বিশেষ ইচ্ছা বলতে পারি এটির লক্ষ ব্যক্তির একক স্বার্থ সাধন। এটি আত্মকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যে আবর্তিত। ব্যক্তির নিজস্ব লাভ-অভিলাষ এতে সংযুক্ত বলে এটি সামষ্টিক কল্যাণের জন্য অনুপযুক্ত হতে পারে। রুশোর ইচ্ছাতত্ত্বে লক্ষনীয় হলো তিনি সার্বভৌমের সাথে সাধারণ ইচ্ছার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু তিনি এটি মনে করেন না যে প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা অভিন্ন এবং কোনো ব্যক্তির বর্তমান ইচছার সাথে তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা অনুরূপ হবে। এতে স্পষ্টতই ইচ্ছার পরিবর্তন লক্ষনীয়।

রুশো অভিন্ন সাধারণ ইচ্ছার ধারণা দিয়েছেন বটে তবে একই সাথে তিনি ব্যক্তির ভিন্ন ইচ্ছা এবং ইচ্ছার পরিবর্তনশীলতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইচ্ছার পরিবর্তনশীলতার দিকটি রুশোর সার্বভৌমের ধারণাকে অধিকতর গণতান্ত্রিক এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে। ইচ্ছার পরিবর্তনশীলতা রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের সূচক। হবসের সার্বভৌমতত্ত্বে অপরিবর্তনীয়তা দৃশ্যমান। কিন্তু রুশোর তত্ত্বে ইচ্ছার পরিবর্তনশীলতাকে আনুগত্যের পরিবর্তন রূপে গণ্য করতে পারি। আনুগত্য যদি অপরিবর্তনীয় হয়ে যায় তবে শাসক হয়ে উঠে প্রভু এবং ক্ষমতা হয়ে উঠে নিপীড়নমূলক, প্রভুত্বব্যঞ্জক অপরিবর্তনীয় আনুগত্য কালক্রমে আর্বিভাব ঘটায় প্রভুর। আর প্রভুত্বের আর্বিভাব ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছা সম্মতির স্থানসমূহ বিলুপ্ত করে দেয়। নষ্ট করে দেয় জনগণের স্বাধীন এবং ঐচ্ছিক সম্মতির দ্বারা গঠিত সমাজকে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা যদি বিলুপ্ত হয় তবে মানুষের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়েছে মনে করতে হবে। রুশোর *সামাজিক চুক্তি* গ্রন্থের শুরুতেই তিনি মানুষের স্বাধীনতাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা হারিয়ে গেলে শাসক হয়ে উঠে প্রভু, রাষ্ট্র হয়ে উঠে শোষণ যন্ত্র এবং মানুষ হারায় তার সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটলে রাষ্ট্রের ধ্বংস ঘটে। সাধারণ ইচ্ছা ও বিশেষ ইচ্ছার মাঝে পার্থক্য বিবেচনায় বিশেষ ইচ্ছাকে রুশো বর্জন করেছেন তা দাবি করা যায় না। রুশো প্রতিটি ইচ্ছার মূল্যায়নে পক্ষপাতী। তবে সাধারণ ইচ্ছা বা সার্বিক ইচ্ছা তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সার্বিক ইচ্ছার সাথে সার্বভৌম সম্পর্কিত। এই ইচ্ছার আনুগত্য রয়েছে। অন্যদিকে বিশেষ ইচ্ছাকে রুশো কেবলমাত্র ব্যক্তির একক ইচ্ছা অর্থে বোঝাননি তিনি এর সাথে সাদৃশ্য টেনেছেন সরকারের। এ প্রসঙ্গে রুশো বলেন, 'বিশেষ ...এ ইচ্ছা হচ্ছে জনসমষ্টির উপর একটি সরকারের আরোপিত ইচ্ছা। এমন অবস্থায় এটিকে বড়জোর একটি আদেশ বলে অভিহিত করা যায়।'[১০৩]

রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে জনগণের ইচ্ছা ও আইনের শাসন পরস্পর সম্পর্কিত।[১০৪] সার্বভৌমের ইচ্ছা আর তার কার্যাবলিকে পৃথক করার অর্থ হলো সার্বভৌমকে খণ্ডিত করা। যেমন– যুদ্ধ ঘোষণা করা, শান্তি স্থাপন করা ইত্যাদি সার্বভৌম থেকে পৃথক কোনো কাজ নয়। বরং সার্বভৌমের অবিচ্ছেদ্য কার্যাবলি। এ ধরণের কার্যাবলিকে রুশো বলেছেন আইনের প্রয়োগ। সার্বভৌমের কার্যাবলির সাথে রাজার বা শাসকের কার্যাবলির এবং সাধারণের ইচ্ছায় কোনো পার্থক্য রুশো করেন নি। তিনি মনে করেন, সকল অংশের মধ্য দিয়েই সমগ্রের সার্বভৌম ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে। রুশো এক্ষেত্রে তাঁর পূর্ববর্তী হুগো গ্রোটিয়াসের মতের সমালোচনা করেছেন।[১০৫]

রুশো সাধারণ ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার পৃথকীকরণে সুস্পষ্ট তফাৎ টেনেছেন। যেমন সাধারণ ইচ্ছা সার্বিক ইচ্ছা এবং এটির উদ্দেশ্য সামগ্রিক মঙ্গল সাধন। সাধারণ ইচ্ছা অভ্রান্ত। তবে সাধারণ ইচ্ছা অভ্রান্ত অথবা সামষ্টিক দাবি অর্থাৎ জনগণের ঐক্যমত সর্বদা নির্ভুল হবে এমন দাবি পুনবিবেচনার সুযোগ রয়েছে।[১০৬] জনগণ যদি প্রভাবিত হয় কিংবা কলুষিত হয় তাহলে তারা শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক প্রতারিত কিংবা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে সাধারণ ইচ্ছা অভ্রান্ত এবং গ্রহণযোগ্য হলে বিশেষ ইচ্ছা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় না। বিশেষ ইচ্ছার ভিন্নতার ফলে সার্বিকের কাছে তা বিলুপ্ত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয় কি না সে প্রশ্ন রয়ে যায়?

অবশ্য এর উত্তর রুশোর কাছে রয়েছে। রুশো মনে করেন, সমাজে অভিন্ন স্বার্থের পরিবর্তে যখন ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ সম্পন্ন গোষ্ঠী (যাকে রুশো বলেছেন উপসমষ্টি) বা পরস্পর বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন উপসমষ্টির সৃষ্টি হয় তাহলে সামগ্রিক স্বার্থ সেখানে ভূলুণ্ঠিত হয়। 'সেখানে ইচ্ছার 'সাধারনত্ব' কেবল উপসমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং রাষ্ট্রসমগ্রের ক্ষেত্রে তেমন 'সাধারণ ইচ্ছা' বিশেষ ইচ্ছা, সাধারণ ইচ্ছা নয়'[১০৭] এধরণের রাষ্ট্রে যে পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় তাতে সাধারণ ইচ্ছা আর সার্বিক বা সরকারের মতের প্রতিফলন ঘটায় না বরং তা সুনির্দিষ্ট কোনো উপগোষ্ঠীর স্বার্থ সাধন করে। এধরণের অবস্থা চলতে থাকলে এক উপগোষ্ঠী অপর উপগোষ্ঠীর ওপর কর্তৃত্ব আরোপ দ্বারা, প্রভাব বিস্তারের সাহয্যে এগুলোকে তার অধীনস্থ করে। ফলশ্রুতিতে সকল উপগোষ্ঠীসমূহের তথাকথিত সাধারণ ইচ্ছা বিলুপ্ত হয়ে একটি বিশেষ ইচ্ছার (যা মূলত উপগোষ্ঠী / গ্রুপের ইচ্ছা) কাছে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবে সাধারণ ইচ্ছা তার কার্যকারিতা হারায় এবং বিশেষ ইচ্ছা পরবর্তীতে সাধারণ ইচ্ছা নামে রূপ লাভ করে। এই বিশেষ ইচ্ছা প্রকৃতবিচারে কোনো ব্যক্তির একক ইচ্ছা ব্যতীত আর কিছু থাকে না। তাই রুশোর অভিমত হলো, রাষ্ট্রসমগ্রের মধ্যে উপসমষ্টির কোনো অস্তিত্ব না থাকা।[১০৮]

এতদআলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় – ব্যক্তির একক চিন্তা রুশোর কাছে তেমন আদৃত নয় এবং রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোনো অঙ্গসংগঠন বা উপগোষ্ঠী বা গ্রুপ থাকার বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব চিন্তাকে প্রকাশের দ্বারা প্রকৃত বিচারে স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে; কোনো সামগ্রিক বা সামষ্টিক স্বার্থচিন্তাকে নয়। রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোনো অঙ্গসংগঠনের উপস্থিতি সাধারণ ইচ্ছার নয় বিশেষ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছারই প্রকাশ। এভাবে সাধারণ ইচ্ছার উপস্থিতি এবং উপগোষ্ঠীসমূহের বিশেষ ইচ্ছার অনুপস্থিতি দ্বারা সার্বভৌমকে এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত করতে চেয়েছেন। সকল অংশের মধ্য দিয়েই সমগ্রের সার্বভৌম ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটে।[১০৯]

স্বীয় সুরক্ষা ও উন্নতি বিধানের লক্ষ্যেই রুশোর জনগণ সার্বভৌমের সাথে সাধারণ ইচ্ছাকে সংযুক্ত করেছে।[১১০] তাই সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতি অংশ বা বিভাগ বা অঙ্গ সংগঠনের ওপর নিয়ন্ত্রণারোপ করবে। এটি লকের মতো ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণে বিশ্বাসী নয় বরং হবসের মতো উপদল সমূহকে নিয়ন্ত্রণে বা নির্মূলে পক্ষপাতী। '...সামাজিক চুক্তি সমাজসংস্থাকে তার সকল সদস্যের উপর পরিচলনার সার্বভৌম শক্তি প্রদান করে। সাধারণ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত এই শক্তিকেই রুশো বলেছেন সমাজ সংস্থার সার্বভৌম শক্তি'।[১১১]

রুশো সার্বভৌম সংস্থারূপে রাষ্ট্রের প্রতি এর সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের প্রতি যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমন গুরুত্বারোপ করেছেন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী এবং সার্বভৌম সংস্থার সৃষ্টিকারীরূপে মানুষের যে সকল প্রকৃতিগত অধিকার রয়েছে সে সমস্তের প্রতি। জনগণ সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে তাদের সম্পদ, স্বাধীনতা এবং শক্তিকে রাষ্ট্র নামক সার্বভৌম সংস্থার কাছে অর্পণ করেছে।[১১২] রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে তিনি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র গঠনকারী সদস্যরূপে মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। রুশো রাষ্ট্রের সদস্যরূপে মানুষ, মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা, অধিকারের সংরক্ষণের দিকসমূহের সাথে সার্বভৌমের অধিকারের পৃথকীকরণ

করেছেন। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র এই দুটি পক্ষের উভয়ে তাদের আপন স্বার্থ এবং দায়িত্বের কারণে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়ে আসতে বাধ্য।[১১৩]

রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের সম্পর্ক পারস্পরিকতায় আবদ্ধ। হবসের কাছে রাষ্ট্র এককভাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন, জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। লকের কাছে সার্বভৌম ক্ষমতার স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারের পরিতৃপ্তি সাধনে। আর রুশোর কাছে সার্বভৌমের নাগরিকের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের প্রত্যাশা রয়েছে, তবে নাগরিকের ওপর সার্বভৌমের এমন কোনো দায়িত্ব কর্তব্য প্রত্যাশা অনুচিত যা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে সক্ষম নয়। এ দিকটিতে রুশোর চিন্তার বিশেষত্ব রয়েছে। সাধারণ ইচ্ছা কেবল নাগরিকের দায়বদ্ধতা অথবা নাগরিকের প্রতি কেবল সার্বভৌমের দায়িত্ব তিনি এমনটা মনে করেননি বরং তিনি একটি পারস্পরিক দায়িত্বের স্থান থেকে বিবেচনা করেছেন। মানুষের যে দায়িত্বের বন্ধন তা মানুষের একার নয়। সার্বভৌমেরও মানুষের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্বের অন্যতম প্রকাশ হলো সার্বভৌম এমন কোনো দায়িত্বের ভার রাষ্ট্রের সদস্যের কাছে প্রদান করবে না যা সমাজের সার্বিক কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত নয়। দায়িত্বের রূপটি হবে এমন যাতে রাষ্ট্রের সদস্যরূপে জনগণ নিজেদের প্রতি দায়িত্ব পালন দ্বারা সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করে আবার রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন না করে নিজের জন্য দায়িত্ব পালন করতে না পারে । রুশো উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করেছেন – ব্যক্তি যখন সাধারণের স্বার্থে তার ভোট প্রদান করে তাহলে বস্তুত ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থেই সে ভোটাধিকার প্রদান করে। অর্থাৎ আমরা যখন সকলের সমান অধিকার এবং ন্যায়ের কথা বলি তাহলে আমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের কথাই বলি।[১১৪] সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ সার্বিক মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের মাধ্যমে সার্বভৌম প্রকারান্তরে সকলের মঙ্গল সাধনে রত হয়।[১১৫] এভাবে সাধারণ ইচ্ছা আপামর জনসাধারণকে সংযুক্ত করে এগিয়ে যায়। যখন সাধারণ ইচ্ছা সাধারণের পরিবর্তে বিশেষ ইচ্ছার দ্বারা চালিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থের উদ্ধারে যুক্ত হবে তাহলে সাধারণ ইচ্ছা তার নৈতিক ও প্রকৃতিগত বৈধতা হারিয়ে ফেলে।

রুশোর সাধারণ ও বিশেষ ইচ্ছার আলোচনায় অন্যতম লক্ষণীয় দিক হলো– ব্যক্তিগত বা বিশেষ ইচ্ছা যেমন সকলের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারে না, কোনো ব্যক্তির ইচ্ছা সাধারণের ইচ্ছাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, অনুরূপভাবে সাধারণ ইচ্ছা যদি কোনো বিশেষ ইচ্ছার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয় তবে সাধারণ ইচ্ছা তার প্রকৃতিগত চরিত্র হারায়। শুধু বিশেষ ইচ্ছা নয় সাধারণ ইচ্ছা যদি কোনো বিশেষের বিষয়ে বা ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে সে ইচ্ছা সাধারণ থাকে না পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

রুশো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন সংখ্যার ওপর নির্ভর করে সাধারণ ইচ্ছা নির্ধারিত হয় না বরং সাধারণ ইচ্ছা নিধারিত হয় সকলের স্বার্থের নিরিখে। কোনো রাষ্ট্রের একজন নাগরিক তার প্রতিযোগীর ওপর যে শর্ত আরোপ করে অনুরূপ শর্তের প্রতিপালন নাগরিক নিজেও করবে। এভাবে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বার্থের মাঝে একপ্রকার অভিন্নতার সেতুবন্ধন তৈরি হয় এবং ন্যায়পরতার সৃষ্টি করে। ন্যায়পরতা সামষ্টিকতাকে একটি সমতার রূপ প্রদান করে। এ সামষ্টিকতার বন্ধন প্রকৃতির রাজ্যের জনগণকে সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ করেছিলো। সামাজিক চুক্তি সম্পাদন দ্বারা সামষ্টিক জনগণ রাষ্ট্রে নাগরিক মর্যাদা প্রাপ্ত হলো এবং সকল নাগরিকের মধ্যে একটি সমতার অবস্থা সৃষ্টি করে– এমনটা রুশো মনে করেন। সামষ্টিক জনগণ একই দায়িত্ব পালনে সম্মত হলো এবং একই অধিকার উপভোগ করলো। সার্বভৌম তথা সাধারণ ইচ্ছা সামাজিক চুক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী সকল সদস্যের ওপর একই প্রকার বৈধ দায়িত্ব অর্পণ করে এবং সদস্যগণও একই প্রকার অধিকারের ধারক হয়। এ সদস্যগণের সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি জাতি।

জনগণ যখন সার্বভৌমের আদেশ-নির্দেশ এবং চুক্তির শর্তমান্য করে চলে তাহলে জনগণ হবসের সার্বভৌমের মতো কোনো রাজা বা ব্যক্তিকে মান্য করে না বরং জনগণ এখানে মান্য করে তাদের নিজেদের ইচ্ছাকে,

ইচ্ছাকর্তৃক সংগঠিত / প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে কোনো উর্দ্ধতন বা অধস্তন পক্ষ নেই। এটি রুশোর শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার যে লড়াই তার অপর একটি দৃষ্টান্ত।

সমতা সম্পর্কিত একটি নীতিরূপে সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব মানুষের প্রকৃতিগত অসমতাকে অস্বীকার করে এবং এটি ক্ষতিকারক বা অযৌক্তিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন – এটি (সাধারণ ইচ্ছা) সর্বোৎকৃষ্ট বা উচ্চতরকে সংখ্যাধিক অধস্তন কর্তৃক প্রণীত আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য করে এবং ঊর্ধবতনকে অধস্তন সংখ্যাধিক্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভালোর দিকে মনোযোগী করে তোলে। একজন ব্যক্তির তা করার স্বাধীনতা রয়েছে যা প্রত্যেকের জন্য করার অনুমতি রয়েছে; আবার কেউ আইনের বাইরেও নয়। মেলজারের মতে, Such considerations led all classical thinkers to regard strict equality as unjust and to have ultimate misgivings about the rule of law or the principle of generality".[১১৬]

রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতা তথা সাধারণ ইচ্ছা চরম, অবিভাজ্য, অবিচ্ছেদ্য, অলঙ্ঘনীয় হলেও মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। গণসম্মতি সার্বভৌমের যে সীমানা নির্ধারিত করেছে তা সার্বভৌম অতিক্রম করতে পারে না। পারে না বলেই সার্বভৌম তার কোনো সদস্যের প্রতি বা নাগরিকের প্রতি কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া এবং তা পালন করতে বাধ্য করতে পারে না। যদি এধরণের কোনো অন্যায় অসাম্যমূলক আচরণ সার্বভৌম করে তবে সার্বভৌম তার সার্বিক প্রকৃতি হারিয়ে বিশেষ প্রকৃতি পরিগ্রহ করে। এতে সার্বভৌম তার কার্য সম্পাদনের ক্ষমতা হারায়।

উর্পযুক্ত আলোচনা থেকে এটা দৃশ্যমান – সামাজিক চুক্তি ব্যক্তির যৌক্তিক স্বাধীনতা হরণ করেনি বরং চুক্তি সম্পাদন দ্বারা ব্যক্তি অধিকতর উন্নত অবস্থায় উপনীত হলো। সাধারণ ইচ্ছা তথা সার্বভৌমের মাধ্যমে জনগণের সাথে এক প্রকার বিনিময় সম্পর্ক এবং নৈতিকতার ভাষায় পারস্পরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠলো। একদিকে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নিজেকে নিয়োজিত করে বিপরীতক্রমে রাষ্ট্র ব্যক্তির সুরক্ষাবলয় নিশ্চিত করে। মঙ্গল সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে অধিকতর উন্নতির পথে নিয়ে যায়। প্রকৃতির রাজ্যে যেমন জনগণ আত্মস্বার্থ রক্ষার্থে স্ব স্ব যুদ্ধ বা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বীয় এবং সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলো। এ সংগ্রাম কেবল ব্যক্তিঅস্তিত্ব কিংবা সামষ্টিক অস্তিত্বের সংগ্রাম নয়, পাশাপাশি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনে এ সংগ্রাম করতে জনগণ সম্মত হয়।

রুশো মনে করেন, মানুষের জীবন প্রকৃতির দান কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে নাগরিকদের জীবন রাষ্ট্রের দান। রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য যে জীবন নাগরিক নিবেদন করে রাষ্ট্র নাগরিকের সে জীবন সর্বদা রক্ষা করে। প্রাকৃতিক স্বাধীনতার পরিবর্তে রাষ্ট্রে ব্যক্তি লাভ করে প্রকৃত স্বাধীনতা।

সার্বভৌমতত্ত্বে বিশেষ ও সাধারণ ইচ্ছার আলোচনা থেকে রুশো সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, তিনি একই সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও বিশ্বজনীনতা এবং সার্বিকতার পরিচয় বহন করেছেন। মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আবার স্বাধীনতার ওপর নৈতিক নিয়ন্ত্রণারোপ করে একে শুধু সীমাবদ্ধ করেননি সে সাথে সার্বিক স্বার্থ তথা গণমানুষের স্বার্থকেও সুরক্ষিত করেছেন। মানুষের স্বাধীনতা এবং যুক্তিবোধের ওপর বিশ্বাস করেছেন। তবে তা লকের মতো কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নিয়ে এগিয়ে যায়নি সে সাথে সাধারণ মানুষ বা গণমানুষের স্বার্থের যদি সমন্বয় সাধন না হয় তবে সে সার্বভৌমের বিলুপ্তি কাম্য। এথেকে স্পষ্ট যে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে সামষ্টিকতাবাদের প্রতিই অগ্রসর হয়েছেন। নাগরিক স্বাধীনতা নিহিত করেছেন কোনো সরকারের হাতে নয় বরং সামষ্টিক নাগরিকের ইচ্ছার ওপর।

রুশোর চিন্তায় ব্যক্তির প্রকৃতিগত অধিকার সংরক্ষণ এবং একই সাথে একটি উদারনীতি লক্ষণীয়। চূড়ান্ত সার্বভৌমের অধিকারী কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তি নয়। রুশোর সার্বভৌম হলো গণমানুষের সাধারণ ইচ্ছা। সাধারণ ইচ্ছা কোনো ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রভাবের উর্দ্ধে এবং সাধারণ ইচ্ছার চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে নৈতিক শক্তি। বার্কার মনে করেন রুশো যে সার্বভৌমের কথা বলেছেন তা হলো – 'নৈতিক সত্তা (moral person)' এবং উক্ত নৈতিক সত্তার চূড়ান্ত আদর্শ হলো 'সাধারণ ইচ্ছা (general will)'। রুশোর নৈতিক সত্তা এবং সাধারণ ইচ্ছার ধারণাসমূহ প্রাকৃতিক আইন সংক্রান্ত চিন্তার সীমা অতিক্রম করে যায়।[১১৭]

রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের বিশ্লেষণ থেকে আর্নেস্ট বার্কার রুশোকে একজন সর্বাত্মকবাদী রূপে অভিহিত করেছেন।[১১৮] বার্কার মনে করেন রুশো সার্বভৌমকে কোনো নিয়ন্ত্রণ কিংবা বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে একে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তাঁর কাছে রুশোর গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে স্বৈরতন্ত্রের প্রকাশ। তিনি সার্বভৌমের বিপক্ষে কোনো শক্তিশালী বিরোধিতাকারী রাখেননি। সামষ্টিকতার অংশ রূপে রুশো একজন ব্যক্তির অধিকারকে গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু তিনি নাগরিকরূপে ব্যক্তির পৌর এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগের অধিকারের গুরুত্ব বিস্মৃত হয়েছেন। তিনি হবসের মতো রাষ্ট্র কর্তৃক গির্জা, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এধরণের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ একটি রাষ্ট্রকে কর্পোরেট রাষ্ট্রে পরিণত করে। একক ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না, ব্যক্তি নাগরিক হয়ে পড়ে ক্ষমতাহীন।

রুশো সরকারকে সার্বভৌমের সাথে অভিন্ন মনে করেননি। সার্বভৌমের দায়িত্ব শাসক নির্বাচন করা নয়। বরং এ দায়িত্ব হলো সরকারের।[১১৯] তাঁর কাছে সার্বভৌম একটি সামষ্টিক অংশ যা গণমানুষের ক্ষমতায় ক্ষমতাসম্পন্ন। অনুরূপভাবে সাধারণ ইচ্ছার যথার্থ প্রকাশ ব্যতীত সরকারের কোনো নিজস্ব ক্ষমতা নেই যা দ্বারা সরকার কোনো আইনপ্রণয়ণ করতে পারে।[১২০] সরকারের ক্ষমতা জনগণের ক্ষমতা যার দ্বারা এটি শক্তিশালী বা শক্তিহীন হতে পারে। সরকার একটি নৈতিক সত্তা। সরকার একটি সংস্থারূপে সার্বভৌম এবং জনতা উভয়ের পৃথক একটি মধ্যবর্তী সংস্থা।[১২১]

রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে অভ্রান্ত দাবি করেন। তাঁর এ দাবিটি যদি আমরা কিছুটা গভীরে চিন্তা করি তাহলে প্রশ্ন আসে সাধারণ ইচ্ছা কি সত্যিই সর্বদা অভ্রান্ত। যেমন–সক্রেটিসকে বিষপ্রয়োগে হত্যাকাণ্ড, জিওর্দানো বুনোকে আগুনে পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি দৃষ্টান্তসমূহের নিরীখে একে অভ্রান্ত বলা যায় না। রুশো যখন বলেন ব্যক্তিকে আদেশ পালনে বাধ্য করার অর্থ হচ্ছে তাকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা ছাড়া অন্য কিছু নয় এর সমালোচনায় দৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন করেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। রাসেল মনে করেন রুশোর 'স্বাধীন হতে বাধ্য করা' বক্তব্যটি একটি আধিবিদ্যা বিষয়। তাঁর (রাসেল) মতে –

গ্যালিলিওর সময়ে সাধারণ ইচ্ছা নিশ্চিতরূপে কোপারনিকাস– বিরুদ্ধ ধারণা ছিল। ধর্মবিচার সভা যখন গ্যালিলিওকে তাঁর মত প্রত্যাহার করতে বলেছিল তাহলে কি তাঁকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা হয়েছিল? যখন কোনো অপরাধীকে কারাগারে বন্দি করা হয় তাহলে কি তাকে 'স্বাধীন হতে বাধ্য করা হয়'?[১২২]

রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের এক প্রকার নৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্ব সাধারণ ইচ্ছা যৌথ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। যৌথ ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশরূপে সাধারণ ইচ্ছা সমাজের জন্য নৈতিক মানদণ্ড নির্ণয় করে এবং সরকার সাধারণ ইচ্ছার ভাবনার প্রতিফলন ঘটায় মাত্র। যৌথ ব্যক্তিত্ব একক ব্যক্তিত্বের আচরণ ও ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাকে একটি নৈতিক নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা দাবি করেন ভন।[১২৩] একটি নৈতিক সংস্থারূপে সাধারণ ইচ্ছা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের অংশ। সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য ব্যক্তিক এবং সামষ্টিক সুরক্ষা বিধান এবং কল্যাণ সাধন করা। সাধারণ ইচ্ছা আইনের উৎস। এটি রাষ্ট্রের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ দ্বারা ন্যায়-অন্যায়ের বিধান নির্ধারণ করে।[১২৪]

রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে মনে হয় সার্বভৌম জনগণের ওপর বাধ্যতা সৃষ্টি বা তৈরি করতে পারে না। সামাজিক চুক্তি সম্পাদন দ্বারা জনগণ তাদের সম্পত্তি ও স্বাধীনতার যে অধিকার রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করেছে তাতে সার্বভৌম নাগরিকদের ওপর বেশি বোঝা চাপানোর অধিকার দেয় না। নাগরিকের সাধারণ ইচ্ছার বাইরে গিয়ে যদি তারা ব্যক্তিগত বিবাদ বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে তাহলে সার্বভৌম ব্যক্তির ব্যক্তিগত সীমানায় তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব বাধ্যতা তৈরি করতে পারে না যখন নাগরিকের জীবন সার্বভৌম দ্বারা নিয়ন্ত্রনাধীন। আবার নাগরিকের ব্যক্তিগত বলয়ের ক্ষেত্রে সার্বভৌম প্রবেশ করে না। সাধারণ ইচ্ছার যৌথ সত্তার বাইরে নাগরিক যখন একক জীবনযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে একক ব্যক্তি সার্বভৌমের অংশ নয়। যখন সামষ্টিকতায় আবদ্ধ তাহলে সে সার্বভৌমের অংশ।

রুশো মনে করেন সার্বভৌম হস্তান্তর অযোগ্য। সাধারণ ইচ্ছার মাঝে প্রকৃত সার্বভৌম নিহিত। সম্ভবত এ কারণে রুশো প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় আপত্তি করেছেন। সার্বভৌমের হস্তান্তর সম্ভব নয় কারণ সার্বভৌম হলো সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ। সাধারণ ইচ্ছা সামষ্টিক মানুষের ইচ্ছা বিধায় এই ইচ্ছার হস্তান্তর সম্ভব নয়। ইচ্ছার কেবল প্রতিফলন ঘটানো বা বাস্তব রূপায়ন সম্ভব কিন্তু হস্তান্তর নয়। কারণ হস্তান্তর হয় শক্তি বা ক্ষমতার, গণমানুষের ইচ্ছার নয়। আইন যদি সাধারণ ইচ্ছা কর্তৃক প্রণীত না হয় অর্থাৎ সাধারণ জনগণ যদি আইন প্রণয়ণে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে আইনসভার সদস্য নির্বাচন করে বা প্রতিনিধিত্বের মাধমে আইন প্রণয়ণ করে তা গ্রহণযোগ্য নয়।[১২৫] জনগণ যদি প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ণ না করে তাহলে তা আইনের মর্যাদা লাভ করে না। রুশো মনে করেন কোনো একজন ব্যক্তির প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতা আইন হতে পারে না। আইন হবে সাধারণ ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত সামষ্টিক বিবেচনাপ্রসূত প্রজ্ঞা।

প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা অসমর্থনের কারনে রুশো তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ক্ষমতার বিভাজনকে সমর্থন করেননি। বরং যারা ক্ষমতার বিভাজনে বিশ্বাসী তিনি তাদের বিরোধিতা করে বলেন, 'সার্বভৌমকে তারা পরিণত করেছে কী একটা কাল্পনিক জীবে, যা গঠিত নানান জায়গা থেকে নেওয়া অংশ দিয়ে।[১২৬] অবশ্য এর পেছনে রুশোর তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেখা যায় আঠার শতকে ক্ষমতার বিভাজনে তিনি দেখেছেন এই বিভাজন মূলত অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণির মাঝে এক প্রকার পারস্পরিক আপস।

সার্বভৌম শক্তির লক্ষ সামাজিক চুক্তির প্রতিজ্ঞা অটুট রাখা। সামাজিক চুক্তির শর্তাবলী পূরণের অংশ হিসেবে সার্বভৌম নিজের সাথে নিজে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে না। তবে সার্বভৌমের অংশরূপে ব্যক্তি মানুষ যখন নাগরিকের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা আইন প্রণয়ণ হয়। সার্বভৌমের ক্ষমতা সীমিত হয় বা মূল চুক্তিকে নষ্ট করে এমন কোনো চুক্তিতে সার্বভৌম আবদ্ধ হয় না। সার্বভৌমের সাথে সাধারণ ইচ্ছার সম্পর্ক দেহের সাথে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্কের মতো। এরা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আঘাত যেমন দেহকে ব্যথিত করে তদ্রুপ সাধারণ ইচ্ছায় গণমানুষের অসন্তোষ সার্বভৌমকে অস্থির করে। সাধারণ ইচ্ছা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফলন তাই বিশেষ ইচ্ছা তথা সংখ্যালঘুর ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের ওপর বলপ্রয়োগের ক্ষমতা ও বৈধতা সাধারণ ইচ্ছার কাছে রুশো প্রদান করেছেন। রুশোর বলপ্রয়োগের এ বিষয়ে যদিও সমালোচনা করে বলা হয় এতে বিশেষের মত প্রাধান্য পায়না। তবে নিরপেক্ষ বিচারে এও অস্বীকার করা যাবে না রাজনৈতিক অগ্রগতি, নীতি নির্ধারণ বা স্থিতিশীলতা আনয়ন বা রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো শাসনব্যবস্থাতেই প্রতিটি নাগরিকের শতভাগ মত গ্রহণ করা সম্ভব না। আক্ষরিক অর্থে সকল নাগরিকের কাছে কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সহমত প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তাই উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে যদি প্রতিটি মতের প্রতিফলন ঘটাতে হয় তবে তা বিশৃঙ্খলা আনয়ন করবে।

রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হলো তিনি মনে করেন না সার্বভৌম অসীম বা সীমাহীন ক্ষমতাধর। রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির ফলে জনগণের ওপর অধিকারপ্রাপ্ত হয় এবং রাষ্ট্র যখন এ অধিকার সামগ্রিক স্বার্থে বা সকলের জন্য প্রয়োগ করে তাহলে তা হয়ে উঠে সার্বভৌম। জনগণের ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু করার এখতিয়ার ও স্বাধীনতা সার্বভৌমের নেই। সার্বভৌম অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাধর জনসাধারণ। জনগণের স্বাতন্ত্র্য খর্ব হয় এমন কোনো কাজে সার্বভৌম হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাই সাধারণ ইচছার লক্ষ হবে সর্বদা সার্বজনীনতা; বিশেষ নয় সার্বিক, ইচ্ছার প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যক্তিবিশেষ নয় সকল জনসাধারণ। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তবে সাধারণ ইচ্ছা তার লক্ষ ও উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। রুশো সার্বভৌমের কাছে নাগরিকের একক দায়িত্বভার অর্পণ করেননি। বরং তিনি নাগরিকের কাছে সার্বভৌমের প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর এ আবেদনটি স্পষ্ট, যাতে তিনি মনে করেন রাষ্ট্র (সার্বভৌম) যেমন নাগরিকদের সুবিধা-অসুবিধা, জীবন সম্পত্তিসহ অন্যান্য বিষয়াদি নিশ্চিতে কাজ করেছে তদ্রুপ নাগরিকদেরও রাষ্ট্রের বিপদকালীন সময়ে এগিয়ে এসে এর সুরক্ষা বিধানে কাজ করা দায়িত্ব। উভয়পক্ষের পারস্পরিক সুরক্ষা বিধান সামাজিক চুক্তির লক্ষ্য। রাষ্ট্রের বিপদে অথবা দুঃসময়ে নাগরিকদের নিজের জীবন তুচ্ছ করে রাষ্ট্রের সুরক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে। যে মানুষের জীবন প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির দান, নাগরিকরূপে রাজনৈতিক জীবন তাহলে রাষ্ট্রের দান। এধরণের অবস্থায় রুশো মনে করেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি বা সাধারণ ইচ্ছাকে অমান্য করা একটি সামাজিক অপরাধ এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

রুশোর রাষ্ট্র একটি আঙ্গিক সত্তা (organic Body)। সার্বভৌমের অংশ হিসেবে সমস্ত নাগরিক সার্বভৌম, আবার সার্বভৌমের স্রষ্টারূপে সকল নাগরিককে নিয়েই সার্বভৌম। এতে ব্যক্তির অংশ এবং অংশী এ দুটি রূপ প্রকাশিত। এভাবে সার্বভৌম বা রাষ্ট্র এবং নাগরিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সূত্রে আবদ্ধ। নির্ভরশীলতার অংশরূপে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের দুঃসময়ে সুরক্ষার্থে এগিয়ে আসে আবার নাগরিকের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র। একইভাবে যখন নাগরিকগণ সাধারণ ইচ্ছার অংশ তারা আইনপ্রণেতা আর নাগরিকগণ যখন একক সত্তা তাহলে তারা আইন মান্যকারী।[১২৭] অবশ্য রুশো স্পষ্ট দাবি করেছেন রাষ্ট্র যখন স্বশাসিত অর্থাৎ জনগণ সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে যুক্ত তাহলে রাষ্ট্রের নির্দেশ মান্য করা, আইন মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য। এভাবে রুশো সাধারণ ইচ্ছার কাছে সার্বভৌমতত্ত্বকে স্থাপন করে প্রকৃত অর্থে জনগণের কাছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। এটি তার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। তার উদারতাবাদের পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে তিনি নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন এবং এটি স্ব-নিয়ন্ত্রণ। এভাবে রুশো কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মাঝে মেলবন্ধন স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। জনগণের স্বাধীনতা জনগণের কর্তৃত্ব দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। কোনো একক ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ বা রাজা নয় সমষ্টিগত জনগণের হাতে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আবার এ কর্তৃত্ব শুধু নিয়ন্ত্রণবাদী নয় স্বাধীনতাকামী।

রুশো সাধারণ ইচ্ছার আলোচনায় উল্লেখ করেছেন সাধারণ ইচ্ছা সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত ও সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পরিচালিত। পক্ষান্তরে হবসীয় মানব চরিত্রের প্রকৃতি আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি মানুষের আচরণ সর্বদা অপরের কল্যাণে পরিচালিত হয় না বরং ব্যক্তির স্বীয় স্বার্থে পরিচালিত করে। এধরণের পরিস্থিতিতে রুশোর বিশ্লেষণ হলো ব্যক্তি মানুষ যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থাতে নিজের কোনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ স্থির করে তবে তা সামষ্টিক মঙ্গলের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। সে অর্থে ব্যক্তিক আচরণের প্রবণতা সামষ্টিক কল্যাণের দিকে ধাবিত। যদিও আমরা মনে করি রুশোর এ বক্তব্য পুনবিবেচনার দাবি রাখে। স্বভাবতই স্বার্থপর মানুষ প্রকৃত বিচারে সামষ্টিক কল্যাণ অভিমুখী প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত কিনা তা বলা দুষ্কর। রুশো সাধারণ ইচ্ছার যে চিত্রায়ণ করেছেন তার বাস্তব প্রতিফলন বেশ দুলর্ভ, অনেকটা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র ও তার দার্শনিক রাজার মতো।

মেলজার মনে করেন– সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বকে কোনোভাবেই একটি কাল্পনিক এবং নৈতিক মতবাদরূপে বিবেচনা না করে একে একটি রাজনৈতিক এবং বাস্তবধর্মী মতবাদরূপে বিবেচনা করা উচিত। এ প্রসঙ্গে মেলজার

বলেন, “The virulent attacks Rousseau directed at unjust and abusive inequality have tended to obscure that he also thought men very much unequal. He believed in “great men” in heroes and philosophers in innate force of soul and innate genius such men are not merely more talented than others they are more perfect beings.”[১২৮]

রুশোর সাধারণ ইচ্ছার সফলতার জন্য প্রয়োজন সত্যিকারের নৈতিক উৎকর্ষতা। যা ব্যক্তিকে সামষ্টিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারে। আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহারে প্রয়োজন রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের পরিত্যাগ। নৈতিক উৎকর্ষতার প্রয়োজন এ কারণে যে, কোনো ন্যায়সঙ্গত আচরণের ক্ষেত্রে যদি (সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের মিল না ঘটে) ব্যক্তি স্ব স্ব স্বার্থবোধের দ্বারা চালিত হয় তবে সাধারণ ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটানো যাবে না। রুশো মনে করেন জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস এমতাবস্থায় জনগণ যদি দূরদর্শিতা সম্পন্ন না হয় এবং সামষ্টিক নৈতিকতা বা সামাজিক নৈতিকতার সাহায্যে পরিচালিত না হয় তবে সাধারণ ইচ্ছা সুফল বয়ে আনবে না। রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে লক্ষণীয় হলো তিনি একই সত্তার মাঝে শাসক ও শাসিতের অন্বেষণ করেছেন। তাই উভয়ের প্রকৃতিগত বৈপরীত্য থাকা সমীচীন হবে না। অন্যথায় স্বাধীনতার সমস্যা সমাধান হবে না। রুশোর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো জনগণের ক্ষমতায়ণ। সমাজে ও রাষ্ট্রে ক্ষমতার প্রকৃত আধার হবে জনগণ। সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী রাজা (হবসের মতো) হবেন না।

রুশো এবং হবসের সার্বভৌমতত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য হলো− চরম সার্বভৌম ক্ষমতার উপস্থিতি ও প্রয়োগ। বৈসাদৃশ্য হলো হবসের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা আর রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সাধারণ ইচ্ছা তথা সাধারণ জনগণ। হবসের মতো রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে ব্যক্তি বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে মেনে নেয়। হবস, লক, রুশো প্রত্যেকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলপ্রয়োগ নয় সামাজিক চুক্তির সাহয্যে সম্মতির মাধ্যমে সৃষ্টি করে। হবস ও রুশো উভয়ের কাছে লক্ষণীয় হলো মানুষ সম্মতির দ্বারা বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকে স্বীকার করে নেয়। হবসের মতে বলপ্রয়োগের এ ক্ষমতা রাজার কাছে আর রুশোর মতে ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার হাতে।

রুশো সাধারণ ইচছার হাতে যে ক্ষমতা দিয়েছেন তাতে তিনি অভ্রান্ত ব্যক্তিগত বিবেকবোধের ইঙ্গিত দিয়েছেন। রুশোর সাধারণ ইচ্ছার ন্যায়পরতামূলক যে চিন্তা তার সাথে আমরা সাদৃশ্য পাই কান্টের শর্তহীন আদেশের এবং বিশ্বজনীনতাবোধ তথা সার্বজনীন মঙ্গল চিন্তায়। এ সকল ম্যাক্সিমে কান্ট এমনভাবে কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন যাতে মানবজাতির সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ হয়।

মেলজার রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বকে ন্যায়পরতার সমন্বয়রূপে নয় বরং প্রতিস্থাপনরূপে গ্রহণ করেছেন। রুশো তাঁর পূর্ববর্তী মতসমূহের সাথে দ্বৈততা পোষণ করে দাবী করেন− true justice is not publicly known or sanctioned, and what appears in the world as “natural law” is always a tool of exploitation.[১২৯] মেলজার মনে করেন রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থটিকে তাঁর পূর্ববর্তী লেখনীসমূহ বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় ডিসকোর্সের আলোকে বিশ্লেষণ করা উচিত এবং সে বিবেচনায় নিতে হবে নৈতিক বাস্তববাদ (moral realism)−কে । স্বতন্ত্রভাবে যদি গ্রন্থটিকে বিবেচনা করা হয় তাহলে গ্রন্থটির সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বকে একটি কাল্পনিক নৈতিক মতবাদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বিপদজনক দিকের চিত্রায়ন মনে হতে পারে।[১৩০]

সার্বভৌমের প্রকৃতি সম্পর্কে চুক্তিবাদীদের আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে আমরা বলতে পারি সার্বভৌম ও নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিকতার সম্পর্ক বিদ্যমান। যেখানে সার্বভৌমের ক্ষমতা নাগরিকের স্বার্থ ও সুরক্ষাবিধানে ব্যবহৃত আবার নাগরিকের দায়িত্ব সার্বভৌমের অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা রক্ষা করা ও আদেশ মান্য করা। ত্রয়ী চুক্তিবাদী বিশেষত রুশোর সার্বভৌমতত্ত্বে লক্ষণীয় হলো রাষ্ট্র একটি নৈতিক সংস্থা। নৈতিকতার আধার হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক

জনগণের ওপর নিপীড়ন গ্রহণযোগ্য নয়। যার ব্যত্যয় বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় লক্ষ করা যায়। আবার একটি সামষ্টিক অংশ রূপে রাষ্ট্রের মর্যাদাহানিকর তথা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কিংবা রাষ্ট্রীয় শান্তিশৃঙ্খলার পরিপন্থী কোনো আচরণকে নাগরিকের অধিকাররূপে প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে নাগরিকের ব্যক্তিগত নৈতিকতার একটি শক্তিশালী উপস্থিতি প্রত্যাশিত। পরিণতিযুক্ত এ নৈতিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক নৈতিকতা এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা একটি পারস্পরিক দায়বদ্ধতায় আবদ্ধ যা রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধশালী সংস্থারূপে টিকিয়ে রাখতে এবং নাগরিকের জীবনযাত্রাকে উন্নত করার লক্ষ্যে অপরিহার্য। নৈতিকতার পারস্পরিক দায়বদ্ধতা নাগরিক ও রাষ্ট্র উভয়ের জন্য একটি লাভজনক অবস্থা তৈরি করতে পারে।

যদিও রুশোর লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে তাঁর চিন্তাধারার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অবসান দ্বারা এক নতুন সমাজ বিস্তার লাভ করে। এ নতুন সমাজ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করেছে– না কি সত্যিকার অর্থে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পেরেছে সে প্রশ্ন থেকে যায়। তবে এটা বলা যায় পূর্ববর্তী সমাজব্যবস্থা অপেক্ষা রুশো যিনি আধুনিক সময়কালের প্রতিনিধিত্বকারী একটি অধিকতর মানবতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন।

তথ্যনির্দেশ

১. Thomas Hobbes, *Leviathan*, A. P. Martinich and B. Battiste (eds.), Revised Edition, Broadview Edition, Canada, 2011, Ch. XVII, pp. 160-161.

২. *Ibid.*, Ch. XXII.

৩. H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 185-189.

৪. Sophie Nicholls, "Sovereignty and Government" in Jean Bodin's *Six Livres de la* République (1576),' Journal of the History of Ideas, Vol. 80, No. 1, University of Pennsylvania, 2019, pp. 47-49.

৫. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XVII, p. 161.

৬. *Ibid.*, Ch. XIX, p. 171.

৭. Howard Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Part II, Ch. X, Clarendon Press, Oxford, 1970.

৮. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXVI, pp. 232-234.

৯. *Ibid.*, Ch. XXIX.

১০. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature*, p. 69.

১১. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXVI, p. 232.

১২. *Ibid.*, Ch. XXVI, pp. 231–235.

১৩. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature*, p. 95.

১৪. George Duke, "Law and Philosophy", Vol. 33, No. 5, Springer Nature, 2014, pp. 605-627.

১৫. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature*, p. 70.

১৬. *Ibid.*, p. 71.

১৭. *Ibid.*, p. 72.

১৮. *Ibid.*

১৯. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XVIII.

২০. *Ibid.*

২১. Howard Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes*, pp. 197-198.

২২. Hobbes, *Leviathan,* Ch. XXV, pp. 135-136.

২৩. *Ibid.,* Ch. XIX.

২৪. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature*, Ch. 3., Princeton University Press, 2004, p. 68.

২৫. জর্জ এইচ. স্যাবাইন (মূল), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৮৭।

২৬. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature,* p. 91.

২৭. Thomas Hobbes, *The Elements of Law: Natural and Politic,* Gaskin JCA (ed.), Reprint, Oxford University Press, 1999, pp. 42.46.

২৮. Thomas Hobbes, *De Cive: On the Citizen,* R. Tuck and M Silver Thorne (ed. and Trans.), Cambridge University Press, Cambridge, Reprint, 2003, pp. 85-87.

২৯. Hobbes, *The Elements of Law: Natural and Politic*, pp. 88-89.

৩০. Perez Zagorin, *Hobbes and the Law of Nature,* p. 94.

৩১. Hobbes, *Leviathan,* Ch. XXV.

৩২. Michael Sevel, "Hobbes: Patriarch of Legal Positivism, or Reinventor of Natural Law?" in *The Bloomsbury Companion to Hobbes,* S. A. Lloyd (ed.), Continuum Press, London, 2012, pp. 7-10.

৩৩. *Ibid*.

৩৪. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes,* p. 181.

৩৫. Hobbes, *Leviathan,* Ch. XXVI, pp. 244-245.

৩৬. Hobbes, *De Cive,* Vol. 2, p. 158 in Warrender, p. 126.

৩৭. *Ibid.*, Ch. XXVIII, pp. 264-274.

৩৮. *Ibid.*, p. 274.

৩৯. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes*, pp. 178-179.

৪০. Hobbes, *Leviathan,* Part II, Ch. XX, p. 182.

৪১. *Ibid.,* Part II, Ch. XX, pp. 182-183.

৪২. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes,* pp. 179-180.

৪৩. Hobbes, *Leviathan,* Ch. XXII, pp. 206-207.

৪৪. *Ibid.*, Part II, Ch. XXII, pp. 211-212

৪৫. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, pp. 177-179.

৪৬. *Ibid.*, p. 179.

৪৭. Hobbes, *Leviathan*, Part II, Ch. XXII, pp. 201-204.

৪৮. *Ibid.*, Ch. 3, pp. 202-203.

৪৯. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes*, p. 182.

৫০. *Ibid.*, p. 181.

৫১. *Ibid.*, pp. 182-184.

৫২. *Ibid.*, p. 182.

৫৩. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXII, p. 208.

৫৪. *Ibid.*, Ch. XXI, pp. 199-201.

৫৫. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes*, p. 199.

৫৬. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXI, pp. 199-200.

৫৭. Hobbes, *De Cive*, Vol.2, p. 158 in Warrender, p. 126.

৫৮. Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes*, p. 135.

৫৯. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau*, Oxford University Press, London, 1982, p. XXV.

৬০ John Locke, *Second Treatise*, § 149, p. 384.

৬১ *Ibid.*, p. 385.

৬২. *Ibid.*, pp. 386-387.

৬৩. Locke, *Second Treatise*, § 135, "Though the legislative be the supreme power in every commonwealth...it is not, nor can possible be absolutely arbitrarily over the lives and fortunes of the people", p. 375.

৬৪ Locke, *Second Treatise*, § 150, pp. 385-386.

৬৫ *Ibid.*, § 151, p. 386.

৬৬. Locke, *Second Treatise*, § 141, pp. 380-381.

৬৭. *Ibid.*, § 156-157, pp. 389-391.

৬৮. *Ibid*.

৬৯. *Ibid*., § 158, 160, pp. 391, 393.

৭০. *Ibid*., § 166, p. 396.

৭১. *Ibid*., § 165, p. 395.

৭২. *Ibid*., § 159, 166, pp. 392-393, 396.

৭৩. হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, পৃ. ৪৯৮।

৭৪. J. W. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, Eight Edition, Oxford University Press, London, 1968, p. 93.

৭৫. *Ibid*.

৭৬ Locke, *Second Treatise*, § 156, p. 389.

৭৭. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, pp. 94-95.

৭৮ Locke, *Second Treatise*, § 156, 157, pp. 389-390.

৭৯ *Ibid*., § 15, § 145.

৮০. *Ibid*., P. 324.

৮১. *Ibid*., P. 329.

৮২. Barker, *Essays in Social Contract*, p. xxxiii.

৮৩. *Ibid*., p. xxv.

৮৪. *Ibid*., p. xxvi,

৮৫ Raghuveer Singh, "John Locke and the Idea of Sovereignty", *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 20, No. 4, 1959, pp. 320-321. https://www.jstor.org/stable/42743527

৮৬. Bedri Gencer, "Sovereignty and the Separation of Powers in John Locke", *The European Legacy*, Vol. 15, No. 3, 2010, pp. 323-339.

৮৭. *Ibid*.

৮৮. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ২০০৮, পৃ. ৩৭।

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

৯০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭।

৯৩. Singh, “John Locke and the Idea of Sovereignty”, pp. 322-330.

৯৪. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, পৃ. ৪০।

৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০।

৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

৯৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

১০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩।

১০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০-৫১।

১০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৮।

১০৫. গ্রোটিয়াস ফ্রান্সে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর গ্রন্থ *দা জুরি বেলি এ্যক প্যাসিস* এ ফ্রান্সের রাজা চর্তুদশ লুইকে সর্বক্ষমতা সম্পন্ন করেছেন এবং জনগণকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

১০৬. রুশো তাঁর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে এ বিষয়ে নিজেই মনে করেন না যে, একটা জনসমষ্টির ঐক্যমত্য সর্বদাই একটা প্রশ্নাতীত সত্য। সরদার, পৃ. ৫৩।

১০৭. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, পৃ. ৫৩-৫৪।

১০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

১১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫০।

১১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫।

১১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

১১৪. ননী ভৌমিক (অনূ.), রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস, খণ্ড. ২, ঢাকা: অবসর প্রকাশন, ২০০৯, পৃ. ১১৫।

১১৫. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*, পৃ. ৫৩।

১১৬. Arthur M. Melzer, “Rousseau's Moral Realism: Replacing Natural Law with the General Will”, Vol. 77, Issue. 3, Cambridge University Press, 1983, p. 650.

১১৭. ননী ভৌমিক (অনূ.), রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস, পৃ. ১২৩।

১১৮. Barker, *Essays in Social Contract*, p. xxxviii.

১১৯. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, পৃ. ১৪৩।

১২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১।

১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

১২২. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, Routledge, London, 1995, p. 671.

১২৩. C. E. Vaughan, *The Political Writings of Jean Jacques Rousseau*, Vols. 1, 2, John Wiley and Sons, New York, 1962, pp. 239-343.

১২৪. *Ibid.*, p. 241.

১২৫. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, পৃ. ১৩০-১৩১।

১২৬. Melzer, "Rousseau's Moral Realism: Replacing Natural Law with General Will", p. 650.

১২৭. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, পৃ. ১৩০-১৩১।

১২৮. Melzer, "Rousseau's Moral Realism: Replacing Natural Law with General Will", p. 650.

১২৯. *Ibid.*, pp.650-651.

১৩০. *Ibid.*

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের ধারণা

হবস, লক ও রুশো অধিকার, সমতা ও স্বাধীনতার ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন মানবপ্রকৃতি বা মানবচরিত্রের ধরণ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন তথা মানবসমাজের রাজনৈতিক চিন্তার পটপরিবর্তন, বৈধ সরকারব্যবস্থার ভিত্তি ইত্যাদি বিষয়বস্তুসমূহের বিচার দ্বারা। স্বাধীনতার ধারণা আলোচনাকালে তাঁদের চিন্তায় ব্যক্ত হয়েছে রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রকৃতি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রের অবস্থান তথা কার্যাবলী ও নাগরিকের প্রতি দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের করণীয়, সম্পত্তি, বিপ্লবের অধিকার, ব্যক্তিগততা বনাম সামষ্টিকতা ইত্যাদি। পাশাপাশি সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের সীমারেখাসমূহ কীভাবে চিত্রিত হয়েছে তাও এতে লক্ষ করা যাবে। আমি এ অধ্যায়ে অধিকার, সমতা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে হবস, লক ও রুশোর মতবাদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরবো। এসব বিষয়ে পরবর্তীকালের রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র দার্শনিকগণের চিন্তার ভিন্নতা আলোচনায় উঠে আসবে। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের স্বাধীনতা ছিল। কারো মতে এ স্বাধীনতা ছিল অবাধ আবার কারো মতে তা নিয়ন্ত্রিত। প্রশ্ন হলো, প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা ছিল কিন্তু সমতা ছিল কি? যদি স্বাধীনতা ও সমতা উভয়ই থাকে তাহলে সিভিল সোসাইটির উদ্ভব কেন? সামাজিক চুক্তি সম্পাদন দ্বারা জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের সকল অধিকার যখন সার্বভৌম শক্তির কাছে সমর্পন করলো, তাহলে তাদের স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকার পূর্বের মতো থাকলো না। আইনের অনুশাসন, সরকারের উপস্থিতি এবং জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা; রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে জনগণ ও নাগরিকের অবস্থান কীভাবে ত্রয়ী চুক্তিবাদীর দর্শনে স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের মাত্রাগত ভিন্নতা তৈরি করে এ সকল বিষয়ের রাষ্ট্রদার্শনিক অনুসন্ধান এ অধ্যায়ের উপজীব্য।

স্বাধীনতা সম্পর্কে হবসের অবস্থান

হবস, লক ও রুশোর চিন্তায় আমরা আধুনিক রাজনীতি, রাজনৈতিক তত্ত্ব বা ধারণাসমূহের এক প্রকার বিজ্ঞানসম্মত ইতিবাচক ধারণা লক্ষ করি। যেমন, হবসের মতে, "সতের শতকের রাজনৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতাবাদী প্রকৃতির ওপর, এরিস্টটলের সেকেলে উদ্দেশ্যবাদের ওপর নির্ভর করে নয়।"[১] হবস এরিস্টটলীয় উদ্দেশ্যবাদী ধারার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের ওপর তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রকৃতির যান্ত্রিক নিয়মের আলোকে মানবপ্রকৃতি, প্রকৃতির রাজ্য ও রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ব্যক্তিকে গ্রহণ করেছেন সমাজের মৌলিক উপাদানরূপে এবং ব্যক্তির সাহায্যে সমাজকাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ থেকে বলা যায় হবস ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হবসের দর্শনে ব্যক্তির স্বার্থ এবং ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর এধরণের চিন্তার সাথে সাদৃশ্য মেলে রোনাল্ড গ্রিমসলির বক্তব্যে। গ্রিমসলিও মনে করেন, ব্যক্তির অধিকারের প্রশ্ন রাজনীতির স্বার্থের প্রশ্নের সাথে অবিচ্ছেদ্য।[২] স্বাধীনতার সংজ্ঞায় টমাস হবস বলেনঃ "LIBERTY or FREEDOM signifieth properly the absence of opposition (by opposition I mean external impediments of motion) and may be applied no less to irrational and inanimate creatures than to rational."[৩]

হবস স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন একজন স্বাধীন বা মুক্ত ব্যক্তি বা মানুষ, যে মানুষ সাহস এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। হবসের স্বাধীনতার ধারণার সাথে আরো

সাদৃশ্য পাওয়া যায় বার্লিনের নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণার। এধরণের স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির সম্ভাব্য ব্যক্তিক কার্যাবলির ওপর বাহ্যিক বা সামাজিক কোনো কিছু কর্তৃক বলপ্রয়োগ বা অযাচিত হস্তক্ষেপ না করা। হবস তার নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণায় স্বাধীনতাকে দেখেছেন অপরের প্রভাব বা হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে, কোনো দৈহিক প্রতিবন্ধকতার উর্দ্ধে গিয়ে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় কার্য সম্পাদন করতে পারে। লক্ষণীয় হলো, হবস মনে করেন সার্বভৌমের অধীনে প্রত্যেক প্রজার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, যদি না প্রজা কারাগার বা শেকল দ্বারা আবদ্ধ হয়।

হবস এক্ষেত্রে স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য করেন। তিনি মনে করেন, যখন কোনো বস্তুর গতি বাহ্যিকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে বস্তুটিকে আমরা স্বাধীনতার অভাবরূপে চিহ্নিত করি। আর কোনো বস্তুর গতি যদি অভ্যন্তরীণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহলে সেটিকে বলা হয় সক্ষমতার অভাব।[৪] যেমন− বস্তুরূপে একটি পাথর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিশীল নয়। পাথরের এ নিশ্চলতাকে বলা হয় এর সক্ষমতা বা শক্তির অভাব। কিন্তু পাথরটির স্বাধীনতার অভাব এমনটা দাবি করা যায় না। কোনো শয্যাশায়ী বা অসুস্থ ব্যক্তি যিনি চলৎশক্তিহীন তার এ অবস্থাকে আমরা স্বাধীনতার অভাব বলবো না, বরং তা হবে শক্তি বা সক্ষমতার অভাব যার দরুণ ব্যক্তি হাটতে পারছে না।

হবসের মতে, আমরা যদি কোনো অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যশক্তি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (যেমন− কোনো কাজ করার অসামর্থ্য বা শক্তির অভাব) বোধ করি তবে তা হবে শক্তির অভাব এবং যখন সে সকল প্রতিবন্ধকতা বাহ্যিক হয় তাহলে তা স্বাধীনতার অভাব। সে স্বাধীনতার প্রয়োগ বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অভাব অনুভূত হয়। সামাজিক সম্পর্কের সাথে ব্যক্তির অনিবার্য স্বাধীনতার সম্পর্ক নেই। হবস মনে করেন, স্বাধীনতার সাথে অপ্রতিহত বা বাধাহীন ক্ষমতার সম্পর্ক আছে। তাঁর দৃষ্টিতে একজন মানুষ তখন স্বাধীন, যখন সে তার পরাক্রম এবং বুদ্ধির দ্বারা যা করতে সক্ষম তা সে করতে পারে এবং সে যা করতে চায় তার সে ইচ্ছা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।[৫]

হবস এভাবে ক্ষমতা (কোনো কাজ করার অভ্যন্তরীণ সামর্থ্য) এবং স্বাধীনতা (বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি)−র মাঝে যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এর সাথে আমরা নঞর্থক স্বাধীনতার সাদৃশ্য পাই। যদিও পরবর্তীতে চিরায়ত উদারতাবাদীগণ এধরণের নঞর্থক স্বাধীনতা সমর্থন করেছেন, তবে হবসই নঞর্থক স্বাধীনতার উদগাতারূপে চিহ্নিত। হবসীয় নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণাকে যখন বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা হয় তাহলে যান্ত্রিক ধারণার সাথে কিছু সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আবার তিনি তার নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণাকে যখন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তাহলে তাতে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক লক্ষণীয়। হবস যখন যান্ত্রিক ধারণার দ্বারা স্বাধীনতা ব্যাখ্যা করেন তাতে তিনি দৈহিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিকে বোঝান। পক্ষান্তরে লক নেতিবাচক স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছেন সামাজিক ধারণা অর্থে। লকের কাছে স্বাধীনতা হলো মানুষের কাজে নিপীড়ন বা বলপ্রয়োগের অনুপস্থিতি। হবসের নেতিবাচক স্বাধীনতার এ ধারণাকে চিরায়ত উপযোগবাদীগণ সহজভাবে গ্রহণ করেননি, তারা একে রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্র মনে করেন।[৬]

হবসীয় নেতিবাচক স্বাধীনতার এ ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে রবার্ট ফিলমার এবং অন্যান্য নিরঙ্কুশতন্ত্রীর (absolutist) কাছে। স্বাধীনতার প্রতি তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি লকের মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁদের এধরণের মত স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সংহতকরণে সহায়ক আইনি ব্যবস্থাকে ভুল বলে মনে করে। নিরঙ্কুশবাদীগণ মনে করেন, যে কোনো আইন মাত্রই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সংকোচন ঘটায়। কাজেই 'আইন স্বাধীনতার উপভোগকে নিশ্চিত করে'− লকের এধরণের মতের বিপরীত মত হবস, ফিলমার প্রমুখের কাছে পাই। তাদের এধরণের মত যে কতটা বিভ্রান্তিমূলক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ একজন ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীনতা অবশ্যই ব্যক্তিকে স্বৈরতন্ত্রের দিকেই চালিত করে। ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারমূলক এবং জাতীয় পরিমণ্ডলে সে স্বাধীনতা হয়ে উঠে স্বৈরতান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ, যা ইচ্ছা তা করা বা অবাধ অপ্রতিহত

কর্মপ্রয়াস যদি স্বাধীনতা হয় তাহলে খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই ইত্যাদি সকল কুকর্ম বৈধতার দাবি রাখে। আর মুক্ত সমাজের দোহাই দিলে অপরাধের বিচারের জন্য এ সকল আইন প্রণয়ণ অর্থহীন। কোনো রকম নিয়ন্ত্রণবিহীন, অবাধ স্বাধীনতার উপভোগের জন্য যে ধরণের সমাজের প্রস্তাব করা হয় তা মূলত নৈরাজ্যমূলক একটি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু নয়।

বার্লিন "Two Concepts of Liberty" (1969) -তে দুই প্রকার স্বাধীনতার ধারণার উল্লেখ করেছেন– নঞর্থক স্বাধীনতা এবং সদর্থক স্বাধীনতা। নঞর্থক স্বাধীনতার সমর্থকগণের মধ্যে আছেন হবস, বেন্থাম, মিল প্রমুখের মতো ব্রিটিশ দার্শনিকগণ (নঞর্থক বা নেতিবাচক স্বাধীনতা হলো যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় বা ব্যক্তি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়)। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতার সদর্থক ধারণার সমর্থকবৃন্দ হলেন কান্ট, রুশো, হেগেল প্রমুখ যারা– স্বাধীনতাকে স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন এবং স্ব-নির্ধারণ বা স্বনিয়ন্ত্রণ এর সাহায্যে বিচার করেন। যদিও বার্লিনের পূর্বেও স্বাধীনতা সম্পর্কে এসব দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত ছিল, তবে তার বিশেষত্ব হলো তিনি মনে করেন উনিশ এবং বিশ শতকে সদর্থক ধারণা সর্বাত্মকবাদ (totalitarianism)–এর জন্য বৈধতা পায় এবং নঞর্থক ধারণা উদার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করে।[৭] স্বাধীনতার ধারণা বলতে বার্লিন বুঝিয়েছেন যেখানে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ থাকবে না। এখানে বলপ্রয়োগ বলতে কোনো পক্ষের বা ব্যক্তি কর্তৃক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হস্তক্ষেপকে বোঝানো হয়েছে। স্কিনার বলেন, হবসের দর্শনে নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি বৈকল্পিক এবং অভিপ্রায়মূলক রিপাবলিকান-বিরোধী হিসেবে।[৮] ফিলিপ পেটিট মনে করেন রিপাবলিকান স্বাধীনতা মূলত নঞর্থক এই অর্থে যে, এখানে 'অন্যের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য অনুপস্থিত'। এরূপ স্বাধীনতার এক প্রকার সদর্থক দিক রয়েছে এবং তা হলো নিজের ওপর স্বীয় কর্তৃত্বের উপস্থিতি।[৯]

হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যে মানবপ্রকৃতির যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাতে মানুষ স্বার্থপর, লোভী, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় মানসিকতাপূর্ণ। এধরণের অনিয়ন্ত্রিত মানুষের কাছে স্বাধীনতার বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবে না অনিয়ন্ত্রিত হবে এ প্রশ্নটি থেকে যায়। তাছাড়া এ মানুষ প্রকৃত বিচারে কতটা স্বনিয়ন্ত্রিত সে প্রশ্নটিও জরুরী। কাজেই হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যের মানবপ্রকৃতি যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক সমাজে পদাপর্ণ করেছে, কিন্তু যাদের চরিত্রের মূলগত দিকসমূহ সুপ্ত থাকলেও নিশ্চিহ্ন হয়নি– এধরণের জনচরিত্রের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সংজ্ঞায়ন ও সীমারেখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আইনের শাসন স্বাধীনতার উপভোগের পথে অন্তরায়– এধরণের দাবি সমর্থিত হলে প্রয়োজন নৈরাজ্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। হবসীয় স্বাধীনতার ধারণা লক্ষ করলে দেখা যায় যে ব্যবহারিক নৈতিকতার প্রতি তাঁর ইঙ্গিত রয়েছে। পক্ষান্তরে লকীয় স্বাধীনতার ধারণা এক প্রকার আদর্শনিষ্ঠ মানদণ্ড যুক্ত। এছাড়া হবসীয় স্বাধীনতার ধারণার সাথে সাদৃশ্য জেরেমি বেন্থামের চিন্তার, যেখানে তাঁরা উভয়ে মনে করেন– আইন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার লকীয় আইনের সাথে আমরা সাদৃশ্য পাই জে. এস. মিলের। লকের সাথে মিলের চিন্তার সাদৃশ্য হলো সামষ্টিকতাবাদে। সমাজের অন্যান্য ব্যক্তি কীভাবে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে সে লক্ষ্যে লক ব্যক্তিমানুষের কাছে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যবোধ প্রত্যাশা করেছেন। বলা যায়, হবসীয় স্বাধীনতার সাথে যুক্ত বাধ্যতা এবং লকীয় স্বাধীনতার সাথে বাধা। এখানে বাধা বলতে বোঝানো হচ্ছে আইনি এবং নৈতিক প্রতিবন্ধকতা তথা সীমারেখা। হবসীয় বাধ্যতা হলো সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বাধ্যতা, যার সাহায্যে স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটবে। হবসীয় স্বাধীনতার ব্যাখ্যা মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি বেশি জোর দিয়েছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতায় এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোনো বিষয়ে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বলপ্রয়োগ দুইভাবে হতে পারে– আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা অথবা হুমকি প্রদর্শন দ্বারা ব্যক্তিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে বাধা সৃষ্টি করা, আবার ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা।

হবস মনে করেন সকল ব্যক্তির মধ্যেকার আবেগ একরকম নয়। ব্যক্তির বস্তুগত আকাঙ্খার ধরণ অনুযায়ী আবেগের পরিবর্তন ঘটে। আবেগ হওয়া উচিত অর্ন্তদর্শন দ্বারা পরিচালিত, যা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[১০] হবসের আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কেবল আবেগকে নয়, একজন শাসকের জন্য অর্ন্তদর্শনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্ন্তদর্শন শাসকের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার যোগান দেয়। হবস মনে করেন একজন শাসকের তথা একজন ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যাতে তা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কমনওয়েলথের জন্য শান্তিমূলক এবং একইসাথে ব্যক্তিক পর্যায়ে যে আবেগ অপরের জন্য অনভিপ্রেত এমন আবেগকে নিবৃত রাখা উচিত। হবসের এধরণের বক্তব্য থেকে এটি বলা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও হবসের কাছে কমনওয়েলথ হলো 'একটি কৃত্রিম মানুষ'। কমনওয়েলথ নামক সংস্থাটি মূলত ব্যক্তির সকল প্রকার মর্যাদার উৎসস্থল। হবস মনে করেন সামাজিক মর্যাদাগত যে অসমতা তা কৃত্রিমভাবে উদ্ভূত। কারণ অহংকার তা ব্যক্তিগত হোক কিংবা কমনওয়েলথের তরফে হোক তা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট নয়। হবস মনে করেন, প্রকৃতির রাজ্যে নয়, বরং রাজনৈতিক সমাজ তথা কমনওয়েলথের কাছে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার্থে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ চুক্তিবদ্ধ হয়ে কমনওয়েলথের কাছে ক্ষমতা সমর্পণ করে। হবসের ভাষায়ঃ "Hitherto I have set forth the nature of man (whose *Pride* and other passions have compelled him to submit himself to government;) together with the great power of his governor, whom I compare to the Leviathan, ..., where God having forth the great power of Leviathan, called him king of Proud."[১১]

হবস প্রজাদেরকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছেন এমন দাবি তার সার্বভৌম এবং সামাজিক চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা থেকে করা যায় না। বরং হবস রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের ক্ষেত্রে সার্বভৌম বা লেভিয়াথানের শক্তিকে সর্বেসর্বা করেছেন। জনগণকে লেভিয়াথানের অনুগত রাখার মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন বলে দাবি করা যায়। স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠায় হবস আইনকেও ব্যবহার করেছেন কিন্তু সে আইনকে তিনি ব্যবহার করেছেন। সার্বভৌমের ক্ষমতাকে সুদৃঢ়করণে এবং জনগণের আনুগত্যের দাবিতে। অবশ্য গথিয়ার হবসের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এধরণের অবস্থানকে কোনো সর্বাত্মক ব্যবস্থা কিংবা স্বেচ্ছামূলক স্বৈরাচারতন্ত্র মনে করেন না। বরং আলোকিত রাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ মনে করেন। তাঁর মতে, হবস কর্তৃত্ববাদী কিন্তু পরোপকারী, যিনি প্রজাদের স্বীয় স্বার্থ সম্পাদনে ব্যাপক সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষমতা এবং দায়িত্ব উভয়ই দিয়েছেন। প্রজাদের পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দিয়েছেন অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কর্ম সম্পাদনের।[১২]

হবসের রাজনৈতিক দর্শনে সার্বভৌম রাজনৈতিক সমাজের মূল শক্তি। প্রজা এবং সার্বভৌমের মধ্যে প্রজা অপেক্ষা সার্বভৌমের ক্ষমতা অধিক। তিনি রাজনৈতিক সমাজে কর্তৃত্ববাদী শাসকের অধীনে প্রজাদের সদর্থক ভূমিকার কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে রুশোর রাজনৈতিক সমাজের প্রণেতা নাগরিকবৃন্দ। এদের হাতেই মূল ক্ষমতা, যারা তাদের পরিকল্পনার ভার অন্যের ওপর অর্পণ করেনি। নাগরিকের সম্মতিতে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ আদেশ-নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা লাভ করেছে। হবস, লক, রুশো প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রজা বা নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক সমাজ গঠিত হতে পারে না। প্রজারা স্বেচ্ছায় সার্বভৌমকে তাদের অবাধ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর দ্বারা স্বীয় জীবনকে নিরাপদ করে তোলে। মানুষই তার স্বাধীন ইচ্ছার ওপর অধীনতা বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। গথিয়ার অনুসরণে বলা যায় "all obligations are self-imposed in a civil association."[১৩]

হবসের লেভিয়াথানে সার্বভৌমের অনুমতিক্রমে রাষ্ট্রের কার্যক্রমসমূহে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। গথিয়ারের মতে, জনগণ একইসাথে সার্বভৌম এবং সার্বভৌম নয়।[১৪] বলা যায়, সার্বভৌম যখন জনগণের

ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারীরূপে শাসক কিংবা এসেম্বলিতে অংশগ্রহণ করে তাহলে তা আদেশদানকারী এবং জনগণরূপে তা আদেশ মান্যকারী।

হবসের এধরণের মতের বিপরীতে রুশো মনে করেন প্রতিনিধিত্বের এ ধারণা মূলত ব্যক্তিক তথা জনগণের স্বাধীনতার পরিত্যাগ।[১৫] রুশোর মতে, প্রজা এবং সার্বভৌম কমনওয়েলথের দুটি আলাদা অংশ নয়, বরং একক সত্তারূপে ব্যক্তি যখন রাষ্ট্রের দ্বারা শাসিত হয় তাহলে সে সাধারণ প্রজা, আবার সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের সাথে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা হয়ে ওঠে নাগরিক।[১৬] হবসের কাছে বহু জনগণের প্রতিনিধিত্বকারীরূপে যা সার্বভৌম রুশোর কাছে তা হয়ে ওঠে সাধারণ ইচ্ছা।

হবসের স্বাধীনতার ধারণার সাথে আইনের অনুশাসনের একটি সম্পর্ক রয়েছে। হবসের দর্শনে আইন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছে। আবার আইনই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে। ব্যক্তি আইনের দ্বারা সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য, আবার আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে ব্যক্তির সার্বভৌমের বিরোধিতা করার স্বাধীনতা নেই, কারণ একবার চুক্তি সম্পাদিত হলে তা অমান্য করার অধিকার জনতার নেই।[১৭] ওয়াটকিনের মতে, ব্যক্তি তার নিরাপত্তার মূল্যে তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে সার্বভৌমের হাতে তুলে দেয়। যেহেতু হবসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো জনগণকে নিরাপদ জীবনের সন্ধান প্রদান, তাই তাঁর কাছে রাজনৈতিক সমাজে জনগণের স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ব্যক্তির জীবনে নিরাপত্তা প্রাপ্তি ঘটে।[১৮] হবসের ক্ষেত্রে জনগণ প্রতিনিধিত্বকারীরূপে সার্বভৌমকে মান্য করবে আত্মস্বার্থরক্ষার্থে। অন্যথায় তারা প্রকৃতির রাজ্যের দুর্বিষহ জীবনে প্রত্যাবর্তন করবে। অন্যদিকে রুশোর ক্ষেত্রে জনগণ সার্বভৌম শক্তিরূপে সাধারণ ইচ্ছাকে মান্য করবে জনগণের সুখ এবং ন্যায্যতা স্থাপনে, সার্বিক মঙ্গল (common good) অর্জনে। অর্থাৎ হবসের সার্বভৌম ক্ষমতাকে জনগণ মান্য করবে স্বীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে, পক্ষান্তরে রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতাকে জনগণ মান্য করবে সার্বিক কল্যাণের জন্য। এভাবেই তাদের উভয়ের দর্শনে কর্তৃত্ব বৈধতাপ্রাপ্ত হয়েছে। কর্তৃত্বের চরম এবং নমনীয় উভয় প্রকার প্রকাশ হবস এবং রুশোর কাছে লক্ষ করা যায়।

হবসের প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, জনগণের মধ্যে সবসময় একটি ভীতিপ্রদ অবস্থা বিরাজ করতো এবং এই ভীতিই জনগণকে আইন মানতে বাধ্য করে। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে ভয় এবং স্বাধীনতার মধ্যে তিনি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন বলে মনে হয়। এখানে ভয় হলো সার্বভৌমের ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যের একমাত্র কারণ, যা হবসের দর্শনে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকাকে তিরোহিত করেছে। তাঁর ভাষায়, "in the act of our submission consists both our obligation and our liberty."।[১৯] যদিও কোনো কোনো রাষ্ট্রদার্শনিক যেমন– ওয়াটকিনস[২০], ভি. মিল[২১] [২২], হারযোগ[২৩], ম্যাকনেলি[২৪] প্রমুখ হবসের দর্শনে স্বাধীনতা ভয়-ভীতির কাছে সংকুচিত হয়েছে এমনটা মনে করেন না।

হবসের লেভিয়াথান গ্রন্থের আলোচনায় তিনি নাগরিকের স্বাধীনতা এবং ভীতির প্রশ্নে নাগরিকের নিরাপত্তার দিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে স্বাধীনতা এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে। পেনকও মনে করেন, হবস স্বাধীনতা অপেক্ষা নিরাপত্তাকে অধিকতর মূল্য দিয়েছেন এবং স্বাধীনতাকে কম গুরুত্বপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।[২৫] যদিও হবস তাঁর দর্শনে স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ বাতিল না করে ভয়ের সাথে স্বাধীনতাকে যুক্ত করেছেন। তাঁর ভয়ের ধারণা প্রচলিত ধারণা থেকে কিছুটা আলাদা, এ ভয় ব্যক্তিকে কেবল অবনমিত না করে কমনওয়েলথের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে।[২৬] এ প্রসঙ্গে তিনি *লেভিয়াথান* গ্রন্থে একটি ডুবন্ত জাহাজের যাত্রীর উদাহরণ দিয়েছেন। একটি ডুবন্ত জাহাজের একজন যাত্রী যখন তার জিনিসপত্র সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে সে এটি যে খুব আনন্দের সাথে করে তা বলা যায় না, আবার এও ঠিক যে এ কাজটা করার বা না করার স্বাধীনতা ব্যক্তির থাকলেও ব্যক্তি বৃহত্তর স্বার্থের সুরক্ষার্থে এ কাজটি করে থাকে। তিনি আরো বলেন, "... ... so

a man sometimes pays his debt, only for fear of imprisonment, which because nobody hindered him from detaining, was the action of a man at liberty. And generally, all actions which men do in Commonwealth, for fear of the law, are actions which the doers had liberty to omit."[২৭] হারযোগ[২৮], ম্যাকনেলি[২৯], ওয়াটকিন[৩০] প্রমুখের মতে হবসের তত্ত্বে ভয় এবং স্বাধীনতা এমনভাবে যুক্ত যাতে ব্যক্তি অভিযোগ না করতে পারে যেন কেউ গৃহযুদ্ধের ভয়ে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষকে মান্যতা প্রদর্শন করছে বা শাস্তির ভয়ে আইনের শাসন মেনে নিচ্ছে। বরং ব্যক্তি তার ইচ্ছাতে এমন আনুগত্যবোধে আবদ্ধ যাতে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে চায় না, কাজেই তার সে স্বাধীনতা রয়েছে। হারযোগ, ম্যাকনেলির এধরণের মত বিশেষ গ্রহণযোগ্য মনে হয় না, বরং হবসের তত্ত্বে আনুগত্যের বা বাধ্যবাধকতার প্রধান কারণই হলো ভয়, যা ব্যক্তির সম্মতি অপেক্ষাও মুখ্য। বরং বলা যেতে পারে, চুক্তিতে ব্যক্তির যে সম্মতি তা তার ভয় থেকেই উৎসারিত। হবস তার প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে জনগণের পদার্পণের কারণ ব্যাখ্যায় বলেছেন, ব্যক্তি যদি এর অন্যথা করে কিংবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তবে তার জীবন পুনরায় বিপন্ন হতে পারে। কাজেই স্বাধীনতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি হবসের দর্শনে দৃশ্যমান নয়। তাছাড়া তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থেই তাঁর সুস্পষ্ট দাবি, 'it is the power of the sovereign' যা জনগণকে মান্য করতে বাধ্য করে এবং তিনি আরো বলেন কমনওয়েলথের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শক্তি এবং অন্যটি হলো ন্যায়বিচার।[৩১] সার্বভৌমের নির্দেশই যখন আইন এবং জনগণ সে আইন মান্য করতে বাধ্য, তাই স্বাধীনতা নয় শক্তির ভয়ই এখানে উপজীব্য। হবসের মতে, "[t]he law is made by the sovereign power, and all that is done by such power is warranted and owned by every one of the people."[৩২] হবস আরো বলেন, রাজনৈতিক আইন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে ব্যক্তির সম্মতিতে, কেননা ব্যক্তি আইন মেনে চলতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।[৩৩] এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বাধীনতার ধারণাটিকে তিনি প্রাকৃতিক আইনের সাথে সংযুক্তকরণ দ্বারা রাজনৈতিক আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটিকে সংকুচিত করেছেন। হবস *ডিসিভ* গ্রন্থে স্বাধীনতাকে গণ্য করেছেন প্রাকৃতিক অধিকারের অংশরূপে এবং এ অধিকারকে সুরক্ষিত করা হয়েছে সিভিল আইন দ্বারা।[৩৪] তাই হবসের দর্শনে স্বাধীনতার স্থান বুঝতে হলে সার্বভৌমের রাজনৈতিক আইন এবং তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, অধিকার– এ সকল বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রাখা দরকার।

ফিলিপ পেটিট তাঁর "Liberty and Leviathan" প্রবন্ধে বলেন হবসের স্বাধীনতা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। রাজনীতিতে নিরঙ্কুশবাদী হওয়া সত্ত্বেও হবসের চিন্তার ধরণ উদার এবং উদারবাদী ধারার। যা তাঁর মৃত্যুর শতাব্দীকালব্যাপী এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।[৩৫] পেটিট আরো বলেন, "হবসের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণা তাঁর সময়কালীন নিও-রোমান এবং রিপাবলিকানদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাকে বদলে দিতে সহায়তা করেছে।"[৩৬]

হবসের কাছে স্বাধীনতার দুটি ধরণ চিহ্নিত করা যায়[৩৭]–

১. অ-প্রতিশ্রুতিরূপে স্বাধীনতা (Freedom as non-commitment) এবং
২. অ-প্রতিবন্ধকতারূপে স্বাধীনতা (Freedom as non-obstruction)

অ-প্রতিশ্রুতি অর্থে স্বাধীনতা হলো কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত বা বাধ্যবাধকতা ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। ব্যক্তি যদি কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বা প্রতিদানস্বরূপ এমনকি চিন্তাভাবনাপ্রসূত উপায়েও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এতেও ব্যক্তির স্বাধীনতা সংকুচিত হতে পারে। হবস মনে করেন সুচিন্তিতভাবে কোনো কার্য সম্পাদন করা বা সম্পাদনার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অ-প্রতিশ্রুতিরূপ স্বাধীনতা বিনষ্ট হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি কিছু সুনির্দিষ্ট বিকল্পের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় কোনো বিকল্প গ্রহণ করে না (যাকে হবস ইচ্ছা মনে করেন) ততক্ষণ পর্যন্ত সে এক বা একাধিক

বিকল্পসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীন। অ-প্রতিশ্রুতিরূপে স্বাধীনতার ধারণায় 'স্বেচ্ছাকৃত কার্য (Deliberation)' প্রত্যয়টি গুরুত্ববহ। স্বেচ্ছাকৃত কার্য বলতে হবস বুঝিয়েছেন কোনো কাজ করার বা না করার ক্ষমতার প্রবৃত্তি এবং ভীতির বিকল্প পর্যায়।" প্রবৃত্তির আকাঙ্খা বলতে হবস বুঝিয়েছেন ব্যক্তির সুচিন্তিত অভিব্যক্তি।[৩৮]

হবসের স্বাধীনতার ধারণায় 'স্বেচ্ছাকৃত কার্য' প্রত্যয়টিকে আমরা একটি প্রতিশ্রুতিরূপে গ্রহণ করতে পারি। যেখানে অ-প্রতিশ্রুতি হলো স্বেচ্ছাকৃত কার্য সম্পাদন না করা। যার ফলে ব্যক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট বিকল্প থেকে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নির্বাচনের দ্বারা স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিত হয়ে পড়ে, যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তিনি স্বাধীন ইচ্ছা বলতে এমন স্বাধীনতা বুঝিয়েছেন যেখানে কোনো ইচ্ছা, প্রবৃত্তি বা ঝোঁক দ্বারা স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হবে না।[৩৯]

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এ স্বাধীনতার সীমা কতদূর? যেমন ধরা যাক, আমি আগামীকাল কোনো কাজ করার জন্য আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এবার অ-প্রতিশ্রুতিরূপ স্বাধীনতার অর্থে আমরা কি বলতে পারি আমার স্বাধীনতা হারিয়ে গেলো? সম্ভবত না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা কিংবা পরিবর্তন করতে পারি ততক্ষণ আমি স্বাধীন। যখন স্বেচ্ছাকৃত অ-প্রতিশ্রুতি আমার স্বাধীনতা হরণ করে তাহলে তা করে সরাসরি কার্য সম্পাদনার্থে, কোনো সিদ্ধান্ত এবং কার্যের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে নয়। অ-প্রতিশ্রুতিরূপ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক কাজের মাধমে স্বাধীনতা তাহলেই হারায় যখন ব্যক্তি সিদ্ধান্তনির্ভর কার্য সম্পাদন করে কেবলমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্বারা নয়।

হবসের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণায় রয়েছে ক্ষমতার সংযুক্তি, যার হস্তক্ষেপ স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে, যা প্রায়শ স্বৈরশাসকের ক্ষেত্রে নির্দেশিত হয়েছে। অন্যদিকে, স্বৈরশাসনে কেবল নয় রিপাবলিকান গণতন্ত্রেও বা অবাধ ব্যবস্থায়ও স্বাধীনতা সংকুচিত হতে পারে। যদিও হ্যারিংটন হবসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে হবস উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্বাধীনতার ধারণাকে আইন থেকে নিঃসৃত করেছেন, তিনি স্বাধীনতার সাধারণ ধারণাকে আইনের উর্দ্ধে বা আইনের দ্বারা স্থাপন করেননি।[৪০] অ-প্রতিশ্রুতিরূপে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। অ-প্রতিশ্রুতিরূপে স্বাধীনতায় এটা বোঝানো হয়েছে যে কোনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কাজ কিংবা পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কোনো কাজ করা হলে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে অথবা লুপ্ত হতে পারে। এ ধরণের স্বাধীনতায় ব্যক্তির ইচ্ছার প্রকাশ নাও ঘটতে পারে। কোনো সুনির্দিষ্ট বিকল্পের মাঝে যখন কোনো একটি ইচ্ছা প্রাধান্য পায় তাতে প্রকৃত চিত্র প্রস্ফুটিত হয় না। এটি প্রবৃত্তি এবং বিতৃষ্ণার একপ্রকার উদ্দেশ্যবাদী বা পূর্বনির্ধারিত বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। হবসের ভাষায়, স্বাধীন ইচ্ছার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ঝোঁক বা প্রবৃত্তি বা আগ্রহ বা ইচ্ছা দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে না। ইচ্ছার স্বাধীনতা বিচার ব্যক্তির ইচ্ছা, অভিলাষ কিংবা প্রবৃত্তি দ্বারা বিচার্য হতে পারে না।[৪১]

হবস অ-প্রতিবন্ধকতারূপে স্বাধীনতা (freedom as non-obstruction) অর্থে বুঝিয়েছেন কোনো ব্যক্তির স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী কাজ করা। স্বীয় নির্বাচন দ্বারা কাজ করার স্বাধীনতা ও বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতি।[৪২] অপ্রতিবন্ধকতারূপ স্বাধীনতায় ব্যক্তি মনে করে তার মাঝে কোনো সিদ্ধান্ত প্রণয়ণের সক্ষমতা রয়েছে। বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতিকেই হবস অ-প্রতিবন্ধকতারূপ স্বাধীনতা বলে নির্দেশ করেছেন।[৪৩] বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ ব্যক্তির ইচ্ছমতো কোনো কিছু করার ক্ষমতা হরণ করে। এধরণের স্বাধীনতা বলতে তিনি দৈহিক স্বাধীনতাকে নির্দেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা এবং প্রতিনিধিত্ব তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অ-প্রতিশ্রুতিরূপে স্বাধীনতার সংজ্ঞায়নে স্বাধীন মানুষ বলতে হবস বুঝিয়েছেন এমন ব্যক্তিকে যে নিজের 'সাহস এবং বুদ্ধি' (Strength and wit) দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম এবং এ দুয়ের সমন্বয়ে ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো

কোনো কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা প্রতিবন্ধকতারূপে গণ্য হবে না। উপর্যুক্ত দুটি বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতিই ব্যক্তির কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা। হবসের ভাষায়, "a free man is he that in those things which by his strength and wit he is able to do is hindered to do what he has a will to."[৪৪]

হবস উল্লিখিত অ-প্রতিবন্ধকতারূপে স্বাধীনতায় 'সাহস এবং বুদ্ধি' প্রত্যয়সমূহ বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন বলে মনে হয়। পাশাপাশি এ দুটো বৈশিষ্ট্যের সমান্তরালে হবসের লেখনীতে 'ভয়' এর উল্লেখ লক্ষ করা যায়। তিনি মনে করেন ভয় এবং স্বাধীনতা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন গভীর সমুদ্রে কোনো নিমজ্জমান জাহাজে থেকে ব্যক্তি কোনো কিছু সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, এ কাজটা ব্যক্তি চাইলে করতেও পারে আবার নাও করতে পারে।[৪৫] তবে এটা বলা যায় ব্যক্তি যখন এধরণের কাজ করে এর পশ্চাতে থাকে তার ভীতি এবং যখন তা করে না তার পশ্চাতে থাকে ইচ্ছা। এভাবে হবসের উল্লিখিত সাহস এবং বুদ্ধির সাথে ভয় এবং স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সামাজিক চুক্তির উদ্ভবের পশ্চাতে আমরা লক্ষ করেছি ভয়ের উপস্থিতি এবং সে ভয় থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ব্যক্তি চুক্তিতে স্বাধীনতা অন্বেষণ করছে।

অ-প্রতিবন্ধকতারূপে স্বাধীনতাকে স্পষ্টকরণে তিনি 'পানির গড়িয়ে পড়ার' প্রাকৃতিক উপমা ব্যবহার করেছেন।[৪৬] এ উপমাটিতে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেন। যেমন– পানির সাধারণ ধর্ম হলো গড়িয়ে পড়া বা বয়ে যাওয়া। নদীর পানির দু'পাশের তীরের উপস্থিতি বা বিরাজমানতা কিন্তু নদীর পানির বয়ে চলার পথে প্রতিবন্ধকতারূপে বিবেচিত হয় না। অনুরূপভাবে একজন কর্তার কোনো কিছু করার সক্ষমতা থেকে তাকে স্বাধীন বা পরাধীন বলে মনে করা হয়। যদি কর্তার এ সক্ষমতা না থাকে সেক্ষেত্রে স্বাধীনতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।[৪৭]

পানির দৃষ্টান্তটিকে অপর একটি বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি "that which is not subject to motion is not subject to impediment"[৪৮] অর্থাৎ হবস নিজেই মনে করেন যা কিছু গতিশীল তা প্রতিবন্ধকতারূপে গণ্য হতে পারে না। হবসের এ বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যদি কোনো বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা ব্যক্তির স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হয়, তাহলে ব্যক্তি যে কার্যের প্রতি তার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে তা বন্ধ রাখে।

পেটিট মনে করেন হবসের *লেভিয়াথান* গ্রন্থে তিনি স্বাধীনতা সম্পর্কে স্বতন্ত্র এবং মৌলিক অবদান রেখেছেন। প্রথমত– কেবল ক্ষমতার উপস্থিতি বিদ্যমানতা নয়, বরং বিদ্যমান ক্ষমতার প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দ্বারা জনগনের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়। দ্বিতীয়ত– ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা হস্তক্ষেপ বা প্রতিবন্ধকতা স্বৈরশাসকের শাসনামলে কিংবা রিপাবলিকীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতাকে সংকুচিত করতে পারে।[৪৯] স্বাধীনতার এধরণের প্রকরণ থেকে পেটিট মনে করেন কেবল চরম সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি কিংবা সর্বাত্মকবাদী সরকারের কারণেই যে ব্যক্তির স্বাধীনতা সংকুচিত হয় তা নয়। তাছাড়া গণতান্ত্রিক বা উদারবাদী সরকারের ব্যবস্থায় জনগণের স্বাধীনতা অধিকতর সুরক্ষিত তা দাবি করা যাচ্ছে না। হবসীয় রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী কেবলমাত্র চরম শক্তিসম্পন্ন কমনওয়েলথের বাধ্যবাধকতামূলক শক্তির কারণে জনগণের বা ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে তেমনটা নয়; যদি সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ বা ক্ষমতার দ্বারা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা না হয়। হবসের মতে, প্রতিবন্ধকতামূলক আইনের বাধ্যতামূলক শক্তির ভূমিকার সাহায্যেও ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা বা বাধ্যতামূলক ক্ষমতার প্রয়োগ স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে না। সেক্ষেত্রে কমনওয়েলথের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক যা হোক না কেন।[৫০]

হবসের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণায় যে বৈশিষ্ট্য আমরা চিহ্নিত করতে পারি তা হলো, কেবলমাত্র ক্ষমতার উপস্থিতি নয়, বরং ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অযাচিত হস্তক্ষেপই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে।[৫১] পেটিট মনে করেন, স্বাধীনতার এধরণের লঙ্ঘন ঘটে থাকে রিপাবলিকান গণতন্ত্রে বা অভিজাতান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী আমলে।[৫২] হবস মনে করেন রাষ্ট্র দুদিক থেকে প্রজাদের জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে– 'obstructing them or exploiting a prior covenant in order to obligate them.' হবসের মতে জনগণ ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীন বা স্বাধীনতা উপভোগ করে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী আইন বা বাধ্যতামূলক কোনো কিছু নিষ্ক্রিয় থাকে। হবসের এ বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই বলা যায় কেবলমাত্র কমনওয়েলথ বা সার্বভৌমের উপস্থিতিই ব্যক্তির স্বাধীনতা বিনষ্টের কারণ তা কিন্তু নয়। বরং কোনো বাধ্যতামূলক বা প্রতিবন্ধকতাকারী শক্তির সক্রিয় উপস্থিতিই প্রজা বা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে। একইভাবে কোনো রাষ্ট্র তার প্রজাকে পরাধীন করতে পারে না, বরং রাষ্ট্র কর্তৃক বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতার প্রয়োগই স্বাধীনতা খর্ব করে।[৫৩] কোনো চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বা শাসকের কাছে প্রজাদের স্বাধীনতা থাকে না, এমন দাবি অব্যর্থভাবে বলা যায় না। একটি বা অ-স্বৈরতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থায়ও জনগণের অধিকারের ওপর ক্ষমতার প্রয়োগে তাদের স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। কাজেই স্বাধীনতার প্রশ্নে চিরাচরিত ধারণা যাতে হবসের সর্বাত্মকবাদ বা চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীনতার পথে অন্তরায়– এর পরিবর্তে যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ থাকে সেখানেই জনগণের স্বাধীনতা খর্ব হয় এ সিদ্ধান্ত পোষণ করা যেতে পারে।

সমতা সম্পর্কে হবস

হবস সমতার যে আদর্শভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাতে তিনি প্রতিটি নাগরিকের আইনের দৃষ্টিতে সমতা তথা আইনের অধীনতাকে বুঝিয়েছেন, ব্যক্তির ক্ষমতার প্রতিযোগিতাকে বোঝাননি। অধ্যাপক ম্যাকফার্সন মনে করেন হবসের কাছে মানুষের প্রাকৃতিক ক্ষমতা তাদের অধিকারের সমতার ভিত্তি প্রদান করে না, বরং প্রকৃতির রাজ্যের যুদ্ধপরিস্থিতি উত্তরণের জন্য তাদের যা ইচ্ছা তা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে, যাতে করে তারা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে।[৫৪] ম্যাকফার্সনের দৃষ্টিতে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার নিরূপিত হয় ব্যক্তির ক্ষমতার সাথে প্রকৃত প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে। যদি বাজার কর্তৃক মূল্য এবং অধিকারের নির্ণয় সমাজের সদস্যদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রতি (যে কর্তৃপক্ষ বাজারব্যবস্থাকে প্রয়োগ এবং বজায় রাখতে পারে) মানুষের যৌক্তিক দায়বদ্ধতার বাধ্যবাধকতা থাকে। এভাবে ব্যক্তির ক্ষমতার সাথে প্রকৃত প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষের দায়বদ্ধতা নির্ধারিত হয় বলে ম্যাকফার্সন মনে করেন। সমাজের সকল সদস্য কর্তৃক বাজারমূল্য এবং অধিকার নির্ধারণের বিষয়টি যদি গ্রহণযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি বাজারব্যবস্থা পরিচালনা করেন, যার প্রতি অন্যান্য সকল সদস্যের দায়বদ্ধতার বিষয়টি যথাযথ ভিত্তি আছে বলা যেতে পারে।

হবস ন্যায় বা ন্যায্যতা (equity)–কে সমতা (equality) অর্থে নির্দেশ করেছেন এবং একে তিনি বন্টনমূলক ন্যায্যতার সমার্থক মনে করেছেন। হবস মনে করেন, "equity, justice, and honour, contain all virtues whatsoever."[55] পেরেজ জ্যাগোরিনের মতে, হবসের প্রাকৃতিক আইনে ন্যায্যতা হলো সমতার একটি বিধি (precept)।[৫৬] যেমন– প্রাকৃতিক আইনে সমতাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বাইবেলীয় নির্দেশনা দ্বারা, যাতে প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

পেরেজ জ্যাগোরিন বলেন, “Equity as a precept of equality is a Hobbesian Law of Nature.” হবসীয় প্রাকৃতিক আইনানুযায়ী আমরা অন্যদের জন্য যতটা অধিকার অনুমোদন করি তার চেয়ে অধিক নিজেদের জন্য দাবী করা নিষিদ্ধ। আর এটাকেই বলা হয় সমতা। হবস দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে, প্রাকৃতিক ও নৈতিক আইন একই। দুটোই শান্তির জন্য অপরিহার্য পথ। কমনওয়েলথের নাগরিকগণ কখনো সার্বভৌমের আইনের বিরুদ্ধাচারণ করলে তা কেবল নাগরিক অধিকারের (Civil Right) বিরুদ্ধাচারণ নয় বরং প্রাকৃতিক ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ। হবস প্রাকৃতিক ন্যায় (Natural Equity) শব্দটি দ্বারা ন্যায় (justice) –কে বোঝান। যেমন– বিচারকদের ন্যায়ের প্রতি বাধ্যবাধকতা কিংবা সকলের ওপর সমভাবে করারোপ করা।

বার্টম্যান দাবি করেন, হবসের কাছে ব্যক্তির অন্তরস্থ চেতনা কিংবা তাঁর নৈতিক মূল্যবোধ প্রকৃতি কর্তৃক সৃষ্ট নয়, বরং একটি কৃত্রিম মানুষ সৃষ্টি করে, (“an artificial man”), অর্থাৎ কমনওয়েলথ নামক কৃত্রিম মানুষ। কমনওয়েলথ নামক কৃত্রিম মানুষ ব্যক্তির মাঝে আইনের দ্বারা ‘ন্যায় এবং অন্যায়ের সংজ্ঞায়ন’ করে। সে অর্থে বার্টম্যান বোঝাতে চান হবসের মতে ব্যক্তির কাছে যথার্থ সম্মানের উৎসস্থল সহজাত বা প্রকৃতিজাত বা প্রকৃতিগত নয়, বরং কৃত্রিম– যা আসে সার্বভৌমের কাছে থেকে, যাকে হবস নিজেই বলেছেন, ‘সকল সম্মানের ঝর্ণাধারা’ (the fountain of all honor.)[৫৭]। এভাবে হবস মানুষকে নৈতিক বিবেচনার আলোকে গ্রহণ না করে সার্বভৌমের মাধ্যমে মানুষকে বিচার করেছেন। বার্টম্যানের মতে, “… Hobbes rids the nature of the passions of moral considerations; man is the measure in the form of the sovereign, whose right to make the judgments of civil law and of social status has been delegated to him by the citizens of the Commonwealth.”[৫৮] সামাজিক অসমতা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট, হবস একে সার্বভৌম এবং ব্যক্তি উভয়ের জন্য হুমকির কারণ মনে করেন। হবস মনে করেন, Justice বা ন্যায্যতা কেবল কমনওয়েলথেই অর্জন সম্ভব।[৫৯] রাজনৈতিক আইনের (Civil laws) নৈতিক বস্তুগততার এ দিকটি উদ্ভূত হয়েছে জনগণের দ্বারা। তারা স্বেচ্ছায় তাদের ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের ভার সার্বভৌমের কাছে অর্পণ করেছে।[৬০]

অধিকার সম্পর্কে হবস

হবসের তত্ত্বে অধিকার এবং স্বাধীনতা সমান্তরালে চলে না। স্বাধীনতার সাথে অধিকারের যে সম্পর্ক তাতে সার্বভৌমের অনুমতি যুক্ত। অর্থাৎ প্রজাদের কোনো কাজ করা বা না করার স্বাধীনতা থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না শাসক বা সার্বভৌম তা অনুমোদন করে কিংবা নিষেধাজ্ঞা জারি করে।[৬১] হবসের কাছে স্বাধীনতার ধারণাটি যতটা ব্যক্তির সাথে যুক্ত তার চেয়েও অধিক যুক্ত কমনওয়েলথ তথা সার্বভৌমের সাথে। সার্বভৌমের স্থিতিশীলতা রক্ষা, আদেশ মান্য করা, আইন পালন করা ইত্যাদি বিষয়সমূহের সাথে স্বাধীনতা যুক্ত। কাজেই ব্যক্তির যা ইচ্ছা তা করার অধিকার হবসের কাছে স্বাধীনতা নয়, তাঁর স্বাধীনতার ধারণার সাথে ব্যক্তির প্রয়োজনের বিষয়টিও যুক্ত।

রাজনৈতিক আইন সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত এবং তার জীবন ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। অবাধ স্বাধীনতা অপেক্ষা রাজনৈতিক সমাজের আইনের শাসন ব্যক্তিকে একটি নিরাপদ জীবন গঠনে সাহায্য করে। হবসের সার্বভৌম আইন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যক্তির আচরণ ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অবলুপ্ত করার জন্য নয়, বরং একে নির্দেশনা দানের জন্য। যেমন – নদীর পাশের তীর নদীর ঢেউকে থামিয়ে দেয় না, বরং বয়ে যেতে সাহায্য করে।[৬২] একইভাবে *লেভিয়াথানে*ও হবস মনে করেন আইন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অবলুপ্ত করার জন্য নয়, বা তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ব্যক্তির গতিরোধ করার জন্য নয়, বরং সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য।[৬৩] আইনের শাসনের সাথে স্বাধীনতার এধরণের মেলবন্ধনে প্রশ্ন জাগে, যে আইনকে তিনি স্বাধীনতার পথে আপাত প্রতিবন্ধকতা

মনে করেছিলেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপলব্ধির জন্য তিনি সে আইনকেই আবার বৈধতা বা গ্রহণযোগ্যতা দিলেন। কাজেই হবসের স্বাধীনতা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়– যে কাজ আইনের দৃষ্টিতে অনুচিত বা বেআইনি নয়, অর্থাৎ যে কাজ আইনসিদ্ধ, সে কাজ করার দ্বারাই মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে পারে, যদিও হবস সার্বভৌমের ওপর চরম ক্ষমতা অর্পণ করেছেন তথাপি সে সব আইন ব্যক্তির জন্য হানিকর নয়।

হবসের স্বাধীনতার ধারণার সাথে আমরা রুশোর স্বাধীনতার ধারণার যে তফাৎ লক্ষ করি তা হলো হবস সার্বভৌমের চরম ক্ষমতার সাথে জনগণের স্বাধীনতাকে সমন্বিত করতে সক্ষম হননি। বরং হবসের তত্ত্বে প্রশ্নটি এসেছে এভাবে যে, (সার্বভৌমের) চরম ক্ষমতা ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য কতটা সহায়ক অথবা ক্ষতিকারক। পক্ষান্তরে রুশোর স্বাধীনতা তত্ত্বে তিনি কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার মাঝে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। উইলিয়াম কনোলি[৬৪], ভিক্টোরিয়া কান[৬৫] প্রমুখ হবসের স্বাধীনতাকে দেখেছেন প্রজাদের অবিরত নিয়ন্ত্রণরূপে, যে প্রজারা চরম কর্তৃত্বের প্রতি অত্যন্ত অনুগত।

হবসের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনায় সার্বভৌমের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লক্ষণীয়।[৬৬] শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় জনগণ সার্বভৌমের কাছে তাদের অধিকারকে সমর্পণ করেছে। হবস মনে করেন সার্বভৌমের যদি কোনো উদ্দেশ্য সাধন করার অধিকার থাকে তাহলে সার্বভৌমের উপায় নির্ধারণের অধিকার রয়েছে।[৬৭] কারণ সার্বভৌমের অধিকার সীমাহীন। যেহেতু সার্বভৌমের কাছে ক্ষমতা ও অধিকার অর্পিত হয়েছে তাই সার্বভৌমের দায়িত্ব জনগণের নিরপত্তা প্রদান। কমনওয়েলথে প্রবেশের দ্বারা জনগণের স্বীয় এবং অপরের সুস্পষ্ট ব্যবধান তৈরি হয় যা পরবর্তীতে প্রজা এবং সার্বভৌমের অধিকার নির্ধারণে সাহায্য করে।[৬৮] জনগণের মতকে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার সার্বভৌমের ছিলো বিধায় হবস মনে করেন এ অধিকার ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে সহায়ক। কিন্তু তার এধরণের একচ্ছত্র অধিকার জনমত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ। সার্বভৌম কর্তৃক জনগণের কোনো লেখনী বা গ্রন্থ বা মতবাদকে মূল্যায়ন বা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা হবস মূলত জনগণের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বা বিচার বিশ্লেষণকে বর্জনের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন, এসবকে নিষিদ্ধ করেছেন। অবশ্য হবস প্রতিটি ক্ষেত্রে নয়, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে জনমত প্রকাশের অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। হবসের জনরায় নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেছেন ডেভিড ভ্যান মিল। তিনিও মনে করেন "Hobbes is correct to note that no society could survive for very long if its members did not abandon the right of judgement on certain issues." অর্থাৎ হবস এ বিষয়ে যথার্থই লক্ষ করেছেন যে সমাজের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের জন্য জনগণের স্বীয় জনরায় বা জনগণের স্ব বিবেচনা বা জনগণের ধারণাকে কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করা উচিত।[৬৯] হবস সমাজের দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য শাস্তির অধিকার (যা সার্বভৌমের কাছে থাকবে) কে সমর্থন করেছেন। তিনি মনে করেন শাস্তি প্রদানের অধিকার জনগণের প্রাথমিক লক্ষ বা চাহিদাই হলো স্বীয় নিরাপত্তা প্রাপ্তি। কারণ কমনওয়েলথের প্রতিষ্ঠালগ্নে মানুষ তার অধিকার, যেগুলো তার কাছে প্রয়োজনীয়রূপে বোধ হয়, এমনকি অপরকে শাস্তি প্রদানের অধিকারও ব্যক্তি সমর্পন করেছে কমনওয়েলথের কাছে।[৭০]

যে-কোনো প্রকার আইনের অনুমোদন (এমনকি নৈতিক আইনসমূহও) সার্বভৌমের অনুমতি ব্যতিরেকে আইনের মর্যাদা পেতে পারে না। এ থেকেই বোঝা যায় যে সার্বভৌমের কাছেই রায় প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে। যদিও রাজনৈতিক আইনসমূহকেও হবস গ্রহণ করেছেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার হাতিয়াররূপে, তথাপিও এটা স্পষ্ট যে, শাস্তি প্রদানের এ ক্ষমতার সাথে শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। যা পরিণামে ব্যক্তিকে আইন মানতে বাধ্য করে। হবসের মতে আইন প্রণেতাদের কাছে কেবল ক্ষমতা রয়েছে তা নয়, সেই সাথে আইন প্রণেতাদের কাছে রয়েছে কর্তৃত্বও। আর কর্তৃত্ব ততক্ষণ বজায় থাকে কিংবা অস্তিত্বশীল হতে পারে যদি এবং কেবল যদি জনগণ তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে – এমনটা মনে করেন জুভেনাল। তাঁর ভাষায়, "[a]uthority ends where voluntare assent ends."[৭১]

জুভেনালের এ বক্তব্য সমর্থন করে সম্মতি দ্বারা কর্তৃত্ব বৈধ হয়ে ওঠে এবং সম্মতিই কর্তৃত্বের ভিত্তি। হবসের রাষ্ট্রদর্শনে তিনি তাঁর লেভিয়াথান বা কমনওয়েলথকে জনগণের স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে সার্বভৌমের কর্তৃত্বকে বৈধতা দিয়েছেন মরণশীল ঈশ্বরের কাছে। তিনি ক্ষমতাকে কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে মুখ্য জ্ঞান করেননি। কর্তৃত্বের প্রতি এ সমর্থন দ্বারাই প্রকারান্তরে হবস রাজতান্ত্রিক সরকারের বৈধতা প্রতিপাদন করেছেন এবং একই সাথে প্রতিষ্ঠা করেন যে রাজার ক্ষমতার উৎসও জনগণের প্রদত্ত ক্ষমতা। এভাবে হবস একচ্ছত্রবাদের একটি যৌক্তিক তত্ত্ব প্রদান করেছেন বলে জুভেনাল মনে করেন।

প্রজাদের ওপর সার্বভৌমের অপার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হবস মনে করেন প্রজাদের সার্বভৌমের কাছে সর্বান্তকরণে আত্মত্যাগ করতে হবে। সচরাচর এটি বহুল কথিত যে, হবস বিদ্রোহের অধিকার সমর্থন করেননি, তবে এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রজাদের জন্য বিদ্রোহের অধিকারকে সমর্থন করেছেন। যদি প্রজার জীবনের প্রতি হুমকি থাকে অথবা তার অঙ্গহানির আশঙ্কা থাকে অর্থাৎ শাসক যদি জীবনের নিরাপত্তা দিতে সমর্থ না হয় তাহলে চুক্তির শর্ত অটুট থাকে না এবং তাহলে প্রজার সার্বভৌমের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ (violence) বা আক্রমণের অধিকার থাকে। প্রজা আত্মরক্ষার অধিকার রক্ষায় সার্বভৌমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারে। হবসের দাবি, "a man cannot lay down the right of resisting them that assault him by force to take away his life, because he cannot be understood to aim thereby at any good to himself."[৭২] হবসের এধরণের বক্তব্য থেকে সামারভিল মনে করেন হবস জনগণকে রাজার বিরুদ্ধে গিয়েও আত্মরক্ষার অধিকার দিয়েছেন।[৭৩] অবশ্য এক্ষেত্রে সার্বভৌম কর্তৃক যদি জনগণকে অন্যায্যভাবে আক্রমণ করা হয় তাহলে এ ক্ষমতার ব্যবহার জনগণ বা প্রজারা করতে পারবে, কিন্তু আত্মরক্ষার নামে কোনো নৈরাজ্যিক পরিণতি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।[৭৪] শাসক যদি প্রজাদের প্রতি অন্যায় বা আঘাত না করে তাহলে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা বিদ্রোহের প্রয়োজন পড়ে না কিংবা চুক্তিভঙ্গেরও দরকার নেই। এ আলোচনা থেকে আমরা দুটি দিক পাই – যেমন হবস সার্বভৌমের কাছে যে অনিয়ন্ত্রিত অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছেন তা সর্বদা ও সবক্ষেত্রে নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে জনগণের মৌলিক বিষয়ে অর্থাৎ জনগণের জীবনরক্ষার অধিকার রেখেছেন তিনি জনগণের হাতে। এর মাধ্যমে সার্বভৌমের ক্ষমতা ও অধিকারকে কিছুটা সীমিত বা সংকুচিত করেছেন। আবার অন্যদিকে জনগণের হাতে অধিকার প্রদান দ্বারা হবস সার্বভৌমের কাছে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার এমন এক দায় উপস্থাপন করেছেন যা প্রকারান্তরে সার্বভৌমকে শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করেছে। এ ব্যাখ্যার প্রতিফলন পাই তাঁর *ডিসিভ* গ্রন্থে।[৭৫]

পক্ষান্তরে গোল্ডস্মিথ মনে করেন, সার্বভৌম কর্তৃক যখন ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের সংজ্ঞায়ন নির্ধারণ করা হয় তাহলে প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের কাছে সার্বভৌমের কাজের অন্যায় বা ত্রুটি নির্ধারণ করার স্বাধীনতা থাকে না। কাজেই সার্বভৌম অন্যায্য হতে পারে না হবসের তত্ত্বের এধরণের দাবির কোনো অর্থ থাকে না।[৭৬] হবসের *লেভিয়াথান* গ্রন্থে স্বাধীনতার আলোচনাতে শুরুতেই যে জটিলতা লক্ষনীয় তা হলো– সমাজ, শান্তি এবং নিরাপত্তা এ সকল বিষয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যক্তিক বিচারবুদ্ধি বা ব্যক্তিক নীতিবোধকে সার্বভৌমের সামষ্টিক বিচারবুদ্ধি বা নীতিবোধের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।[৭৭] এতে ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্নটি ভয়ের কাছে চাপা পড়ে যায়। এ ভয় সার্বভৌমের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা, যে ভয়ের সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তির ওপর বাহ্যিক চাপ বা বলপ্রয়োগের আশঙ্কা। আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন দ্বারা এই ভয়কে বৈধতা দানের চেষ্টা করেছেন লক। তাঁর এ প্রচেষ্টা দ্বারা সার্বভৌম বা রাজা বা শাসক এবং প্রজাদের মধ্যে একপ্রকার বিপরীতার্থক সর্ম্পক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বলে মনে হয়, যার মূল সূত্রটি হলো স্তরায়িত ক্ষমতা, উচ্চতর শক্তির প্রতি নিম্নতর শক্তির (প্রজা) আত্মসমর্পণ। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দেখা দেয়, ভয় থেকে যে রাজনৈতিক শক্তির উত্থান এর কি বৈধতা রয়েছে? উত্তরে হবস বোঝাতে চান, আনুগত্য প্রদর্শনের প্রধান কারণ সম্মতি, এবং ভয় এক্ষেত্রে সম্মতিকে নিশ্চিত করে। যদিও ভয়ের কারণে মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু এটি তার আত্মসমর্পণের একমাত্র কারণ নয়।

স্বাধীনতা সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গি

লকের রাষ্ট্রচিন্তায় প্রায়শই দাবি করা হয় যে তিনি জনগণকে ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং তাঁর জন-স্বাধীনতার উদাহরণরূপে তিনি জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের অধিকার দিয়েছেন তা নির্দেশ করা হয়। লক সম্পর্কে প্রচলিত এ দাবির সাথে একমত পোষণ করা যায় না। লক জনগণকে বিপ্লবের যে অধিকার দিয়েছেন তা কি নিয়ন্ত্রিত নাকি মুক্ত? এর উত্তরে বলা যায় তিনি জনগণকে বিপ্লবের যে অধিকার দিয়েছেন তা নিয়ন্ত্রিত। যেমন– লক মনে করেন যদি কোনো ব্যক্তি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তার বিপ্লবের অধিকার রয়েছে। আবার পরবর্তীতে তিনি উল্লেখ করেছেন কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রতি অন্যায্যতা বা নিপীড়ন দুর্ভাগ্যজনক, তবে এরকম বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে।[৭৮] কারণ হিসেবে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজে প্রবেশের সময় সমাজকে যে ক্ষমতা দিয়েছে, সমাজ যতদিন টিকে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ব্যক্তি এ ক্ষমতার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কমনওয়েলথের প্রতি সরকারের কর্মকাণ্ড বিতর্কের উর্দ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত সুরক্ষার প্রশ্নটি যদি বিতর্কিত হয় বা সরকার কর্তৃক পুরোপুরি নিশ্চয়তা বিধান না হয় তবুও তা বিপ্লবের জন্য সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তিকে এধরণের মান্যতা পালনে নির্দেশ প্রদান করেছে। ব্যক্তি তার স্বীয়সম্পত্তির অধিকারের স্বার্থে প্রাকৃতিক আইন ভঙ্গ করতে পারে না, যদি সে তা করে তবে তা হবে শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিপন্থী এবং জনকল্যাণের বিপরীত। কেননা সমাজের একজন সদস্যরূপে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত বিচার বা মূল্যায়ন এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাকে সমর্পণ করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মেনে নেওয়ার রায়কে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মূল্যায়ন বা বিচারের সর্বশেষ ক্ষমতারূপে তিনি বলেছেন 'Appeal to Heaven' এর কথা। যার কাছে লক চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছেন বিচারের। লকের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সুবিধা-অসুবিধাকে মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই বিপ্লবের বা বিদ্রোহের অবাধ স্বাধীনতার পরিবর্তে লকের কাছে স্বীকৃত পাওয়া যায় বিপ্লবের নিয়ন্ত্রিত অধিকার। স্বাধীনতাও এভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই লক সম্পর্কে বহুল প্রচলিত দাবি 'তিনি একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী'– এ সম্পর্কেও একমত পোষণ করা যায় না এবং তাকে একজন 'নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী' (Qualified Individualist) রূপে অভিহিত করাটা অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়। যেমন– সরকারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে লক বলেন– মানুষের বহুধা বিভক্ত স্বার্থের ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ্ব বিবাদের সূত্রপাত এবং একে নিবৃত্ত করতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন। একে অপরের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ না করা কিংবা অন্যের ওপর চড়াও না হওয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তথা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার্থে প্রয়োজন পড়ে সরকারের। সরকার জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় অভিন্ন স্বার্থ (Common interest) প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে আনুগত্যের। মানুষ কেবলমাত্র তার প্রাকৃতিক অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে সমাজে অংশগ্রহণ করেনি, সরকারের প্রতি অবিরাম আনুগত্য দ্বারা ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থ হাসিল করতে চায়।[৭৯] লক এভাবে সরকারের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং প্রমান করতে চান সরকার জনস্বার্থ সংরক্ষণে কাজ করে।

লক নির্দেশিত স্বাধীনতার সাথে হবসের চিন্তার তফাৎ রয়েছে। যেমন, হবস ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি দিলেও আবার সে স্বাধীনতার অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন সার্বভৌম দ্বারা। শাসক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সে স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। কিন্তু লকের রাষ্ট্রচিন্তায় শাসকের এমন অধিকার চিন্তা করা উদ্ভট। লক তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে হবসীয় চিন্তার বিপরীতে বারংবার বলেছেন শাসক তথা ব্যক্তির একচ্ছত্র ইচ্ছার অধীনস্থতা দ্বারা স্বৈরাচারিতার প্রকাশ ঘটে। এতে জনগণের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়। তাই লকের কাছে স্বাধীনতার সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষণই মুখ্য। তা করতে সাহায্য করে আইন। কাজেই তার স্বাধীনতা ভাবনায় আইন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। লকীয় স্বাধীনতাতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে মানুষের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আইন তৈরি করে মানুষ এবং প্রয়োগও করে জনগণের

মধ্য থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি। এভাবে সম্মতির সাহায্যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত চেয়েছেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে একচ্ছত্র রূপ না দিয়ে তার সাথে জনগণের অংশগ্রহণকে তথা সংশ্লিষ্টতাকে যুক্ত করেছেন। এ সংশ্লিষ্টতাতে রয়েছে জনগণের স্বাধীন চিন্তার প্রতিফলন। লকীয় সম্মতিতত্ত্ব জনগণের স্বাধীনতা এবং অধিকারের মূর্ত প্রকাশ। সম্মতি দ্বারা জনগনের অধিকারের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে। পাশাপাশি জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিক স্বাধীনতা উভয়ই প্রকাশিত হয়েছে। সম্মতিতত্ত্বে জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দ্বারা স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটেছে।

লকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ভাবনায় যে রাজনৈতিক ও নৈতিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাকে বিবেকের স্বাধীনতারূপে চিহ্নিত করা যায়। এতে আছে সম্মতি, অধিকার এবং দায়িত্বশীলতা। অধিকারের প্রশ্নে লকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায় প্রাকৃতিক অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে । লকীয় প্রাকৃতিক অধিকারের সংরক্ষণ যেমন ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয় অন্যদিকে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে।

স্বাধীনতা, সমতা এবং অধিকারের সংরক্ষণার্থেই কিন্তু লকীয় সরকারব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের প্রকাশ। লকীয় স্বাধীনতা রুশোর মতো গণঅভীপ্রায়ের মাঝে লীন হয়ে যায় না; আবার হবসের মতো শাসকের একচ্ছত্র ইচ্ছার মাঝে স্থিত হয় না। লকীয় স্বাধীনতা এবং অধিকারের বোধ রাষ্ট্রকে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপকে মানবিক অধিকারের চেতনায় অগ্রসর করেছে বটে তবে এটাও স্বীকার করতে হবে তার চেয়ে বেশি শাণিত করেছে পুঁজিবাদী চেতনাকে। হবস ও রুশোর মতো কর্তৃত্ববাদী সার্বভৌমকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা তিনি (লক) মূলত জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারেরই পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছেন, মুক্ত রেখেছেন। তবে এটিও উল্লেখ্য হবস বা রুশোর মতো নিরঙ্কুশতন্ত্রকে সমর্থন না করলেও তিনি রাজ্য শাসনে নিয়ন্ত্রণবাদকে সমর্থন করেন, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত দেন।

সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করার ক্ষমতা বা অধিকার প্রদান দ্বারা লক জনগনের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করেছেন। স্বেচছাচারী সরকারের পতনের বা এধরণের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার যে অধিকার তিনি জনগণকে দিয়েছেন তা বৈপ্লবিক সন্দেহ নেই। জনবিপ্লবের এ অধিকার প্রদান দ্বারা লক নিঃসন্দেহে চরম ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখার মানসেই লক একচ্ছত্র রাজতন্ত্র কিংবা চরম সার্বভৌমত্ব কোনোটিকেই স্বীকার করেননি। তবে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, জনগনের স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয়ে লকীয় চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পারস্পরিকতা– যে পারস্পরিকতায় আবদ্ধ সরকার এবং জনগণ। এখানে দায় এবং দায়িত্ব উভয়পক্ষের– জনগণ এবং সরকারের। অবশ্য জর্জ এইচ স্যাবাইন লকের সমালোচনা করে বলেন– লকের কাছে ব্যক্তি এবং ব্যক্তির অধিকারের পাশাপাশি এসেছে সমাজ ও সরকারের ভূমিকার বিষয়সমূহ। অথচ উভয় বিষয়সমূহ কীভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে, চূড়ান্ত হতে পারে, তার কোনো স্পষ্ট বিশ্লেষণ লক দেননি।[৮০]

লকের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে প্রাকৃতিক আইনের সীমারেখা দ্বারা। সরকার বা সমাজ জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এ নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে সাধারণ আইন দ্বারা। এ আইনে রাষ্ট্রের স্বার্থ সর্বাগ্রে বিবেচিত হয়নি; ব্যক্তিস্বার্থ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি আইনের পরিসীমায় তার ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে। প্রচলিত অর্থে ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম পূজারীরূপে লককে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীরূপে চিত্রিত করা হয়। তবে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে এভাবে চিত্রায়ণের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এক প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। সেদিক থেকে লককে একজন নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলা যেতে পারে।

দায়িত্ব ও কর্তব্যের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে স্বাভাবিক আইন। লকের স্বাভাবিক আইনের ধারণার সাথে অধিকার, স্বাধীনতা, সমতা ও নৈতিকতার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি মনে করেন, আইনের প্রকৃত ভূমিকা দ্বারা ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ বোঝায় না, বরং ব্যক্তির স্বীয় বিবেচনা জাগ্রত করতে ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া বোঝায়। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতার আস্বাদ পায়, পাশাপাশি অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা নয়। লকের কাছে স্বাধীনতার যে অর্থ তা অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত হবে এবং এতে অপরের অন্যায্য হস্তক্ষেপও থাকবে না। অন্যের হস্তক্ষেপমুক্ত হয়ে ব্যক্তি যখন তার প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ উপভোগ করতে পারে তাহলে সেটাই হলো স্বাধীনতা।

লকের স্বাধীনতার ধারণার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া জে. এস. মিলের 'Essays On liberty' নামক প্রবন্ধের স্বাধীনতার ধারণার সাথে। মিলও মনে করেন স্বাধীনতা হলো ব্যক্তির ওপর বিভিন্ন বাধার অপসারণ। তাই মিল ব্যক্তির দৈহিক ও নৈতিক স্বাধীনতার ওপর কোনোরূপ কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেনি। সেই অর্থে, মিল ও লক উভয়ের স্বাধীনতার ধারণায় উপস্থিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপের বিরোধিতা। স্বাধীনতার ধারণায় বার্লিন সদর্থক এবং নঞর্থক প্রকার দেখিয়েছেন।[৮১] মিলের স্বাধীনতার ধারণায় আমরা দুই ধরণের স্বাধীনতার প্রকাশ লক্ষ করি। যার একটি ব্যক্তির স্ব-সত্তার সাথে এবং অন্যটি অপরাপর ব্যক্তির সাথে যুক্ত। মিল ও লক উভয়ে স্বাধীনতার ধারণায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন যা হবসীয় ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইশায়াহ বার্লিনের নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারণার সাথে লকের রাজনৈতিক স্বাধীনতার এক প্রকার প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য আছে। যেমন নেতিবাচক স্বাধীনতার ব্যাখ্যায় বার্লিন মনে করেন ব্যক্তির অবস্থানরত এলাকায় বা সীমানায় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী বা রাষ্ট্র বা সংস্থার পক্ষে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। লকও মনে করেন, কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ স্বাধীনতার বিকাশের পথে অন্তরায়। ব্যক্তি যখন তার স্বার্থকে সংরক্ষণে উদ্যোগী হয় তাহলে তার এধরণের উদ্যোগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে-কোনো হস্তক্ষেপ ব্যক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণের শামিল, যা ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। নেতিবাচক স্বাধীনতায় বার্লিন স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন– প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞাত, সচেতন। রাষ্ট্রের উচিত হবে না ব্যক্তির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে স্থির করে দেওয়া। বার্লিন উল্লিখিত স্বাধীনতার ইতিবাচক প্রকরণের সাথে আমরা লকের নৈতিক স্বাধীনতার ধারণার সাযুজ্য খুঁজে পাই। বার্লিন ইতিবাচক স্বাধীনতায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উচ্চতর ও নিম্নতর দুটি ধাপে বিভক্ত করেছেন। তিনি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে উন্নত ধাপের নির্দেশ করেছেন তাতে রয়েছে যুক্তিবাদিতা ও আদর্শ, যা আমরা লকের জনগণের ধারণার মাঝেও পাই। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ রাজনৈতিক সমাজে নৈতিকতাবোধের দ্বারা লালিত হয়ে অধিকতর সংবেদনশীল জীবনযাপন করবে এমনটা ধারণা লকের। লকীয় নৈতিক স্বাধীনতাতে রয়েছে অবাধ স্বাধীনতার পরিবর্তে বিবেক; নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এবং যাতে ব্যক্তি তার স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে স্বীয় স্বার্থের পাশাপাশি অপরের মঙ্গলের জন্য কাজ করে। এক্ষেত্রে বার্লিন উল্লিখিত ইতিবাচক স্বাধীনতার উন্নত স্তরে থাকে যুক্তিবাদ এবং আদর্শ।[৮২] কাজেই লকীয় স্বাধীনতার নৈতিক দিকটির বিশ্লেষণে বলা যায়, কোনো ব্যক্তির মাঝে আদর্শ সৃষ্টির নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্যও প্রয়োজন স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার এধরণের আলোচনার প্রেক্ষিতে হবসকে দেখা যায় তিনি আইনের শাসনের মাঝে স্বাধীনতাকে অন্বেষণ করেছেন। অর্থাৎ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে স্বাধীনতার উপলব্ধি সম্ভব। স্পষ্টতই হবসীয় চিন্তাতে স্বাধীনতার একটি কর্তৃত্ববাদী রূপ লক্ষণীয়। হবসীয় এ ধারণার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় বার্কারের মতের। বার্কারও মনে করেন, স্বাধীনতা হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার ভোগের ক্ষমতা। তবে বার্কার– উল্লিখিত স্বাধীনতার সাথে আইনের সংযোগ রয়েছে এবং এ স্বাধীনতা কার্যকর হওয়া সম্ভব আইনের মাধ্যমে। স্বাধীনতার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র এ আইনকে প্রয়োগ করবে।

লক যদিও হবস এবং ফিলমারের মতো রক্ষণশীল স্বাধীনতার ধারণায় বিশ্বাসী নন, তবে তিনি নৈরাজ্যবাদীদের মতো সম্পূর্ণ অবাধ স্বাধীনতারও সমর্থক নন। বরং লকীয় স্বাধীনতার ধারণার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় তাঁর প্রাকৃতিক অধিকারের আলোচনায়। যেমন– যথাযথ স্বাধীনতা বলতে তিনি নির্দেশ করেছেন যেখানে ব্যক্তির কাছে স্বীয় সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে ব্যক্তিকর্তৃক উপযুক্তরূপে বিবেচিত কোনো কর্তৃপক্ষকে মনোনীত করতে পারে। ব্যক্তি তার স্বাধীনতার উপভোগে প্রাকৃতিক আইনের কিংবা রাজনৈতিক আইনের আশ্রয় কিংবা সাহায্য যেমন গ্রহণ করতে পারে, অপরদিকে সে আইনের পাশাপাশি স্বীয় নৈতিকতাবোধের সাহায্যে অপরের অধিকার এবং স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে উদ্যোগী হবে। ব্যক্তি এ দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবে যাতে সে পরস্পরের কারণে স্বাধীনতা উপভোগে বাধাগ্রস্থ না হয়।

লকীয় স্বাধীনতার ব্যাখ্যায় এটি স্পষ্ট এখানে রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক শক্তি বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে কর্তৃত্ববাদী শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা প্রদত্ত হয়নি। আবার ব্যক্তিও অপরের স্বাধীনতা এবং অধিকারে কোনে রকম বলপ্রয়োগ বা অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অপরের দ্বারা বলপ্রয়োগের অর্থাৎ অধীনস্থতা না থাকাকে যদি লকের স্বাধীনতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করি, তাহলে দুটি বিষয় বলা যায়– প্রথমত এধরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতার সংরক্ষণে লকীয় ভাবনাটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিপরীত দিকে অপরের অধীনস্থতা মুক্তির প্রেক্ষিতে যদি বিষয়টি বিবেচনা করা হয় তাহলে লকীয় তত্ত্বে সম্পত্তিকেন্দ্রিক যে মালিক-শ্রমিক তথা প্রভু-দাস সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তির সম্পত্তির অনিয়ন্ত্রিত অধিকার (অর্থাৎ একজন ব্যক্তির যত ইচ্ছা তত সম্পত্তি লাভের) সে অধিকারকে সীমিত করা আবশ্যক। লকীয় স্বাধীনতার ধারণায় প্রকৃতির রাজ্য বা প্রাক-রাজনৈতিক সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের পেছনে জনগণের প্রধান দাবি– একজন যোগ্য ও দক্ষ বিচারকের, আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইনের যথার্থ প্রয়োগ। অর্থাৎ আইন লকীয় ধারণায় একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবকরূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু বেন্থাম লকীয় এ ধারণার বিরোধিতা করেন। তিনিও হবস ও ফিলমারের স্বাধীনতার ধারণা গ্রহণ করেন এবং মনে করেন যে কোনো আইন অবশ্যই স্বাধীনতাকে সীমিত বা সংকুচিত করে। বেন্থাম দাবি করেন যে– আইনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, স্বাধীনতা নয়।[৮৩] হবসের সাথে লকের তুলনায় বলা যায় হবস যেধরণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেছেন তাকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বলা যেতে পারে। এর বিপরীতে লক চেয়েছেন স্ব-সার্বভৌমত্ব (self-sovereignty) কে।[৮৪]

স্বাধীনতা সম্পর্কে লকের বক্তব্যে আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে যে আপাতবিরোধ তার সমর্থন মেলে না।[৮৫] কারণ প্রকৃতির রাজ্যেও মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করতো তাতেও আইনের উপস্থিতি ছিল। যদিও সে আইন রাজনৈতিক নয়, প্রাকৃতিক ছিল। তথাপিও লক বোঝাতে চান আইনের শাসনের সাথে স্বাধীনতার সংকুচিত হওয়ার সুযোগ নেই, বরং প্রকৃতির রাজ্যেও যে প্রাকৃতিক আইনের প্রচলন ছিলো তাতেও মানুষের স্বনির্ভরতা, সমতা, অপরের ক্ষতি না করা, জীবন, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির ক্ষতি না করার বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হতো।[৮৬]

লক কোনো উচ্চতর শক্তির অধীনে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্থান দেননি। তিনি জাগতিক কোনো শক্তি, কোনো আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জনগণের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেননি। তবে তার অর্থ এমন নয় যে, জনগণ বা ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা করার স্বাধীনতা পাবে। এক্ষেত্রেই লকের মানবচরিত্রে যুক্তিবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আইনের দ্বারা অনুমোদিত কার্যক্রম পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে বলে ব্যক্তি যেমন প্রাকৃতিক আইন তথা প্রকৃতির কার্যকারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না, কিংবা ঘটায় না, তদ্রুপ ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকার পরেও ব্যক্তি রাজনৈতিক আইনসমূহকেও ব্যক্তিগত ও বৃহত্তর সামষ্টিক স্বার্থে লঙ্ঘন না করে মান্য করে। প্রাকৃতিক আইনসমূহ এক প্রকার নৈতিক অনুশাসন সৃষ্টির দ্বারা যেভাবে অপরের

ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে, তদ্রুপ রাজনৈতিক আইনসমূহও যৌক্তিক অনুশাসন সৃষ্টির দ্বারা ব্যক্তিকে আইন মেনে চলার দায়বদ্ধতা তৈরি করে।

লকের মতে স্বাধীনতা একটি প্রাকৃতিক অধিকার এবং এ অধিকারের সৃষ্টি প্রাকৃতিক আইনের দ্বারা।[৮৭] প্রাকৃতিক আইনের সাথে যুক্তিবাদিতার একটি সম্পর্ক রয়েছে। আর ব্যক্তির যুক্তিবাদিতা তাকে অননুমোদিত বা অনুমোদিত কাজের সীমারেখা নির্দেশ করে। লকের স্বাধীনতা ধারণার সাথে শৃঙ্খলার এবং স্থায়িত্বের একটি নিবিড় যোগ রয়েছে বলে দাবি করা যায়। প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হলো প্রাকৃতিক আইনানুযায়ী জীবনযাপন করা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি অপরের প্রাকৃতিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কাজ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজে সিভিল আইন অমান্য করতে পারে না, কারণ তার যুক্তিবোধ রয়েছে এবং লকীয় রাজনৈতিক সমাজের সিভিল আইনের সাথে প্রাকৃতিক আইনের সম্পর্ক রয়েছে। লকের *Letter Concerning Toleralion* শীর্ষক পত্রে বিচারিক ক্ষমতা ও আদেশের দ্বারা জনগণের স্বাধীনতার ব্যাঘাত ঘটে কিনা এর উত্তরে বলা যায়– এক্ষেত্রে একদিকে রয়েছে সরকার এবং সমাজ, অপরদিকে রয়েছে ব্যক্তির বিবেক। তাই ব্যক্তির বিবেকবোধের সাথে আইনসিদ্ধ নয় এমন কোনো কার্যক্রম থেকে স্বীয় কর্তৃত্বকে সংকুচিত করে এমন কোনো সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন না।[৮৮]

লকের মতে প্রকৃতির রাজ্য ও রাজনৈতিক সমাজ উভয় অবস্থাতে জনগণের স্বাধীনতা বহাল ছিলো। কিন্তু হবসের ধারণা লকের থেকে ভিন্ন। স্বাধীনতা বলতে হবস বোঝান অনিরাপত্তা বা অনিরাপদ জীবন থেকে মুক্তি, প্রকৃতির রাজ্যের অবাধ স্বাধীনতা থেকে মুক্তি, নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থা থেকে নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজে ব্যক্তির জীবনযাত্রা (যা দ্বারা হবস স্বাধীনতার সীমা টেনেছেন)। হবসের চিন্তায় স্বাধীনতা ব্যক্তির একক প্রাপ্তি বা প্রত্যাশার বিষয় নয়। বরং কমনওয়েলথে সামষ্টিক কল্যানের ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে এ প্রত্যাশার প্রাপ্তি ঘটে।

সমতা সম্পর্কে লক

সমতা সম্পর্কে লকের ধারণা হবসের ধারণা থেকে পৃথক। হবসীয় প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের মাঝে যে শারীরিক ও মানসিক সমতার বর্ণনা পাওয়া যায় তা থেকে লকের বর্ণনার স্বাতন্ত্র্য হলো, অধিকার প্রসঙ্গে লক ব্যক্তির ক্ষমতা, সামর্থ্য, মর্যাদা ইত্যাদির পরিবর্তে নৈতিক সমতার ওপর আলোকপাত করেন। তার কাছে সকল ব্যক্তিমানুষই সমমর্যাদার অধিকারী। লক নৈতিক সমতার ওপর গুরুত্বারোপ দ্বারা ব্যক্তির যুক্তিবুদ্ধিকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিকভাবে অসমান হলেও নৈতিক সমতার বিচারে ব্যক্তির সমান হওয়া উচিত। নৈতিক সমতা ব্যক্তির মাঝে যুক্তির সমতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। নৈতিকতার এ বোধ ব্যক্তির মাঝে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে প্রেরণা যোগায়। হবসের কাছে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সমতার বিষয়টি যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে লকের কাছে তা ভিন্ন। লক ব্যক্তির অধিকারের সমতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। অধিকারের সমতা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হলো অধিকার উপভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করা। ব্যক্তির অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন ব্যক্তির অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করা । অধিকারের সমতার সাথে নৈতিক চেতনার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হলো ব্যক্তির যুক্তিবোধ। যা মূলত ব্যক্তির মাঝে ন্যায়পরতাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে। যুক্তিবাদিতা ব্যক্তিকে ন্যায়ধর্মী হতে পথ দেখায়, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে, পাশাপাশি ব্যক্তি কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয় অপরের শ্রম বা সম্পত্তির পরিবর্তে স্বশ্রমে কাজ করতে উদ্যেগী হয়।

লক মানুষকে প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেননি। কোনো পূর্বনিয়ন্ত্রণবাদকে তিনি সমর্থন করেননি। বরং তাঁর মানুষ আধুনিক মানুষ, সে যুক্তিবাদী। এ যুক্তিবোধে তাড়িত সত্তা কেবল স্বীয় স্বার্থে লালায়িত নয়। সে ব্যক্তিস্বার্থ

অবশ্যই সংরক্ষণ করে কিন্তু একই সাথে সে নৈতিকতা দ্বারাও চালিত; যা ব্যক্তিকে কর্তব্যবোধে তাড়িত করে এবং অন্যের জন্যেও সে কাজ করে।

মোদ্দা কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মানুষের যুক্তিবাদিতার মধ্যেকার সমন্বয়মূলক সংযুক্তি পুনরায় প্রকাশ পায় লকের চিন্তায় (যা পূর্বে লক্ষ করা যায় এরিস্টটলের চিন্তায়)। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লকের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তাঁর উদারনীতিবাদ (Liberalism)। উদারনীতিবাদের প্রবক্তারূপে লকের চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে সহিষ্ণুতা ব্যক্তিস্বার্থের জয়জয়কার আবার একই সাথে নীতি-নৈতিকতার সংশ্লেষণ এবং উপযোগবাদী মনোবৃত্তি। লকের উদারতাবাদকে তাঁর অধিকার, সমতা ও স্বাধীনতার এক সমন্বিত মূর্ত প্রকাশরূপে দাবি করা যায়। এ থেকে বলা যায়, লকের উদারতাবাদে রাষ্ট্রের স্বার্থ ব্যক্তির স্বার্থকে সংরক্ষণ দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হবসের মতো কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (যা দ্বারা হবস মূলত সার্বভৌমের চরম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন) লকের কাছে উপলব্ধ হয়নি, তবে লকের কাছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা লক্ষণীয় তাতে একদিকে রয়েছে ব্যক্তির স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার জয়গান, আবার অন্যদিকে রয়েছে প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

লকের উদারতাবাদে স্বাধীনতার জয়ধ্বনি রয়েছে বটে, তবে তা অবাধ নয় বরং নিয়ন্ত্রিত। এ নিয়ন্ত্রণ আইনের দ্বারা, যে আইন একই সাথে রাজনৈতিক (Civil law) ও প্রাকৃতিক আইনের (Natural Law) প্রকাশ। এ আইনে রয়েছে নৈতিকতার ঘেরাটোপ এবং এ নৈতিকতাবোধ আবার ঈশ্বরতাত্ত্বিক ভাবনা দ্বারা প্রতিপালিত। এভাবে মূলত লক চিত্রায়িত করেছেন আদর্শ সমাজজীবনের চিত্রকে। কাজেই বলা যায় লকের কাছে একটি আদর্শ বা সুসংহত রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব পেয়েছে শৃঙ্খলাপূর্ণ স্বাধীনতা। এ শৃঙ্খলা হতে পারে ব্যক্তির যুক্তিবোধ দ্বারা অথবা নৈতিকতাবোধ দ্বারা অথবা আইনের দ্বারা পরিচালিত। বলা যায়, এতে কেবল ব্যক্তিস্বার্থই বিবেচ্য নয়, সামষ্টিক স্বার্থও এসেছে।

লক ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকারসমূহে তাকে সম্পত্তি উপভোগের স্বাধীনতা দিয়েছেন, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানার বিষয়ে কোনো সমতা নিরূপনের প্রস্তাব দেননি। তাহলে বলা যায় লক ব্যক্তির স্বাভাবিক সমতাকে স্বীকার করেছেন কিন্তু সামাজিক সমতাকে এড়িয়ে গেছেন। অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকানার ওপর ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণের কোনো সীমারেখা টানেননি। এতে স্পষ্ট যে, অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করলেও ধনবৈষম্যকে জিইয়ে রেখে অসমতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। একজন ব্যক্তি যতটা সম্ভব ততটা সম্পদের অধিকারী হতে পারবে এবং রাষ্ট্র এ বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির রাজ্যেই এবং মানুষ স্বীয় সম্মতিতেই সম্পত্তির এই বৈষম্যকে মেনে নিয়েছে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সমাজেও ধনবৈষম্য বিরাজমান থাকে।

অধিকার সম্পর্কে লক

প্রাকৃতিক অধিকার সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রকৃতির রাজ্যের যে পরিস্থিতির কারণে মানুষ রাজনৈতিক সমাজের উত্থান ঘটাল, সে রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌম নামক কোনো কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে সাধারণ মানুষ তথা ব্যক্তিমানুষের অধিকার, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় লকের যে প্রচেষ্টা তা বিশেষত লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অবস্থাটিকে দৃঢ়তা দেয়। লকের ব্যক্তিগত অধিকারের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে জনকল্যাণের (Public Good) সংযোজন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমর্থিত বিভিন্ন বক্তব্য আমরা তাঁর *সেকেন্ড ট্রিটিজ* গ্রন্থটির বিভিন্ন স্থানে লক্ষ করি।[৮৯] একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরূপে লকের যে পরিচয়[৯০] কেন্ডাল তার সাথে

ভিন্নমত পোষণ করেন।[৯১] কেন্ডাল মনে করেন এর মাধ্যমে লকের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে না। ব্যক্তি-অধিকারের সুরক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকারান্তরে লক ব্যক্তির সামগ্রিক আনুগত্য দাবি করেছেন এবং আনুগত্যের এ পরিবর্তন তাহলে সম্ভব যখন পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে উঠে, যা বিপ্লবকে অনিবার্য করে তোলে। কেণ্ডাল মনে করেন, রুশো নয় বরং লকই প্রকৃতপক্ষে 'রাষ্ট্রের আধিবিদ্যক তত্ত্ব' এর জনক।[৯২] অবশ্য কেন্ডাল ছাড়াও টি. এইচ গ্রিনও অনেকটা একই মত পোষণ করেন। গ্রিনের মতে রুশোর গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহের অধিকাংশই লকের *সেকেন্ড ট্রিটিজ* গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৯৩] এক্ষেত্রে বলা যায়, লক রাজনৈতিক ক্ষমতার সূত্রপাত করেছেন কর্তৃত্ববাদী এবং সামষ্টিকতাবাদী চরিত্র দ্বারা, যার সাহায্যে তিনি প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের দ্বারা সৃষ্ট আধুনিক রাজনৈতিক সমাজকে বৈধতা দান করেছেন এবং সেই লক্ষ্যে সমাজে সরকারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।

কেন্ডালের এ মতের বিপরীতে গশ অবশ্য মনে করেন রাজনৈতিক ক্ষমতা কর্তৃত্ববাদী এবং সামষ্টিকতাবাদীতার পরিবর্তে জনকল্যাণের জন্য কতটা ব্যবহৃত হয় তা দ্বারা লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্য বিচার্য হতে পারে।[৯৪] লকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চরিত্রের বিপরীতে তাকে সামষ্টিকতাবাদীরূপে প্রমাণে কেন্ডালের যুক্তি হলো, প্রাকৃতিক রাজ্যের মানুষের যে চরিত্র লক রূপায়ন করেছেন তা পুরোপুরিই সামাজিকীকৃত (socialized) এবং তাদের সকল অধিকারসমূহ উদ্ভূত হয়েছে সামাজিক প্রয়োজন থেকে। তিনি মনে করেন প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ যদি প্রাকৃতিক আইনের অধীন এবং সেখানে তাদের অধিকার ও কর্তব্য থাকে তাহলে বলা যায় প্রকৃতির রাজ্য নিজেই সামাজিক অবস্থা। প্রকৃতির রাজ্য সম্পর্কে লক নিজেই বলেছেন মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র হয়ে মানবজাতির সকল সদস্য একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করে।[৯৫]

লকের এ বক্তব্য একদিকে ব্যক্তির সমাজবদ্ধ জীবনকে প্রতিফলিত করে এবং অন্যদিকে একটি রাজনৈতিক সমাজ গঠনের জন্য তাদের উদ্দেশ্যমূলক প্রবণতা নির্দেশ করে। একে বলা যায় ব্যক্তির পারস্পরিক বিশ্বাসের প্রকাশ্য ফল। আইনদ্বারা প্রণীত অধিকারের উদ্দেশ্য হলো সামষ্টিক কল্যাণ। কোনো রাজনৈতিক সমাজস্থিত সদস্যদের জন্য তাদের 'প্রাকৃতিক স্বাধীনতা'র উৎসর্গী করণ প্রয়োজন এবং তা বৃহত্তর স্বার্থে ন্যায্য হবে। কারণ, 'অনেক সুযোগ-সুবিধা' যা একজন নাগরিকরূপে তারা উপভোগ করে, সেগুলো মূলত উৎসারিত হয়েছে সমাজস্থিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহযোগিতা এবং শ্রম দ্বারা। লকের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণের সময় ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে বা আইনভঙ্গকারীকে প্রত্যর্পণের দ্বারা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা রাষ্ট্রের কাছে তুলে দেয়। বলা যায়, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সমষ্টিগতভাবে আইনভঙ্গকারীর শাস্তির বিষয়টি নির্ধারিত হয়। অবশ্য শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ সমাজ এবং আইনকে সাহায্য করবে সরকারের অংশরূপে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির এক প্রকার রূপান্তর লক্ষ করা যায়, যাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলে লককে যেরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তার বিপরীতে কেন্ডালের অবস্থানটি অধিকতর সংহত মনে হয়েছে।[৯৬] কেন্ডাল লককে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পরিবর্তে সামষ্টিকতাবাদের ধারক প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

লকের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতা হলো 'জনহিত বা জনগণের কল্যাণ' এর সমার্থক।[৯৭] লকের রাজনৈতিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'জনগণের সম্মতি'। ব্যক্তির বা জনগণের সম্মতির সাথে তার বা তাদের স্বাধীন ইচ্ছার নিবিড় যোগ রয়েছে। লক মনে করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন এবং তাই ব্যক্তির স্বীয় সম্মতি ব্যতীত জাগতিক অন্য কোনো শক্তি ব্যক্তিকে অধীনতায় আবদ্ধ রাখতে পারে না।[৯৮]

প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আইন মেনে চলার দ্বারা ব্যক্তি সমগ্র সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করে। বিপরীতক্রমে একজন আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদানের দ্বারা একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা সমাজের প্রতি অধিকারের পাশাপাশি দায়িত্বকেও রক্ষা করলো। অধিকার সংক্রান্ত লকের আলোচনা থেকে বলা যায়, কেবল ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের প্রতি লক যে গুরুত্ব দিয়েছেন এমন বক্তব্য পরিপূর্ণ নয়। ব্যক্তির অধিকার রক্ষার পাশাপাশি লক

সম্প্রদায়ের বা সামষ্টিক স্বার্থকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া সম্প্রদায়গত (community) স্বার্থ সংরক্ষণ দ্বারা ব্যক্তি কেবল তার অধিকারকেই উপভোগ করে না, সেই সাথে দায়িত্ববোধের মাধ্যমে ব্যক্তি জনগণের কল্যাণের দিকটি বিবেচনা করে।

একজন ব্যক্তিকে আইনের শাসনের অধীনে আনয়ণের ক্ষেত্রে দুই ধরণের আইন লক্ষ করা যায়। যেমন– প্রাকৃতিক আইন এবং রাজনৈতিক আইন। প্রাকৃতিক আইন দ্বারা ব্যক্তি আদমের সন্তানরূপে উত্তরাধিকার সূত্রে আবদ্ধ। প্রাকৃতিক আইনের সাথে যুক্ত রয়েছে আধিবিদ্যক দিক। অন্যদিকে রাজনৈতিক আইনের সাথে যুক্ত রয়েছে ব্যক্তির যুক্তিবাদিতা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা। পজিটিভ ল (রাজনৈতিক আইন) সম্পর্কে একজন ব্যক্তি জানতে পারে একটি নির্দিষ্ট বয়সে এবং তারপর ব্যক্তি এই আইনের আওতাধীনে আসে । অর্থাৎ আইনের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বংশপরম্পরায় সংযুক্ত নয়। এদিক থেকে বলা যায় ব্যক্তির সাথে প্রাকৃতিক আইনের যে সম্পর্ক তা ব্যক্তিগত এবং ব্যক্তির সাথে রাজনৈতিক আইনের সম্পর্কটি সামষ্টিক। প্রাকৃতিক আইনের পরিবর্তে রাজনৈতিক আইনে পদার্পণ দ্বারা ব্যক্তি শাসন করার বা শাস্তি প্রদানের অধিকার তৃতীয় পক্ষকে সমর্থন করেছে। কেন্ডাল একে মনে করেছেন জনগণের দায়িত্ব, যে দায়িত্ব পালন দ্বারা একজন 'নির্দোষের স্বার্থ' সংরক্ষণ করে। এ থেকে বলা যায় ব্যক্তি তার স্বার্থসংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের দ্বারা প্রকারান্তরে সমাজের মঙ্গলের জন্য দায়িত্ব পালন করে।

কেন্ডালের বক্তব্যে আমরা লক্ষ করেছি ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষায় এবং তার সম্পত্তির অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হলে ব্যক্তিকে বিপ্লবের অধিকার লক দিয়েছেন বটে, তবে তা কার্যত সামষ্টিক অধিকার, কোনো ব্যক্তিক অধিকার নয়। সম্পত্তির অধিকার রক্ষিত না হলে কিংবা কমনওয়েলথের স্বার্থবিরুদ্ধ কাজ করা হলে জনগণকে লক বিপ্লবের অধিকার দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তার সামষ্টিকতাবাদের পরিচয় মেলে। লকের ভাষায়, "the power that every individual gave the society when he entered into it, can never revert to the individuals again as long as the society lasts."।[৯৯] লকের এ বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি তার ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সমাজে বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত সে এ ক্ষমতার বিরোধিতা করতে পারে না। যদি সে এর ব্যত্যয় করে তাহলে কিন্তু ব্যক্তি জনস্বার্থ কিংবা প্রাকৃতিক আইন কিংবা প্রাকৃতিক অধিকারের ব্যত্যয় ঘটায়। লকের অধিকার সংক্রান্ত মতের আলোচনা থেকে তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর পরিবর্তে সামষ্টিকতাবাদীর (collectivist) যে দাবি কেন্ডাল করেছেন তা যুক্তিযুক্ত বলা যায়। তাছাড়া লক যখন চূড়ান্ত ক্ষমতার বিচারের ক্ষেত্রে 'স্বর্গের প্রতি আবেদন' '(appeal to Heaven)' করেন তাতেও কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন ও দাবির প্রতিই সমর্থন প্রকাশ পায়।

লকের রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণে বলা যায়, কিছু ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি অপেক্ষা সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, যা সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। তবে সামষ্টিক বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের কাছে ব্যক্তিগত অধিকার যে বিলুপ্ত হতে পারে বা কোণঠাসা হতে পারে একথা অস্বীকার করা যাবে না। অবশ্য লক নিজেও সাংবিধানিক নির্ভরতার উল্লেখ করেছেন, একচ্ছত্র রাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিকে নয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুরক্ষা দ্বারা। সামষ্টিক অধিকারের সংরক্ষণ দ্বারা স্বাধীনতা ও অধিকার তাৎপর্যপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে আইনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সকল ক্ষেত্রে না হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে সামষ্টিক কল্যাণ বা জনসাধারণের মঙ্গলকে সমন্বিত করেছেন। লকের এ চিন্তার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের সাথে। সার্ত্রে মনে করেন একজন ব্যক্তি তার একার অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে না, যতক্ষণ ব্যক্তি সমাজের সামষ্টিক কল্যাণে বা স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে, অপরের স্বার্থ সংরক্ষণ দ্বারা নিজের স্বার্থকে তথা জীবনকে তাৎপর্যমন্ডিত করে তোলে।[১০০]

লক মনে করেন অধিকারণ জনপ্রশাসন টিকে থাকার যৌক্তিকতা প্রদান করে। তিনি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রশাসনের কাছে ন্যস্ত ক্ষমতার সাথে অধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ হিসেবে দেখেছেন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে জন রোর বলেন– "By protecting individual rights on a mass scale – and despite the paradox, that's what the administrative state does – the administrative state would seem to be a faithful servant of the original covenant by which we do the bidding of Hobbes and Locke and enter civil society to secure the protection of our individual rights."[১০১]

লকের সম্পত্তিতত্ত্বের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে তিনি জনগনের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার খর্ব করার ক্ষমতা কোনো শাসককে প্রদান করেননি, বরং সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের এ সকল প্রাকৃতিক অধিকারের সর্বাগ্রে নিশ্চয়তা বিধান করা। উল্লিখিত প্রাকৃতিক অধিকারসমূহের মাঝেই তিনি স্বাধীনতাকে স্থান দিয়েছেন (যা ব্যক্তির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত) এবং এটি কোনো অর্জিত ব্যাপার নয়। স্বাধীনতা এবং অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। যাতে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

প্রাক-রাজনৈতিক সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ দ্বারা প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ তাদের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহকে অধিকতর সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, হবসের মতো কিন্তু লকের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার তীব্র অনুপস্থিতি ছিল না, বরং তাঁর প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের প্রাকৃতিক অধিকারসমূহ আরো সুরক্ষিত এবং সম্প্রসারিত করাই রাজনৈতিক সমাজের উত্থানের অন্যতম কারণ। ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষা এবং সম্প্রসারণের নিহিতার্থ হলো ব্যক্তির স্বাধীনতায় জোরপূর্বক হস্তক্ষেপ না করা এবং স্বাধীনতার উপভোগ নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে।

লকের অধিকার সংক্রান্ত ভাবনায় তিনি জনকল্যাণের সাথে ব্যক্তিগত কল্যাণের কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করেননি। কারণ, ব্যক্তির সমষ্টি মিলেই সমাজে সামষ্টিকতা বা সংঘবদ্ধ শ্রেণি তৈরি হয়। সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরের পরিপূরক। একে অপরকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল নয়। যেমন– সম্পত্তির (জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি) অধিকার নিশ্চিত করা লকীয় সরকারের লক্ষ। আর সরকার হলো ব্যক্তির সমষ্টি। অধিকার সম্পর্কে লকের এ ভাবনা সামাজিক সত্তারূপে ব্যক্তির স্বার্থ এবং রাজনৈতিক সত্তারূপে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার পরস্পর একীভূত।

লকের রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত মতের দুর্বলতা হলো তাঁর রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণকারী। যারা ভূ-সম্পত্তির মালিক তারাই সমাজে পূর্ণ সদস্য। ভূ-স্পত্তির অধিকারীগণ তাদের পিতৃপুরুষের সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করবে।[১০২] পক্ষান্তরে সমাজে যারা শ্রমিক শ্রেণি এবং ভূ-সম্পত্তিহীন তারা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও রাজনৈতিক সরকারের কাছে ঠিক পুঁজিপতিদের মতো সমমূল্য মূল্যবান নয়; তাই তারা রাষ্ট্রের পূর্ণ সদস্য নয়।[১০৩]

লকের অধিকার সম্পর্কিত ভাবনায় তিনি জনগণের অধিকার এবং নাগরিকদের অধিকারকে স্বতন্ত্রভাবে দেখেছেন। যেমন– লক কেবলমাত্র সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছেন। নাগরিকের সম্পত্তিতে তার বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। লকীয় অধিকারের ভাবনায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিঅধিকারের জয়জয়কার ঘটলেও সামষ্টিক স্বার্থ এবং বিত্তহীন শ্রেণির স্বার্থ ভূলুণ্ঠিত হয়। যদিও লকের দর্শন বিশ্লেষণে এমনটা মনে হয় যে, তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছেন রাষ্ট্রের নাগরিক অবশ্যই সম্পত্তির অধিকারী হবে। তৎকালীন ইংল্যান্ডের বাস্তবতায় তিনি হয়তো এমন মনোভাব পোষণ করতে পারেন। যদি তা হয় তাহলে তিনি পুজিঁপতি শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করেছেন তা বলা যায়। তবে বর্তমান বাস্তবতায় (যদি এ বাস্তবতা সর্বদা বিরাজমান)

ভূ-সম্পত্তিহীন ব্যক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্রের হতদরিদ্র ব্যক্তি যার সম্পত্তির মালিকানা নেই তার প্রতি কি রাষ্ট্র আগ্রাসী বা কর্তৃত্ববাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে? লকীয় অধিকারের ধারণা গ্রহণ করলে বলতে পারি, রাষ্ট্র কেবল পুঁজিপতি বা ধনিকশ্রেণির নয়। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে নাগরিকত্বের পরিচয় প্রদান পুঁজিবাদী মানসিকতার নামান্তর বলে মনে হয়। লকীয় রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকার সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে বা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে তিনি যতটা গতিশীল করেছেন অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা সোচ্চার মনে হয়নি। একদিকে তিনি মানুষের মর্যাদার কথা বলেছেন অপরদিকে সম্পত্তির বৈষম্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। সম্পত্তির অধিকারীগণ নাগরিকের মর্যাদা পাবে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী গোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর চড়াও হতে পারে, সবল কর্তৃক দুর্বলরা যদি শোষণের স্বীকার হয় তাহলে জনগণের মধ্যে সমতা থাকে না এটা বলা যায়। যেমন– একজন মালী যখন ঘাস কাটে তাহলেও সে ঘাসের ওপর অধিকার থাকে মালিকের, মালীর নয়। এতে কেবল ধনবৈষম্য এবং পুজিঁপতির স্বার্থ সংরক্ষণই প্রতিফলিত হয় না, সেই সাথে শ্রমিককে দাসে পরিণত করে ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমতা এবং অধিকাররের দাবিসমূহকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়।

স্বাধীনতা সম্পর্কে রুশোর অবস্থান

প্রথম ডিসকোর্সে তিনি যে স্বাধীনতাকে বর্ণিত করেছেন সেটির সাথে *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের স্বাধীনতার ধারণার বেশ পার্থক্য রয়েছে। যেমন– *ডিসকোর্স*-এ তিনি যে স্বাধীনতা ও সমতার অন্বেষণ করেছেন তাতে আদিম সমাজ, সুখ, সরলতার প্রতি অনুরাগ এবং আধুনিক সমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে তিনি আধুনিক সমাজের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিলেন। যেমন *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের স্বীকৃত সমাজ একটি রাজনৈতিক সমাজ এবং এর প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। এরিস্টটলের মতো তিনিও মনে করেন একটি রাজনৈতিক সমাজ কেবল মানুষের অপরাধের প্রতিষেধক নয়, সেই সাথে মানুষের যে কোনো প্রগতির শর্ত। মানুষের যে কোনো অসমতাই দাসত্ব সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি দাসত্ব রুশোকে ব্যথিত করে। তিনি অসমতা, দাসত্ব ও দরিদ্রতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে রাষ্ট্রচিন্তাকে প্রবাহিত করেছেন। কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধিই তাঁর কাছে প্রাচুর্য ও মুক্তি নয়। সাথে নৈতিক দিকটিও তাঁর কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট গ্রন্থে রুশো ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সামাজিক তথা রাজনৈতিক শৃঙ্খলা এবং কর্তৃত্বের সমন্বয় সাধন করেছেন, যাতে তিনি ব্যক্তির সাথে সামষ্টিক স্বার্থ ও স্বাধীনতার সংরক্ষণে কাজ করেছেন। একই সাথে রুশো যখন ব্যক্তির সাথে সামষ্টিক স্বার্থের সমন্বয় করেছেন তাহলে তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বয় করে কমনওয়েলথে। সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বে তিনি সকল ব্যক্তি বা নাগরিককে কমনওয়েলথের প্রজারূপে সমন্বিত করে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে যুক্ত করেছেন। ব্যক্তিকে কমনওয়েলথে সক্রিয় ভূমিকায় নিযুক্ত করে তিনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার দুটোই প্রদান করেছেন। ওয়াট এর মতে, “Rousseau also introduces his state as a partnership in all sciences, in all arts and in every virtue.”[১০৪]

স্বাধীনতা, সমতা কিংবা দাসত্বমুক্তি প্রতিটিই তিনি খুঁজে পেয়েছেন শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজে। রাজনৈতিক জীবনে সামাজিক চুক্তির দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতার উপলব্ধি ঘটে এবং এ স্বাধীনতার আস্বাদনে তিনি প্রয়োজন বোধ করেছেন কর্তৃত্বকে, শৃঙ্খলাকে। রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের প্রথম পুস্তক লক্ষ করলে বোঝা যায় স্বাধীনতা সম্পর্কে রুশোর উপলব্ধি। সেখানে তিনি স্পষ্টত বলেন, সামাজিক চুক্তির ফলে মানুষ তার প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাধিকার– যা অবাধ, অসীম কর্তৃত্ব হারায় বটে, তবে তা লাভ করে এক নতুন সামাজিক স্বাধিকার এবং তার ঈপ্সিত বস্তুর ওপর ন্যায্য কর্তৃত্ব। মানুষের স্বাধীনতার শক্তি তার দৈহিক শক্তিতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যে স্বাধীনতায় শক্তি তার রয়ে যায় তা হলো

সামাজিক স্বাধীনতা বা ন্যায্যতার শক্তি এবং রুশো এধরণের সামাজিক স্বাধীনতা বলতে বুঝিয়েছেন মূলত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি বা বিবেক যা প্রকারান্তরে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যদিও মানুষ এ রাজনৈতিক সমাজে তার কিছু স্বাধীনতা হারায়। তা রুশো স্বীকার করেন কিন্তু বিনিময়ে সে মানুষের প্রাপ্তিই অধিক। সে প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বাধীনতা হারালে লাভ করে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বিকশিত হয় তার নৈতিক চেতনা, প্রজ্ঞা, পরিশীলিত যুক্তিবোধ। তবে রুশো রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে (জনগণ সামাজিক চুক্তির দ্বারা যা লাভ করে) গুরুত্ব দিতে গিয়ে তার পূর্বসমর্থিত প্রকৃতির রাজ্যের স্বাধীনতা ও সমতাভিত্তিক জীবনকে পরিপূর্ণ বা যথার্থ জীবনের মর্যাদা প্রদান থেকে সরে আসেন। তিনি মনে করেছেন রাজনৈতিক সমাজই মানুষকে প্রকৃত সভ্যতা দান করে। তাহলে আমরা বলতে পারি রুশোর কাছে মানুষের নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাই হলো তার প্রকৃত স্বাধীনতা। ওয়ার্নার এবং জিংকের মতটি এক্ষেত্রে প্রনিধানযোগ্য। তারা মনে করেন, আত্মসম্মানবোধ সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারে রলসের এই বিশ্বাসটি মূলত রুশোর কাছ থেকেই পাওয়া। কারণ, রুশো কেবলমাত্র সমতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন তা-ই নয়, একইসাথে তিনি মনে করেন রাজনৈতিক জীবন একটি প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত স্বীয় এবং সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে সমন্বিত করতে পারে এবং পারা উচিত।[১০৫]

স্যাবাইনের মতে, ব্যক্তির অধিকার যথা– স্বাধীনতা, সাম্য এবং সম্পত্তি– যা প্রাকৃতিক বিধান মানুষের ওপর আরোপ করে সেগুলিই হলো নাগরিকের প্রকৃত অধিকার। রুশো বলেন, প্রথাগত বিধান এবং আইনগত অধিকারের দ্বারা মানুষেরা সমান হতে পারে এবং হবসের মতো তিনি বলেননি যে, মানুষেরা দৈহিক শক্তির কারণে মূলত সমান।[১০৬]

রুশো স্বাধীনতার পূজারী বটে, তবে সে স্বাধীনতা বাধাবন্ধনহীন নয়। তাঁর স্বাধীনতা হবে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, এ নিয়ন্ত্রণে থাকবে শৃঙ্খলা। সে শৃঙ্খলা কেবল ব্যক্তির নিজের স্বাধীনতার বিধান করে না, অপরের স্বাধীনতাও সংরক্ষণ করে। রুশোর স্বাধীনতা শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই রুশো বলেছেন– 'জন্মেই মানুষ স্বাধীন কিন্তু সে সর্বত্র শৃঙ্খলিত।' রুশোর এ উক্তিটি লক্ষ করলে বোঝা যায় তাঁর স্বাধীনতার শৃঙ্খলা সমাজকাঠামোতে সম্ভব এবং এ সমাজ অবশ্যই একটি রাজনৈতিক সমাজ এবং এর অবশ্যই রয়েছে নৈতিকতায় অনুশাসন। স্বাধীনতা উপভোগের জন্য প্রয়োজন একটি সুসংবদ্ধ সমাজ, একটি রাজনৈতিক কাঠামো। এই সমাজ-কাঠামোতে স্বাধীনতাপিয়াসী ব্যক্তি একক স্বাধীনতা অন্বেষণ করে না, অপরের স্বাধীনতার সুযোগ সংরক্ষণ দ্বারা স্বীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ করে। কাজেই বলা যায়, রুশোর স্বাধীনতা ভাবনায় ব্যক্তির একক স্বাধীনতা তার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করে পরার্থপরতার দিকে ধাবিত হয়। রুশোর স্বাধীনতার এ ভাবনার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্রের। তাঁর অস্তিত্ববাদী চিন্তায় ব্যক্তি কেবল স্বীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না। পাশাপাশি অপরের জন্যও ব্যক্তি ভাবে এবং অপরের স্বার্থ সংরক্ষণের দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় অস্তিত্বকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। এ থেকে বলা যায় রুশোর স্বাধীনতা-ভাবনায় সামষ্টিকতাবাদ লক্ষনীয়। রুশোর স্বাধীনতায় যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো ব্যক্তি সমষ্টির কাছে নিজেকে লীন করে, বৃহত্তর সমাজের কাছে আত্মস্বার্থ ত্যাগ করে যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করে। এধরণের চিন্তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হতে পারে অথবা পুঁজিবাদী সমাজের যে আত্মকেন্দ্রিক ভাবধারা তার সাথেও বৈরী হতে পারে, কিন্তু মানবতার বিচারে কিংবা মানুষের যুক্তিবৃত্তির বিচারে রুশোর এ চিন্তার সদর্থক প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে (রাষ্ট্রে) রূপান্তরের ফলে ব্যক্তির প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটে। ব্যক্তির মাঝে আত্মস্বার্থ থেকে ন্যায়বোধের, নৈতিকতাবোধের সৃষ্ট হয়। ব্যক্তির ন্যায়-নৈতিকতাবোধের সাথে যুক্ত হয় তার কর্তব্যবোধ। এ কর্তব্যবোধ ব্যক্তিকে পরার্থপরতায় উজ্জীবিত করে, সামষ্টিকতাবাদে ধাবিত করে। রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণকৃত মানুষ কেবল প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হবে। যুক্তিনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতায়

কিছু সুযোগ-সুবিধা কম পেতে পারে, কিন্তু সে এমন কিছু অধিকার লাভ করে যা ব্যক্তিমানুষ প্রকৃতির রাজ্যে লাভ করেনি। বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক সমাজে প্রাপ্ত স্বাধীনতায় ব্যক্তি মহৎ আবেগ, যুক্তিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে অধিকতর অধিকার ভোগ করে এবং একই সাথে তার আত্মার উন্নয়ন সাধিত হয়। রুশোর ভাষায় – "সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তি যা হারায় তাকে আমরা বলতে পারি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তথা তার ব্যক্তিগতভাবে যেমন ইচ্ছা তেমন কর্মের স্বাধীনতা, তার প্রবৃত্তির অবাধ চাহিদার দাসত্ব করার স্বাধীনতা।"[১০৭]

ব্যক্তি যখন তার প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে একে স্বাধীনতা না বলে দাসত্ব বলা। বরং ব্যক্তি যখন আইনের প্রতি তথা নিজেদের দ্বারা (সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা) প্রণীত শাসনব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে সেটাই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা। এভাবেই রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা নৈতিকতার বলয়ে, দায়িত্ব-কর্তব্যের অনুশীলনে সুরক্ষিত হয়ে উঠে।

কাজেই সামাজিক চুক্তির দ্বারা ব্যক্তি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হারায় কিন্তু লাভ করে জীবন এবং সহায় সম্পদের ওপর মালিকানার অধিকার। প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ব্যক্তি তার দৈহিক শক্তির দ্বারা রক্ষা করতো এবং উপভোগ করতো। কিন্তু নাগরিকত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হারানো ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজে যে অধিকার লাভ করে তা তার নৈতিক স্বাধীনতা।

রুশোর দর্শনে নৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ স্বাধীনতাই ব্যক্তিকে নিজের ওপর কর্তৃত্ব আরোপে তথা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। রুশোর মতে– "নৈতিক স্বাধীনতাই মানুষকে তার নিজের প্রভুতে পরিণত করে। আমরা যখন প্রবৃত্তিকে মান্য করি তাহলে আমরা স্বাধীন নই, আমরা প্রবৃত্তির দাস। অপরদিকে সমাজের বিধান মান্য করার অর্থস্বাধীন হওয়া।"[১০৮] "একজন মানুষ যখন তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেয়, তাহলে সে তার অনিবার্য মনুষ্যত্বকেই বিসর্জন দেয়। সে বিসর্জন দেয় তার সকল অধিকারকে। সে বিসর্জন দেয় নিজের মানুষ হওয়ার দায়িত্বকেই।"[১০৯]

রুশোর স্বাধীনতার উপলব্ধি থেকে এটা দাবি করা যায় যে, রাজনৈতিক সমাজ তথা রাষ্ট্র, সুশাসন, আইনের প্রতি আনুগত্য, নিয়ন্ত্রিত যুক্তিবোধ– এসবের সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতা অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত। সুশাসন হলো এখানে সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন, যেখানে সরকারের জবরদখল, অন্যায্য কর্তৃত্ব থাকবে না এবং বিশৃঙ্খলাও থাকবে না। এভাবে রুশো স্বাধীনতার ধারণায় একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছেন। অবশ্য কার্লাইল মনে করেন রুশো এরিস্টটলীয় সমাজদর্শনকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[১১০] এরিস্টটলীয় দর্শনে (তাঁর *পলিটিক্স* গ্রন্থে) তিনি মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে কেবল সামাজিক জীব নয়, সেই সাথে রাজনৈতিক জীবসত্তারূপে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক সমাজ ব্যক্তির প্রগতির অপরিহার্য শর্ত। রুশোর স্বাধীনতার ধারণায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এই অর্থে যে তিনি লক অপেক্ষা ভিন্নভাবে স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেছেন। লকের রাজনৈতিক সমাজে বিচারকের উপস্থিতি এবং স্বীকৃত আইনসমূহের অনুমোদন দ্বারা স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এ ব্যবস্থার বিপরীতে রুশো তুলে ধরেছেন যে রাজনৈতিক সমাজে মানুষ কেবল সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য সম্মিলিত হয়নি, বরং নৈতিকতা এবং স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার জন্য একত্রিত হয়েছে। প্রকৃতির রাজ্য থেকে পৌর সমাজে মানুষের যে প্রক্রিয়ায় ও উদ্দেশ্যে পর্দাপণ সেটি অবশ্যই একটি সাহসী পদক্ষেপ। আলফ্রেড কোবান রুশোর এধরণের ভাবনাকে মানবজীবনে একটি বিপ্লব বলে মনে করেন। যার দ্বারা মানুষ একই সাথে নৈতিক এবং রাজনৈতিক সত্তাতে পরিণত হয়েছে।[১১১]

রুশোর স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনায় বেশ কিছু সদর্থক দিক থাকলেও এতে কিছু অসঙ্গতিও লক্ষণীয়। তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের পুস্তক-৪, অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনা লক্ষ করলে আমরা তার অসঙ্গতিসমূহ চিহ্নিত করতে পারি। রুশো যে ধরণের সরকারব্যবস্থা সমর্থন করেছেন তাতে তিনি সিভিল ধর্ম বা সিভিক ধর্ম বা পৌর ধর্ম নামে এক বিশেষ ধরণের ধর্মমতকে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রচার করার পক্ষপাতি । তিনি মনে করেন প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের একটি

সামাজিক ধর্ম ‘civil religion’ থাকবে। এরদ্বারা বিশেষ বিশেষ জাতীয় দিবসসমূহে স্মৃতিসৌধ, যুদ্ধক্ষেত্র বা জাতীয় পতাকা উদযাপিত হবে। রুশো– উল্লিখিত এ ধর্মমত চার্চের অনুরূপ নয়, যদিও মাঝে গির্জার কার্যক্রম বা রীতিনীতিসমূহ প্রকৃতির ধর্মে পালিত হতে পারে। সিভিল ধর্মের বৈশিষ্ট্য হবে ন্যায়ের ধারণা বা ন্যায়কারীরা খুশি থাকবে এবং অন্যায়কারীরা শাস্তি পাবে (এক্ষেত্রে ব্যক্তির মৃত্যু পরবর্তী ঈশ্বরের বিশ্বাস থাকতে পারে) এবং রাষ্ট্রীয় আইনের পবিত্রতা সুরক্ষিত থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রুশো তিন প্রকার ধর্মের উল্লেখ করেছেন, যার প্রথমটি হলো – প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোনো ধর্মের সাথে যুক্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা ব্যক্তি তার কর্তব্যের প্রতি অনুরক্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তিকে কর্তব্যকে ভালোবাসতে ও পালন করতে সাহায্য করবে এমন মনে করেন রুশো। প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস সমর্থন করেন রুশো, কিন্তু প্রকারান্তরে ধর্মহীনতা বা ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসকে অবৈধ বলে গণ্য করেছেন।

রুশো যে ধর্মের অনুশীলনকে সমর্থন করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সিভিল ধর্ম (civil religion)। তাঁর মতে ব্যক্তিগত নৈতিকতার প্রশ্নে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সিভিল ধর্মের এর সাথে যুক্ত থাকা। তাঁর মতে, “not exactly ... religious dogmas, but .... social sentiments without which a man cannot be a good citizen or a faithful subject.”[১১২] প্রত্যেকের সিভিল ধর্ম বা সামাজিক ধর্মের সাথে যুক্তকরণ দ্বারা রুশোর বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে যারা সামাজিক ধর্মের বিধিবিধান মান্য করবে না তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

রুশো যখন বলেন সামাজিক ধর্মে বা পৌর ধর্মের প্রতি যারা প্রথমে শ্রদ্ধা পোষণ করে ও পরে অমান্য করে তাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে, তাঁর এধরণের বক্তব্য রাষ্ট্রের ভিন্নমত পোষণকারীদের বলপ্রয়োগের দ্বারা কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে সহমতে আনয়ন করা নির্দেশ করে। এতে তিনি ভিন্নমত পোষণকে একটি অপরাধরূপে বিবেচনা করেছেন এবং একে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল গণ্য করেছেন।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রকার ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যেসব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া যায় যেসব ধর্মের মধ্যে সহিষ্ণুতার নীতি রয়েছে। অন্যথায় কিছু কিছু নাগরিক অপরের শত্রুতে পরিণত হবে যা সামাজিক শান্তির বিঘ্ন ঘটাবে। রুশোর বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, অসহিষ্ণু ধর্মকে সহ্য করা হবে না।

রুশো মনে করেন সামাজিক ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে একজন নাগরিকের আচরিত বিশ্বাস বা বিধি-নিষেধ রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হবে সামাজিক প্রয়োজন পূরণের সামাজিক অনুভূতি হিসেবে। অবশ্য এর পেছনে স্পষ্ট কারণ ‘সামাজিক এই অনুভূতি ব্যতিরেকে কোনো মানুষ একজন সুনাগরিক কিংবা সমাজের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে না’।[১১৩] সুনাগরিকের গুণাবলি বা শর্তরূপে রুশোর এই ভাবনা দোষণীয় নয়। কিন্তু সমস্যার উদ্ভব হয় যখন রুশো এই শর্ত অর্জনে বলপ্রয়োগের পরার্মশ দেন। স্বাধীনতার প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রসঙ্গে রুশোর মত হলো কেবলমাত্র প্রকৃতির অনুগত হওয়াকে প্রকৃত বিচারে দাসত্ব বলা চলে, স্বাধীনতা নয়। পক্ষান্তরে, আইনের প্রতি ব্যক্তি যখন আনুগত্য প্রদর্শন করেও আইন মান্য করে সেটাই হলো স্বাধীনতা। রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি যখন সার্বভৌম কর্তৃক প্রণীত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং আইনানুযায়ী ব্যক্তি সার্বভৌমের একজন সদস্যরূপে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। সার্বভৌমের অংশরূপে সাধারণ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী জনগণ আইন প্রণয়ন করে। আবার ভোটাধিকারও প্রয়োগ করে। এভাবে জনগন রাজনৈতিক সমাজে বসবাসের দ্বারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় স্বাধীনতার উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তাঁর প্রবল জাতীয়তাবাদী চেতনা। যাকে সমুন্নত রাখার জন্য তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা সামষ্টিকতায় আবদ্ধ করেছেন।

রুশোর রাজনৈতিক সমাজে জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্নটি মুখ্য নয়, বরং জনসাধারণের ভালো এবং ন্যায্যতার প্রশ্নটি মুখ্য। সামষ্টিকতা এবং ভ্রাতৃত্ব উভয়ের সম্মিলনে রুশো এমন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছেন যাতে প্রত্যেকে স্বীয়

ইচ্ছাকে মান্য করার দ্বারা কমনওয়েলথের ইচ্ছাকে মান্য করবে। রুশোর সার্বভৌমের ভিত্তি অনপেক্ষ বা চরম ক্ষমতা নয়, বরং অধিকার ও ন্যায়পরতার সমতা যা ব্যক্তির স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদানকারীরূপে ভূমিকা রাখবে। রুশো ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন যা প্রতিফলিত হয়েছে তার সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বে। বলা বাহুল্য সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বে রয়েছে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন, স্বনিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক মূল্যবোধ যা দ্বারা ব্যক্তি অর্জন করে পৌর স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অবশ্য এক্ষেত্রে রুশোও মনে করেন, যখন নাগরিকেরা আইন মান্য করে তাহলে তা তাদের স্বাধীনতাকে উপভোগে সাহায্য করে, আইন মান্য করার মাধ্যমে তারা মূলত তাদের স্বাধীন ইচ্ছাকেই মান্য করে। এভাবেই রুশো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সমন্বিত করেছেন।[১১৪] কাজেই বলা যায়, রুশোর রাজনৈতিক দর্শনে সম্মতি, চুক্তি কিংবা সাধারণ ইচ্ছা সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে চেয়েছেন। এমনকি রুশো যখন বলেন 'স্বাধীন হতে বাধ্য করা হবে' এর দ্বারা তিনি সামষ্টিকতা বা কোনো গোষ্ঠী দ্বারা বা সমাজ কর্তৃক ব্যক্তির নৈতিক দিকটিকে যুক্ত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন।[১১৫] সামষ্টিক পরার্থপরতার লক্ষ্যে যদি ব্যক্তির আত্মস্বার্থ ক্ষুন্ন হয় কিংবা বিসর্জন দিতে হয় তবে তা-ই শ্রেয়। কারণ ব্যক্তি যদি কেবল নিজের জন্য বাঁচে তবে তাতে সুখ থাকলেও শান্তি থাকতে পারে না । এক্ষেত্রে গ্রিমসলির অবস্থান অধিক যুক্তিযুক্ত। গ্রিমসলি রুশোর সার্বভৌম সংক্রান্ত মতকে গণতান্ত্রিক দাবি করেন এবং জনগণের কাছেই চূড়ান্ত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব রক্ষিত হলো বলে মনে করেন।[১১৬] অবশ্য হুকাট, রাইলি প্রমুখের মতে রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব এবং সামষ্টিক কল্যাণের ধারণাকে যুক্তকরণ দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার গুরুত্বকে খাটো করেছেন।[১১৭] রুশোর স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো তিনি এমন একটি Body Politic প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যাতে ব্যক্তি কমনওয়েলথের সাধারণ ইচ্ছাকে মান্য করার পাশাপাশি ব্যক্তি তার স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছাকেও মান্য করতে পারবে।[১১৮]

সমতা সম্পর্কে রুশো

সরকারব্যবস্থায় জনগণের সমতার বিষয়টিতে রুশো লক অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি সমতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সম্পদ অপেক্ষা রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ বিষয়ে অধিক আলোকপাত করেছেন। যেমন– তিনি যখন সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, মতপ্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মত দেন তাহলে তিনি সকল জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেন। যা তার সমতার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাছাড়া সম্পদের ধারণা প্রসঙ্গে রুশো মনে করেন একজন ব্যক্তির এতটা গরীব বা ধনী হওয়া উচিত নয় যাতে সে অপরকে ক্রয় কিংবা অপরের কাছে বিক্রি হতে পারে। এতে তাঁর চিন্তায় শ্রদ্ধা এবং সমতার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

রুশো তার সরকারব্যবস্থায় যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলেছেন তাকে 'অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র' বলে গণ্য করা যায়। এটি একটি সুশাসিত সরকারব্যবস্থা ও এর সফলতার শর্ত হলো এতে জনগণের স্বাধীনতা ও সমতা রক্ষিত হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে রুশো এমন দাবি করছেন না যে গণতন্ত্রই যথার্থ ও সর্বোত্তম ব্যবস্থা।

রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা'র ধারণা একটি সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার। সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব দ্বারা তিনি চেয়েছেন এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে যা দ্বারা সকল নাগরিক সমানভাবে উপকৃত হতে পারে। জনগণের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত সমাজে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নয়, আপামর জনতার স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। সকল জনগণের দাবিকে তিনি গণ্য করতে চেয়েছেন, লকের মতো কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যবস্থাকে নয়।

রুশোর সমতা সম্পর্কিত ধারণা পর্যালোচনায় তাঁকে লিঙ্গবাদী বলে বিবেচনা করা যায়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের পরিবর্তে কেবল পুরুষদের স্বার্থ সংরক্ষণেই তিনি সোচ্চার হয়েছেন। শুধু তাই

নয়, তিনি নারীদেরকে সচেতনভাবে অধস্তনরূপে চিত্রিত করেছেন। রুশো নাগরিক বোঝাতে সর্বদা পুরুষ জাতিকে নির্দেশ করেছেন।[১১৯] তিনি মনে করেন নারীরা সর্বদা পুরুষদের অধস্তন হয়ে থাকবে। কারণ নারীর জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতা সবকিছুই পুরুষ অপেক্ষা নিম্নতর। নারীর কাজ হলো গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলে। সংসারের শ্রীবৃদ্ধি, সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন ইত্যাদি নারীর কর্তব্যকর্ম মনে করেন রুশো। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচলিত শিক্ষা কিংবা উচ্চশিক্ষা নারীর জন্য নয়। নারীর শিক্ষা হবে গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা।[১২০] কাজেই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা সমর্থন রুশোর কাছে লক্ষ করা যায়নি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী নাগরিকত্বের দায়িত্ব ও গুণাবলীসমূহ কেবল পুরুষ জাতির প্রতিই বিস্তৃত হওয়া উচিত। রুশোর সমতাভিত্তিক সমাজে নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি তা বৈষমমূলক এবং এখানে নারী নাগরিকের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হয় না। তিনি মনে করেন নারী-পুরুষের মাঝে প্রকৃতিগতভাবেই অসাম্য রয়েছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় রুশোর কাছে পুরুষরাই নাগরিক এবং নারীরা অ-নাগরিক।[১২১]

নাগরিকতা সম্পর্কে রুশোর মত পর্যবেক্ষণে যে অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো– তিনি মনে করেন সক্রিয় নাগরিকতা ও গার্হস্থ্য কার্যের মধ্যে একটি বিপরীতার্থক সম্পর্ক রয়েছে। যিনি গার্হস্থ্য কার্যাবলি সম্পাদন করবেন তিনি নাগরিক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবেন না। রুশোর সাম্যবাদী ভাবনায় এধরণের লিঙ্গবাদী অসাম্য চিন্তার পূর্ব অনুরণণ মেলে এরিস্টটলের চিন্তায়। এরিস্টটল তাঁর *পলিটিক্স* গ্রন্থে 'দাসতত্ত্বে'র সমর্থনে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার অন্যতম কারণ হলো দাসপ্রথা গণতান্ত্রিক চর্চাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রাসঙ্গিক। গণতন্ত্র চর্চা বলতে এক্ষেত্রে বোঝানো হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ। অবশ্য কেবল এরিস্টটল নয়, প্লেটোও মনে করেন একটি সমৃদ্ধ জীবনব্যবস্থা রাজনৈতিক জীবন ও রাজনীতি চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় দাসেরা। যারা তাদের প্রভুদের গার্হস্থ্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান দ্বারা প্রভুদের বাহ্যিক পরিমণ্ডলে তথা নগররাষ্ট্রের কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সুযোগ সৃষ্টি করে; নাগরিকগণ এসেম্বলি অথবা জনসম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা বলা যেতে পারে যে, গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের পাশাপাশি আধুনিক চুক্তিবাদী দার্শনিক রুশো: সমতার পক্ষে কথা বলেছেন কিন্তু দাসপ্রথার সমর্থন কিংবা পুরুষতান্ত্রিকতার সমর্থন দ্বারা একদিকে তাঁরা ধনী-গরিব বৈষম্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, অন্যদিকে লিঙ্গবাদী বৈষম্যের প্রকাশ দ্বারা প্রকারান্তরে অসমতাই চিত্রিত করেছেন। এধরণের মতের সমর্থন পাওয়া যায় জনাথন ভলফের কাছে। তাঁর মতে, "The Greeks took for granted that democracy was consistent with Slavery, Rousseau that it was consistent with sexual inequality, and wollstonecraft that it was consistent with the disfranchisement of the poor". [১২২]

রুশোর সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি তাত্ত্বিকভাবে সুমধুর সন্দেহ নেই। অন্তত সুসংহত বা সুসংবদ্ধ একটি সমাজের জন্য সাধারণ ইচ্ছার ধারণাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সমকালীন বাস্তবতায় এটিও বিবেচনার প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমতা অর্জন একটি রাষ্ট্রের সমতা প্রতিষ্ঠায় একমাত্র নিয়ামক নয় যা দ্বারা সাধারণ ইচ্ছাকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও একটি রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর মাঝে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, নৃ-তাত্ত্বিক, দার্শনিক কিংবা জাতিগত মতভেদ থাকতে পারে। এতসব মতভেদ অতিক্রম করে কোনো অভিন্ন সাধারণ ইচ্ছার অধীনস্থ হওয়াটা দুরুহ। তাছাড়া সমতার বিচারে এটাও বিবেচ্য হওয়া উচিত যে, প্রত্যেক জনগণের প্রয়োজন বা চাহিদা অভিন্ন হবে না। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রণীত কর্মসূচিও ভিন্ন হওয়া উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পীড়িত এলাকায় জনগণের জন্য প্রণীত কর্মসূচী আবার উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জন্য প্রণীত কর্মসূচী একসূত্রে প্রোথিত হতে পারে না। আবার বাংলাদেশের নাগরিকদের যে সকল নাগরিক সুবিধা উপভোগের সুযোগ রয়েছে তা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। এধরণের

প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশের জন্মসূত্রে নাগরিক যে সকল অধিবাসী রয়েছে তাদের সাধারণ ইচ্ছার বিষয়টি এত সহজতর হবে না। এভাবে সমকালীন বৈশ্বিক বাস্তবতায় যেখানে দেশে দেশে উদ্বাস্তু বা শরাণার্থী সমস্যা কিংবা জলবায়ুগত বিপর্যয় কিংবা অর্থনৈতিক মেরুকরণের কারণে সাধারণ ইচ্ছার ব্যবহারিক বাস্তবায়নযোগ্যতা একটি বড় প্রশ্ন এবং একই সাথে সমতার বিষয়টিতেও প্রশ্ন থেকে যায়।

রুশোর স্বাধীনতা তত্ত্বের সমালোচকগণ মনে করেন স্বাধীনতাকে আনুগত্যের সাথে সমন্বিত করা বস্তুতপক্ষে ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন– আইন প্রণয়ন দ্বারা ব্যক্তি তার স্বাধীনতার প্রকাশ ঘটায় অথবা আইনের প্রতি মান্যতা দ্বারা সে স্বাধীনতাকে উপভোগ করে। আবার সংখ্যালঘু তথা ভিন্নমত পোষণকারীর ইচ্ছা যদি আইনে প্রকাশিত না হয় তাহলে তাকে আইন মান্য করতে বাধ্য করাটা তার অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ বলা যেতে পারে? আর বলপ্রয়োগ বা বাধ্যতার দ্বারা যদি স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে কি একথা বলা যায় যে স্বাধীনতার সাথে শক্তিপ্রয়োগ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত?

রুশোর স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ধারণার সাথে কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া যায় জে. এস. মিলের সাথে। মিল যদিও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের পক্ষপাতী নন, তবে তিনি এটা মনে করেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করা যুক্তিযুক্ত।[১২৩] মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যদি কোনো জনগোষ্ঠীর ক্ষতি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে সেসব ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মত প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আবার মত প্রকাশের স্বাধীনতার অজুহাতে যদি ব্যক্তি মিথ্যা বা গুজন রটনা করে সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে তাহলে তাতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণারোপ হতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসির নগরে উস্কানিমূলক গুজব সৃষ্টি ও সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রকাশ দ্বারা সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছিল। এধরণের আরো বহুবিধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে যা সামাজিক শৃঙ্খলা ও জনগণের শান্তি বিনষ্ট করে। সে বিবেচনায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা অন্য জনগণের ক্ষতি বা হুমকির কারণ হয় তবে তা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এ ধরণের ক্ষেত্রে আইনের শক্তি প্রয়োগ যদি সামাজিক শৃঙ্খলার সহায়ক হয় তবে আইনি শক্তি প্রয়োগ গ্রহণযোগ্য হবে। এ প্রসঙ্গে ভলফের মত স্মরণযোগ্য। ভলফ মনে করেন সংখ্যালঘুদের প্রতি রুশোর চিন্তাভাবনা তথা দৃষ্টিভঙ্গি পছন্দ করা কঠিন।[১২৪]

রুশোর স্বাধীনতা ও সমতা সংক্রান্ত আলোচনার সাথে আমরা সাদৃশ্য দেখতে পাই ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেতা রোনাল্ড কার্টল্যান্ডের সাথে। কার্টল্যান্ড বলেন, "What we must settle at once is whether we rate freedom above equality."[১২৫] তিনি মনে করেন সমতার সাথে যুক্ত রয়েছে অধীনতা এবং নিপীড়ন। সহিষ্ণুতা এবং সমন্যায্যতা কেবল গণতন্ত্রের সম্ভব। যদিও ক্যারিট মনে করেন, স্বাধীনতা এবং সমতার মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে এবং এদের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না। তাই তিনি দাবি করেন স্বাধীনতা সর্বদা সমান হওয়া উচিত এবং এ সমতা সম্ভব সমান রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয়ে।[১২৬]

যদিও নৈতিকতাবোধের অভাবের কারণে কিংবা নৈতিক চেতনা জাগরিত না হওয়ায় কোনো নাগরিককে রাষ্ট্র বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে না ঠিকই, তবে (ধর্মবিশ্বাস রূপে নয়), সামাজিক জোট ধারণ করার ব্যর্থতার দরুন একজন নাগরিকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় আইন ও নীতিকে অমান্য করার কিংবা মান্য করতে ব্যর্থ হওয়ায়, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নাগরিকের আত্মত্যাগে ব্যর্থ হওয়ার দরুন রাষ্ট্র নাগরিককে বহিষ্কার করতে পারে। আবার রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক রাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রথমে স্বীকার করলেও পরবর্তীতে অস্বীকার করে অর্থও হলো আইন অমান্য করা। একে রুশো মনে করেন নাগরিক প্রথমে আইনকে মান্য করলে পরে আইনের সামনে মিথ্যাকে উচ্চারণ করেছে। সমাজের একজন সদস্য হিসেবে এটি হচ্ছে তার গর্হিত অপরাধ। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অধিকার আছে নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড বিধান করা।[১২৭]

রুশোর কাছে জনগণের রাজনৈতিক প্রশ্নটি কেবলমাত্র প্রজার জীবনের নিরাপত্তা কিংবা সার্বভৌমের চরম কর্তৃত্ব স্থাপনের দ্বারা বিচার্য হয়নি বরং রুশোর মতো এবং সার্বিক কল্যাণকে উদ্দেশ্যরূপে গণ্য করেছেন এবং রাষ্ট্র ন্যায্যতা ও সার্বিক কল্যাণ যদিও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে না পারে তবে জনগণের আনুগত্য থাকবে না।[১২৮]

রুশো যদিও মনে করেন যে জনগণের প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীনতা ছিলো, তবে জনগণের জন্য সত্যিকার স্বাধীনতার উদ্ভব ঘটে যখন তারা স্বাধীনভাবে তার মত প্রকাশ করতে পারে এবং সেজন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র।[১২৯] রুশোর রাজনৈতিক দর্শনে সর্বোচ্চ শক্তি বৈধ এবং সমাজে নিরাপত্তার নিশ্চয়তাদানকারী হিসেবে কাজ করে সে শক্তিই আবার অধিকার ও ন্যায়বিচারের সমতা নিশ্চিত করে; এভাবে এ শক্তি রুশোর রাষ্ট্রদর্শনে স্বাধীনতার জামিনদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তিনি নিজেই বলেছেন জনগণ সামাজিক চুক্তির দ্বারা যা হারায় তা হলো প্রাকৃতিক স্বাধীনতা এবং যা সে পায় তাহলো অনিয়ন্ত্রিত অধিকার; যা সে অর্জন করে তা হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা (civil freedom) এবং ব্যক্তি যা কিছুর অধিকারী তার মালিকানা।[১৩০] রুশোর এ বক্তব্য থেকে বলা যায় তিনি ব্যক্তির প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন রাজনৈতিক সমাজে এবং সাধারণ ইচ্ছা ও নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারা রাজনৈতিক (civil) স্বাধীনতার রূপদান করেন। রুশোর স্বাধীনতার ধারণায় রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত সার্বিক বা সামষ্টিক স্বার্থ এবং ব্যক্তিক ইচ্ছা বিশেষ ইচ্ছার সাথে যুক্ত।

অধিকার সম্পর্কে রুশো

রুশো মনে করেন, সামাজিক চুক্তি সার্বভৌমের হাতে তার প্রজাসাধারণের ওপর যে অধিকার প্রদান করে, সে অধিকারের সীমানা সামাজিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করতে পারে না। রুশো দাবি করেন, একজন নাগরিকের কোনো কাজ যদি সমাজের ক্ষতির কারণ না হয়, তবে সে কাজের কোনো জবাবদিহি নাগরিক সার্বভৌমকেও দিতে বাধ্য নয়। রুশোর এই দাবিকে যদি আমরা ধর্মের প্রশ্নে প্রয়োগ করি তাহলে বলা যায় একজন নাগরিক যে ধর্ম পালন করছে সে ধর্ম বিশ্বাসে রাষ্ট্রের ততক্ষণ পর্যন্ত উদ্বেগ বা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিশ্বাস অন্য নাগরিকের দায়িত্ব পালনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণ হয়। যদি তেমনটা হয় তবে রাষ্ট্রের উদ্বেগ থাকতে পারে। রাষ্ট্রে একজন নাগরিক ইহজাগতিক বিষয়ে মাথা ঘামাতে পারে, তবে পারলৌকিক বিষয়ে রাষ্ট্র মাথা ঘামায় না, কাজেই বলা যায় রাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের জন্য প্রতিবন্ধকতার কারণ না হলে রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাধীনতা কিংবা অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

রুশো এমন একটি রাজনৈতিক সমাজ গঠন করেছেন যেখানে মানুষ দাস নয় বরং সক্রিয় নাগরিক হিসেবে, যারা নিজেদের প্রতি মান্যতা প্রদর্শন করার দ্বারা অর্থাৎ আইন মান্য করার দ্বারা সার্বভৌমকে মান্য করে। ওয়াট মনে করেন, রুশোর প্রজারা সার্বভৌমের প্রতি সম্মতি এবং বিশ্বাস প্রদান দ্বারা সার্বভৌমে পরিণত হলো।[১৩১]

রুশো জনগণকে ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্বের দ্বারা স্বাধীনতা উপভোগ্য করে তুলেছেন। বিপরীতে হবসের দর্শনে সার্বভৌমের চরম ক্ষমতা এবং সদস্যদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা প্রকাশ পায়। জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকার করে কিন্তু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক নয়। হবসের কাছে রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি স্তরায়িত ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে রুশোর ক্ষেত্রে এ ক্ষমতার এ সম্পর্ক পারস্পরিক।

রুশো ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর এক প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। নিয়ন্ত্রণ আরোপ দ্বারা তিনি জনৈতিক বা প্রথাগত নৈতিকতার (public বা customary morality) ওপর জোরারোপ করেন, যা দ্বারা জনগণের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের স্থানটি রক্ষিত হয় না। ব্যক্তিক রুচি বা অপ্রচলিত কোনে বিধিকে তিনি যেভাবে

নিয়ন্ত্রিত করেছেন তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। যদিও এর বিপরীত চিত্রটি হলো সামষ্টিকতার ওপর গুরুত্বারোপ। জননৈতিক বা প্রথাগত নৈতিকতার প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানের ফলে রুশোর এ চিন্তা মিলের 'জীবনযাপনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা'-র (experiments of living) বিরোধী। একে গ্রহণ করতে হলে আমাদের ব্যক্তিক জীবনাচরণকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

রুশোর স্বাধীনতার ধারণায় ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হলেও এতে স্বাধীনতার যেসব সদর্থক ব্যঞ্জনা রয়েছে তা দ্বারা সামষ্টিকতাবাদ যেমন সংরক্ষিত হয়েছে, তেমন জাতীয়তাবাদের বিকাশেও তার এই সামষ্টিকতাবাদের মেলবন্ধন ঘটেছে। তবে স্বাধীনতা কেবল ব্যক্তিক চাওয়া পাওয়ার স্ফুরণ ঘটানোকে বোঝালে তা আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, যার বিরোধিতা করেছেন তিনি। এটা দাবি করা যায় যে রুশোর স্বাধীনতার ধারণায় ব্যক্তির উপভোগ কিংবা কেবল চাওয়া-পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ নয়, তার চেয়েও গুরুত্ববহ হলো ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ যা ব্যক্তিকে স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগী করে তোলে। সে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ উৎসারিত হবে যুক্তি ও পরার্থপরতা দ্বারা। স্পষ্টতই, মিলের জীবনযাপনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এর পরিবর্তে রুশো জীবনযাপন (living the life)-কে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেন। আর এধরণের জীবনযাপন সম্ভব সুশীল সমাজ বা রাজনৈতিক সমাজে। গ্রিমসলি মনে করেন, হবস যেখানে রাজনৈতিক আনুগত্যকে শক্তভিত দিতে চেয়েছেন তার বিপরীতে রুশো চেয়েছেন বিধিবদ্ধ বৈধ বা আইনগত দাবির দ্বারা স্বাধীনতার চর্চাকে সমন্বিত করতে।[১৩২]

হবস প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ তথা ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের অবস্থাকে সকল অশান্তির জন্য দায়ী করেছেন। বিপরীতে রুশো মনে করেন মানুষের ব্যক্তিগত নির্ভরতা অর্থাৎ একজন ব্যক্তির অন্যের ওপর নির্ভরশীলতাই অশান্তির কারণ।[১৩৩] কেননা এতে সার্বিক স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা থাকে না, থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের চরিতার্থ করার প্রবণতা। তাহলে বলা যায়, হবস বা রুশোর কাছে জনগণের ব্যক্তিগত স্বার্থ-নির্ভরতা কাটিয়ে একটি নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সার্বভৌমের ভূমিকা রয়েছে। রুশো তাঁর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে ব্যক্তিগত নির্ভরশীলতাকে দায়ী করেছেন। এর কারণ তিনি মনে করেন বস্তুগত নির্ভরতা নৈতিক বা সামাজিক দিক থেকে ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু ব্যক্তিক নির্ভরতা বা মানুষের ওপর নির্ভরশীলতা যদি অনিয়ন্ত্রিত হয় তবে তা সমাজকে বিপন্ন করতে পারে।[১৩৪] এভাবে রুশো স্বাধীনতার সাথে নির্ভরশীলতা এবং অনির্ভরশীলতার যোগসূত্র সৃষ্টি করে দেখান কীভাবে সামাজিক শৃঙ্খলা বা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক সমাজে মানুষ স্বাধীন হতে পারে, অপেক্ষাকৃত মহত্তর, উদারতাবাদী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। রুশোর স্বাধীনতা তত্ত্বে আরো লক্ষনীয় স্বাধীনতার প্রকৃতি ও স্বরূপ বিচারে জনগণই এখানে সার্বভৌম আর হবসের কাছে জনগণ সার্বভৌমের অধীন। হবসের স্বাধীনতার ধারণায় স্বাধীন ইচ্ছা অপেক্ষা আত্মস্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ, তাই নৈতিকতা তাঁর কাছে রুশোর মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিন্টজ মনে করেন, হবসের কাছে ইচ্ছা হলো ভয় ও আশার মধ্যেকার দ্বন্দ্বে বিচারের সর্বশেষ কাজ।[১৩৫]

রুশোর কাছে নাগরিক অধিকারের বিষয়টি মুখ্য, কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকারব্যবস্থা নয়। তাঁর কাছে ম্যাকিয়াভেলি বা হবসের মতো রাজা বা শাসক আইনের উর্দ্ধে নয়। তাঁর কাছে রাষ্ট্র কোনো স্বনিয়ন্ত্রিত বা স্বপরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা কোনো সর্বোচ্চ সংগঠন নয়। রাষ্ট্রের চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের কাছে নিরাপদে সমর্পন করা যেতে পারে বলে রুশো মনে করেন।[১৩৬] রুশোর দর্শনে স্পষ্টত এক প্রকার গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি দৃশ্যমান।

হবসের সার্বভৌম এবং রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মাঝে আরেকটি পার্থক্য হলো হবসের সার্বভৌম হলো ক্ষমতার প্রকাশ এবং এর সাথে পুরোপুরি যুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি। সার্বভৌমের সাথে যুক্ত রয়েছে রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, রাজতান্ত্রিক সরকার। তাই এটি ইচ্ছামাফিক জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অধস্তন করতে পারে। পক্ষান্তরে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা কোনো ক্ষমতার নয়– জনগণের স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের প্রকাশ, এটির সাথে

ক্ষমতার সংযোগ অপেক্ষা জনগণের সংযোগ মুখ্য। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাকে প্রাথমিকভাবে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত মনে হলেও তিনি জনগণের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্য হবসের সার্বভৌমের মতো কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী। রুশো মনে করেন ক্ষমতার হস্তান্তর কিংবা প্রতিনিধিত্ব হতে পারে কিন্তু ইচ্ছার হস্তান্তর বা প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়।[১৩৭] ভিনচ মনে করেন, হবস প্রতিনিধিত্বশীলতার ধারণাকে সমর্থন করেছেন, কারণ বহুসংখ্যক জনগগোষ্ঠীকে একত্রিত রাখা বা সম্মিলিতভাবে বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন প্রতিনিধি কিংবা প্রতিনিধিত্বের।[১৩৮]

উল্লেখ্য, রুশো যে স্বাধীনতার উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি নাগরিকদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, নাগরিকদের স্বাধীন হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে হবে (অর্থাৎ প্রদান করা হবে)। এ বিষয়ে তিনি *A Discourse on Political Economy* তে উল্লেখ করেছেন এভাবে–

"There can be no patriotism without liberty, no liberty without virtue, no virtue without citizens; create citizens, and you have everything you need; without them, you will have nothing but debased slaves, from the rulers of the State downwards. To form citizens is not the work of a day; and in order to have men it is necessary to educate them when they are children."[১৩৯]

রুশোর মতে, আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা নাগরিকদের প্রাথমিক দায়িত্ব, সার্বভৌমের কাজ যদিও আইনের সাথে সম্পর্কিত তবে কোনো আইনই আইন হবে না যদি তা জনগণ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত বা সমর্থনযোগ্য না হয়। তিনি আরো মনে করেন কোনো জনপ্রতিনিধি বা প্রতিনিধিত্বকারী জনগণের প্রতিনিধি হতে পারবে না।[১৪০] রুশোর এ বক্তব্য যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে আধুনিককালের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের যে ধারণা অথবা কোনো গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের যে দাপট বা আমলাতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা এর কোনোটিই রুশোর রাজনৈতিক দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং বিরোধী। রুশোর এধরণের মত থেকে আমরা জনগণের অধিকার ও সরকারের অধিকারের মধ্যে তফাৎ পাওয়া যায়।

রুশোর সরকারব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক (representative) সরকারের বিপক্ষে তাঁর অবস্থান হলেও তিনি অংশগ্রহণমূলক (participatory) সরকারের ততটা বিরোধী নন। আধুনিককালের গণতন্ত্রের যে ধারণা (প্রতিনিধিত্বমূলক) তার সাথে রুশো একমত নন, বরং অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে সমর্থন দ্বারা তিনি প্রাচীন এথেনীয় গণতান্ত্রিক ধারার প্রতি সমর্থন দিলেন। প্রাচীন গণতন্ত্রের যে ধারা তাতে জনগণ এমন একটি অংশ রূপে (body) কাজ করে যে একই সাথে নির্বাহী এবং বিচারিক কার্য সম্পাদন করে।[১৪১] এভাবে রুশো এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যা মূলত জনসম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং গণতান্ত্রিক প্রকৃতির অনুসারী। যদিও সাধারণ ইচ্ছার প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন কিন্তু এর মূল্যবিচার সম্পর্কে সর্বদা আস্থাশীল ছিলেন না। ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি সাধারণ ইচ্ছার সিদ্ধান্তকে সঠিকভাবে উপলব্ধি বা বিচার নাও করতে পারে। সে সংশয়ও রুশো রেখেছেন। তাঁর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে জনগণের সার্বিক মঙ্গলের জন্য, সামষ্টিক কল্যাণের জন্য যেটা অনুঘটকরূপে কাজ করে তা হলো রাজনৈতিক শিক্ষা। হোকাটও এমন মত পোষণ করেন এবং তিনি মনে করেন রুশোর দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্মতি নয়, বরং রাজনৈতিক শিক্ষা যা মানুষকে জনকল্যাণের (public good) বা গণ-ভালর পথে পরিচালিত করে।[১৪২]

এ বক্তব্য দ্বারা তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন শিশুদেরকে যদি শৈশব থেকে নৈতিকতার এমন পাঠ দেওয়া হয় যাতে সে তার ব্যক্তিস্বার্থে নয়,সকলের স্বার্থে ভাববে তবে সে একজন আদর্শ নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে, ব্যক্তির স্বার্থ সামষ্টিক স্বার্থের সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়ে উঠবে না। যদিও রুশো যে প্রকৃতিবাদী

শিক্ষাদর্শনের সমর্থন করেছেন তাতে শিশুবাধা-বন্ধনহীন পরিবেশে অবাধ বিচরণে বেড়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা তাঁর। অন্যদিকে শিশুকে শৈশব থেকে জনকল্যাণের শিক্ষা প্রদান যা মূলত তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রদত্ত হবে। শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রটি প্রশ্নসাপেক্ষ। এতে শিশুর ইচ্ছার স্বাধীনতা নয় বরং ইচ্ছা ও মনন অপরের দ্বারা গড়ে ওঠে, যা প্রকারান্তরে সার্বভৌমের পক্ষে সহায়ক হয়।

হবস, লক এবং রুশোর স্বাধীনতার ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণে বলা যায়, রুশোর স্বাধীনতা তত্ত্বের নৈতিক ভিত্তি এবং সামষ্টিক চেতনা উভয়ই অত্যন্ত সুদৃঢ়। পক্ষান্তরে হবসের স্বাধীনতার ধারণায় মূল চালিকাশক্তি হলো সার্বভৌম এবং তার কাছে নিরাপদ জীবনপ্রাপ্তির সন্ধানে আনুগত্য প্রকাশ। তাছাড়া হবসীয় স্বাধীনতা ধারণায় সামষ্টিক চেতনা বেশ ম্রিয়মান, লকের কাছে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্তিই স্বাধীনতার একটি বড় অনুষঙ্গ। রুশোর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার সাথে সামষ্টিক অধিকারের মেলবন্ধনটি চমৎকার। তিনি মনে করেন, কোনো রাষ্ট্রে এমন কোনো মৌলিক আইন বা সামাজিক চুক্তি নেই যাকে রদ করা যায় না। সকল নাগরিক যদি সাধারণ ঐক্যমতের ভিত্তিতে কোনো চুক্তি ভঙ্গ করতে চায় তবে সে ভঙ্গ করাটাও বৈধতা লাভ করে।[১৪৩] রুশোর এ বক্তব্যে একদিকে স্বাধীনতার আবার অন্যদিকে নাগরিক ঐক্যমত বা সামষ্টিক ঐক্যবদ্ধতার দিকটি চিহ্নিত করা যায়। নাগরিকদের সম্মতিক্রমে চুক্তিভঙ্গ করা হলো সে ভঙ্গের বিষয়টিকে তিনি বৈধতা দিয়েছেন।

রুশো ছিলেন স্বাধীনতার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। স্বাধীনতা, ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা কিংবা স্বয়ংসম্পূর্ণতা রক্ষায় তিনি রাজতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সামাজিক কাঠামোসমূহের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতার সাথে সামষ্টিক স্বাধীনতার সমন্বয় করেছেন এবং কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত করেছেন স্বাধীনতার ধারণা। তিনি হবসের মতো চরম রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন না, বরং জবাবদিহিতার পক্ষে ছিলেন। রুশো ব্যক্তির স্বাধীনতা অবশ্যই সমর্থন করতেন, তবে তিনি অবাধ স্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণেও দ্ব্যর্থহীন অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। স্টারোবিনস্কি মনে করেন, হবসের বিপরীতে রুশো রাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক সংগঠনসমূহকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করেছেন। যে কারণে তাকে ফরাসি বিপ্লবের পথপ্রদর্শকরূপে গণ্য করা হয়।[১৪৪]

আলফ্রেড কোবান বলেন, রুশো ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রভাবে তুলনীয় বস্তু মনে করেছেন এবং ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে তিনি দৃঢ় সমতার ভিত্তিতে একটি অন্যটির বিকল্পরূপে গ্রহণ করেছেন।[১৪৫] একজন জ্ঞানালোক যুগের দার্শনিক হিসেবে রুশোর উদ্দেশ্য সবসময় ব্যক্তি এবং তার স্বাধীনতা। তবে এটাও সত্যি যে ব্যক্তির এ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে কমিউনিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র বা কমিউনিটি অবশ্যই এ উদ্দেশ্য পূরনের পথে একটি উপায় মাত্র। রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে ব্যক্তির স্থান। রুশো মনে করেন ব্যক্তির অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কমিউনিটি যদি সুসংহত না হয় তাহলে তা ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্য কাজ করতে পারবে না। রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির অগ্রগণ্যতা পাওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। রাষ্ট্র এবং কমিউনিটি (সমাজ অর্থে) ব্যক্তির নৈতিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার স্বাধীনতার সুরক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। রুশো বিশ্বাস করতেন যে, যদি কমিউনিটি ব্যক্তিকে নৈতিক মুক্তির সম্ভবনা এবং স্বাধীনতা প্রদান সুসংহত না করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট যৌক্তিক অগ্রগণ্যতা রয়েছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে। কিন্তু এই অগ্রগণ্যতা তাহলেই যুক্তিসিদ্ধ (justifiable) হয় যখন রাষ্ট্র ব্যক্তির নৈতিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে সক্রিয়ভাবে কাজ করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা নিরাপদ করে। এ প্রসঙ্গে কোবান বলেন:

> “Rousseau believes that unless the community so organized as to endow man with the possibility of moral freedom and liberty he will know neither of these, and that therefore the state necessarily has a certain logical priority to the individual. But this priority is justifiable

only in so far as the state does actively develop the individual's moral personality and secure his liberty; while Rousseau can afford to attribute considerable scope to the idea of the state, because he does not allow it any end other than the moral and material well-being and happiness of the individuals who compose it."[১৪৬]

রুশোর আশা রাষ্ট্রের মালিকানা যেন হয় সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যাপক ও প্রবল এবং নাগরিকদের সম্পত্তি যেন হয় যতটা সম্ভব স্বল্প ও সীমিত। সম্পত্তির সমতার বিষয়ে রুশোর স্পষ্ট অবস্থান- কোনো ব্যক্তিরই অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা নেই। সম্পত্তির মালিকানার বিষয়ে তিনি বলেন কোনো নাগরিকের এতটা প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া উচিত নয়। যাতে সে অন্য ব্যক্তিকে কিনতে পারে এবং একজনের এতটা গরীব হওয়া উচিত নয়, যাতে সে নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। রুশোর এ বক্তব্যে আমরা দুটি দিক লক্ষ করি– একটি হলো সম্পত্তির অবারিত মালিকানা নয়, এবং অন্যটি হলো সম্পত্তির মালিকানাতে ব্যক্তির অর্থনৈতিক এবং নৈতিক দায়, অর্থাৎ তিনি পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে শোষণের জন্য দোষী করে দারিদ্রকে দায়মুক্তি দিতে চাননি। সে সাথে ন্যূনতম সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ দ্বারা ধনী-গরিবের মাঝে একটি নৈতিক মানদণ্ড তৈরি করেন, যাতে একে অন্যের কাছে পণ্যে পরিণত না হয়, দাসত্বে আবদ্ধ না হয়। রুশো অনুসরণে বলা যায় দারিদ্র্য হলো দাসত্ব। দারিদ্র স্বাধীনতা নষ্ট করে। সে স্বাধীনতার হরণ বহুবিধ হতে পারে। যেমন– অর্থনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি। তাঁর এ চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী বক্তব্যে, যেখানে তিনি দাবি করেন কোনো ব্যক্তিরই অন্যের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা বা অধিকার কোনোটিই নেই।

পূর্বেই আমরা বলেছি দারিদ্র ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট করে, ব্যক্তিকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই রুশো মনে করেন, স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার অর্থ হলো মনুষ্যত্বের বিনাশ করা। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হারায় অর্থাৎ স্বাধীনতাবিহীন ব্যক্তি মানুষের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় না। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও দাসত্ব-মুক্তির জন্য সাম্যাবস্থা জরুরী এবং এই সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠায় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তিই নয়, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী ও স্থায়ীকরণের জন্যও সাম্যাবস্থা অপরিহার্য। অন্যথায় বিপ্লব-বিদ্রোহ, অসন্তোষ–অভ্যুত্থান রাষ্ট্রের জন্য অনিবার্য। তবে রুশো রাষ্ট্রের পরিচয় নির্ধারণে যুদ্ধ বা শক্তি প্রদর্শন কিংবা অর্থনীতি বা বাণিজ্য অপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও প্রাচুর্যকে।

চুক্তিবাদী রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব লক্ষ করলে বোঝা যায় এতে তিনি কীভাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকাররের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। যেমন– তিনি তার চুক্তিতত্ত্বে উল্লেখ করেছেন শাসন শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বরং শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হবে জনগণের সাধারণ ইচ্ছা, জন-মানুষের শক্তি অর্থাৎ তাদের সম্মতি বা ইচ্ছার প্রতিই রুশো শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন। এর দ্বারা তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগের যেমন সুযোগ দিলেন, আবার সমাজকে স্বীকার করলেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক শক্তিরূপে। এ সমাজে ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা লুপ্ত হলো, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হলো নিয়ন্ত্রিত ও নৈতিক স্বাধীনতা যা একইসাথে যুক্তিবাদী, পরার্থবাদী এবং সামগ্রিক। সমাজ এবং ব্যক্তির পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক রুশোর দর্শনে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বাধীনতা প্রদান করেছে, আবার পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করার দ্বারা রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তির নৈতিকতার উন্মেষ ঘটে। এ উন্মেষ তাকে সাহায্য করে সমতা বিধানে কাজ করতে।

বস্তুতপক্ষে রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* অধিকার, স্বাধীনতা ও সমতার একটি দলিল। যাতে শাসক শ্রেণি কিংবা কোনো গোষ্ঠী কিংবা পুঁজিপতির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। তিনি ভেবেছেন আপামর জনগোষ্ঠীকে নিয়ে। হবস এবং রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় মৌলিক পার্থক্য হলো মানবপ্রকৃতি এবং রাজনৈতিক সমাজ সম্পর্কে তাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি

সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে বিরাজমান। হবসের মতে রাজনৈতিক সমাজের অস্তিত্বহীনতা হলো মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং সিভিল সোসাইটি (রাজনৈতিক সমাজ) হলো সেই অর্থে মানুষের প্রাকৃতিক অবস্থার সমাপ্তি। রুশো প্রস্তাব করেছিলেন দায়বদ্ধতার আকারগত বা প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি, যা হবসের কাছে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। রুশো প্রাকৃতিক এবং নৈতিক স্বাধীনতার মাঝে যে সুস্পষ্ট বিভক্তি টেনেছেন হবসের স্বাধীনতার ধারণা থেকে তা ভিন্ন। রুশোর নাগরিকত্বের ধারণা গুরুত্বারোপ করে সার্বিক ও বিশেষের মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তির প্রতি।[১৪৭] কেবলমাত্র আইনগত বাধ্যবাধকতা কিংবা বৈষয়িক স্বার্থের সন্তুষ্টি বিধানই রুশোর রাজনৈতিক সমাজের উদ্দেশ্য নয় বরং ব্যক্তিকে সমষ্টির সাথে যুক্ত করে অন্তরস্থিত মহত্ত্ববোধ সমাজস্থিত বন্ধনে রূপ দিতে চেয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, রুশোর স্বাধীনতাভাবনা যতটা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে লালন করে প্রকৃত বিচারে তা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠে সামষ্টিক কল্যাণের স্বার্থে টেকসই ও নিরাপদ রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়। রুশোর স্বাধীনতা– চিন্তায় মূলত কর্তৃত্ব নয়, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব অধিক এবং তিনি হবস অপেক্ষা অধিকতর সফলভাবে স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। পক্ষান্তরে হবস চেয়েছেন স্বাধীনতার দ্বারা এক প্রকার কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে এবং সীমিত স্বাধীনতার সুযোগ দানের মাধ্যমে ব্যক্তির নিরাপদ রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। গথিয়ারের মতে, হবসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের এবং জনগণের নিরাপত্ত প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই লক্ষ্যে হবস রাষ্ট্রের ন্যায়পরতা এবং কল্যাণকামিতা অপেক্ষা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তকে মুখ্য মনে করেছেন।[১৪৮] যদিও হবস জনগণের ভয়ের সাথে সম্মতিকে যুক্ত করে সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্যের বৈধতা দিয়েছেন তথাপিও বলা যায় তাঁর স্বাধীনতার ধারণার সাথে ভীতির প্রশ্নটি জড়িত। ভীতি নিরসনের সাথে যুক্ত রয়েছে আইনের শাসন। কাজেই বলা যায় হবসের প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ নাগরিক হওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজে পদাপর্ণের দ্বারা যে মুক্তির স্বাদ লাভ করে তার মাধ্যমেই মূলত তারা স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে। আর হবসের স্বাধীনতা কোনো ব্যক্তিক স্বাধীনতা নয় যা লকের কাছে উপস্থিত, হবসের কাছে স্বাধীনতার সাথে যুক্ত কমনওয়েলথ। হবসের দর্শনে সার্বভৌমের চরম ক্ষমতার প্রতি সমর্থনের কারণরূপে বলা যায়, মানবচরিত্রের নৈরাশ্যবাদী রূপ তাঁকে ব্যক্তির ক্ষমতা ও অধিকার সমর্পনকে সমর্থন করেছে। রুশোর দর্শনে ব্যক্তি একইসাথে প্রজা হিসেবে দায়বদ্ধ আবার শাসক হিসেবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনাকারী। রুশোর স্বাধীনতাভাবনায় কর্তৃত্ব বা ভয় নয়, নৈতিকতাই বড় চালিকাশক্তি। এই নৈতিকতার মূল্যবোধ একদিকে জনগণের সামাজিক, রাজনৈতিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকে ভাবতে শেখায়, অপরদিকে ব্যক্তির নিজের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতাকে উপভোগ্য করে। একজন প্রজা বা ব্যক্তি বা নাগরিক যখন সামষ্টিক কল্যাণে কাজ করে সে মুক্ত এবং সে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা কোনো বাধ্যবাধকতার সম্মুখীন হচ্ছে না। অন্যথায় ব্যক্তিকে সামষ্টিক স্বার্থে কাজ করতে উদ্দীপন এবং শিক্ষা দেওয়া হবে। এভাবেই সম্ভবত রুশোর বিখ্যাত উক্তি "ব্যক্তিকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা হবে" এর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়, যা দ্বারা এটা বোঝানো হয় যে একটি রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি তার যা ইচ্ছা তা সে করতে পারে না। হবসের দর্শনে স্বাধীনতা ও কর্তৃত্বের মাঝে সমন্বয় ঘটেনি, বরং দূরত্ব লক্ষণীয়; পক্ষান্তরে রুশোর কাছে কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার সমন্বয় ঘটেছে, যাতে তিনি সার্বভৌমের সাথে প্রজাদের দূরত্বকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১. Andrez Rapaczynski, *Nature and Politics: Liberalism in the Philosophy of Hobbes, Locke and Rousseau*, Cornell University Press, Ithaca, 1987, p. 28.

২. Ronald Grimsley, *The Philosophy of Rousseau*, Oxford University Press, London, 1973, pp. 95-96.

৩. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Revised Edition, A. P. Martinich and Brian Battiste (eds.), Ch. XXI, Broadview Edition, Canada, 2011, p. 190.

৪. *Ibid*.

৫. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXI, p. 193.

৬. সদর্থক বা ইতিবাচক স্বাধীনতার (Positive freedom) ধারণাটি রাষ্ট্রচিন্তায় অপেক্ষাকৃত নতুন । সদর্থক স্বাধীনতা হলো কোনো কিছু করার ক্ষমতা। উনিশ শতকের দার্শনিকবৃন্দ– মূলত হেগেল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে হবস এ স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করেন। হেগেলীয় সদর্থক স্বাধীনতার ধারণাটি গ্রহণ করলে হবসের ক্ষমতা এবং স্বাধীনতার মধ্যকার এ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সদর্থক স্বাধীনতার এ ধারণাটি রাষ্ট্রদর্শনে নতুন এ কারণে যে নঞর্থক স্বাধীনতায় নিপীড়নের অনুপস্থিতি অর্থে স্বাধীনতার প্রকাশ আমরা প্রাচীন কাল থেকেই দর্শনে লক্ষ করি।

৭. Colin Bird, *An Introduction to Political Philosophy*, Cambridge University Press, 2006, p. 177.

৮. *Ibid*, p. 190.

৯. Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 21-31.

১০. Martine A. Bertman, "Equality in Hobbes, with Reference to Aristotle", *The Review of Politics*, Vol. 38, No. 4, Cambridge University Press, 1976, p. 536. https://www.jstor.org/stable /1406416

১১. Thomas Hobbes, *Leviathan*, p. 209.

১২. David P. Gauthier, *The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes*, Clarendon Press, Oxford, 1969, p. 139.

১৩. *Ibid*, pp. 40-41.

১৪. *Ibid*, p. 175.

১৫. Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Book III, Ch. I, Oxford University Press, New York, 1982, pp. 222-223.

১৬. *Ibid.*, p. 222.

১৭. Thomas Hobbes, *Leviathan*, p. 161.

১৮. John W. N. Watkins, *Hobbes's System of Ideas: A Study in the Political Significance of Philosophical Theories*, Hutchinson University Library, 2nd Edition, London, 1973.

১৯. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch.   , p. 196.

২০. John W. N. Watkins, "Liberty" in *Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays*, Cranston, M. W., and Peter, R. S. (eds.), Anchor Books, New York, 1972, pp.213-232.

২১. David Van Mill, "Hobbes' Theories of Freedom", *The Journal of Politics*, University of Chicago Press, Chicago, Vol. 57, No. 2, 1995, pp. 443-459.

২২. David Van Mill, "Civil Liberty in Hobbes's Commonwealth", *Australian Journal of Political Science*, Vol. 37, Issue 1, 2002, pp. 21-38.

২৩. Don Herzog, *Happy Slaves: A Critique of Consent Theory*, University of Chicago Press, Chicago, 1989, pp.   .

২৪. F. S. Mc Neilly, *The Anatomy of Leviathan*, Macmillan, New York, 1968.

২৫. J. R. Pennock, "Hobbes's Confusing "Clarity"- The Case of "Liberty"," *The American Political Science Review*, Vol. 54, No. 2, June, American Political Science Association, 1960, p. 429.

২৬. David Van Mill, "Civil Liberty in Hobbes's Commonwealth", *Australian Journal of Political Science*, vol. 37, Issue-1, 2002, p. 37.

২৭. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXI, p. 191.

২৮. Don Herzog, *Happy Slaves: A Critique of Consent Theory*, University of Chicago Press, Chicago, 1989, pp. 1675-1681.

২৯. F. S. McNeilly, *The Anatomy of Leviathan*, Macmillan, New York, 1968.

৩০. Jhon. W. N. Watkins, *Hobbes's System of Ideas: A Study in the Political Significance of Philosophical Theories*, Hutchinson University Library, 2nd Edition, London, 1973.

৩১. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch. XX, pp. 182-183.

৩২. *Ibid*, Ch. XXVI, pp. 232-233.

৩৩. *Ibid*, p. 200.

৩৪. Thomas Hobbes, *De Cive: On the Citizen,* R. Tuck and M Silver Thorne (ed. and Trans.), Cambridge University Press, Cambridge, Reprint, 2003, p. 151.

৩৫. Philip Pettit, "*Liberty and Leviathan*", Vol. 4, Issue. 1, Sage Journals Publications Ltd., London, 2005, p. 131. https://doi.org/10.1177/1470594x05049439

৩৬. Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

৩৭. Philip Pettit, "Liberty and Leviathan", Vol. 4, Issue.1, Sage Journals Publications Ltd., London, 2005, p. 133-138. https://doi.org/10.1177/1470594x05049439

৩৮. Thomas Hobbes, *Leviathan,* p. 33.

৩৯. *Ibid*, Ch. XXI, pp. 192-193.

৪০. James Harrington, *The Commonwealth of Oceana and a System of Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p. 20.

(… … Hobbes was deliberately putting the notion of freedom from the law in place of the common notion of freedom under the law or by the law.)

৪১. Thomas Hobbes, *Leviathan,* Ch. XXI, pp. 190-194.

৪২. *Ibid*, Ch. XXI, pp. 193-194.

৪৩. Philip Pettit, "Liberty and Leviathan", pp. 135-137.

৪৪. *Ibid,* p. 138.

৪৫. *Ibid,* p. 139.

৪৬. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXI, pp. 23-234.

৪৭. Quentin Skinner, *Visions of Politics,* Chapter III, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 213.

৪৮. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch. XIV, pp. 136.

৪৯. Philip Pettit, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government,* Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. ..

৫০. Philip Pettit, "*Liberty and Leviathan*", Vol. 4, Issue. 1, Sage Journals Publications Ltd., London, 2005, p. 148. https://doi.org/10.1177/1470594x05049439

৫১. Philip Pettit, *Republicanism: Theory of Freedom and Government*, Oxford: Oxford University Press, 1999, pp. .

৫২. Philip Pettit, "*Liberty and Leviathan*", Vol. 4, Issue. 1, Sage Journals Publications Ltd., London, 2005, p.149. https://doi.org/10.1177/1470594x05049439

৫৩. *Ibid*, p. 148.

৫৪. C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, p. 86.

৫৫. Thomas Hobbes, Leviathan, Ch. XV, p. 147.

৫৬. Perez Zagorin, "Hobbes and the Law of Nature", NJ: Princeton University Press, Princeton, 2009, pp. 42-53.

৫৭. Thomas Hobbes, *Leviathan*, p. 120.

৫৮. Martine A. Bertman, "Equality in Hobbes, with Reference to Aristotle", *The Review of Politics*, Vol. 38, No. 4, Cambridge University Press, 1976, p. 534. https://www.jstor.org/stable/140626

৫৯. Thomas Hobbes, *Leviathan*, p. 83.

৬০. Bertman, "Equality in Hobbes, with Reference to Aristotle", *The Review of Politics*, p. 539.

৬১. Johann P. Sommerville, *Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context*, Macmillan Press Ltd., London, 1992, p. 75.

৬২. Thomas Hobbes, *De Cive*, p. 151.

৬৩. Thomas Hobbes, *Leviathan*, pp. 239-240.

৬৪. William E. Connoly, *Political Theory and Modernity*, Cornell University Press, Ithaca, 1993, p. 34.

৬৫. Victoria Kahn, "Hobbes, Romance, and the Contract of Mimesis," in *Political Theory*, Vol. 29, No. 1, Sage Publications Inc., New York, 2001, p. 24. https://www.jstor.org/stable/3072541

৬৬. Thomas Hobbes, *Leviathan*, Ch. 18.

৬৭. *Ibid*, pp. 169-170.

৬৮. Starobinski, *Jean-Jacques Rousseau, Transparency and Obstruction*, University of Chicago Press, Chicago, 1988, p. 27.

৬৯. David Van Mill, “Civil Liberty in Hobbes’s Commonwealth”, *Australian Journal of Political Science*, vol. 37, Issue-1, 2002, p. 26.

৭০. Thomas Hobbes, *Leviathan*, p. 214.

৭১. Bertrand de Jouvenel, *Sovereignty: An Inquiry into the Political Good*, Huntington, J. F. (trans.), Cambridge University Press, Cambridge, 1957, p. 38.

৭২. Thomas Hobbes, *Leviathan,* p. 193.

৭৩. Johann P. Sommerville, *Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context*, Macmillan Press Ltd., London, 1992, p. 52.

৭৪. Thomas Hobbes, *Leviathan,* p. 126.

৭৫. Thomas Hobbes, *De Cive,* p. 82.

৭৬. M. M. Goldsmith, “Hobbes On Law”, in *The Cambridge Companion to Hobbes*, Sorell, Tom (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 280.

৭৭. Howard Warrender, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Clarendon Press, Oxford, 1970, pp. 124-130.

৭৮. John Locke, *Second Treatise*, § 230.

৭৯. Gough, *John Locke’s Political Philosophy,* p. 31.

৮০. George H. Sabine, *A History of Political Theory,* Revised by Thomas Landon Thorson, 4th Edition, IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi: Oxford, 1973, pp. 525-526.

৮১. Sir Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” in *Political Philosophy*, Anthony Quinton (ed.), Oxford University Press, London, 1969, pp. 141-152.

৮২. *Ibid*, pp. 152.

৮৩. George H. Smith, “Negative and Positive Liberty: Some Historical Reflections”.

৮৪. *Ibid*., https://www.liberlarianism.org/publications/essays/excursions/negative-positive-liberty-some-historical-reflections.

৮৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, John Locke, “Essay Concerning the True, Original, Extent and End of Civil Government”, pp. 127-127 in Joseph S. Murphy, *Political Theory: A Conceptual Analysis*, The Dorsey Press, Illinois, 1968, pp. 198-99.

৮৬. John Locke, *Second Treatise*, Ch. 2. § 6.

৮৭. *Ibid*, § 57.

৮৮. John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, (… … if government be faithfully administered, and the counsels of the magistrate be indeed directed to the public good, this will seldom happen.”), Hackett Pub. Co. Indianapolis, 1983, p. 33.

৮৯. *Second Treatise* গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে লক রাজনৈতিক ক্ষমতার যে সংজ্ঞায়ন করেছেন তাতে দেখা যায় তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অন্য সকল ক্ষমতা থেকে পৃথকভাবে দেখেছেন।

৯০. অধ্যাপক ভন লককে বিশেষত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রূপে মনে করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, C. E. Vaughan, *Studies in the History of Political Philosophy before and after Rousseau*, Manchester University Press, 1935, Published online by Cambridge University Press, 2009, 130 ff.

৯১. Willmore Kendall, “*John Locke and the Doctrine of Majority – Rule*”, University of Illinois Press, 1959.

৯২. Jonathan Wolf Gough, *John Locke’s Political Philosophy*, Eight studies, The Clarendon Press, Oxford, 1968, p. 24.

৯৩. T. H. Green, *Principles of Political Obligation*, The Law Book Exchange Ltd., Clark, New Jersey, 2005, p. 51.

৯৪. Gough, *John Locke’s Political Philosophy*, p. 26.

৯৫. John Locke, *Two Treatises of Government*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967, p. 128.

৯৬. *Ibid*, p. 130.

৯৭. Gough, *John Locke’s Political Philosophy*, p. 31.

৯৮. John Locke, *Second Treatise*, § 104-119.

৯৯. *Ibid*, § 243.

১০০. Jean Paul Sartre, Being and Nothingness, Routledge, New York, 2018.

১০১. J. A. Rohr, *To Run a Constitution: The Legitimacy of the Administrative State*, University Press of Kansas, Lawrence, Kans, 1986, p. 161.

১০২. John Locke, *Second Treatise*, § 117.

১০৩. C. B. Macpherson, “The Social Bearing of Locke’s Political Theory” in *Western Political Quarterly*, Vol. VII, No. 1, 1988, pp. 1-22.

১০৪. E. D. Watt, "Rousseau Rechaufee– Being Obliged, Consenting, Participating, and Obeying only Oneself", *The Journal of Politics*, Vol. 43, No.- 3, 1981, p. 715.

https://doi.org/10.2307/2130633

১০৫. J. M. Warner and J. R. Zink, "Therapeutic Politics: Rawls's Respect for Rousseau", *The Review of Politics* (78) 2016, p. 117-140.

১০৬. জর্জ এইচ. স্যাবাইন (মূল), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৫৪৩।

১০৭. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১।

১০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।

১১০. A. J. Carlyle, *Political Liberty: A History of the Conception in the Middle Ages and Modern Times*, Routledge, London, 2019.

১১১. Alfred Cobban, *Rousseau and The Modern State,* Routledge Library Edition: 18th Century Philosophy, Ch. 6, Routledge, London, 2019.

https://doi.org/10.4324/9780429026904

১১২. Jean Jacques Rousseau, *Social Contract*, Bk. IV, Ch. 8, p. 307.

১১৩. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোস্যাল কনট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৭৩।

১১৪. Jean Jacques Rousseau, *Social Contract*, Book- I, Ch. VI, pp. 179-181.

১১৫. Andrez Rapaczynski, *Nature and Politics: Liberalism in the Philosophy of Hobbes, Locke and Rousseau*, Cornell University Press, Ithaca, 1987, p. 262.

১১৬. Ronald Grimsley, *The Philosophy of Rousseau*, Oxford University Press, London, 1973, pp. 117-118.

১১৭. Max Hocutt, "Compassion without Charity, Freedom Without Liberty: The Political Fantasies of Jean-Jacques Rousseau" *The Independent Review,* Vol. 8, No. 2, 2003, pp. 165-191, https://www.jstor.org/stable/24562684.

Patrick Riley, "A Possible Explanation of Rousseau's General Will", *The American Political Science Review,* 64/1, 1970, pp. 86-97. https://doi.org/10.2307/1955615

Patrick Riley, "Rousseau's General Will: Freedom of a Particular Kind", *Political Studies*, 3, Issue 1, 1991, pp. 55-77. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1991.tb00581.x

১১৮. Jean-Jacques Rousseau, *Social Contract*, Book I, Ch. VI, p. 138.

১১৯. Jonathan Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2006, p. 85.

১২০. মন্দিরা চৌধুরী, "শিক্ষা দর্শনে রুশোর প্রকৃতিবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও সীমাবদ্ধতা", *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ৭, সংখ্যা ৯, জুলাই ২০১৬- জুন ২০২৪।

১২১. রুশো কর্তৃক নারী-পুরুষের মধ্যেকার এ বৈষম্য প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়ে নারী অধিকার বিষয়ে শক্তিশালী উদগাতা মেরী উলস্টোনক্রাফটের লেখনীতে। উলস্টোনক্রাফট তাঁর *A Vindication of the Rights of Woman* (1792) গ্রন্থে রুশোর বিতর্কিত এ ধারণার সমালোচনা করেন। নারী-পুরুষের মাঝে এরূপ বৈষম্যের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। উলস্টোনক্রাফট মূলত নারীদের শিক্ষার অধিকার প্রদান দ্বারা পুরুষের মতো নারীদের জন্য সমরূপ সুযোগের সমতা বিধানে লেখনী ধারণ করেন। আঠারো শতকে উলস্টোনক্রাফট উনবিংশ শতকে মিল নারীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এঁরা নারীর ভোটাধিকারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রাখেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ নারীকে তার অধিকার অর্জনে ও সমতা ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে নিয়ে যায়।

১২২. Jonathan Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*, p. 86.

১২৩. John Stuart Mill, *On Liberty*, p.184.

১২৪. Jonathan Wolf, *An Introduction to Political Philosophy*, p. 88.

১২৫. Ronald Cartland, "Why am I a Democrat?" *Law Quarterly Review*, Vol. 56, 1940, pp. 61-74.

১২৬. Edgar F. Carritt, "Liberty and Equality" in *Political Philosophy*, Anthony Quinton (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1969, p. 127.

১২৭. Sir James Fitzjames Stephen, *Liberty, Equality and Fraternity*, Holt & Williams, New York, 1878, R. J. White (ed.), Cambridge University Press, 1967.

১২৮. D. D. Raphael, *Problems of Political Philosophy*, p. 111.

১২৯. Jean-Jacques Rousseau, *Social Contract*, pp. 141-142.

১৩০. *Ibid*, p. 141.

১৩১. E. D. Watt, "Rousseau Réchauffé – Being Obliged, Consenting, Participating, and Obeying Only Oneself", *The Journal of Politics*, 43/3, 1981, p. 714. https://www.jstor.org/stable1213063

১৩২. Ronald Grimsley, *The Philosophy of Rousseau*, Oxford University Press, London, 1973, p. 160.

১৩৩. Jean-Jacques Rousseau, Emile, Barbara Foxley (trans.), Everyman Library, No 518, J. M Dent and Sons Ltd, London, 1911, p. 49.

১৩৪. *Ibid*, p. 49.

১৩৫. Samuel I Mintz, *The Hunting of Leviathan*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, pp. 124-127.

১৩৬. Ronald Grimsley, *The Philosophy of Rousseau*, Oxford University Press, London, 1973, pp. 117-118.

১৩৭. Jean-Jacques Rousseau, *Social Contract*, p. 145.

১৩৮. Peter Winch, "Man and Society in Hobbes and Rousseau" in *Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays*, M. W. Cranston, and R. S. Peter (eds.), Anchor Books, Garden City, N. Y., 1972, p. 249.

১৩৯. Jean-Jacques Rousseau, *The Collected Works of Rousseau: Discourse On Political Economy*, Jean Seine (trans.), United States, 2023.

http: //www.constitution.org/jir/polecon.html

১৪০. Jean-Jacques Rousseau, *Social Contract*, p. 194.

১৪১. Ronald Grimsley, *The Philosophy of Rousseau*, Oxford University Press, London, 1973, p. 109.

১৪২. Max Hocutt, "Compassion Without Charity, Freedom Without Liberty: The Political Fantasies of Jean-Jacques Rousseau", pp. 182-184.

১৪৩. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, p. 197.

১৪৪. Jean Starobinski, *Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction*, University of Chicago Press, Chicago, 1988, p. 22.

১৪৫. Alfred Cobban, *Rousseau and The Modern State*, Routledge Library Edition: 18th Century Philosophy, Ch. 4, Routledge, London, 2019.

https://doi.org/10.4324/9780429026904

১৪৬. *Ibid*, pp. 8.

১৪৭. P. J. SteinBerger, "Hobbes, Rousseau and the Modern, Conception of the State", *The Journal of Politics*, Vol. 70, No. 3, July, 2008, p. 611. https://doi.org/10.1017/s002238/60808064x

১৪৮. David P. Gauthier, *The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes*, Clarendon Press, Oxford, 1969, p. 161.

অষ্টম অধ্যায়

সম্পত্তিতত্ত্ব ও ব্যক্তিমালিকানার ধরণ

সম্পত্তি রাজনৈতিক জীবনে সন্দেহাতীতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণের পাশাপাশি মানুষের জীবনের রাজনৈতিক চড়াই-উৎড়াই উত্তরণের সাথে সম্পত্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। এর সাথে যোগ রয়েছে অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং রাজনীতির। আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের প্রেক্ষাপটে সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা তথা সম্পত্তি কীভাবে ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে সে সম্পর্কিত স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় জন লকের *Two Treatises of Government* (1689) গ্রন্থে। এছাড়াও হেগেলের *Philosophy of Right* (1821) গ্রন্থে সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা লক্ষ করা যায়। সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা ও সামষ্টিক মালিকানা কীভাবে ত্রয়ী চুক্তিবাদীদের কাছে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং সমকালীন বিশ্বব্যবস্থায়-অর্থনীতি ও রাজনীতিতে তাদের সম্পত্তিসংক্রান্ত ভাবনা কেন সমভাবে প্রাসঙ্গিক তা আমরা এ অধ্যায়ে লক্ষ করব। রাষ্ট্রচিন্তায় চুক্তিবাদীদের মতে সম্পত্তি কী? সম্পত্তির প্রকৃতি কিরূপ এবং সম্পত্তির অধিকার ও মালিকানার ধরণ, সম্পত্তির সাথে মালিকানার সম্পর্ক, রাজনৈতিক সমাজে সম্পত্তির সমীকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

হবস, লক ও রুশোর রাষ্ট্রদার্শনিক বিশ্লেষণে এ কথা বলা যায় যে তারা তিনজনই পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজে সম্পত্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমকালীন পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় জীবনব্যবস্থা সকল ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করছে অর্থনীতি তথা সম্পত্তি। যদিও হবসের চুক্তিতত্ত্বে সম্পত্তি সম্পর্কে লক ও রুশো অপেক্ষা কম আলোচনা পাওয়া যায়। তবে বুর্জোয়া সমাজের একজন যথার্থ প্রতিনিধিত্বকারীরূপে লকের রাষ্ট্রদর্শনে সম্পত্তির আলোচনা একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। তিনি সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব এবং তাতে ব্যক্তির নৈতিক অধিকারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, রুশো আবার সামাজিক বৈষম্যের মূলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থাকে দুষেছেন। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং সম্পত্তির নির্দিষ্ট সীমা আছে কিনা– চুক্তিবাদীদের আলোচনা থেকে এসব বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ধরণ সম্পর্কে অধিকতর সরব উপস্থিতি পাওয়া যায় লক ও রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায়। সম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে তাঁদের মাঝে রয়েছে মতপার্থক্য। সতেরো শতকের ব্রিটিশ রাজনৈতিক অর্থনীতির ধারা পর্যালোচনায় বলা যায় রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকার ও সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান দ্বারা বুর্জোয়া উদারতাবাদী ধারার বীজ রোপিত হলো। এ প্রসঙ্গে লোপাটা বলেন, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সতের শতকের ব্রিটিশ উদারতাবাদী চিন্তার উৎস ও বিকাশ চিহ্নিত করা যায়; তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের যে ধারণা তা ছিল মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষা দান– এভাবে উদার বৈশিষ্ট্যের ধারণা বিকশিত হয়।[১]

হবস

ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার সময়কালে পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজ এক নতুন বৈশিষ্ট্যে আবির্ভূত হলো। নতুন এই পুঁজিবাদী সমাজে নাগরিকগণ অবাধ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে থাকে। এবং একই সাথে নাগরিকগণ তাদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার যেন সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে রাষ্ট্রকে হাতিয়ার রূপে গড়ে তুলল। তৎকালীন উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার একজন শক্তিশালী প্রতিনিধি টমাস

হবস রাষ্ট্রকে মানুষের পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিভূ রূপে গড়ে তুলেছেন। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষ জান-মালের নিশ্চয়তা চাইল। রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি তার সম্পত্তির সংরক্ষণের বিষয়েও ভূমিকা রাখল। অবশ্য হবসের রাষ্ট্রচিন্তা লকের মতো সম্পত্তিকেন্দ্রিক নয়, মুখ্যত ব্যক্তির নিরাপত্তা কেন্দ্রিক। তাই হবসের সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব এবং প্রকৃতির রাজ্যের স্বরূপ অনুসন্ধানে লক্ষ করা যায় রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় ব্যক্তির কাছে সম্পত্তি নয় নিরাপত্তা, আত্মরক্ষার মতো বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। রাজনৈতিক জীবনে পর্দাপণের দ্বারা ব্যক্তি যখন তার নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হলো অত:পর সার্বভৌমের কর্তৃত্বাধীনে সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা (মূলত) এবং ব্যক্তিমালিকানা (অংশত) স্বীকৃত হলো। হবস মনে করেন রাষ্ট্রীয় মালিকানা ব্যতিরেকে সম্পত্তির অন্য কোনো মালিকানা নেই। সম্পত্তির ওপর যেকোনো মালিকানা সম্পর্ক নির্ধারণ করবে সার্বভৌম।

জোহান অল্সথ্রন হবসের সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় তিনটি স্বতন্ত্র যুক্তি উপস্থাপন করেছেন– নিরাপত্তার যুক্তি, নির্ভুলতার যুক্তি এবং সৃষ্টির যুক্তি। তিনি মনে করেন, হবসের সম্পত্তিতত্ত্বে সার্বভৌম বণ্টনমূলক নাগরিক আইনের দ্বারা শূন্যাবস্থা থেকে সর্বধরণের সম্পত্তির অধিকার সৃষ্টি করেছেন।[২] লক্ষণীয় বিষয় হলো অলস্থ্রন মনে করেন, বণ্টনমূলক ন্যায্যতার বর্তমানে যে প্রচলিত অর্থ তা হবসের কাছে ভিন্ন অর্থ বহন করে । হবসের *লেভিয়াথান* গ্রন্থে বণ্টনমূলক ন্যায্যতাকে স্বৈরশাসকের বৈশিষ্ট্যরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবি করেন রাষ্ট্রে বণ্টনমূলক নাগরিক আইনের সাহায্যে হবস ব্যক্তিকে সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার প্রদানের পরিবর্তে ব্যক্তির জন্য নতুনভাবে সম্পত্তি সৃষ্টি করেছে এবং জনগণকে সম্পত্তির অধিকার প্রদান করেছে।[৩] বাজারভিত্তিক সমাজের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মসমূহের বাস্তবায়ন করেছে।[৪] অল্সথ্রনের নির্ভুলতার যুক্তি এবং নিরাপত্তার যুক্তিসমূহ মূলত ম্যাকফার্সনের দাবির (হবস পুঁজিবাদী বাজার সমাজব্যবস্থাকে বৈধতা দানের জন্য ন্যায্যতার পুনঃসংজ্ঞায়ন করেছেন) প্রতি সহমত পোষণ করে। (অল্সথ্রন মনে করেন) [৫] – Both the Security Argument and the Precision Argument assume that private individuals have the capacity to create provisional claims to property. By enforcing and authoritatively specifying private contracts, the states elevate such pre-political claims into legally effective property rights.[৬]

হবসের রাজনৈতিক সমাজে একজন ব্যক্তির অপরের বিপরীতে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার থাকলেও সার্বভৌমের বিরুদ্ধে নেই। সম্পত্তির ওপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী সার্বভৌম। হবসীয় রাষ্ট্রদর্শনে সার্বভৌম সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসাকারী। তবে নাগরিক অবশ্যই বিবাদ নিষ্পত্তিতে আইন ও আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে।[৭] হবস সম্পত্তির সংজ্ঞায়নে বলেছেন–

…is annexed to the sovereignty the whole power of prescribing the rules whereby every man may know what goods he may enjoy and what actions he may do without being molested by any of his fellow subjects, and this is it men call property.

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি অপরের দ্বারা আক্রান্ত না হয়ে কিংবা অপরকে আক্রমণ না করে কি ধরণের ভালো সে উপভোগ করতে পারে এবং সে কি ধরণের কাজ করতে পারে তার নিয়ম নির্দেশনা প্রদানের সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে সার্বভৌমের হাতে; এবং একেই মানুষ বলে সম্পত্তি।[৮]

লকের সাথে হবসের সম্পত্তিতত্ত্বের পার্থক্য হলো লক সম্পত্তির মালিকের কাছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন। কিন্তু হবস সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করলেও তাদের কোন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কিংবা ক্ষমতা প্রদানে পক্ষপাতী ছিলেন না। হবস সমর্থিত রাজতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা যেখানে সংকুচিত হয়েছে সেখানে শাসনাধিকার তাদের কাছে থাকবেনা তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে হবস লকের মতো অবাধ নয় বরং

সীমিত পরিসরে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা সমর্থন করেছেন বলা যায়। ব্যক্তির অর্থনৈতিক, নৈতিক কিংবা রাজনৈতিক যে জীবন হোক না কেন হবস কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের পক্ষে। তবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এই আগ্রাসনের কারণে তাকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সমর্থক ভাবার সুযোগ নেই। হবস যেখানে নাগরিকের অর্থনৈতিক জীবনকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের আওতাভুক্ত করেছেন তার সমসাময়িক এডাম স্মিথ কিংবা জেরেমি বেন্থাম নাগরিকের বা ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধী।

হবসের সম্পত্তি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণে দেখা যায়, সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার পতনের পর যে নতুন অর্থনীতির জোয়ার আসল তাতে নতুন নাগরিক সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক যূথবদ্ধতা এবং তাকে কেন্দ্র করে নাগরিকের নতুন আশা-আকাঙক্ষা নির্মিত হয়েছে। এতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রাথমিকভাবে স্বীকৃত হলেও বিস্তৃত বিচারে রাজার কাছে এর নিয়ন্ত্রণ রক্ষিত হলো। ব্যক্তির সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে সম্পত্তির নিরাপত্তা গুরুত্ব পেল। হবসীয় চুক্তিতত্ত্বে সার্বভৌম রাজনৈতিক সমাজে কেবল শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন কিংবা বিবাদের নিষ্পত্তিকারীরূপে ভূমিকা রাখে তা নয়, সে সাথে ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করে নাগরিক অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার। হবসীয় সম্পত্তিতত্ত্বে সম্পত্তির মালিকানা সূত্রপাত ও নির্ধারণ হয়েছে সিভিল ল দ্বারা, বাজার ব্যবস্থার দ্বারা নয়। হবসীয় রাষ্ট্রচিন্তায় সার্বভৌমই একমাত্র কর্তৃপক্ষ যে সম্পত্তির অধিকার নিরূপণ করবে। সম্পত্তির সংজ্ঞা এবং সম্পত্তির ওপর সার্বভৌমের মালিকানা প্রসঙ্গে হবস বলেন– For before constitutions of sovereign power, as already been shown, all men had a right to all thing, which necessarily causeth war; and therefore this property, beings necessary to peace and dependency on sovereign power, is the act of that power in order to the public peacesic]. These rules of propriety (or *meum* and tuum) and of *good, evil, lawful, and unlawful,* in the actions of subjects, are the civil laws.”[৯]

হবসীয় প্রকৃতির রাজ্য ছিল এমন এক যুদ্ধংদেহী পরিস্থিতি যে অবস্থায় সম্পত্তির কোনো প্রকার অধিকার থাকতে পারে না। হবস লকের মতো মনে করেন না যে সরকার বা রাষ্ট্র প্রাকৃতিক অধিকারের (সম্পত্তি)সুরক্ষা বিধান করবে। বরং হবস মনে করেন সার্বভৌম একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ সকল সম্পত্তির সম্পর্ক নির্দেশ করবেন। সার্বভৌমের অনুপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারে না। সার্বভৌম ঠিক করবেন ব্যক্তির সাথে সম্পত্তির সম্পর্কের মাত্রা। হবসের চুক্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণে আমরা দাবি করতে পারি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আর্বিভাব মূলত রাষ্ট্রে। রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি।

সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে হবসের আলোচনায় লক্ষণীয় দিক হলো সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপস্থিতি। রাষ্ট্র বা সার্বভৌম যেহেতু সিভিল ল এর স্রষ্টা, তাই তিনি জনসাধারণের জন্য সম্পত্তির অধিকারও সৃষ্টি করেছেন। সার্বভৌম কর্তৃক সৃষ্ট এ অধিকারের উদ্দেশ্য ছিলো জনগণের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা। সার্বভৌমের এ উদ্দেশ্যের মধ্যে একপ্রকার বণ্টনমূলক ন্যায্যতা দ্বারা তিনি রাজনৈতিক সমাজে নতুনভাবে সম্পত্তি ও সম্পত্তির অধিকার সৃষ্টি করলেন যা প্রকৃতির রাজ্যে ছিলো না।

হবসের রাষ্ট্রচিন্তায় মানুষের প্রধান চাহিদা ছিল– ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা বিধান করা। ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ করা নয়। তাই তিনি ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা বিধানের প্রয়োজনে সম্পত্তির উপর অধিকার সংকুচিতকরণকে বৈধতা দিয়েছেন। হবস সার্বভৌমকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে তার পদক্ষেপসমূহ লেইসেজ ফেয়ার রূপে গন্য করা যায় না।[১০] হবসের মতে, সম্পত্তির মালিকানায় ন্যায্যতা হলো প্রত্যেক ব্যক্তির যা নিজের তাকে তা দেওয়ার অবিরত ইচ্ছা।[১১] হবস মনে করেন যদি মালিকানা না থাকে অর্থাৎ সম্পত্তি না থাকে তবে

সেক্ষেত্রে কোনো অন্যায্যতাও থাকে না। যেখানে কোনো বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতা থাকে না, সেখানে কোনো কমনওয়েলথও থাকে না। কমনওয়েলথ না থাকলে কোনো সম্পত্তিও থাকে না। প্রত্যেক মানুষের সকল কিছুর প্রতি অধিকার থাকে।[১২] যদি কমনওয়েলথ না থাকে জনগণের সম্পত্তির অধিকার থাকে না । কমনওয়েলথ না থাকলে কোনো কিছুই অন্যায্য নয়। ন্যায়ের প্রকৃতি নিহিত থাকে চুক্তি বৈধ রাখার মাধ্যমে। চুক্তির বৈধতা কিংবা বৈধ চুক্তির চুক্তির সূত্রপাত রাজনৈতিক ক্ষমতার সংঘটনের মাধ্যমে। জনগণকে সে ক্ষমতার অধীনে বাধ্য করার মধ্যেই নয়। সম্পত্তি ব্যবস্থাও শুরু হয়েছে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ সম্পত্তির সূত্রপাতের মাধ্যমে চুক্তির বৈধতা শুরু হয়েছে।[১৩] সম্পত্তি ব্যবস্থার কারনে মানুষ রাজনৈতিক সমাজের সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। আনুগত্যে রয়েছে নাগরিকের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও শৃঙ্খলা।

হবসের এ বক্তব্যে সম্পত্তি এবং ন্যায্যতার ধারণা তাঁর চিন্তায় সমান্তরালভাবে চলেছে। সম্পত্তি ও ন্যায্যতা উভয়ই সংজ্ঞায়িত ও নির্দেশিত হয়েছে কমনওয়েলথের মত রাজনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব দ্বারা। যদি কমনওয়েলথ না থাকে তাহলে ন্যায্যতা থাকে না আর যদি ন্যায্যতা না। থাকে তাহলে সম্পত্তির মালিকানাও থাকে না। কারণ প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তির কোনো সুনির্দিষ্ট মালিকানা বা অধিকার ছিলো না, সবকিছুর প্রতি অধিকার ছিলো যাকে হবস মনে করেন অন্যায্যতা। সম্পত্তির সাথে ন্যায্যতার বিষয়টি হবসের কাছে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যার মূল নিহিত আছে তার প্রাকৃতিক আইনের এগারো নম্বর সূত্রে। এ সূত্রানুযায়ী ‘that he deals *equally between them*’ অর্থাৎ সার্বভৌম সম্পত্তির বণ্টনে ন্যায্যতা ও সমতা নিশ্চিত করবে। অন্যথায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির এ বিতর্ক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে। সার্বভৌম যখন প্রাকৃতিক আইন দ্বারা সম্পত্তির বণ্টন নিশ্চিত করবেন তার মূলভিত্তি হবে অবশ্যই ন্যায্যতা।[১৪] সার্বভৌম যখন বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তার মধ্যে আইনের একজন ভালো ব্যাখ্যাকারী কিংবা একজন ভালো বিচারকের যে সকল গুণাবলী থাকতে হবে তন্মেধ্যে প্রথম হলো ন্যায্যতা নামক প্রাকৃতিক আইনের সূত্রটির যথাযথ উপলব্ধি। এ উপলব্ধি অন্যকারো লেখনী পড়ে সৃষ্টি হবে না, এর উৎস হবে ব্যক্তির স্বীয় প্রাকৃতিক প্রজ্ঞা এবং অনুধ্যান।[১৫]

কমনওয়েলথের মধ্যেকার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবেন সার্বভৌম। যদি সার্বভৌম সম্পত্তির সর্বোচ্চ মালিক না হয় বা কমনওয়েলথের উপস্থিতি না থাকে তবে প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের সাথে বা তাদের প্রতিবেশির সাথে চিরস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তা রক্ষার জন্য ব্যক্তির শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এধরণের পরিস্থিতিতে যা থাকে তা সম্পত্তিও নয়, সম্প্রদায়ও নয়, তা হলো অনিশ্চয়তা। হবসীয় চুক্তিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী জনগণের অর্থাৎ চুক্তিকারীদের স্বার্থ রক্ষা করা। শর্ত রক্ষার দ্বারা চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করা। এ কাজটি কমনওয়েলথের অধিপতি হিসেবে সার্বভৌমই সম্পাদন করবেন। তাই সার্বভৌম চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণ করবেন, পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার দ্বারা সম্পত্তির বণ্টন করবেন। সার্বভৌম নিজের বিবেচনার জন্য কিছু ক্ষেত্রে বণ্টনমূলক নীতির অনুশীলন করতে পারেন। তবে জনগণের জন্য সম্পত্তির মালিকানা ও বণ্টনে তিনি পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার নীতির আশ্রয় নিবেন। পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার নীতি গ্রহণ করলেও সার্বভৌমর কাছে এর মূল ভিত্তি হবে সমতা এবং পক্ষপাতহীনতা।

সম্পত্তির ওপর নাগরিকদের মালিকানার ধরণ নির্ধারণে হবসের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, যে কোনো ধরণের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির উদ্ভব ঘটেছে মূলত সার্বভৌমের অবাধ বণ্টন থেকে।[১৬] সম্পত্তির অধিকার উপভোগ করতে হলে জনগণকে অবশ্যই কমনওয়েলথের প্রতি, সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পত্তির অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে। একজন প্রজার সম্পত্তির অধিকার থাকার অর্থ সে সার্বভৌমের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত নয়, কেবল অপর প্রজার আধিপত্য থেকে মুক্ত।[১৭]

এরিস্টটলের মতে, কোনো কাজের ন্যায্যতা দুইভাবে প্রতিপাদন করা যায়– বণ্টনমূলক ন্যায্যতা ও পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতা। পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতা গাণিতিক হারে এবং বণ্টনমূলক ন্যায্যতা জ্যামিতিক হারে তৈরি হয়।[১৮] হবস বণ্টনমূলক ন্যায্যতার পরিবর্তে পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার সমর্থন করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের চুক্তিবদ্ধ জনগণের ন্যায্যতা বিধানে তিনি মানুষের মধ্যে সুবিধার সমবণ্টনের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ জনগণের প্রয়োজন সাপেক্ষ পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার কথা বলেছেন।[১৯]

পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার দ্বারা একজন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের সেসব স্বার্থ সংরক্ষিত হয় যা দ্বারা সে সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, ধার, পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যকলাপ চুক্তির অংশরূপেই সম্পাদন করতে পারে।[২০] পক্ষান্তরে বণ্টনমূলক ন্যায্যতা দ্বারা সমতার ভিত্তিতে একজন শাসক ন্যায় নির্ধারণ করবেন। সম্পত্তির ওপর সর্বাগ্রে সার্বভৌমের অধিকার রক্ষায় সার্বভৌম বণ্টনমূলক নীতির পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার দ্বারা সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা নির্ধারণ করবেন। লরেন্স বলেন, হবস *লেভিয়াথান* এবং *ডিসিভ* উভয় গ্রন্থেই সম্পত্তির অধিকারকে ন্যস্ত করেছেন নাগরিক এবং সার্বভৌমের মধ্যেকার সম্পর্কের কাছে। এ সম্পর্ক পরিচালিত হবে প্রাকৃতিক আইন দ্বারা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বভৌম ও প্রজাদের মধ্যে পরিচালন সূত্র হবে ন্যায্যতা।[২১] অর্থনীতির ক্ষেত্রে হবস কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে প্রথাগত এবং বুর্জোয়া ধারণার সংমিশ্রণ বলা যায়, যা তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় একটি স্বতন্ত্রধারা রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। হবসীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে সমতার কথা বলা হয় তা কিন্তু বাজার আইনে সমঅধীনস্থতা নয় বরং সার্বভৌমের আইনের অধীনে সমতা।[২২]

হবস মনে করেন সার্বভৌমের কাজ হচ্ছে সকলের জন্য নিরাপত্তা বিধান করা। সম্পত্তির সুরক্ষা তার প্রধান কাজ নয়। যদি জননিরাপত্তা দিতে সার্বভৌম ব্যর্থ হয় তবে যে গোলযোগ তথা রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে যা জনগণ কর্তৃক সার্বভৌমের উপর আরোপিত দায়িত্বের বিচ্যুতি এবং তা সিভিল সোসাইটির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেবে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ রাজনৈতিক সমাজে প্রবেশের পূর্বে ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা ছিল না। ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা এবং বণ্টনের সূত্রপাত ঘটে রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে। হবস সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অযৌক্তিক মালিকানাকে সমর্থন করেননি। হবসের সম্পত্তির ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সার্বভৌম ন্যায্যতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সামষ্টিক মঙ্গলের (common good) নিরিখে একটি নির্দিষ্ট পরিমান সম্পত্তি বণ্টন করেন। সম্পত্তির ওপর প্রজাদের যে মালিকানা সে মালিকানা কিন্তু সার্বভৌমকে বাদ দিয়ে প্রজাদের একচ্ছত্র মালিকানা নয়।[২৩] যদিও অধ্যাপক ম্যাকফার্সন হবসের সম্পত্তির ধারণাকে মালিকানাভিত্তিক বাজার সমাজ এবং মালিকানাভিত্তিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদরূপে অভিহিত করেছেন।[২৪] কোন প্রজার তার সম্পত্তির ওপর মালিকানার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল প্রজাকে তা ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারলেও কিংবা অন্যান্য প্রজাকে এর মালিকানার বাইরে রাখতে পারলেও সার্বভৌমকে বাদ দিতে পারে না।[২৫] সার্বভৌম কর্তৃক ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপের আইনগত সুযোগ রয়েছে।

রাজনৈতিক সমাজে কমনওয়েলথের কাজ কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চুক্তির বাস্তবায়ন কিংবা বিবাদ মীমাংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সাবভৌম বা রাষ্ট্র স্বত:প্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাজনৈতিক অধিকার সৃষ্টি করে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা দ্বারা নয় বরং রাজনৈতিক আইন দ্বারা নির্ধারিত হলো।[২৬] সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনাতে হবস অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং বৈদেশিক বানিজ্য নীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বভৌমকে পূর্ণ ক্ষমতা বা অধিকার দিয়েছেন। সার্বভৌম কর্তৃক প্রজাদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের অধিকার, বৈদেশিক বানিজ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে এধরণের অংশগ্রহনকে টমাস কিথ বুর্জোয়া মূল্যবোধ এবং চিন্তাধারার বিপরীত বলে মনে করেন।[২৭] তিনি মনে করেন একজন ব্যক্তির নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চুরি করা যেমন দোষের নয় তদ্রুপ রাষ্ট্রের শান্তি এবং প্রজাদের সম্পত্তির পূর্ণ উপভোগের জন্য সার্বভৌম কতৃর্ক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ গ্রহনযোগ্য। কিথের এ বক্তব্য মেনে নিলে সার্বভৌম

কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে হবসকে বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্তের প্রচলিত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় হবসের সময়কালে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার আলোকে হবস তাঁর *লেভিয়াথান* গ্রন্থে সার্বভৌমের কাছে সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। সার্বভৌমই সাধারণ নাগরিকদের মাঝে সম্পত্তির মালিকানা নিরূপন করবেন। সার্বভৌম কর্তৃক সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা হবস মূলত যেকোনো ধরণের বিপ্লবকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। গৃহযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ হবস *এলিমেন্টস অব ল*[২৮] গ্রন্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি তার যে সমর্থন ছিলো *লেভিয়াথান* গ্রন্থে তা থেকে সরে আসলেন। *লেভিয়াথান* গ্রন্থে তিনি দাবি করেন– রাজনৈতিক সমাজ বা কমনওয়েলথে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বণ্টনমূলক এবং সিভিল আইন দ্বারা স্বীয় কর্তৃত্ব বহাল রেখেছেন; সম্পত্তির বিষয়টি সার্বভৌম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। *লেভিয়াথান* গ্রন্থে আপাতদৃষ্টে হবসের সম্পত্তি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি যতটা অনুদার মনে হয় তাঁর *এলিমেন্টস অব ল'* গ্রন্থের বিচারে ততটা সংকীর্ণ মনে হয় না। এখানে সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ততটা কঠোর মনে হয়নি। হবস গৃহযুদ্ধ পূর্বকালীন লেখনীসমূহে প্রাকৃতিক অধিকারের স্থান নির্দেশ করেছেন রাষ্ট্রের পূর্বে। সম্ভবত তিনি রাজনৈতিক সমাজের পূর্বে ব্যক্তির অধিকার ও সম্পত্তির অধিকারকে স্থান দিয়েছেন। সম্পত্তিকে প্রাকৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান দ্বারা।

লক

সম্পত্তি সম্পর্কে লকের ধারণা সুস্পষ্টরূপে হবস এবং রুশো অপেক্ষা স্বতন্ত্র। লকের সম্পত্তিতত্ত্বের সাথে আমেরিকার অর্থনীতির একটি নিবিড় সম্বন্ধ আমরা লক্ষ করি। *Second Treatise* গ্রন্থে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির আলোচনাকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থ, অর্থনীতি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং এ থেকে উদ্ভূত জটিলতা লকের রাজনীতির তথা রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম মূল ভাবনারূপে পরিগণিত হয়েছে।[২৯] সম্পত্তিতত্ত্বে লকের ভাবনা তাঁর পূর্বে প্রচলিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা ভিন্ন। যেমন- প্রাচীন রাষ্ট্রদর্শনে সম্পত্তির যে অবস্থান আমরা লক্ষ করেছি তাতে সমাজের ক্ষেত্রে সম্পত্তির একটি আদর্শবাদী ধারা দেখা যায়। আর আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় লক সম্পত্তির সম্পূর্ণ বস্তুবাদী ধারা অঙ্কন করেছেন যাতে সম্পত্তি সমাজের যে কোন অর্জনের পশ্চাতে উদ্দেশ্যরূপে গণ্য হয়েছে। লক রাজনীতি এবং অর্থনীতির মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছেন, যাতে বলা যায়, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই লকের সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। লক বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানব অস্তিত্বকে স্থিতিশীলতা প্রদান করেছে। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারীগণ নিজেরাই নিজেদের যত্ন-সুরক্ষায় সমর্থ হয়েছে।[৩০] লককে আধুনিক রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্যতম স্থপতি বলা যায়। ম্যাকফার্সন *Social Bearing* প্রবন্ধে লককে একজন সুখবাদীরূপে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লকের সম্পত্তিতত্ত্বে সম্পত্তির ভূমিকাটি গৌন করে দেখেছেন এবং তিনি মনে করেন ব্যক্তির বৌদ্ধিক আচরণের মূলে রয়েছে আনন্দের সংমিশ্রণ।[৩১]

মার্কিন চিন্তাবিদ জন রলস তাঁর *Theory of Justice* (1971) গ্রন্থে প্রচলিত উপযোগবাদী নীতির সমালোচনা করে একটি উদার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের চাহিদা ও প্রাপ্তির বিষয়টিকে তুলে আনেন। প্রচলিত উপযোগবাদী নীতিবিদ্যায় সর্বাধিক সংখ্যক সুখকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। সমস্যাটা হলো, যখন সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সুখের কথা বলা হয় তাহলে সে সুখের মাঝে ইন্দ্রিয় সুখ না কি মনস্তাত্ত্বিক সুখ প্রধান্য পেল তা গুরুত্ব পায় না। কিন্তু এটাও সত্য যে, কেবলমাত্র তাৎক্ষনিক ইন্দ্রিয় সুখের অন্বেষণ ব্যক্তির নৈতিক জীবনযাত্রার সাথে গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। কেবলমাত্র স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ অথবা জাগতিক সুখ বা দৈহিক সুখের প্রয়াস ব্যক্তির নৈতিকতার বিষয়টিকে মূল্যহীন করে তোলে। এধরণের পরিস্থিতিতে নৈতিকতার

বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে জন রলস আর্থ-সামাজিক সম্পদ বণ্টনের ন্যায্যতার বিষয়টি সামনে আনেন তাঁর *Theory of Justice* গ্রন্থে। দ্বারা হবসের মাধ্যমে উদারতাবাদী চিন্তার বীজ রোপিত হয়েছে বলে লোপাটা মনে করেন। তাই লোপাটা লককে নয় হবসকে ব্রিটিশ উদারতাবাদের জনক দাবি করেন।[৩২]

লকের রাষ্ট্রচিন্তায় সম্পত্তির ধারণা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের মাঝে সম্পত্তির ধারণা ও অধিকার ছিল। সম্পত্তির অধিকারকে নির্বিঘ্ন করার জন্য বা সম্পত্তির সুরক্ষা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রকৃতির রাজ্যের প্রাক-রাজনৈতিক জনগণ রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। লকের ভাষায় "the reason why men enter into society is the preservation of their property."[৩৩] এ উক্তি থেকে প্রতিভাত যে প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তির ধারণা ছিল এবং প্রকৃতির রাজ্য তথা রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেও সম্পত্তি নামক প্রতিষ্ঠান ছিল। রাজনৈতিক সমাজে সরকারের দায়িত্ব হলো সম্পত্তি নামক প্রতিষ্ঠানটির সুরক্ষা বিধান করা। রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির পূর্বেও সম্পত্তি নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃতির রাজ্যে বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণের পর সরকারের প্রধান কাজ ছিল এ প্রতিষ্ঠানটিকে সুরক্ষিত রাখা।[৩৪] রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তির প্রাকৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের দরুন রিচার্ড শ্ল্যাটার লকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতত্ত্বকে অভিহিত করেছেন বুর্জোয়া তত্ত্ব বা চিরায়ত উদারতাতত্ত্ব নামে।[৩৫]

লকের সম্পত্তিতত্ত্বে সম্পত্তির ধারণাতে ব্যক্তিগত মালিকানার দাবিটি যেভাবে স্পষ্ট হয়েছে তার পূর্বে প্রাকৃতিক আইনের দার্শনিকবৃন্দের (প্রাকৃতিক আইনের সমর্থক দার্শনিকবৃন্দের মাঝে আছে পুফেনর্ডফ, গ্রোটিয়াস প্রমুখ) লেখনীতে এর বিপরীত ধারণা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া প্রাচীন রাষ্ট্রচিন্তায়ও মোটামুটি এরকম ধারণা লক্ষণীয়। যাতে সম্পত্তির ওপর কোন ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতির পরিবর্তে মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতির অবাধ সরবরাহকৃত সম্পদ (যেমন– আলো, বাতাস) গ্রহন করতে পারত। সম্পত্তি বলতে আধুনিককালে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্বশীলতার সাথে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মাধ্যমে সম্পত্তির উপর ব্যক্তির মালিকানার দাবিটি জোরালো রূপ লাভ করে। সম্পত্তির মালিকানাকে সুরক্ষিত করার প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাজে প্রয়োজন দেখা দিল আইনের। সম্পত্তির উদ্ভব সমাজে অধিকার ও সাম্যের বিতর্ককে আরো বেগবান করে। তবে কোনো কোনো রাষ্ট্রদার্শনিক[৩৬] মনে করেন সম্পত্তির উদ্ভব রাষ্ট্র সৃষ্টির পর, পূর্বে নয়।

লকের সম্পত্তিতত্ত্বে জনগণ প্রাকৃতিক অধিকার সহযোগে যে রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তুলল তাতে প্রাধান্য পায় তাদের সম্পত্তির অধিকার এবং এ অধিকার ব্যক্তির হাতেই ছিল। লকের তত্ত্বে রাষ্ট্রে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার নতুনভাবে সৃষ্টি হয়নি বরং ব্যক্তি প্রকৃতির রাজ্য থেকেই সম্পত্তির অধিকার ধারণ করতো। সরকার গঠনের পর ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে ব্যক্তির সম্পত্তির এই অধিকার (আংশিক বা পুরোপুরি যা হোক) সরকার হরণ করতে পারবেনা বলে লক মনে করেন।[৩৭] অবশ্য সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় ব্যক্তির সম্মতি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মতি ব্যতীত সরকারের পক্ষে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সংযোজন বা বিয়োজন (আইন, কর রাজস্ব ইত্যাদি) সম্ভব নয়। যদি তা করা হয় সেটি হবে আইনের লঙ্ঘন।

কেন্ডাল অধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নে লককে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অপেক্ষা অধিকতর সামষ্টিকতাবাদীরূপে দাবি করেছেন। সম্পত্তির মালিকানার প্রশ্নে যদিও তিনি সম্মতির কথা বলেছেন তবে তিনি প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত সম্মতি এবং মালিকানাকেই জোরারোপ করেছেন। লকের ভাষায় 'every man has a property in his own person; this nobody has any right to but himself. The labour of his body and the work of his hands we may say are properly his'।[৩৮] অর্থাৎ ব্যক্তির স্বীয় শ্রমলব্ধ কাজ তার সম্পত্তিরূপেই গণ্য হবে। ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিরই কেবল অধিকার থাকবে।

কেন্ডাল মনে করেন, প্রাকৃতিক আইনের উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানবজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং ঈশ্বর মানুষের কাছে পৃথিবীকে দিয়েছেন সার্বিকভাবে। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর তার কাছে ব্যক্তিগত সম্পদ তবে যে সম্পত্তির অধিকারে ব্যক্তি তার শ্রম নিযুক্ত করেছে সে শ্রম থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে ব্যক্তির একার নয় বরং সামষ্টিক অধিকার বলে তিনি মনে করেন। অধিকন্তু, লক নিজেই বলেছেন একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজন বা ব্যবহারের অধিক সম্পদের মালিকানা দাবি করবে না, অতিরিক্ত সম্পদ ব্যক্তি সার্বিক উত্তরাধিকারের অংশরূপে অপরাপর জনসাধারনের জন্য বিলি করবে। কেন্ডাল দাবি করেন, সম্পত্তির অধিকার, প্রকৃতপক্ষে, কেবলমাত্র ব্যক্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত নয় অধিকন্তু মানুষের সামষ্টিক উত্তরাধিকারের প্রতি দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পৃক্ত।

লক মনে করেন সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার কিংবা মালিকানা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্মতি নয় বরং ব্যক্তির শ্রমই নির্নায়ক। সম্মতি মুখ্য নয় কারণ ঈশ্বর সকলের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ দিয়েছেন তার প্রয়োজন মেটাতে; অত:পর ব্যক্তি স্বীয় শ্রম আরোপের দ্বারা তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের ওপর প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি-সাপেক্ষে মালিকানা স্থাপনের বিষয়টি খুব একটা সঙ্গত বোধ হয় না। লকের মতে, 'to insist on consent would be to condemn men to starvation in the midst of God's plenty.'[৩৯]

সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে লক রাজনৈতিক নয় প্রাকৃতিক অধিকারকে যুক্ত করেছেন। শ্রমের সাথে সম্পত্তির অধিকার সংযুক্ত। লকের সম্পত্তিতত্ত্বের প্রথম ধারণাটি হলো টিকে থাকার যুক্তি (the agrument from survival)।[৪০] এ যুক্তি দ্বারা লক বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতিতে সব কিছু মানুষের জন্য সমান ভাবে ছিল। প্রকৃতিতে সম্পদের সমতাপূর্ণ অবস্থা থেকে সে সম্পদ কিভাবে ব্যক্তিগত হলো তা নির্দেশে লক মৌলিক প্রাকৃতিক আইনকে গ্রহণ করেছেন। যেমন- লকের মতে একজন ব্যক্তি প্রকৃতি প্রদত্ত আপেলটি যখন বাগান থেকে সংগ্রহ করল তাহলে উক্ত আপেলটির উপর ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা ব্যক্তির সম্পত্তিতে পরিণত হয়।[৪১] অবশ্য এতে এমনটা দাবি করার সুযোগ নেই যদি বাগানের সব আপেল একজন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেয় তাহলে সে সকল আপেলের মালিক হবে। লক এক্ষেত্রে বলেছেন একজন ব্যক্তি ততটা সম্পদ তার সংগ্রহে রাখতে পারবে, যতটা সে ব্যবহার করতে পারবে অপচয় করবে না এবং অপর ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন যেন তার দ্বারা বাধাগ্রস্থ না হয় (এটাকে সাধারণত লকীয় প্রোভিসো বলা হয়)। লক সম্পত্তির অপচয়কে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন। কারণ তা প্রাকৃতিক আইন বা নিয়মের বিরোধী। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী কোন ব্যক্তি যতটা সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবে ততটা (সম্পত্তি) সে সংগ্রহ করবে অর্থাৎ নিজের অধিকারে রাখবে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পত্তিতে সকল মানুষের অধিকারে রয়েছে।

লকের সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনা থেকে কিছু বিষয় স্পষ্ট। যেমন– তিনি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করেছেন, সম্পত্তির উৎস প্রাকৃতিক হলেও তাতে সকলের অধিকার রয়েছে, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পত্তিতে ব্যক্তি স্বীয় শ্রমারোপ দ্বারা সে সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত অধিকারে নেয়-আবার তা হলেও ব্যক্তি একচ্ছত্রভাবে সকল সম্পত্তির মালিকানা দাবি করতে পারবে না। ব্যক্তির ব্যক্তিগত শ্রম সাধারণের জমিকে (common land) ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। উল্লেখ্য, অপচয় রোধের তীব্র আবেদন জানানোর দ্বারা লক অপরাপর জনগণের জন্য সম্পদের বণ্টন রেখেছেন বলা যায়। তবে সম্পদের সমতাভিত্তিক বণ্টনের কোনো ব্যবস্থা লকের কাছে লক্ষণীয় নয়। যদিও সম্পদের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় তিনি কিছু ক্ষেত্রে সরব হয়েছেন।

সম্পত্তির অধিকার এবং মালিকানা সংক্রান্ত আলোচনার যথার্থতা নিরূপণে এক বহুত্ববাদী সমন্বয় স্টিফেন মুনযার। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির যথাযথ বণ্টন এবং মালিকানার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিও প্রস্তাব করেছেন। মুনযারের এ নীতিতে তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছেন উপযোগবাদ, কান্টীয় এবং রলসীয় ধারার ন্যায্যতার বিবেচনা। পাশাপাশি তিনি ব্যক্তির কাজ অনুযায়ী যা প্রাপ্ত তাকে তা দেওয়ার এ বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

বিবেচনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[৪২] এভাবে মুনযার সম্পত্তির যথাযথ বণ্টন এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য এক বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

লক বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শ্রম পরস্পর সম্পর্কিত। শ্রমই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে সামষ্টিক সম্পত্তির পার্থক্য তৈরি করে। তবে শ্রম দ্বারা মালিকানা স্থাপনের প্রশ্নে লকের এ বক্তব্যটি স্পষ্ট নয়। ব্যক্তির শ্রম যদি সম্পত্তিতে মালিকানা দাবির সূত্র হয় তাহলে শ্রমিক ও মালিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটত। কিন্তু লকের সম্পত্তিতত্ত্বে তিনি মালিক শ্রেণির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। শ্রমিকদের প্রদত্ত শ্রমকে তিনি অর্থের বিনিময়মূল্যে বিচার করেছেন। এতে স্পষ্টতই সম্পত্তিতে শ্রমভিত্তিক মালিকানার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। লকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতত্ত্বের ধারণাটি আত্মকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট বলা যায়।[৪৩] তাঁর সম্পত্তিতত্ত্বের (জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা) প্রতি ক্ষেত্রে ব্যক্তির একক স্বার্থ প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তিস্বার্থের রক্ষণাবেক্ষনে তিনি অধিক উদ্যোগী ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি আঘাত সরকারের পরিবর্তন ঘটায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই ট্রাস্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সরকারের উদ্ভব। যদিও সম্পত্তিতত্ত্বের আলোচনার কিছু ক্ষেত্রে তিনি সামষ্টিক স্বার্থের বিষয়টি আলোচনা করেছেন তথাপিও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অধিকার অগ্রগণ্য হয়েছে। হবস ও লকের তত্ত্বসমূহ ছিল অহংবাদী।[৪৪] হবস ও লক উভয়ের সম্পত্তি সংক্রান্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষা করার জন্য সমাজ টিকে থাকে এবং এগুলোকে সমাজ সৃষ্টি করতে পারে না। স্যাবাইন মনে করেন লকের তত্ত্ব হতে অষ্টাদশ শতকে যে মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হয় তা মানব আচরণের ব্যাখ্যায় ছিল অহংবাদী।[৪৫]

লকের সম্পত্তিতত্ত্বে এটি স্পষ্ট যে সম্পত্তির অধিকার মানুষের প্রাক-রাজনৈতিক অধিকার। তাই সম্পত্তির মালিকানায় সমতার বিষয়টি গৌণরূপেই লকের তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর উদারনৈতিক চিন্তাধারায় সামাজিক বৈষম্য স্বীকৃতি পেয়েছে। লক মনে করেন, সামাজিক বৈষম্য হলো একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং এটি ঈশ্বরের সৃষ্ট। যেমন- 'আমার ভৃত্য যে ঘাস কাটে তাতে আমার স্বাভাবিক অধিকার'– লকের এধরণের বক্তব্যে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন এবং পুঁজিবাদী মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। আবার শ্রমই সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তার এধরণের অবস্থানের ব্যত্যয় লক্ষিত হয়। এখানে শ্রম অপেক্ষা পূর্বমালিকানা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। লকের মতে, সম্পত্তিগত বৈষম্য মানুষ স্বীয় সম্মতিতে মেনে নিয়েছে। সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে লক আদর্শিক নয় বরং বুর্জোয়া ভাবাদর্শ অনুসরণ করেছেন বলা যায়। লকের কাছে রাজনৈতিক শক্তি বা প্রতিষ্ঠানরূপে রাষ্ট্র ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং সরকার এবং রাষ্ট্রের গুরুত্ব তাহলে, যখন তা মানুষের সম্পত্তির সুরক্ষা দিতে সক্ষম। তাই লক কেবলমাত্র বেঁচে থাকাকে শান্তি ও নিরাপদ মনে করেন না। যখন রাজনৈতিক সমাজ ও সংগঠন ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকারসমূহকে সুরক্ষিত করে, ব্যক্তিকে সুবিধা দেয় তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পান লক। সম্পত্তির প্রতি এধরণের দৃষ্টিভঙ্গিই লককে সমকালীন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার প্রকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বকারীরূপে তুলে ধরেছে।

যদিও প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেকেই স্ব স্ব কাজের বিচারক ছিল কিন্তু রাজনৈতিক সমাজে এ ব্যাপারটা আর থাকল না। এ সমাজে সরকার সে ভূমিকাটি গ্রহণ করে। সম্পত্তিতে ব্যক্তির স্ব স্ব মূল্যায়ণ কিংবা বিচারের পরিবর্তে আইন ও আদালত ব্যক্তিগত সম্পত্তির সুরক্ষার দায়িত্ব নিল। তাই লক মনে করেন, সরকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অর্জন এবং সুরক্ষা বিধানে সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নিষ্পত্তি আইনের (Settled Laws) সাহায্য নিল। সে লক্ষ্যেই কিন্তু প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের প্রাক্কালে লক একজন বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষ বিচারকের প্রয়োজন অনুভব করেন। বিচারক যদি নিরপেক্ষ না হন তাহলে যে কোনো আইনি সমস্যার যথার্থ সমাধান আশা করা যায় না। বিশেষত ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদসমূহ ব্যক্তির মাঝে সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের জন্ম দেয়।[৪৬]

লক মনে করেন সরকারের কাজ হচ্ছে জনগনের অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা।[৪৭] (জনগণের অধিকার হলো তাদের সম্পত্তির অধিকারসমূহ, যথা- 'জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি'র অধিকার)। প্রকৃতির রাজ্য ও রাজনৈতিক

জীবন উভয়ক্ষেত্রেই জীবনের প্রতি অধিকার উদ্ভূত হয় আত্মসংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা থেকে। স্বাধীনতার অধিকারকে লক যুক্ত করেছেন সরকারের উপস্থিতির সাথে, যেখানে সরকারের অস্তিত্ব টিকে থাকে সাধারণ সম্পত্তিতে। আর সম্পত্তি সম্পর্কে লকের যে মত তাতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ও সম্পত্তির নিরাপত্তাকে জোরদার করার লক্ষ্যে তার রাজনৈতিক সমাজের সরকারব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। লকের সম্পত্তিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন থমাস জেফারসন।[৪৮] জেফারসনও লকের মতো মনে করেন সরকারের উদ্দেশ্য হলো জীবন, স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করা এবং আনন্দের অন্বেষন। জেফারসনের আনন্দ অন্বেষণের ধারণাটি উদ্ভূত হয়েছে লকের *An Essay Concerning Human Understanding* থেকে।[৪৯] জেফারসনের সরকারের ধারণায় তিনিও লকের মতো মনে করেন শাসিতের সম্মতি সরকারের ভিত্তি। এছাড়াও জেমস ম্যাডিসন[৫০] প্রমুখ আমেরিকার সংবিধান ও সরকার সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠায় লকের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলন।

আঠারো শতকের জ্ঞানালোক যুগের দর্শনে লক এবং রুশোর রাষ্ট্রভাবনা আমেরিকা এবং ফ্রান্সে বিশেষত সম্পত্তি এবং সরকার বিষয়ে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। লকের সম্পত্তিতত্ত্ব আমেরিকার বিপ্লবে এবং রুশোর সম্পত্তি সম্পর্কিত ভাবনা প্রভাবিত করেছে ফরাসি বিপ্লবকে। লকের সম্পত্তির ধারণা গৃহীত হয়েছিল বৃটেনের র‍্যাডিকেল হুইগদের দ্বারা এবং পরবর্তীতে তাদের দ্বারা আমেরিকার কলোনীসমূহ প্রভাবিত হয়। আমেরিকার বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে *সেকেন্ড ট্রিটিজের* ১৩৪ নং সেকশনটি প্রায়শ ব্যবহৃত হয়।[৫১] এতে লক বলেছেন, একজন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শক্তি কোনো ব্যক্তির কাছে হতে সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।[৫২] তিনি আরো বলেন, ব্যক্তির সম্মতিই হলো তার সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অন্যথায় ব্যক্তির সম্পদের কোনো অংশ বা সম্পদ ব্যক্তির অধিকারে থাকে না। প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে পদাপর্ণের দ্বারা ব্যক্তি তার আত্মরক্ষার্থে যা প্রয়োজন তা নিজে না করে আইনের দ্বারস্থ হলো। সমাজে প্রচলিত আইনের দ্বারা মানুষ তার সুরক্ষা প্রত্যাশা করে। সমাজের কাছে মানুষ সমতা, স্বাধীনতা এবং নিজের হাতে থাকা আইন প্রয়োগের ক্ষমতাকে হস্তান্তর করল।[৫৩]

জনগণ প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করেছে জীবন, স্বাধীনতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।[৫৪] লক নিজেই বলেছেন জনগণ কমনওয়েলথ গঠন করেছে এবং সম্পদের অধীনে একত্রিত হয়েছে তাদের সম্পত্তিকে সুরক্ষিত করার জন্য।[৫৫] লকের রাজনৈতিক সমাজে সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিকে নাগরিকের মর্যাদা দেয় এবং সম্পত্তিহীন ব্যক্তির অবস্থান রাজনৈতিক সমাজে দাস সমতুল্য।[৫৬] তাহলে এটি স্পষ্ট যে সম্পত্তি ব্যক্তিকে নাগরিকের মর্যাদা প্রদান করেছে এবং সম্পত্তির মালিকানা ব্যতীত ব্যক্তি সমাজে দাসের মর্যাদাভুক্ত। লকের সম্পত্তিতত্ত্বের সাথে স্পষ্টভাবে জড়িত শ্রেণিভিত্তিক সমাজের ধারণা। লক বিশ্বাস করেন যদি অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক অভিজাতগণ (Political Elites) রাষ্ট্রের সাধারণ জনগনের সম্পত্তি অর্জনের জন্য আইন প্রনয়ণ না করে তবে শ্রেণিসংঘাত থাকবেই।[৫৭]

কোনো দেশের কোনো জমি যদি অনাবাদী থাকে এবং জনগণ দরিদ্র থাকে, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির আইন এতদূর বিস্তৃত হয়েছে যা ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকারকে হরণ করে; যে প্রাকৃতিক অধিকার ব্যক্তিকে শ্রম এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহারের সাধারণ সুযোগ দিয়েছে।[৫৮] লকের সম্পতিতত্ত্ব সম্পত্তি এবং করারোপের ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে।[৫৯]

জেরেমি ওয়ালড্রোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত যুক্তিসমূহ বিচারমূলক পর্যালোচনা করে– (বিশেষত লক, নোজিক এবং হেগেল-এর) এতে তিনি বণ্টনগত ত্রুটি চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে একটি সমাজে কিছু লোকের প্রচুর সম্পত্তি এবং কারো কোনো সম্পত্তি না থাকার অধিকারের যথার্থ ভিত্তি থাকতে পারে না। সম্পত্তি হলো মানুষের

অধিকার– এ স্লোগানটি আধুনিক পুঁজিবাদী দেশসমূহে বিদ্যমান সাংঘাতিক অসমতাকে বৈধতা দানের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৬০]

জেমস গ্রুনেবম সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার যথাযথ বা বৈধ স্থাপনের জন্য স্বায়ত্ত্বশাসিত মালিকানার (যার দ্বারা প্রাকৃতিক এবং উৎপাদিত সম্পদের উপর স্ব-অধিকার থাকবে) দাবি করেন। প্রাকৃতিক এবং উৎপাদিত সম্পদের ওপর অপর অপেক্ষা ব্যক্তির যথার্থ স্বীয়মালিকানার একটি চিত্র প্রদানের চেষ্টা করেন। গ্রুনেবম 'স্বায়ত্ত্বশাসিত মালিকানা'র এধরণের দাবি দ্বারা এমন এক অধিকারের চিত্রাঙ্কন করেন যা মূলত গড়ে উঠেছে ব্যক্তির পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের সম্পর্ক দ্বারা। তিনি একে যে কোনো সমাজের যৌক্তিকভাবে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। গ্রনেবমের মতে সবধরণের মালিকানার রয়েছে এক প্রকার 'প্রয়োজনীয় যৌক্তিক কাঠামো'।[৬১] এ কাঠামোর সাহায্যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী অধিকার নির্ধারণ করে । যে প্রক্রিয়া দ্বারা অধিকারের অর্জন, হস্তান্তর এবং বিচ্ছিন্নতা নির্ধারিত হয়।[৬২] এ ধরণের কর্মপ্রক্রিয়ায় তিনি ব্যক্তি, সমাজ, প্রকৃতির এবং সামাজিক সম্পর্ক সমূহের মধ্যকার যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে ব্যক্তিগত এবং বিচারিক চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত মালিকানার প্রস্তাব করেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। অবশ্য এধরণের মালিকানার ক্ষেত্রে তিনি যে অন্যতম মানদণ্ডটি গ্রহণ করেন তা হলো Òto each according to his needs''.[৬৩] স্বায়ত্ত্বশাসিত মালিকানা কেবল কোনো একক ব্যক্তির জন্য নয় ব্যক্তিগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। এর দ্বারা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী তার বা তাদের সামর্থ্যকে সম্পদ এবং স্বীয় ভূমিকাতে ধারণ করতে পারে। তাঁর মতে, ÒIndividual ownership of self and labor must include the rights to use and manage one's labor, the right to whatever income can be earned by one's labor, and the right to give or to exchange portions of one's labor with others.''[৬৪] স্বায়ত্তশাসিত মালিকানার এ মডেলে ভূমি বা সম্পদে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দের অধিকার রয়েছে কীভাবে এ ভূমি এবং সম্পদ ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের।[৬৫] গ্রুনেবমের এ মডেলটি 'স্বায়ত্ত্বশাসিত মালিকানা' বলা হয় কারণ এটি স্বায়ত্ত্বশাসনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। লক্ষনীয় হলো, গ্রুনেবমের এ সমাধানটিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে স্বীয় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে অপরের স্বার্থ যেন ক্ষুন্ন না হয়। অপরের অপরিহার্য কল্যাণ যেন নষ্ট না হয়।

লকের সম্পত্তিতত্ত্বের পর্যালোচনাতে এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় । তাঁর সম্পত্তিতত্ত্বের দ্বারা সে সময়কার মানব চরিত্রের একটি চিত্র আমরা পাই যাতে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠা বা দাবি স্পষ্ট দৃশ্যমান। পক্ষান্তরে মধ্যযুগের দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখি প্রাচীনকাল থেকে এ সময়কাল পর্যন্ত সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামষ্টিক তথা সামাজিক মালিকানা। পরবর্তীকালে সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গন এবং মধ্যবর্তী শ্রেণির উদ্ভবের ফলে সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার দাবি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সম্পত্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রন বা কর্তৃত্বের অবস্থান হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিমণ্ডলে ও ব্যক্তির মননে রেঁনেসারও একটি ভূমিকা রয়েছে।

সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অধিকতর পর্যালোচনায় বলা যায়, অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের দ্বারা প্রকারান্তরে ক্ষমতাও সামষ্টিকতা থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে উপনীত হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বা ক্ষমতা, অধিকার, স্বাধীনতা, সমতা, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়সমূহও বৃহত্তর পরিমণ্ডল থেকে ক্ষুদ্র পরিমণ্ডল অর্থাৎ সমষ্টি বা গোষ্ঠীগত অবস্থা থেকে একক বা ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বিবেচনা লাভ করে। ফলে সামাজিক মূল্যবোধ সমূহের মাঝেও পরিবর্তন আসতে থাকে।

লকের সম্পত্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণে বলা যায় সম্ভবত সম্পত্তিতে রাজপরিবারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করার জন্য লক ব্যক্তিগত মালিকানাকে অধিকতর সুসংহত করেছেন। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের প্রাক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে

জনগণের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা তিনি বিধৃত করেছেন। এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্র ব্যবস্থা উদ্ভবের পূর্বেও বিরাজমান ছিল। প্রকৃতির রাজ্যে লক সম্পত্তির যে ব্যক্তি মালিকানা নির্দেশ করেছেন তা কোনো রাজনৈতিক সমাজে অধিগত নয়। এ প্রসঙ্গে গফ বলেন, লক প্রকৃতির রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা স্বীকৃতি দিয়েছেন কিন্তু তিনি কোনো সরকারের অধীনে তথা সরকারব্যবস্থার আওতাধীন কোনো নাগরিকের সম্পত্তির নির্দেশ করেননি।[৬৬] গফের এ বক্তব্য থেকে আমরা বলতে পারি প্রাথমিক অবস্থায় ব্যক্তি স্বীয় সম্পত্তিতে কোনো কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়নি। পরবর্তীতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ব্যক্তি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণার্থে ট্রাস্ট নামক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ করে।

আবার সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রসঙ্গে লকের অবস্থানটি সংশয়াপূর্ণ মনে হয় যখন তিনি *সেকেন্ড ট্রিটিজ* এ অনেকটা রবার্ট ফিলমারের সুরে সম্পত্তিতে ঈশ্বরীয় মালিকানার বা সংযুক্তির বিষয়টি যুক্ত করেন। ফিলমার তাঁর *প্যাট্রিয়ার্কা* গ্রন্থে যেভাবে রাজতান্ত্রিক শাসনকে ঈশ্বরের নির্দেশ বা ইচ্ছারূপে বোঝাতে চেয়েছেন তদ্রুপ লক প্রকৃতির রাজ্যের এ সম্পত্তিতে ঈশ্বরকে সম্পর্কিত করেছেন । যেমন– লক যখন বলেন ঈশ্বর মানবজাতির কাছে পৃথিবীকে সাধারণভাবে (in common) দিয়েছেন, সে সাথে মানুষকে ঈশ্বর দিয়েছেন বুদ্ধিমত্তা যার সাহায্যে তারা প্রকৃতি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে সম্পত্তি সাধারণ অবস্থায় ঈশ্বর কর্তৃক সার্বিকভাবে প্রদত্ত হয়েছিল অর্থাৎ ঈশ্বর কিন্তু ব্যক্তিমালিকানাকে প্রচলন করেননি। বরং মানুষ তার শ্রমের মাধ্যমে স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করল। লক ব্যক্তিগত শ্রমের বিষয়টি দ্বারা সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানাকে বৈধতা দিলেন। যেখানে স্বীয় শ্রম প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত সম্পত্তি ঈশ্বরের প্রদত্ত দানরূপে বিবেচিত হয়। অবশ্য স্যার ফ্রেডেরিক পোলক লকের এধরণের মতের বিরোধিতা করেন। পোলকের মতের সাথে মিল পাওয়া যায় রোমান আইনের। রোমান আইন কিংবা স্যার পোলক উভয়ে একে মন্দ আইন বলে অভিযোগ করেন। পোলকের মতে, ব্যক্তিগত সুরক্ষা, সম্মান ইত্যাদি বিষয়ে একজন ব্যক্তির অধিকার বাজারজাতকরণ কিংবা হস্তান্তর সম্ভব নয় এবং তা লক উল্লিখিত সম্পত্তির অধিকার অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। এ বিষয়ে পোলক মন্তব্য করেন, Locke's attempt to make an extended conception of Occupation bear whole burden of property was eminently that of an ingenious layman."[৬৭]

সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানার প্রশ্নে আরেকটি দিক হলো– লক যখন দাবি করেন ব্যক্তি তার ইচ্ছামত সম্পত্তির মালিক হতে পারে যতক্ষণ ব্যক্তি তা নষ্ট না করে এবং অপরের স্বার্থকে সংকুচিত না করে। কাজেই ব্যক্তির যত ইচ্ছা তত সম্পদ অধিগ্রহন বা মালিকানার বিষয়টিকে লক নিজেই ব্যক্তিকর্তৃক সম্পত্তির তছরূপ না হয় (before spoils) এ শর্ত দ্বারা সীমিত করেছেন। যদি ব্যক্তি তার ভাগের অতিরিক্ত গ্রহণ করে যা অন্যের আবার ব্যক্তি যদি সম্পত্তির অপচয় করে তবে শাস্তির জন্য বিবেচিত হবে।[৬৮] লকের এ বক্তব্য কেবল ব্যক্তিমালিকানা তথা ব্যক্তিস্বার্থের প্রতিফলন না বরং ব্যক্তিগত সুবিধার পাশাপাশি সামষ্টিক সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণের চিত্র। একই সাথে ব্যক্তির দায়বদ্ধতা ও সম্পত্তির অধিকারের সীমারেখা।

লক সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের সাথে শ্রমের সংযোগ ঘটালেন শ্রমের মূল্যতত্ত্বে। লক নিজেই বলেছেন শ্রমই সবকিছুতে মূল্যের পার্থক্য তৈরি করে। লকের শ্রমের মূল্যতত্ত্ব পরবর্তীতে আঠার শতকের অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এমনকি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ এর *Wealth of Nations* গ্রন্থটিতে লকের সম্পত্তিতত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সম্পত্তিতত্ত্বে শ্রমের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বলা যায় লক এখানে স্পষ্টতই পুঁজিবাদী শ্রেণির বা মালিক শ্রেণির স্বার্থসংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পণ্য উৎপাদনকারী অপেক্ষা বাজারজাতকারী অর্থাৎ শিল্প শ্রমিক অপেক্ষা শিল্পের মালিক বা কর্তৃপক্ষের জন্য অধিক ভেবেছেন। বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ততটা সোচ্চার নন।

অর্থাৎ লক মালিক পক্ষের শ্রমের বিষয়ে ভেবেছেন কিন্তু মালিককে পণ্যটি বাজারজাতকরণের উপযোগী করে উৎপাদনের নেপথ্যে যারা কাজ করে তাদের বিষয়ে লকের ভাবনায় গুরুত্ব দেখা যায়নি (যা পরবর্তীতে সমাজতান্ত্রিক ধারার লেখনীতে গুরুত্ব পেয়েছে)। উনিশ শতকে রিকার্ডো এবং তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে অর্থমূল্য-বিনিময় মূল্যে নির্দেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে লকের কাছে (অনুরূপ এরিস্টটল এবং আরো অন্যান্যদের কাছে) অর্থমূল্য ব্যবহারের মূল্য নির্দেশিত হয়েছে।[৬৯]

লক সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষার সাথে সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকাকে সংযুক্ত করে দুয়ের মাঝে পার্থক্য করতে অসমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান দ্বারা সরকারের সাফল্য নির্ধারণ করে লক একজন ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি অধিকার এবং একটি সরকারের রাজনৈতিক সাফল্য এ দুয়ের মাঝে পৃথকীকরণে ব্যর্থ হয়েছেন।[৭০] লকের সম্পত্তিতত্ত্বের এধরণের চেতনার সাথে আমরা সাদৃশ্য লক্ষ করি সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার যাতে সম্পত্তি ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা সংমিশ্রিত হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে।

লকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে বণ্টনমূলক ন্যায্যতার প্রশ্নটি প্রায়শ উত্থাপিত হয়। বণ্টনমূলক ন্যায্যতার সর্মথকগণ মনে করেন সম্পত্তির সুষম বণ্টন ন্যায্যতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কেননা ধনীদের সম্পত্তির সৃষ্টি ও প্রসারে গরীবদের ভূমিকা রয়েছে বলে গরীবরাও সম্পত্তির ন্যায্য দাবীদার। লকের সম্পত্তিতত্ত্বে ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে বণ্টনমূলক ন্যায্যতার বিষয়টি স্পষ্টতই উপেক্ষিত হয়েছে। তাঁর সম্পত্তিতত্ত্ব পুঁজিবাদী ধারাকে বিকশিত করার পাশাপাশি ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ধাবিত করে। সম্পদের অসমতা ঘনীভূত করার দ্বারা শাসক শোষিতের বৈষম্যকেই প্রকটিত করে। যদিও শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিপতি শ্রেণি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে তবে শেষপর্যন্ত বিত্তহীন শ্রেণি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার স্বাধীনতা হারায়।

পক্ষান্তরে যারা বণ্টনমূলক ন্যায্যতার বিরুদ্ধে তাদের যুক্তি হলো সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টি কোন জন্মদিনের উৎসবের কেক অতিথিদের মাঝে ভাগাভাগি কিংবা শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের তাদের মেধার ভিত্তিতে বণ্টনের মতো নয়।[৭১] তারা মনে করেন সম্পত্তি প্রকৃতিতে অপরিশোধিত অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে। ব্যক্তি তার শ্রম, সামর্থ্য, মেধা ইত্যাদির ভিত্তিতে সে সম্পত্তিকে আহরণ দ্বারা সম্পত্তিতে স্বীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে। তাই এ বিষয়ে কেউ কারো দ্বারা তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন দাবিকে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য তারা মনে করেন না।

যদিও বণ্টনমূলক ন্যায্যতার সমর্থকগণ মনে করেন সম্পত্তির যথাযথ বণ্টনে রাষ্ট্র তার অর্থনীতিকে যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে সংগঠিত করার দ্বারা এ ন্যায্যতার জন্য কাজ করতে পারে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের এ দাবি সমাজতান্ত্রিক ধারার দাবির সাথে সাদৃশ্যময়। সমাজতান্ত্রিকগণ মনে করেন, যদিও আধুনিককালে প্রচুর তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়েছে তবুও বণ্টনব্যবস্থার মানদন্ড নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে এবং তা করতে হবে অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বা দক্ষতা বা সক্ষমতাকে পরিহার না করে।[৭২] আর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অবস্থানটিকে স্পষ্ট করা সম্ভব হলে বণ্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকর্তৃক সমতার নীতিসমূহ কতদূর পর্যন্ত বাস্তবায়িত হতে পারে তা ধারণা করা যায়।

লক ব্যক্তিগত শ্রমারোপের দ্বারা সম্পত্তির যে ব্যক্তিগত মূল্য নির্ধারণ করেন তার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় রর্বাট নোজিকের "আত্ম-মালিকানা" (sefl-ownership)[৭৩] এর ধারণার। এ ধারণা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্বীয় শরীর, শ্রম, মেধা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পদ প্রাকৃতিক অধিকার বলে উপভোগ করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যক্তি যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় তা বাদ দিলে ব্যক্তির স্বীয় শ্রম বা স্বীয় শক্তি দ্বারা সে তার সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারে এবং এর দ্বারা সম্পত্তির প্রতি ব্যক্তির অধিকার সৃষ্টি হয়। অবশ্য লক এবং নোজিক উভয়ের লেখনীতে এটি তারা উল্লেখ করেছেন কোন ব্যক্তির মালিকানার ক্ষেত্রে ততটাই সে গ্রহণ করতে পারে যাকে লক বলেছেন "as

much and as good in common" বা প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে প্রদত্ত সম্পত্তি যাতে সকল মানুষের অধিকার রয়েছে।[৭৪]

রর্বাট নোজিক লকের শ্রম আরোপের যুক্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি তোলেন। যেমন- ভূমির উপর শ্রম আরোপের ফলে উক্ত ভূমিতে যদি ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে কোনো অনধিকৃত বস্তুর উপর /সাথে যদি ব্যক্তি অধিকৃত কোন বস্তু মিশ্রিত হয় তাহলে কি অনধিকৃত বস্তুটিও ব্যক্তির নতুনভাবে অধিকৃত হলো। লকের শ্রম-মিশ্রণ যুক্তি[৭৫] অনুযায়ী বিষয়টি যথার্থ। কিন্তু নোজিক একটি বিপরীত যুক্তি দ্বারা লকের যুক্তিটির দুর্বলতা তুলে ধরেন। যেমন, আমি যদি একবোতল টমেটো জুসের মালিক হই এবং সে বোতলের জুস যদি আমি কোন সমুদ্রে নিপতিত করি এবং মিশ্রিত করি তাহলে আমি কি সমগ্র সমুদ্রের মালিকানা দাবি করতে পারি অথবা আমি কি সে টমেটো জুসকে সমুদ্রের পানি থেকে আলাদা করতে পারি ?'[৭৬]

যদিও নোজিকের এ যুক্তিটিতে লকের ধারণাটিকে মিশ্রিত করণের পরিবর্তে শ্রম আরোপের দ্বারা পৃথক করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁর শ্রম মিশ্রণ যুক্তি কে মূল্য-সংযোজন যুক্তি (value-added argument) দ্বারা সমর্থন করা যেতে পারে।[৭৭] শ্রম সম্পত্তিতে মূল্য আরোপ করে। লকের ভাষায়- 'labour... puts the difference of value on everything.'[৭৮] লক ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতাকেও সম্পত্তিরূপে দাবি করেছেন এক্ষেত্রে সম্পত্তির দু-ধরণের অর্থ তাঁর কাছে আমরা লক্ষ করি। একটি সংকীণ অর্থে যাতে রয়েছে সম্পত্তি (possessions) এবং পন্য (goods) আর বিস্তৃত অর্থে তিনি সম্পত্তি বলতে বুঝিয়েছেন জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতা (life, liberty and estate)।[৭৯]

এ থেকে বলা যায় লকের সম্পত্তির সংজ্ঞায়ন বিস্তৃত পরিধিতে ব্যাপ্ত। সম্পত্তির অধিকার ও সংরক্ষণের সাথে যুক্ত করেছেন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকারের সীমাকে। তাহলেও এটা বলা যাচ্ছে না যে ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকারী নয় তার কোনো অধিকার নেই। কারণ সম্পত্তিহীন ব্যক্তিও যেহেতু আইনের সীমাবদ্ধতার অধীন তাই উক্ত সম্পত্তিহীন ব্যক্তিরও আইনের সুরক্ষা এবং সুবিধা পাওয়ার অধিকার আছে।[৮০] আইনের সুরক্ষার সুবিধা বলতে লক বুঝিয়েছেন একজন কৃষক যে কৃষিকাজ করে সেও সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু সুবিধা উপভোগ করবে।

লকীয় শর্ত[৮১] কে যদি আমারা খুব কঠোর ভাবে গ্রহন না করে অপেক্ষাকৃত উদারভাবে গ্রহন করি তাহলে তা কেবল ব্যক্তিক স্বার্থকে সংরক্ষণ না করে বৃহত্তর সামষ্টিক স্বার্থের সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতে পারে। লকের এধরণের চিন্তার সাথে আমরা সাদৃশ্য পাব নোজিকের 'entitlement theory of justice' (যা বণ্টনমূলক ন্যায্যতা নামে পরিচিত)। এবং 'ঐতিহাসিক ছায়া'[৮২] এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যদিও পরবর্তীতে কোনো কোনো লেখক লকের সাথে নোজিকের চিন্তার কিছু অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন।[৮৩]

অর্থব্যবস্থা লকের সম্পত্তিতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। সম্পদের অপচয় বন্ধের সূত্রে তিনি যুক্ত করলেন অর্থকে। উদ্বৃত্ত সম্পদকে মজুদের জন্য তিনি অর্থকে ব্যবহার করেন; বাণিজ্য এবং উৎপাদনকে বৃদ্ধি করেন। সম্পদের পরিবর্তিরূপ অর্থাৎ ভূমি ভূ-সম্পদে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তে অর্থ সম্পদ রূপে স্থলাভিষিক্ত হলো। ফলশ্রুতিতে সমাজে সম্পদের বৈষম্য বা অসমতা ঘনীভূত হতে লাগল। মানুষের সমতাভিত্তিক সহজ সরল জীবনযাপন বদলে গেল।[৮৪] লক অর্থকে নির্দেশ করেছেন অসমানুপাতিক এবং অসম সম্পত্তি ধরিত্রীর।[৮৫] অর্থের বিস্তৃত ব্যবহার পরবর্তীতে সম্পদের বৈষম্যকে আরো বেগবান করে। অর্থের ব্যবহার নেতিবাচক অর্থে বৈধতা পেল কারণ অর্থ অপরের সম্পত্তির অধিকারে অযাচিত হস্তক্ষেপ করে না এবং ইতিবাচক অর্থে মানুষ নিজেরা সম্মতির দ্বারা এর ব্যবহারকে স্বীকৃতি দিয়েছে।[৮৬]

যদিও রাজনৈতিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণ করা তবে সম্পত্তির অনিয়ন্ত্রিত অধিকার বা সম্পদের যথোচ্ছাচারকে লক সমর্থন করেননি। যেহেতু সম্পত্তির অধিকার একটি প্রাকৃতিক অধিকার তাই সমাজ (রাজনৈতিক) চাইলেই ব্যক্তির অধিকারকে রদ করতে পারে না। সম্পত্তির সুরক্ষা বিধানের লক্ষ্যে সমাজকে কিছু বিধি বিধানভুক্ত করেছেন লক।[৮৭] ম্যাকফারলেন মনে করেন, এ বিধানের সাহায্যে লক সরকারকে সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্ব দিলেও সরকার কর্তৃক ব্যক্তির সম্পত্তি দখল বা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করেননি। লক সরকার কর্তৃক সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখার অধিকার দিলেও সরকারের কাছে সম্পত্তি হরণের কোনো অধিকার প্রদান না করার বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সরকারের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য, সরকারের নিরাপত্তার জন্য জনসম্মতির ভিত্তিতে করারোপের উপর জোর দিয়েছেন। ব্যক্তির সম্মতিতে ব্যক্তি কর্তৃক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ যারা আবার সরকারের অংশ তারা এ করারোপ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার ও সম্মতির ভিত্তিতে করারোপের প্রেক্ষিতে এরকম প্রশ্নও কেউ কেউ উত্থাপন করেছেন যে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার সদস্য যারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত তাদের দ্বারা একজন ব্যক্তি সম্পত্তির অধিকার থেকে আইনগতভাবে বা বৈধভাবে বঞ্চিত হয় কি না ?[৮৮] এধরণের প্রশ্নের উত্তর মিলেছে লকের লেখনীতে।[৮৯] আইনসভার এমন ক্ষমতা নেই যাতে ব্যক্তির স্বাধীনতা, সম্পত্তি, জীবনের উপর তারা নিয়ন্ত্রণ করবে। ম্যাকফারলেন লকের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতত্ত্বকে সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমর্থনযোগ্য নয় মনে করেন, বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থের পুনবর্ন্টনের জন্য তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত।[৯০]

লকের সম্পত্তিতত্ত্বে ব্যক্তিমালিকানার যে ধরণ নির্দেশিত হয়েছে তা স্পষ্টতই সমাজের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণেই কাজ করেছে। এ পুঁজিবাদী ধারাকে শক্তিশালীকরণের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বেগবান করা হয়েছে বলতে পারি। ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণ দ্বারা লক প্রশংসিত হয়েছেন। তবে বিপরীত দৃষ্টিকোন থেকে বলতে পারি লক এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় বা সামষ্টিক যে ক্ষমতা তাকে ছত্রভঙ্গ করে সম্পদের অসম বণ্টনকেই শক্তিশালী করেছেন। বৈষয়িক সম্পত্তি রক্ষার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপকে লক জনজীবনে স্বাগত জানিয়েছেন। ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষার বিষয়ে তার যে তৎপরতা লক্ষণীয় ব্যক্তির পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে তেমনটা অনুপস্থিত। এর বিপরীত চিত্র দেখেছি হবস এবং রুশোর লেখনীতে। জনগণের সম্পত্তি রক্ষার জন্য সিভিল সরকারের দায়কে লক যতটা জোরালো ভাবে উপস্থাপন করেছেন বলতে দ্বিধা নেই জনগনের মৌলিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় তা অতটা জোরালো নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় অবশ্য তার উদ্যোগসমূহ সম্পত্তির সুরক্ষা বিধানের পদক্ষেপের ফলশ্রুতিস্বরূপ আগত। সে অর্থে বলতে পারি, লক ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যতটা নাগরিকের বা ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলেছেন তদপেক্ষা অধিক বলেছেন ব্যক্তির অধিকারের কথা। প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিতকরণে তিনি (লক) যে রাজনৈতিক সমাজের অভ্যুদয় ঘটালেন তাতে বাস্তবিকই হবসের মতো কোনো সার্বভোম শক্তির স্থান নেই এবং সম্পত্তিরক্ষার নিমিত্তে অভিজাততন্ত্রকে (oligarchy) সমর্থন করেছেন। এতে রাষ্ট্রের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে রাষ্ট্র পরিচালনার ঝোঁক তৈরি হয় এবং সম্পত্তিহীন বা দুঃস্থ বা গরীব নাগরিকের রাজনৈতিক মতের মূল্যায়ন হয়না। বিত্তহীন শ্রেণি স্বাভাবিক ভাবেই এ ধারাতে অবমূল্যায়িত হয় এবং বিত্তবান শ্রেণি হয় রাষ্ট্রের কাছে, শাসকের কাছে অতি মূল্যায়িত। যে কারণে পুঁজিবাদী অর্থনীতির একজন প্রতিভূরূপে লক রাজনীতিকে, রাজনৈতিক ক্ষমতা, সরকার, স্থায়িত্বকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত করেছেন।

অর্থনীতি তথা সম্পত্তি রক্ষার মানদণ্ডে সরকারের সাফল্য নির্ধারিত হয় বলে লকীয় রাজনৈতিক ভাবাদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রসমূহে (যেমন–যুক্তরাষ্ট্র) জীবন অপেক্ষা বিত্ত কখনো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যেমন- করোনার কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীতেও যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত অর্থনীতির দেশে সরকার জীবন রক্ষা অপেক্ষা সম্পত্তির সুরক্ষায় অধিক মনোযোগী ছিলেন। লক প্রকৃতির রাজ্য থেকে মানব সমাজে উত্তরণের কারণ রূপে স্পষ্ট উল্লেখ

করেছেন মানুষ সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে রাজনৈতিক সমাজ (civil society) প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং তিনি বলেন রাজনৈতিক সমাজে মানুষ সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে আইন প্রনয়ণ করে।[৯১]

লকের সম্পত্তিতত্ত্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্পষ্ট প্রভাব দৃশ্যমান। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পত্তির প্রসারে ব্যক্তি প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। যে শ্রম সম্পত্তিতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে সে শ্রম আবার ব্যক্তিকে পরস্পরের দাসে পরিণত করে মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরীব সম্পর্ক সৃষ্টি দ্বারা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব যদি হয় সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান করা তবে অবশ্যই সম্পত্তিহীন শ্রেণি রাষ্ট্রের সুরক্ষাবলয়ের বাইরে অবহেলিত থেকে যায় যা আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্বে, ধনতান্ত্রিক সমাজে স্পষ্ট। তাই করোনার মতো বৈশ্বিক মহামারীর সময়কালেও বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ কিংবা বাংলাদেশের মত মধ্য আয়ের দেশসমূহেও মানুষের জীবন অপেক্ষা জীবিকা মুখ্য হয়েছে। জীবিকার চাকা সচল রাখার জন্য, সম্পদশলীদের সম্পদ সুরক্ষার জন্য, অথবা বিত্তহীনদের জীবন টিকিয়ে রাখার জন্যও আবার সে সম্পদই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কাছে।

রুশো

সভ্যতা সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ আদিম অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। সে অতি অল্পে তুষ্ট হতো প্রকৃতি তার প্রয়োজন পূর্ণ করত। সভ্যতার অগ্রগতির দ্বারা মানুষ যখন শস্য ও কৃষিকার্যের সূত্রপাত ঘটাল এবং ধাতু বা লোহার আবিষ্কার করল, এর দ্বারা মানুষের জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলো। মানুষ নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন ছাপিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে মনোযোগী হলো। ধাতু এবং কৃষির আবিষ্কার ব্যক্তিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করল। এভাবেই সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানপ্রতিষ্ঠা হলো। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক কৃষিতে লোক নিয়োগ করলেন, তাহলে যদিও শিল্প-কারখানা ছিলনা তথাপিও সামন্তব্যবস্থা বিকশিত হলো। শুরু হলো সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য, নিপীড়নের লড়াই। মানুষ পারস্পরিক সহমর্মিতা হারিয়ে হলো প্রভু-ভৃত্য। এভাবে প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা থেকে সম্পত্তির বৈষম্য ও শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে মানুষ রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করল। এ বিশ্লেষণ থেকে আমরা বলতে পারি রুশোর স্বাধীন মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের কারনে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

সম্পত্তির উদ্ভব ব্যক্তির আচার-আচরণ, স্বার্থ, চিন্ত-ভাবনা সমস্ত কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। সমাজে ব্যক্তির সামাজিকীকরণের পেছনে রয়েছে তার স্বার্থচিন্তা কৌশল, শক্তি, চাতুর্য দ্বারা ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থ আদায় করেছে। এটি সম্পত্তি সম্পর্কে রুশোর বস্তুগত ব্যাখ্যা। পাশাপাশি সম্পত্তির একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও তিনি দাঁড় করেছেন। সম্পত্তির উদ্ভবের ফলে যেমন সৃষ্টি হলো বস্তুগত বৈষম্য, ধনী-দরিদ্র, একই সাথে জেগে উঠল ব্যক্তির স্বার্থপরতা এবং অহংবোধ। সম্পত্তিই ব্যক্তির সফলতার পরিমাপক হয়ে পড়ল। সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তির মধ্যে প্রভাব, খ্যাতি, প্রতিপত্তির চাহিদা সৃষ্টি করে। রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন বলে মনে হয়।

Discourse of the Origin of Inequality গ্রন্থে রুশো সম্পত্তি ব্যবস্থাকে দেখেছেন অশান্তির উৎসরূপে। কিন্তু *The Social Contract* গ্রন্থে তিনি সম্পত্তিব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দিয়েছেন রাষ্ট্রের কাছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে ধারা আমরা লকের সম্পত্তিতত্ত্বে পেয়েছি এর বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় রুশোর সম্পত্তি সংক্রান্ত ভাবনাতে। রুশো সম্পত্তিকে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ নয় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। সম্পত্তির মাধ্যমে ব্যক্তির লাভ নয় বরং নাগরিকের প্রয়োজন পরিতৃপ্ত করা ছিলো রুশোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সম্পত্তির বণ্টন বাণিজ্য নীতির দ্বারা নয় বরং কেন্দ্রীয় বণ্টন নীতিতে পরিচালিত করার পক্ষে রুশোর

অবস্থান। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় বা মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তির লাভ-ক্ষতির উপর বাজার নিয়ন্ত্রণ হয় এবং ব্যক্তির বাজার নিয়ন্ত্রণ লকের কাছে দোষণীয় নয়। পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে সকলের চাহিদাকে নিবৃত্ত করার মত পণ্য রাষ্ট্র উৎপাদিত করে। নিয়ন্ত্রণ এবং বণ্টনের মালিকানা রাষ্ট্রের কাছে থাকাতে রাষ্ট্রের পক্ষে একটি সমতাপূর্ণ ও ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় বলে মনে করা হয়। সম্পত্তিতে বা উৎপাদিত পণ্যের উপর ব্যক্তির পরিবর্তে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বহাল থাকল। রুশোর সম্পত্তি সংক্রান্ত ভাবনায় আধুনিক কালে সাদৃশ্য মেলে কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলসের চিন্তার সাথে।

লকের মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিরোধিতা করে উপযোগবাদী দৃষ্টিকোন থেকে যে অভিযোগ আনা যায় এর সমর্থন পাওয়া যায় এঙ্গেলসের *Speeches in Elberfeld* –এ। এঙ্গেলস লিখেছেন–

> Since we know how much, on the average, a person needs, it is easy to calculate how much is needed by a given number of individuals, and since production is no longer in the hands of private producers but in those of the community and its administrative bodies it is a tingling matter to regulate production according to needs.[৯২]

অর্থাৎ এঙ্গেলসের মতে রাষ্ট্রের পক্ষে নাগরিকের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের চাহিদা নির্ণয় করা, নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী যোগান দেওয়া কোন কঠিন কাজ নয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিবর্তে উৎপাদনের মালিকানা কমিউনিটির হাতে থাকবে। মার্কসবাদী এবং সমাজতন্ত্রীকগণ মনে করেন বাজার হলো একটি বাজে ব্যাপার। অপচয়পূর্ণ (wasteful)[৯৩] ব্যাপার যাতে শ্রমিককে বিছিন্ন করে, শ্রমিককে শোষণ করে সর্বোপরি অন্যায্য অসমতার দিকে বাজারকে পরিচালিত করে। এঙ্গেলস তাঁর *Speeches in Elberfeld*–এ মুক্ত বাজারের বিপক্ষে দুটি অভিযোগ আনেন- মুক্ত বাজার অবশ্যম্ভাবীরূপে একের পর এক সংকট ডেকে আনে, যাতে ব্যক্তি কাজ থেকে বিতাড়িত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এঙ্গেলস মুক্ত বাজার অর্থনীতির এ সংকট বোঝানোর জন্য বাণিজ্য চক্রের উল্লেখ করে।বাণিজ্য চক্রের ধ্বংসাত্মক বলয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদগণ চেষ্টা করেও সক্ষম হননি।

এঙ্গেলসের দ্বিতীয় অভিযোগ– পুঁজিবাদী সমাজে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী উৎপাদনশীলতায় কোনো ভূমিকা রাখে না। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট সমাজে এ সকল জনগণকে উৎপাদনের কাজে যুক্ত করার মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস এবং দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব। এক্ষেত্রে এঙ্গেলস রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ধর্মবেত্তা শ্রেণি, গাহর্স্থ্য শ্রমিক এবং অন্যান্যদেরকে তিনি রাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতার কাজে সরাসরি যুক্ত করতে চেয়েছেন।[৯৪]

রুশো ব্যক্তিগত সম্পদের সমর্থক ছিলেন না। তিনি ব্যক্তিগত সম্পদের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সকল সদস্যের সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করেন। রুশো মনে করেন রাষ্ট্রের অর্ন্তগত সকল সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্র। সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমর্থনে রুশোর অবস্থান স্পষ্ট। কারণ প্রকৃতির রাজ্যের মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে চুক্তি সংঘটিত করে। এই চুক্তির দ্বারা আলাদা আলাদা ব্যক্তিসত্তা সম্মিলিত ভাবে গড়ে তুলল একটা নৈতিক এবং যূথবদ্ধ (collective body) অংশ। চুক্তির ফলে যে নাগরিক সমাজের উদ্ভব ঘটে তা কিন্তু সামষ্টিক সত্তা কোনো একক ব্যক্তিসত্তা নয়। রুশো বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধানে সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান করে দেখলেন সম্পত্তির ব্যক্তির উদ্ভবই মাঝে যাবতীয় বৈষম্যে সৃষ্টি করেছে। সমাজের কাঠামোগত বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন সভ্যতার অগ্রগতির সাথেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব।

রুশো কর্তৃক সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা অসমর্থনের পেছনে একটি যুক্তি এরকম হতে পারে যে- তিনি বণ্টনের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রের উৎপাদক শ্রেণি তা ক্ষুদ্র হলেও সম্পত্তিতে তার সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। সম্পদের সমবণ্টনের ভিত্তিতে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা গেলে স্বাধীনতা উপভোগ নিশ্চিত করা যায়। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা বলতে বোঝানো হচ্ছে ধনবৈষম্য রহিত করা। ধনবৈষম্য হ্রাসে রুশো ধনী-গরীবের মধ্যকার সম্পত্তির ব্যবধান যেন ব্যাপক না হয় সে নিমিত্তে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সমর্থন করেছেন। তিনি রাষ্ট্রের আকৃতি ও ক্ষমতার ব্যাপকতা সমর্থন করেছেন কিন্তু নাগরিকের সম্পত্তি যতটা সীমিত রাখা যায় তার প্রত্যাশা করেছেন।

রুশোর সম্পত্তিতত্ত্বে তিনি কেবল রাজনৈতিক সমতাকে মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয় মনে করেন। সে জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক সমতাও। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা প্রসঙ্গে রুশো বলেন "প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ সম্পত্তির উপর অধিকার থাকলেও তা সতত লোকসমাজের অধিকারের নীচেই অবস্থান করে।"[৯৫]

সম্পত্তি সম্পর্কে রুশোর ধারণায় আপাত বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। যেমন *ইনইক্যুয়ালিটি*-তে তিনি সম্পত্তির মালিকানা এবং উদ্ভব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছেন (সম্পত্তিকে সকল অসাম্য ও অশান্তির মূল রূপে চিহ্নিত করেছেন) এর বিপরীতে *A Discourse on Political Economy* (1758) তে ভিন্নমত ধারণ করেন। এখানে সম্পত্তির অধিকারকে 'নাগরিকত্বের অন্য সকল অধিকারের মাঝে সর্বাধিক পবিত্র' এবং 'সুশীল পৌর সমাজের প্রকৃত ভিত্তি রূপে দাবি করেছেন'।[৯৬] এ পর্যায়ে লকের সাথে রুশোর চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। রুশো মনে করেন জনগণের স্বেচ্ছাসম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ তথা ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য কোন করারোপ তার উপর ধার্য করা যাবে না। লক জনগণের সম্মতির প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সম্মতিকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে, রুশো কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা জনপ্রতিনিধিকে নয় বরং সম্মতির জন্য সাধারণ ইচ্ছার উপর নির্ভর করেছেন।

রুশো সম্পত্তি বলতে বুঝিয়েছেন যা আইনগতভাবে অর্জিত হয়েছে, যা দ্বারা সম্পত্তির উপর আইনগত দাবি তথা বৈধ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় বা ব্যক্তি দাবি করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে, ব্যক্তি কিভাবে কীসের ভিত্তিতে স্বীয় মালিকানাকে প্রকাশ্যে দাবি করতে পারে। পৌর সমাজে রুশো ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি যে দাবি বা মালিকানা তার স্বীকৃতি প্রদানে 'সম্পত্তির প্রথম অধিকার বা প্রথম মালিকের অধিকার' (right of first occupant) নীতি ব্যবহার করেন। যদিও ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার প্রাকৃতিক অধিকার থেকে উদ্ভূত এবং একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা সম্পত্তি সে অধিকার করতে পারত। এ ভিত্তিতে যখন ভূমির মালিকানার অধিকারের প্রশ্নটি আসল বা ভাগাভাগির ব্যাপারটি এল তাহলে এ মালিকানা নির্ধারিত হলো 'প্রথম ভূসম্পত্তির অধিকারীর অধিকার (the right of first occupant), এর দ্বারা। তবে, রুশো এটা মনে করেন না যে ভূমি বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথম ভূসম্পত্তির অধিকারীর অধিকারের কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। রুশো ভূমির উপর প্রথম অধিকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনটি শর্তের কথা বলেছেন[৯৭]

প্রথমত, যে ভূমিটির উপর একজন ব্যক্তি স্বীয় অধিকার দাবি করে সে ভূমিটি ইতোপূর্বে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অধ্যুষিত হবে না।

দ্বিতীয়ত, একজন ব্যক্তির টিকে থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত ভূমি দখলে রাখবে না

তৃতীয়ত, একজন ব্যক্তির ভূমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার্থে তাকে সরাসরি শ্রম প্রদানে নিযুক্ত হতে হবে অর্থাৎ জমি চাষ করার দ্বারা ব্যক্তি যে শ্রম দেয় তাতেই প্রকৃতপক্ষে ঐ ব্যক্তির ভূমিটির প্রতি মলিকানা প্রতিষ্ঠা পায়।[৯৮]

সম্পত্তির মালিকানার সম্পর্কে রুশোর প্রদত্ত এ তিনটি শর্ত মূল্যায়ণে স্পষ্ট হয় যে তিনি প্রকৃতির রাজ্য অথবা রাজনৈতিক সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তি কুক্ষিগত করা, সম্পত্তির অবাধ ব্যক্তিমালিকানা ইত্যাদি বিষয়সমূহ দৃঢ়ভাবে বর্জন করেন এবং একই সাথে ধনী-গরীব বৈষম্য সৃষ্টি যাতে না হয় তেমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর সম্পত্তিতত্ত্বকে পরিচালিত করেছেন।

রুশো মনে করেন না যে, অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান বা অভিন্ন হবে। তাছাড়া অধিকার স্থাপনের ক্ষেত্রে রুশো বলপ্রয়োগ বা শক্তিমত্তার দিকটিকে অগ্রাহ্য করেন। বরং শক্তির পরিবর্তে রুশো আইনকে গ্রহণ করেছেন অধিকারের বৈধতা নিরূপণের জন্য। নৈতিক ও আইনগত ভিত্তির সাহায্যে রুশো অধিকারের বৈধতা দিয়েছেন। যেমন– রুশো সামাজিক চুক্তির সাহায্যে সৃষ্ট অধিকারসমূহকে বৈধতা প্রদানে কর্তৃত্বের যে নৈতিক ভিত্তি প্রদান করেছেন তাতে তিনি ব্যক্তির অধিকারকে সামষ্টিক অধিকারের সাথে সমন্বিত করেছেন। অর্থাৎ ব্যক্তিক অধিকার জনগণের অধিকারের সাথে যুক্ত হয়ে একদিকে তা যেমন ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করে একই সাথে সে অধিকার ও স্বার্থ সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রাপ্তির দ্বারা গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। এমন কোন ব্যক্তিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না যা সাধারণ ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ থেকে আমরা বলতে পারি রুশোর কাছে ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা সামষ্টিক অধিকার অগ্রগণ্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি সামষ্টিক স্বার্থ বিঘ্নকারী হয় তবে তা গুরুত্ব পাবে না। এক্ষেত্রে বলা যায় সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সম্পত্তি ব্যবস্থার সমর্থন আমরা রুশোর কাছে লক্ষ করি। বলা যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে তিনি বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমর্থনের পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন করেছেন।

রুশো এমন এক প্রকার সমন্বিত অধিকারব্যবস্থা উল্লেখ করেছেন যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার প্রকৃতবিচারে জনগোষ্ঠীর (Community) অধিকার সংরক্ষণ দ্বারা সুরক্ষিত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি একক ব্যক্তিঅধিকার যেখানে দুর্বল, ভঙ্গুর, ক্ষীণ সেখানে মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস দ্বারা সৃষ্ট অধিকার অধিকতর সংঘবদ্ধ। ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকের ভালো-তে ব্যক্তির ভালোত্ব নির্ণিত হয়েছে। ব্যক্তির 'একক' স্বার্থ ত্যাগপূর্বক ব্যক্তি অবশ্যই অধিকতর শক্তিশালী সুরক্ষা বলয়ে আবদ্ধ হলো। এভাবে গোষ্ঠী বা সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি ব্যক্তির দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং এ ব্যবস্থাটি অধিকতর উদার-নৈতিক। একের সাথে অন্যের অধিকার সম্পর্কিত হওয়ার ফলে প্রতিশ্রুতির এমন এক বাধ্যবাধকতা তৈরি হলো যাতে একক সত্তা এমনভাবে কাজ করে যা সামষ্টিকভাবে সর্বোচ্চ স্বার্থ সংরক্ষণ করে। রাষ্ট্রও ব্যক্তিক স্বার্থ সংরক্ষণের দ্বারা প্রকৃত বিচারে সকলের স্বার্থই সংরক্ষণ করে। কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, স্বার্থ ও অধিকার এর পরিবর্তে মানুষ সকলের স্বার্থ ও অধিকারের জন্য কাজ করে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অবলুপ্ত হয়। রুশোর সম্পত্তি সংক্রান্ত ধারণায় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রকৃতপক্ষে জনগোষ্ঠী বা এলাকার সাথে যুক্ত। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তি সমষ্টি কতৃর্ক রক্ষিত ও পরিচালিত। এভাবে রুশোর সম্পত্তিতত্ত্বে ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামষ্টিক মালিকানা স্বীকৃতি পেল যাতে সম্পত্তির অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সাথে আনুগত্য ও দায়বদ্ধতার সম্পর্কে যুক্ত। তারা পরস্পরের সাথে গোষ্ঠী স্বার্থে আবদ্ধ।

সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা রুশোর কাছে গৌণ; সামষ্টিক মালিকানা মুখ্য। তবে এ সামষ্টিকতা কিন্তু কোন অভিজাত বা ধনীগোষ্ঠীর সমষ্টি নয়, এখানে সামষ্টিকতা যুক্ত সমাজের যৌথ অংশের সাথে। সম্পত্তির সমতা বিধানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ স্বীকৃত এবং এক সামষ্টিক স্বার্থ হলো 'সাধারণ ইচ্ছা'। সমাজের যৌথ অংশ বা কালেক্টিভ বডি নামক যে সমষ্টি সমাজে আপামর জনগোষ্ঠীকে ধারণ করে তা গড়ে ওঠে। এ যৌথ অংশ কোনো পুঁজিপতি শ্রেণিও নয়। রুশো উল্লিখিত এ কালেকটিভ বডি-র সম্পত্তির সমতা বিধানে রাষ্টীয় হস্তক্ষেপ অনুমোদিত। কালেকটিভ বডির সামষ্টিক স্বার্থ পরিণত হয় সাধারণ ইচ্ছা-তে। সাধারণের ইচ্ছানুযায়ী রাজস্ব, কর ইত্যাদি ধার্য

করা হবে। নাগরিকের স্বেচ্ছাসম্মতি ব্যতীত সরকার তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো কর, রাজস্ব আরোপ করতে পারবে না।

সাধারণ ইচ্ছা অবশ্য কোনো সিদ্ধান্ত অসঙ্গতিপূর্ণভাবে গ্রহণ না করে জনস্বার্থ এবং আইনের বিধি- বিধানের সাহায্যে গ্রহণ করবে। তাই একজন নাগরিকের সম্পত্তিতে রাষ্ট্র যখন করারোপ করে তা সাধারণের প্রয়োজনে করা হয় এবং এই নীতিতে করারোপকে বৈধ বলা যায়। ব্যক্তি বা নাগরিকের সম্মতি নেই বলে তা অবৈধ হয়ে যায় না। রুশো সমতা প্রতিষ্ঠার্থে করারোপের ক্ষেত্রে তিনটি নীতি নিধার্রণ করেছেন।[৯৯] প্রথমত, সম্পত্তির মালিকানায় সমানুপাতিক হারে করারোপ করা হবে। দ্বিতীয়ত, করারোপের ক্ষেত্রটিকে বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্তৃত করা যেতে পারে। যেমন- কোন ব্যক্তির যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে বা অবাধ অর্থসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিক করারোপের পরিমাণ ন্যায্য হতে পারে। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র কতৃর্ক বৃহত্তর সুবিধা প্রদানার্থে সম্পদশালীদের কাছে কর ধার্য করা যেতে পারে।[১০০]

সরকার রাষ্ট্রের কেবল মাত্র নীরব প্রহরীরূপে কাজ করে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত থাকবে না, বরং সরকারের উচিত 'ধনীদের স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধাচারণ' দ্বারা গরিবের স্বার্থ রক্ষা করা এবং 'ভাগ্যের চূড়ান্ত অসমতা প্রতিরোধ করা'।[১০১] লকের সম্পত্তি ব্যবস্থার মতো রুশোর সম্পত্তিতত্ত্বে সরকার কোন পুতুল বা যন্ত্ররূপে সম্পত্তির সুরক্ষা দেখভাল করেই ক্ষান্ত হবে না। রুশোর কাছে সরকার ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ দ্বারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পদের অসমতা দূরীকরণে দায়িত্ব পালন করতে পারে। রুশো মনে করেন, সমাজ কর্তৃক সম্পত্তি এমনভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, যাতে একজন নাগরিক এতটা ধনী না হয় যাতে সে অন্যকে ক্রয় করতে পারে এবং অন্যের এতটা গরীব হওয়া উচিত নয় যাতে সে নিজেকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।'[১০২]

সম্পদের অসমতা সম্পর্কে রুশোর মত হলো, সম্পদের অসমতা রাষ্ট্রীয় সুসংহতার সাথে বিরুদ্ধবাদক। এতে দুর্নীতি এবং ধনী-গরীব বৈষম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অধিক সম্পদ ধনী-গরীব বৈষম্য সৃষ্টির দ্বারা সমাজে ব্যক্তির মাঝে এক প্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি করে। এতে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। কেবল অর্থনৈতিকভাবেই নয়, ব্যবসায়িক কেনাবেচাতে যুক্ত হয়ে দরিদ্র ব্যক্তি তার স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে ধনী ব্যক্তির কাছে দাসত্বে আবদ্ধ হয়।

রুশো ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ের মেলবন্ধনে একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবে মূল নিয়ন্ত্রণটি রাষ্ট্র কতৃর্ক নিধারিত। সামাজিক চুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ তাদের স্ব স্ব সম্পদ ও সম্পত্তি সমাজের হাতে যদিও সমর্পণ করলো তবে এর অর্থ এমন নয় যে রাষ্ট্রই সকলের ভূ-সম্পত্তির সকল মালিকানা গ্রহণ করলো। সম্পত্তির একজন আইনগত সংরক্ষক রূপে রাষ্ট্র জনগণের সম্পত্তির একজন অছি/রক্ষক রূপে আবির্ভূত হলো। একই সাথে রাষ্ট্র সমাজে ধনবৈষম্য যাতে বৃদ্ধি না পায়, অসমতা যাতে সৃষ্টি না হয় সে জন্য সম্পত্তির উপর আপাত নিয়ন্ত্রণারোপ করে।[১০৩]

রুশো *Constitutional Project for Corsica* গ্রন্থে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে এ ধরণের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটান। এখানে তিনি দারিদ্র্যতা হ্রাসে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণকে সমর্থন করেছেন।[১০৪] অবশ্য রুশো এটাও মনে করতেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করা সম্ভব নয়। তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে 'সম্ভাব্য সংকীর্ণতম পরিধির মধ্যে সীমিত রাখা' এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সবসময় জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা উচিত। সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা এজন্য থাকা উচিত যাতে প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে তার কাজ অনুযায়ী সাধারণ সম্পত্তির অংশ সমানুপাতিক বণ্টন হয়। যদিও রুশো কর্সিকার প্রতি যে প্রস্তাবনা দিয়েছেন তাতে আপাতদৃষ্টে মনে হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু গভীর বিচারে বলা

যায় তিনি কেবলমাত্র অর্থনীতিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ না রেখে সমৃদ্ধ ও স্বাধীন কৃষক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন, যাতে কৃষকরা তাদের স্বীয় ভূসম্পত্তিতে নিরাপদ।

মোট কথা, রুশো চেয়েছেন রাষ্ট্রে সম্পত্তির ব্যবস্থা এমন হোক যেন রাষ্ট্রে নাগরিকের সংখ্যা অপেক্ষা রাষ্ট্রের আওতাধীন বা মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ হবে অধিক এবং শক্তিশালী। এ থেকে বলা যায় সম্পত্তি সম্পর্কে রুশোর মনোভাব ছিল এমন, যাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার দরুন কোন ব্যক্তি সম্পত্তির মলিকানা থেকে বঞ্চিত হবে না আবার জনগণের মালিকানা/অংশগ্রহণ দ্বারা সম্পদের অপচয় রোধ করা যায়। এতে ভূমিহীনরা ভূমির মালিক হতে পারে কিন্তু সীমিত বছরের জন্য। আবার কমিউনিটির সভ্যরূপে ব্যক্তিরা কর প্রদানের পরিবর্তে তাদের শ্রম প্রদান দ্বারা যৌথভাবে কাজ করবে। রুশোর এ বক্তব্য থেকে পুনরায় প্রমাণিত হলো রাষ্ট্রে প্রত্যেকের বসবাসযোগ্য ভূমি থাকবে যেখানে কেউ অধিক ধনী হবে না। এ হলো একটি জাতির সমৃদ্ধির মূলনীতি।

রুশো যদিও *ইনইক্যুয়ালিটি* গ্রন্থে দাবি করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রথম সূত্রপাত কৃষি দ্বারা যাতে দেখা যায় ব্যক্তি কর্তৃক ভূমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার সাথে কৃষিকাজের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ছিল না তাহলে তারা সুখী, শান্তিময় এবং দুর্নীতিমুক্ত ছিল। এ সময়ের জনগণকে /ব্যক্তিকে রুশো বলেছেন "noble savage"।[১০৫]

রুশো ভালোত্বকে যুক্ত করেছেন মানুষের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক প্রবণতা রূপে এবং নৈতিকতাকে (virtue) যুক্ত করেছেন নাগরিকের গুণাবলীরূপে। একজন ভালোমানুষ কর্তব্যপরায়ণ (virtuous) মানুষ থেকে ভিন্ন। প্রথমজন কেবল নিজের জন্য ভালো। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যতক্ষণ স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোন কিছু থেকে বঞ্চিত নয়, যে কাজ সে আনন্দ নিয়ে করতে পারে না এমন কাজ সে করে না। এধরণের ব্যক্তি যে ভালো কিন্তু নৈতিক নয় তেমন ব্যক্তি সমাজের জন্য অনুপযুক্ত। স্বাধীন সমাজ তথা রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি তার আদিম বা প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বর্জন করে। সদস্যরা সম্প্রদায়ের বা সমাজের আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন দ্বারা অবদান রাখে। স্ট্রস এর মতে, 'free society comes into being through the substitution of conventional equality for natural inequality.'[১০৬]

বিলিং মনে করেন, রুশোর অর্থনৈতিক ধারণা, বাজার সমাজ, সম্পত্তি এবং বিনিময় ইত্যাদি বিশ্লেষণসমূহকে প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়েছে।[১০৭] সাধারণত সমালোচকগণ রূশোর পুঁজিবাদী সমাজের প্রতি যে অবিশ্বাস তার সাথে সমন্বিত করেছেন রুশোর 'autarchic' মডেলের রাজনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রচলিত এসব বিশ্লেষণের বিপরীতে বিলিং রুশোর কাল্পনিক সমাজের মডেলকে পুর্নমূল্যায়ণ দ্বারা রুশোর পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্লেষেণ করেন। যাতে বাজার পদ্ধতিতে ব্যাপক অসাম্যের উপস্থিতি, সুযোগের বৈষম্য ইত্যাদি বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও বাজার অর্থনীতির দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করা হয়েছে।[১০৮]

রাজনৈতিক সমাজ ব্যক্তিগত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং একই সাথে এটি বিনিময় প্রথার ক্ষেত্রেও একটি কার্যকরী ক্ষেত্র। রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তিকে প্রাকৃতিক মানুষ থেকে পরিবর্তিত করে মালিক শ্রেণির সৃষ্টি করে, ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হলো। ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যক্তিকে একদিকে অপরের ইচ্ছার অধীনতা থেকে মুক্ত করে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় যেমন সাহায্য করল তদ্রুপ সৃষ্টি করলো পুঁজিপতি শ্রেণির বিপরীত গোষ্ঠীরূপে পুঁজিহীন শ্রেণি। একই সাথে উন্মুক্ত বাজারে শ্রমের বিনিময় পণ্যরূপে স্বীকৃত হয়। সম্পত্তির উদ্ভব অনুপ্রাণিত করলো বাজার অর্থনীতিকে এবং অন্যদিকে সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পত্তির উদ্ভব বিনিময় প্রথা চালু করে, সে সাথে শুরু হয় অধিকারের প্রশ্ন, নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সম্পত্তির অধিকারের ধারণা ব্যক্তির ব্যক্তিগত চিন্তাচেতনা এবং পারস্পরিক আচরণ, রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তির একক ও গোষ্ঠীগত অবস্থান ইত্যাদি সকল বিষয়ে নতুন সমীকরণ তৈরি করে। সম্পত্তির অধিকারের ধারণা বিনিময় মূল্যের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ প্রসঙ্গে বার্জেলকে স্মরণ করা যায়।[১০৯] তিনি মনে করেন সম্পত্তির বিনিময় মূল্য অধিকারের গ্রহণ, হস্তান্তর এবং সুরক্ষার সাথে সংযুক্ত। এমনটা ধরে নেওয়া হয় যে, যে কোনো সম্পদের ক্ষেত্রে এর মূল্যবৃদ্ধি, অধিকারের পূর্ণসংরক্ষণ এবং পূর্ণ হস্তান্তর বেশ দামী। তিনি আরো বলেন, জনগণ তাদের সম্পত্তির যথোপযুক্ত মূল্যমান পায় না বলে ধরে নেয় এবং তাই তাদের সম্পত্তির অধিকার কখনোই পূর্ণ নয়।[১১০]

ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বৈষম্য সমাজে ব্যক্তিগত বিরোধের জন্ম দেয়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সর্ম্পক হয়ে পড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রত্যাশী। শ্রেষ্ঠত্বের এই লড়াই প্রকারান্তরে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতার লড়াই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ মানবতার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে লাগল। বৈষম্যের মানসিকতাই দুর্নীতির সচূনা করে। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই সমাজের জন্য নেতিবাচক ফল বয়ে আনে। বৈষম্যের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ব্যক্তিকে যেকোনো মূল্যে সফলতা অর্জনে প্ররোচিত করে। একের প্রাপ্তি অন্যের অপ্রাপ্তির কারণ, অন্যকে বঞ্চিত করেই ব্যক্তির অর্জন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদে প্রত্যেকের কাছেই নিজের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির মনতস্ত্বত্ত্বে এভাবেই বৈষম্যমূলক সমাজ ধরা পড়ে। প্রেম-প্রীতি, সহযোগিতা ইত্যাদি মানবিক গুনাবলিসমূহ এ সমাজে অনুপস্থিত। সাফল্যই এখানে শেষ কথা। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে ব্যক্তি অপরের প্রতি চতুরতা, নিষ্ঠুরতা, উদারতা কিংবা ভণ্ডামি যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ আচরণের প্রকাশ ঘটায়।

সাফল্য লাভের আশায় বুর্জোয়া সমাজে মানুষ একে অন্যের দাস হয়ে পড়ে। দাস-মালিক সম্পর্ক কিন্তু কেবল ধনগত বৈষম্যের ভিত্তিতে হয় না। পাশাপাশি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমেও হতে পারে। ধনীরা কেবল গরীবদের প্রভু নয়, বিপরীত দিকে ধনীরা গরিদের দাস হতে পারে। যেমন– গরীবেরা অর্থের জন্য ধনীদের কাছে আবদ্ধ, আবার ধনীরা দরিদ্রদের কাছে আবদ্ধ কাজের বিনিময়ে সেবা প্রাপ্তির আশায়। এভাবে রুশো মনে করেন ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রসারে প্রত্যেকে প্রত্যকের কাছে সর্ম্পকের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকেই পরস্পরের কাছে সুবিধাভোগী। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবে ব্যক্তি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে, পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। এভাবে বৈষম্য সমাজে নৈতিক অধঃপতন সৃষ্টি করে।

আধুনিক সমাজে একজন অন্যজনকে বঞ্চিত না করে সমৃদ্ধি লাভ করে না। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যক্তি অপরকে প্রভাবিত, প্ররোচিত করে। শঠতা, চাতুর্য ও বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে সম্পত্তি সমাজে স্বীয় স্থান করে নেয়। একে আমরা নৈতিক বৈষম্য বলতে পারি। এতে ব্যক্তি বৈষয়িকভাবে প্রচুর বিত্তবৈভবের অধিকারী হলেও মানসিকভাবে ব্যক্তিকে প্রায় হতাশ করে। ব্যক্তি হয়ে পড়ে সমাজবিচ্ছিন্ন, জনবিচ্ছিন্ন।

এভাবে রুশো দেখলেন প্রাক-সামাজিক যুগের স্বাধীন মানুষ রাজনৈতিক সমাজে পরাধীন হলো, স্বাধীনতা হারাল, প্রভূ-ভৃত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ হলো। এ সম্পর্কে কোনো ভালোবাসা, মমতা নেই, আছে বিদ্বেষ, শঠতা এবং বৈষম্য। স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠল নৈতিকভাবে অধঃপতিত শ্রেণি। শান্তি শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রকৃতির রাজ্যের স্বাভাবিক মানুষ রাজনৈতিক সমাজে হয়ে উঠল কৃত্রিম মানুষ এবং দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল। শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, মানুষ সম্পত্তি ও বৈষম্যের কারণে হয়ে উঠল কলহপ্রবন, হতাশাগ্রস্থ, পরাধীন সত্তা।

তথ্যনির্দেশ

১. Benjamin B. Lopata, “Property Theory in Hobbes,” *Political Theory*, Vol. 1, No. 2, Sage Publications, p. 203.

২. Johan Olsthoorn, “Hobbes on Justice, Property Right and Self-owernship”, *History of Political Thought*, Vol. 36, No. 3, 2015, pp. 471-498.

৩. *Ibid.*, p. 484.

৪. L. C. B. Macpherson, *The Political Theory of Possesive Individualism: Hobbes to Locke*, Oxford University Press, 1962, p. 98.

৫. Olsthoorn, “Hobbes on Justice, Property Right and Self-owernship”, p. 483.

৬. Olsthoorn, “Hobbes on Justice, Property Right and Self-owernship”, *History of Political Thought*, p. 483.

৭. Laurens Van Apeldoorn, “Hobbes on Poperty: Between Legal Certainity and Sovereign Discretion”, *Hobbes Studies*, Vol. 34, 2021, p. 79.

৮. Thomas Hobbes, *Leviathan*, A. P., Martinich, and B., Battiste, (eds.), Revised Edition, Part II, Ch. XVIII, Broadview Press, Canada, 2011.

৯. *Ibid.*, p. 139.

১০. L. J. Macfarlane, *Modern Political Theory*, Thomas Nelson and Sons Ltd., London, 1970, p. 183.

১১. Hobbes, *Leviathan*, Part. 1, Ch. XV, p. 139.

১২. প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের বা কমনওয়েলথবিহীন জনগণের এই অধিকার হলো বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি। তাই এ ধরণের অধিকারে স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজে এরূপ অধিকার এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে স্থান নিলো কমনওয়েলথের প্রতি আনুগত্য বা বাধ্যবাধকতার উপস্থিতি।

১৩. Hobbes, *Leviathan*, Part. 1, Ch. XV, p. 139.

১৪. *Ibid.*, p. 147.

১৫. *Ibid.*, p. 246.

১৬. Hobbes, *Leviathan*, p. 219.

১৭. *Ibid.*, p. 219.

১৮. Aristotle, Nichomachean *Ethics*, Book V in *Leviathan*, p. 143.

১৯. Hobbes, *Leviathan*, Part 1, Ch. XV, p. 143.

২০. *Ibid.*, pp. 143-144.

২১. Laurens Van Apeldoorn, "Hobbes on Property: Between Legal Certainty and Sovereign Discretion", *Hobbes Studies*, p. 79.

২২. Macfarlane, *Modern Political Theory*, p. 183.

২৩. Hobbes, *Leviathan*, Ch. XXIV, p. 218.

২৪. Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism*, pp. 105-106.

২৫. *Ibid.*, pp. 218-219.

২৬. *Ibid.*, p. 497.

২৭. Thomas Keith, "The Social Origin's of Hobbes Political Thought" in *Hobbes Studies*, Brown (Edt.), Basil Blackwell, Oxford, 1965, p. 160.

২৮. *The Elements of Law* গ্রন্থে হবস দাবি করেন পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা জনগণ সম্পত্তি অর্জন করেছেন।

২৯. Mark F. Griffith, "John Locke's Influence on American Government and Public Administration", *Journal of Management History*, Vol. 3, No. 3, Emerald Group Publishing Limited, 1997, p. 231.

৩০. John Locke, *Second Treatise*, § 285-302.

৩১. C. B. Macpherson, *Social Bearing*, p. 12. in *Life*, *Liberty and Property*, (Rep.), p. 77.

৩২. Benjamin B Lopata, "Property Theory in Hobbes", *Political Theory*, Vol. 1, No. 2, Sage Publications, 1973. pp. 203-218.

৩৩. Locke, *Second Treatise*, § 222.

৩৪. J. W. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, Eight Edition, Clarendon Press, Oxford, 1968, p. 73.

৩৫. Richard Schlatter, *Private Property: the History of an Idea*, George Allen & Unwin, London, 1973, p. 151.

৩৬. Otto Gierke and Ernest Barker, *Natural Law and the Theory of Society*, Ernest Barker (trans.), Reprint, The Law Book Exchange Ltd., 2001, i. 104, ii. 295.

৩৭. Locke, *Second Treatise*, § 139.

৩৮. *Ibid.*, § 27.

৩৯.*Ibid.*, Ch. V. § 28.

৪০. Jonathan Wolff, *An Introduction to Political Philosophy,* Revised edition, Oxford University Press, New York, 2006, p. 139.

৪১. Locke, *Second Treatise*, Ch. V. § 28.

৪২. S. R. Munzer, A Theory of Property, Cambridge University Press, New York, 1990, pp. 9-10.

৪৩. জর্জ এইচ. স্যাবাইন, *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুকস্টল, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯১।

৪৪. স্যাবাইন, *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), পৃ. ৪৯১।

৪৫. *প্রাগুক্ত*।

৪৬. Locke, *Second Treatise*, § 285-302.

৪৭. Locke, *Second Treatise*, § 323.

৪৮. Griffith., "John Locke's Influence on American Government and Public Administration", *Journal of Management History*, p. 228.

৪৯. John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, abridge and edited with an introduction by A. D. Woozley, New American Library, New York, 1974, pp. 173-174.

৫০. F. McDonald, *Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution*, University Press of Kansas, Lawrence, Kans, 1985, p. 7.

৫১. Steven M. Dworetz, *The Unvarnished Doctrine: Locke Liberalism, and the American Revolution,* Duke University Press, Durham, 1994, pp. 75-76.

৫২. Locke, *Second Treatise*, § 138, § 139.

৫৩. John Locke, *Two Treatises of Government*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967, p. 371, § 131.

৫৪. *Ibid.*, p. 368, § 123.

৫৫. *Ibid.*, pp. 368-369. § 124.

৫৬. Locke, *Second Treatise*, § 85.

৫৭. *Ibid.*, § 34.

৫৮. Thomas G. West, *Vindicating the Founders: Race, Sex, Class and Justice in the Origins of America*, Lanham, MD: Rowman & Littefield Publishers, 1997, p. 48.

৫৯. Steven M. Dworetz, *The Unvarnished Doctrine: Locke Liberalism, and the Americal Revolution,* Duke University Press, Durham, 1994, p. 78.

৬০. Jeremy Waldron, *The Right to Private Property,* Oxford University Press, Oxford, 1988, p. 5.

৬১. James O. Grunebaum, *Private Ownership,* Routledge and Kegan Paul, London, 1987, pp. 111-112.

৬২. *Ibid.*

৬৩. *Ibid.*, p. 124.

৬৪. *Ibid.*, p. 171.

৬৫. *Ibid.*, p. 173.

৬৬. Gough, *John Locke's Political Philosophy*, p.77.

৬৭. Sir Frederick Pollock, "Locke's Theory of the State", in *Essays in the Law,* p. 90.

৬৮. এ সম্পর্কে লকের মত, John Locke, *Second Treatise,* § 30, 31.

৬৯. Gough, *John Locke's Political Philosophy,* p. 83.

৭০. *Ibid.*, p. 88.

৭১. Colin Bird, *An Introduction to Political Philosophy,* Cambridge University Press, New York, 2008, p. 102.

৭২. Colin, *An Introduction to Political Philosophy,* p. 103.

৭৩. Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia,* Basic Books, New York, pp. 171-172.

৭৪. David Wootton (ed.), *The Selected Political Writings of John Locke,* Mentor, New York, 1993, p. 274.

৭৫. প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদে ব্যক্তি স্বীয় শ্রম আরোপের দ্বারা যখন ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এ পদ্ধতিকে বলা যায় শ্রম মিশ্রন যুক্তি (Labour-mixing agrument)।

৭৬. Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, p. 175.

৭৭. Wolff, *An Introduction to Political Philosophy,* pp. 140-141.

৭৮. Locke, *Second Treatise,* S. 40, p. 296.

৭৯. *Ibid.*

৮০. Macfarlane, *Modern Political Theory,* p. 191.

৮১. “Lockean Proviso” হলো (জন লকের সম্পত্তির শ্রমতত্ত্ব যা দ্বারা বোঝানো হয়) যখন ব্যক্তি প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পত্তিতে স্বীয় শ্রম প্রয়োগ করে তাহলে তাতে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ব্যক্তি ততক্ষণ তা করতে পারে যখন অপরের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে।

৮২. Colin, *An Introduction to Political Philosophy,* p. 112.

৮৩. Ron Replogle, “Natural Rights and Distributive Justice: Nozick and the Classical Contractarians,” *Canadian Journal of Political Science,* Vol. 17, No. 1, 1985, pp.65-86. https://www.jstor.org/stable/3227654

৮৪. Locke, *Second Treatise,* Ch. 5. § 107.

৮৫. *Ibid.*, Ch. 5, II, § 50.

৮৬. *Ibid.*, p. 186.

৮৭. John Locke, *Second Treatise*, Ch. V. § 120.

৮৮. Macfarlane, *Modern Political Theory,* p. 189.

৮৯. John Locke, *Second Treatise,* Ch. V. § 135.

৯০. Macfarlane, *Modern Political Theory,* p. 189.

৯১. Locke, *Second Treatise*, § 3.

৯২. Marx, K, Engels, F, and Lenin, V. I., *Engle’s Speeches in Elberfeld*, rep. in *On Communist Society,* Progress Press, Moscow, 1974, p. 10.

৯৩. এঙ্গেলস বাজারকে ‘wasteful’ বলতে বোঝাতে চেয়েছেন শ্রমিকের সুপ্ত প্রতিভার অপচয়।

৯৪. Engle’s, Speeches in Elberfeld, ibid; p. 11.

৯৫. স্যাবাইন, *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনু.), পৃ. ৫৪৩।

৯৬. Jean-Jacques Rousseau, *The Collected Works of Rousseau: Discourse On Political Economy,* Jean Seine (trans.), United States, 2023., pp. 5-6.

৯৭. Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, translated and introduction by Maurice Cranston, BK I, Ch. 9, Penguin Books, 1968, pp. 66-68.

৯৮. *Ibid.*, p. 66.

৯৯. Macfarlane, *Modern Political Theory,* p. 197.

১০০. Rousseau, *Discourse on Political Economy,* pp. 262-265.

১০১. *Ibid.*, p. 250.

১০২. Rousseau, *The Social Contract*, BK II, Ch. II, p. 90.

১০৩. Jean Jacques Rousseau, *Considerations on the Government of Poland and On its Proposed Reformation*, April, 1772 (completed but not published), pdf, source: www.isn.ethz.ch http://www.consititution.org/jjr/poland.htm - 03-01-2008

১০৪. Jean Jacques Rousseau, *Constitutional Project for Corsica*, Kessinger Publishing, 2004, p. 317.

১০৫. Rousseau, *The Social Contract*, p. 8.

১০৬. Leo Strauss, "On the Intention of Rousseau", *Social Research*, Vol. 14, No. 4, The Johns Hopkins University Press, 1947, pp. 455-487.

১০৭. Andrew Geoffry Billing, "Rousseau's Critique of Market Society: Property and Possessive Individualism" in *The Discours Sur L'Inégalité*, Journal of European Studies, Vol. 48, Issue 1. 2018, pp. 3-19. https://doi.org/10.11771004/24417744090

১০৮. *Ibid.*

১০৯. Y. Barzel, *Economic Analysis of Property Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984, p.2.

১১০. *Ibid.*

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশে সামাজিক চুক্তির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য

একটি আদর্শ বা ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা কেবল আধুনিককালে রাষ্ট্রচিন্তার আলোচিত বিষয় নয়। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে ন্যায়ভিত্তিক সমাজের রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। আধুনিককালেও এ ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। সামাজিক চুক্তিবাদীদের লেখনীতেও রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মত পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ধরণ বা পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত এ প্রশ্নের উত্তরে চুক্তিবাদীর মধ্যে অধিকতর উদারনৈতিক মত পাওয়া যায় জন লকের কাছে। তিনি *Two Treatises of Civil Government* গ্রন্থে রাষ্ট্রশাসনের যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন তা মূলত জনগণের সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সম্মতিতত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্র ও সরকার উভয়ের ভিত্তি হবে জনসাধারণের সম্মতি। এক্ষেত্রে তাঁর মতকে দাবি করা হয় একটি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থারূপে। কারণ এতে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সম্মতির ওপর বা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়। লক উল্লিখিত সরকারব্যবস্থার এ ধরণের সাথে বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মিল লক্ষ করা যায়। অবশ্য প্রশ্ন ওঠে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতির ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় তবে ভিন্নমতাবলম্বী কিংবা যারা ঐ সরকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যমত ছিল না রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান কি হবে। রাষ্ট্র কি তাদের প্রতি বৈরী আচরণ করবে নাকি নাগরিকের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে? এর উত্তরে বলা যায়, হেগেল তাঁর *Science of Logic* গ্রন্থে যে দ্বন্দ্বতত্ত্বের কথা বলেছেন তাতে এর সমাধান নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রে ভিন্ন মতাবলম্বী থাকলেও রাষ্ট্র হবে সকল মানুষের প্রতি সহযোগিতাপরায়ন। সকলের মিলনক্ষেত্র হবে রাষ্ট্র। সোজা কথায়, একটি সমন্বয় থাকবে। হেগেল তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বে যে সমন্বয়ের কথা বলেছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সে সমন্বয় প্রয়োজন; যাতে থাকবে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা, উদারনৈতিক মূল্যবোধ ও সহনশীলতা। তবে এসব দিক সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর তরফ থেকে আসা বাঞ্ছনীয়, কেবল সরকারের পক্ষ থেকে এ সকল প্রত্যাশার সুষ্ঠু সমাধান মিলবে না।

বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংবিধানের মূলনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার যে ধরণ তাতে রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের মূল বিষয়টি হলো সাধারণ জনগণের মঙ্গলের লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বা জনগণের মঙ্গলই রুশোর কাছে মুখ্য। বাংলাদেশের সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা আইন বিভিন্নক্ষেত্রে তাত্ত্বিকভাবে রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় 'সাধারণের তথা জনগণের মঙ্গলকেন্দ্রিক নীতি বা বিধি-বিধানই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি।'[১]

সংবিধানের নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় যখন এতে সাধারণ জনগণের বা গণমানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে; যখন এতে সামষ্টিক মঙ্গল যুক্ত থাকে, যখন এ সংবিধানের আইন-কানুন ও বিধি-বিধানসমূহের দ্বারা জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। প্রশ্ন উঠে, বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান বাস্তবতায় রুশোর সাধারণ ইচ্ছার প্রতিফলন কতটুকু? উত্তরে বলা যায়, যদিও সংবিধানে বাংলাদেশকে একটি গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে অভিহিত করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী রূপে তাঁর কাছে অধিকাংশ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া যায় হবসের সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সার্বভৌমের সাথে।

বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে সংকট তাতে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্বলিত বিধি-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি প্রকটভাবে অনুভূত। সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতার আধিপত্যই দৃশ্যমান। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি (রাজনীতিবিদ) অপেক্ষা অনির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ (বুর্জোয়া শ্রেণি) ধনিক-বনিক-আমলা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে। ফলে বর্তমান বাংলাদেশে রাষ্ট্রের কোনো নীতিদার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বহুবিধ কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নীতিদার্শনিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়াটা কঠিন হয়ে পড়েছে। মানুষ যখন স্বীয় স্বার্থের পরিতৃপ্তি ঘটায় এবং অপরের স্বার্থের বিষয়েভাবে তখন এর সাথে যুক্ত হয় ব্যক্তির মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনার প্রশ্ন। রূঢ় হলেও সত্যি যে, বর্তমান বাংলাদেশে মানুষের মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনা ক্রমশ দুর্বলতর হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ ও আবেগ অধিকতর প্রবল রূপ ধারণ করছে। অর্থনৈতিকভাবে একটি লুণ্ঠনধর্মী পুঁজিবাদী ধারা এখানে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। এ ধারাটি রাজনীতি ও জনগণের মাঝে এমন এক অন্তরায়রূপে দাঁড়িয়েছে যাতে রাজনীতিবিদদের পরিবর্তে ধনিক-বনিক-আমলা কর্তৃক রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অপরদিকে, বর্তমানে এক শ্রেণির ভোঁতা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছে যারা অতীতে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তীকালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও মাথা ঘামিয়েছে; কিন্তু তারা বর্তমানে স্বীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণে ব্যস্ত ও তৃপ্ত। তাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে সামাজিক সাংস্কৃতিক বিমুখতা, জাতীয়তাবাদী আবেগ ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে তাদের অধিকাংশের কাছে; আবার অন্যদিকে ধর্মীয় উগ্রবাদের মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমাধান অন্বেষণ করছে। জাতীয়তাবাদের স্থলে স্থান করে নিতে চায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ। প্রায়শ উগ্র ধর্মান্ধতা বা মৌলবাদের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ রূপে প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা চালায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ।

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে অধিকাংশের মধ্যে যে আত্মকেন্দ্রিকতা লক্ষণীয় এর সাথে অংশত সাদৃশ্য মেলে লকের সম্পত্তিতত্ত্বের। যেখানে সম্পত্তির সুরক্ষা মুখ্য বিষয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও জনগণ উভয়ের কাছে উপজীব্য হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক সুরক্ষা। দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একটা লুটেরা অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। কোটি টাকা প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়ে গেলেও তা ফেরানোর কোনো কার্যকরী উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় তরফে লক্ষ করা যায় না। পুঁজিবাদী অক্টোপাস যে কেবল ধনিক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করে তাদের তুষ্ট করছে তা নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেষ্টিত করেছে, তাদের মাঝে তৈরি হয়েছে রাজনীতি বিমুখতা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হককে উদ্ধৃত করা যেতে পারে – "আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশে রাজনীতিবিদদের এবং রাজনীতিতে তৎপর বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ, জাতিরাষ্ট্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিকতাবাদ নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই।[২]

জনগণ অর্থনৈতিক অধিকারের বিষয়ে যতটা সচেতন রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে ততটা সচেতনতা লক্ষ করা যায় না। যে-কারণে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী কর্তৃক রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। রাজনৈতিক সচেতনতার পরিবর্তে আধুনিক বাংলাদেশের জনগণের মাঝে অর্থনৈতিক দাসত্ব মুখ্য হয়ে উঠেছে। উদারনৈতিকতা ও যুক্তিবাদিতার স্থলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্ষমতার দাপট প্রচণ্ডভাবে দৃশ্যমান। তবে এ ক্ষমতা জনগণের মতামতের প্রকৃত চিত্র নয়। এ ক্ষমতার সাথে জনসংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যাবে অর্থনৈতিক ও পেশীশক্তির দাপট। যে ক্ষমতার সাথে জনগণের ইচ্ছার বা সম্মতির সংশ্লেষণ ঘটে না তার কোনো নৈতিক ভিত্তি থাকে না। আপাতদৃষ্টে এর আইনগত বৈধতা বা ভিত্তি হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে কিন্তু এর কোন নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। বাংলাদেশের রাজনীতির চলমান সংকট ততদিন বিদ্যমান থাকবে যতদিন জনগণের গণতান্ত্রিক শক্তি বিকশিত না হবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তি ও জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অনুপস্থিতি বা

রাজনীতি–বিমুখতার ফলে জনসম্মতির প্রতিফলন না ঘটার দরুন একপ্রকার 'রাজনৈতিক নিরঙ্কুশতন্ত্র বা Political absolutism' গড়ে উঠেছে।[৩] বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে কোনো পরিচ্ছন্ন অথবা সুস্থ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায় না। 'নির্দলীয় রাজনীতি, অদলীয় রাজনীতি, নাগরিক কমিটি, নাগরিক আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন, রাজনীতিবর্জিত সুশাসনের তত্ত্ব ইত্যাদি দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে রাজনীতির গতি ও প্রকৃতি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে উত্তরাধিকারভিত্তিক নেতৃত্ব, পরিবারতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র।[৪]

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। যেমন, বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের আগ্রাসী প্রভাব, দুর্নীতি এবং তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিদ্যমানতা বা প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট দৃশ্যমান। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কেবল বর্তমান বাংলাদেশের নয়, বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ও প্রচলন মধ্যযুগ থেকেই লক্ষ করা যায়। ষোল শতকের ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে ম্যাকিয়াভেলি, হবস, লক, রুশো প্রমুখের লেখনীতে ধর্মের প্রভাব থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করতে এবং কেন তা প্রয়োজন তার ব্যাখ্যা– বিশ্লেষণও তারা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। তথাপিও এ কথা অনস্বীকার্য যে শুধু আধুনিককালে নয় সমকালীন বিশ্বরাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এর ব্যতিক্রম নয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বর্তমান বাংলাদেশে এক আগ্রাসীরূপ পরিগ্রহ করেছে। যদিও বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। তবে এটিও সত্যি, জনগণ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির খোলস থেকে মুক্ত হয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটায়। যদিও এ দেশটি জন্মলগ্ন থেকে এবং ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের একটি মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সকল ধর্মের মানুষের বসবাসের জন্য রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী ছিল। তথাপিও বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বাস্তবতায় তেমনটি দাবি করার সুযোগ ক্ষীণ। পঁচাত্তর পরবর্তী সরকারসমূহের হাত ধরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং সময়ের পরিক্রমায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে ধারা তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ বাংলাদেশের রাজনীতিতে অসংখ্য ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, আবার যেসকল দল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কিংবা ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের নামকরণ করেনি তারাও প্রকৃত বিচারে কতটা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির চর্চা করে সে প্রশ্নটি বারংবার চলে আসে।

সামাজিক চুক্তিবাদীদের লেখনীতে কমবেশি জনগণের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের উপস্থিতিকে সমর্থন করেছেন কিন্তু তারা (হবস, লক ও রুশো) রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনকরূপে পরিচিত ম্যাকিয়াভেলি হতে শুরু করে চুক্তিবাদীগণের লেখনী থেকে এটা বোঝা যায় কেন এবং কীভাবে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার তৎকালীন ইউরোপের ভগ্নদশা সৃষ্টির জন্য দায়ী। সেই সাথে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রে নাগরিকের জন্য চূড়ান্ত স্বস্তির কারণ হতে পারে কি না এবং তা জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পথকে রুদ্ধ করে কি না সে প্রশ্ন চলে আসে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণই ক্ষমতার মালিক। বাংলাদেশের সংবিধানেও সে কথাই বিধৃত আছে। কিন্তু বাস্তবে গণতন্ত্র কি সত্যিই 'গণ'-দের তন্ত্র? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে। কেননা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যে বৈশিষ্ট্য তাতে দেশের আইন, বিচার, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি সর্বান্তকরণে জনগণের মালিকানা, অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত থাকা ও প্রতিফলিত হওয়ার দাবি রাখে। এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর

ক্ষমতার প্রয়োগের পথে প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের কাছে থাকার কথা যা দ্বারা জনগণ রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তদারকি করতে পারে।

যদিও একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থারূপে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা গণ্য হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবুও সমকালীন বিশ্বে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য রাষ্ট্রব্যবস্থারূপে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। হবস, লক ও রুশো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করেননি। রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থের সাধারণ ইচ্ছার বর্ণনা থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে হতে পারে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। রুশো তার উক্ত গ্রন্থে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন যা প্রাচীন গ্রিসে লক্ষ করা যেত। তাছাড়া তিনি নিজেই দাবি করেছেন গণতন্ত্র ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট ভূখণ্ডের জন্য প্রযোজ্য যার জনসংখ্যা দশ হাজারের বেশি হবে না। ত্রয়ী চুক্তিবাদীগণ তাদের লেখনীতে চরম রাজতন্ত্র (হবস), নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (লক) এবং গোষ্ঠীতন্ত্রকে (রুশো) সমর্থন করেছেন। যে সকল যুক্তিতে তারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করেননি আধুনিককালের রাষ্ট্রে সে সকল বিষয়ের উপস্থিতি গণতন্ত্রকে সংকটাপন্ন করেছে। গণতন্ত্রের সংকটের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী কারণসমূহের মাঝে আছে রাজনীতি সচেতন জনগণের অনুপস্থিতি, ব্যবসায়ী এবং আমলাদের কাছে ক্ষমতার কুক্ষিগতকরণ, যথাযথ মত প্রকাশে স্বাধীনতার অভাব, শাসকের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি, জন নির্বাচনকে প্রভাবিতকরণের প্রয়াস, সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য, দুর্নীতি, নৈতিক অধ:পতন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা বা রাজনীতিবিমুখতা, দলীয় লেজুড়বৃত্তি, দুর্বল রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ব্যবস্থা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে সংকট তা নিরসনে 'সিভিল সোসাইটি'র শক্তিশালী ভূমিকাকে প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য সমাধানরূপে কোনো কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণি সমর্থন করেন। রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে 'সিভিল সোসাইটি'র আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো রুশো উল্লিখিত সিভিল সোসাইটির যে চিত্র তা কি আধুনিককালে বিশেষত বাংলাদেশে বিদ্যমান সিভিল সোসাইটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা রুশোর লেখনীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তিতে রাখার জন্য যে অতন্দ্র পাহারার প্রয়োজন পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিভিল সোসাইটি সে ভূমিকাটি পালন করেছে বলে ধারণা করা হয়। সিভিল সোসাইটির এ ভূমিকা সমাজে রাজনৈতিক দল ও সরকারের ক্ষেত্রে ওয়াচডগ রূপে কার্যকর– এমন বিশ্বাস করা হয়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখবো গণতন্ত্রের শক্তিশালী রক্ষাকবচরূপে যে সিভিল সোসাইটি তা প্রকৃত বিচারে কতটুকু ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

সিভিল সোসাইটি ও বর্তমান বাংলাদেশ

প্রাচীন গ্রিস ও রোমে 'সিভিটাস' প্রত্যয়টি রাষ্ট্র অর্থে ব্যবহৃত হতো। আর সিভিটাসের বসবাসরত জনগণ পরিচিত পায় 'সিভিল' রূপে। কাজেই 'সিভিল সোসাইটি' প্রত্যয়টিকে যদি আমরা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিবেচনা করি তাহলে বলা যায় এটি হলো নাগরিক সমাজ। আধুনিককালে রুশো যে অর্থে সিভিল সোসাইটিকে ব্যবহার করেছেন তাতে তিনি প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রের মতো ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠীসম্পন্ন রাজনৈতিক সমাজকে বুঝিয়েছেন।

চুক্তিবাদীদের আলোচনায় দেখা যায় প্রকৃতির রাজ্য থেকে মানুষ চুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাজের উন্মেষ ঘটিয়েছে। এ সমাজে জনগণ উন্নততর ও নিশ্চিত সমৃদ্ধ জীবনের লক্ষ্যে স্বীয় অস্তিত্বকে নিরাপদ করার জন্যে একত্রিত হয়। [একত্রিত সমাজবদ্ধ সত্তা রাজনৈতিক সমাজে সৃষ্টি করে সিভিল সোসাইটি।] হবসের আলোচনায় জনগণ তাদের প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে, যার দ্বারা সীমিত হয় জনগণের অবাধ স্বাধীনতা এবং জনগণের

এ অধিকার জমা করা হয় লেভিয়াথানের কাছে। পক্ষান্তরে লকের জনগণ তা সমর্পণ করে সরকার নামক ট্রাস্টের কাছে আর রুশোর জনগণ সাধারণ ইচ্ছার কাছে। চুক্তিবাদীদের আলোচনায় এটি স্পষ্ট– জনগণ একক জীবনের পরিবর্তে গোষ্ঠীবদ্ধতায় আবদ্ধ হয় স্বেচ্ছায়, স্বীয় স্বার্থে ও বৃহত্তর লাভে। এভাবে গোষ্ঠীজীবন রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। সামাজিক চুক্তি দ্বারা জনগণ যে এসোসিয়েশন তৈরি করে তা সামষ্টিকতার ফল। সামষ্টিকতার এ প্রক্রিয়াটি চুক্তির ফলে উদ্ভূত। যেহেতু চুক্তির ফলে রাজনৈতিক সমাজের সৃষ্টি তাই রাষ্ট্রের সাথে সিভিল সোসাইটির সম্পর্ক হবে পারস্পরিক– এমনটাই প্রত্যাশিত। আন্তনিও গ্রামসির মতে, "রাষ্ট্র হবে সিভিলদের রক্ষক ও প্রতিপালনকারী, সিভিলদের ভালোমন্দের দেখভালকারী ও অধিকার সংরক্ষণকারী।"[৫]

হবস, লক ও রুশোর লেখনীতে কমবেশি সিভিল সোসাইটির আলোচনা লক্ষ করা যায়। এতে একটি সাদৃশ্য স্পষ্ট– সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ বা পৌর সমাজ বলতে তাঁরা রাজনৈতিক সমাজকেই বুঝিয়েছেন, অ-রাজনৈতিক জনগণের সমাজ তথা প্রকৃতির রাজ্যের সদস্যদের নয়। রাজনৈতিক সমাজের সদস্যরা নাগরিক সমাজের তথা নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে। এর কারণরূপে বলা যায় রাষ্ট্রের অন্য একটি অর্থ হলো 'পলিস' এবং পলিসের সমাজকে বলা হচ্ছে রাজনৈতিক সমাজ। বুর্জোয়া দার্শনিক জন লক সিভিল সোসাইটির অপর নামকরণ করেন রাজনৈতিক সমাজ বা পলিটিক্যাল সোসাইটি।[৬] চুক্তিবাদীদের উল্লিখিত সিভিল সোসাইটি বা নাগরিক সমাজ কিংবা বর্তমান বাংলাদেশে আমরা যার নামকরণ করেছি 'সুশীল সমাজ'-এর একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেকের সময়কালেই এই সমাজ পুঁজিপতি শ্রেণির সমাজ। অর্থাৎ বিত্তশালীর সমাজ বা ধনিক শ্রেণির সমাজ। সিভিল সোসাইটির অর্ন্তভুক্ত সদস্যগণ একদিকে রাজনৈতিক অন্যদিকে ধনিক শ্রেণির অংশ যা বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতার সাথে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ এখানে সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজের যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা নিজেদের রাজনীতি সচেতন বলে যেমন দাবি করেন কিংবা রাজনীতি সচেতন, একই সাথে এ সমাজের সভ্যগণ বিত্তহীন বা দিনমজুর শ্রেণির কোনো সরাসরি প্রতিনিধি বা সভ্য নয় বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় 'সুশীল সমাজ' প্রত্যয়টি সমাজের আপামর জনতার প্রতিনিধিত্ব করে কি না সে প্রশ্ন রয়ে যায়। সুশীল সমাজ আপামর নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব না করে সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণি বা গোষ্ঠী বা দলের পকেট হিসেবে কাজ করছে এমন বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

যদিও ধনী-গরীব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের রাজনৈতিক জীবনে উত্তরণের জন্য এ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়, কিন্তু সমকালীন বাস্তবতা হলো রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক সমাজ বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পৃষ্টপোষকে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণ–রাষ্ট্র লালন, পালন এবং ধারণ করে।[৭] এ রাষ্ট্র শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষণকে অবলুপ্ত তো করেইনি বরং উত্তরোত্তর এর প্রসার ঘটিয়েছে; দেশে দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমান বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এ বৈষম্যকে ধারণ করে। প্রশ্ন হতে পারে, চুক্তিবাদের ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমাজের উদ্দেশ্য কী ছিল– শ্রেণিস্বার্থ সংরক্ষণ নাকি আপামর জনতারস্বার্থ সংরক্ষণ? পুঁজিপতির স্বার্থসংরক্ষণই যদি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হয় তবে পুঁজিহীনদের রাষ্ট্রের নাগরিক মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকে কি? নাকি প্রাচীন দাসভিত্তিক সমাজের মতো এ সমাজে বিত্তহীন শ্রেণি রাজনৈতিক পথ পরিক্রমায় ঘুটিরূপে কাজ করে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখেনা। বিত্তহীন এ শ্রেণিকে রাজনৈতিক সমাজ ও কার্যক্রমে যাদের অংশগ্রহণ নেই তাহলে নাগরিকের মর্যাদা দেয়া যায় কি? বরং প্রশ্ন জাগে সুশীল সমাজ বা নাগরিক সমাজরূপে আমরা যাদের চিহ্নিত করি তারা প্রকৃত বিচারে কি রাজনৈতিক সমাজ নাকি অভিজাত বা এলিট বা ধনিক শ্রেণি। বিত্তহীন শ্রেণিকে নাগরিক মর্যাদা প্রদানের প্রশ্ন উঠছে এ কারণে যে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত বা নিম্নবিত্ত জনগণ যারা জীবনসংগ্রামেই ক্লান্ত তারা প্রকৃত অর্থে কতটা রাজনীতিসচেতন। রাষ্ট্রের অধিবাসীরূপে একজন মানুষ রাজনৈতিক জীব হতে পারে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এবং রাজনীতি সচেতন এমনটা সবসময় বলা যায় না। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সভ্য হওয়ার পরেও যে সকল সাধারণ জনগণ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে (অনেক ক্ষেত্রে) বঞ্চিত অথবা

রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুফল যাদের কাছে পৌঁছায় না তাদের চাহিদার বা দাবি-দাওয়ার প্রতিফলন ঘটাবে সুশীল সমাজ এমনটাই প্রত্যাশিত। যদিও বাংলাদেশের সুশীল সমাজ যারা মূলত অভিজাত শ্রেণির অংশ তাদের সাথে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সরাসরি সংযোগ প্রায়শই থাকে না। ফলে শ্রেণিবৈষম্য ও শ্রেণিশোষন তিরোহিত না হয়ে ঘনীভূত হতে থাকে। রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে সামাজিক চুক্তির ফলে সৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থায় তিনি চেয়েছেন একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি মনে করেন চুক্তির ফলে সৃষ্ট সমাজ সংস্থায় সকল মানুষের সমান অধিকার। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমান ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং রুশোর সমাজ সংস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেকের এবং সকলের অধিকার সমান। তাঁর বিশ্বাস বৈষম্যের দ্বারা কোনো ব্যক্তিরই যথার্থ স্বার্থ সাধন হতে পারে না।[৮] রুশোর এ বক্তব্যকে যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে বর্তমান বাংলাদেশে বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল সোসাইটি বিদ্যমান থাকতে পারে না এবং বড় কথা হলো, এ রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থপূর্ণতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বর্তমানে রাষ্ট্রসমূহ স্পষ্টতই বৈষম্যপ্রবণ এবং রুশোর বক্তব্য অনুযায়ী এধরণের ক্ষেত্রে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ হয় এবং চুক্তি স্বীয় কার্যকারিতা হারায়। ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অবশ্য কেবল রুশো নয় হবস ও লকের আলোচনাতেও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব চুক্তি দ্বারা জনগণ সরকার বা রাজার ওপর ন্যস্ত করে, যাতে রাজা প্রজার বা নাগরিকের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করবে। অর্থাৎ রাজার দায়িত্ব হলো সকল প্রজাদের সার্বিক ভালো নিশ্চিত করা। এখন প্রশ্ন আসে, রাজা বা শাসক যদি সকল প্রজার অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে সরকার বা রাষ্ট্রের বৈধতা থাকে কিনা। আবার হবস চরম ক্ষমতার সমর্থন সত্ত্বেও মনে করেন, সরকার অর্থাৎ রাজা যদি জনগণের অধিকার তথা নিরাপত্তা দিতে অসমর্থ হয় তাহলে জনগণ সে ক্ষমতার বিরুদ্ধচারণ করতে পারে।[৯]

হবস, লক ও রুশো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে শাসক যদি চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে অর্থাৎ জনগণের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে শাসকের কাছে অর্পিত ক্ষমতা পুনরায় জনগণের দিকে ফেরত যায়। সরকার ও জনগণের এধরণের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছে ডেভিড হিউমের বক্তব্যক। তিনি *Original Contract* গ্রন্থে বলেন– সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা চুক্তির দ্বারা অন্যের কাছে প্রদান করা হলেও সে চুক্তি ভঙ্গ হচ্ছে কিনা তা নজরদারি প্রয়োজন।[১০]

হিউমের বক্তব্যে নজরদারির যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সিভিল সোসাইটির। শাসক শাসিতের প্রতি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কিনা কিংবা রাজা চুক্তিভঙ্গ করছে কিনা ইত্যাদি। যদিও সিভিল সোসাইটি কিন্তু প্রকৃত বিচারে জনগণের অর্থাৎ সিভিলদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা একদল প্রতিনিধি। যদিও কেবল হিউম নয় তার পূর্বেও চুক্তিবাদীদের লেখনীতে সিভিল সোসাইটির উল্লেখ রয়েছে এবং রুশোর লেখনীতে তার কার্যক্রম অত্যন্ত স্পষ্ট। এমনকি ষোড়শ শতকে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির *প্রিন্স* গ্রন্থেও *সিভিল প্রিন্সিপালিটি* নামে সিভিল সোসাইটি বা সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধির বিষয়ে উল্লেখ পাওয়া যায়।[১১]

সিভিল সোসাইটি বা তার প্রতিনিধিদের কাজ হচ্ছে সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা। একই সাথে এ সোসাইটিতে সিভিল বলতে কেবল এলিটদের প্রতিনিধিত্ব নয় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি থাকাটাও প্রয়োজন– সেসকল বিষয় কতটা কার্যকার হচ্ছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি নামক যে সোসাইটি গড়ে উঠেছে তাকে এলিট শ্রেণি বলার কারণ এতে সভ্যবৃন্দের তালিকায় যাদের উল্লেখ আছে (এ সম্পর্কে একটি তালিকা পাওয়া যায় হাসনাত আবদুল হাইয়ের লেখনীতে।)[১২] এবং যাদের উল্লেখ নেই, যেমন- অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলা, সামরিক কর্মকর্তা, দেশি-বিদেশি এনজিও, বহুজাতিক কোম্পনির প্রতিনিধিগণ, বিরোধী রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়ী প্রমুখ– এ দুয়ের কোনো ক্ষেত্রেই সিভিল সোসাইটির পেশাজীবীর তালিকায় হতদরিদ্র, দিনমজুর, কৃষক কিংবা

এধরণের কোনো শ্রেণির প্রকৃত প্রতিনিধিকে তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশের এ সিভিল সোসাইটি কি সত্যিকারের সিভিলদের প্রতিনিধি?

এ প্রশ্ন ওঠে এজন্য যে বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির সাথে সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এদেশের কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুরদের শোষণ-নিপীড়ন, সংখ্যালঘু বা আদিবাসী নির্যাতন কিংবা নারীদের ওপর সংঘটিত সহিংসতায় এ সোসাইটিকে খুব একটা সোচ্চার ভূমিকায় পাওয়া যায় না যতটা পাওয়া যায় সরকারের প্রতি বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতায়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওপর খবরদারির প্রশ্নে, শেয়ার বাজারের প্রশ্নে এমনকি করোনার লকডাউনে বা এ ধরনের দুর্যোগে জীবন অপেক্ষা জীবিকা রক্ষার নামে শিল্পপতিদের মিল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অবস্থান গ্রহণে। বাংলাদেশের সুশীল সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে নদী-পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ক্রান্তিকালে। তাই এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ যে সোসাইটির দেখভালের কথা তাদের দেখভাল বা নজরদারি করবে কে? যে সুশীল সমাজ সরকারকে সাধারণ জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে বাধ্য করার কথা, সরকার বা রাষ্ট্রের সাথে সর্বস্তরের জনগণের সংযোগ স্থাপন ও সেতুবন্ধনের কাজ ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুলিশের ভূমিকাকে নজরদারিতে রাখার কথা– সে সকল প্রশ্ন থেকে সরে এসে কিংবা বিভক্ত হয়ে সিভিল সোসাইটি হয়ে উঠেছে এলিট সোসাইটি। এর অধিকাংশ সভ্যবৃন্দ স্বীয় স্বার্থ-মত সংরক্ষণে প্রাধান্য দেয়।

রাষ্ট্রীয় কার্যে সিভিল সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা, রাষ্ট্রকাঠামোতে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, সমাজের এলিট সোসাইটির সঙ্গে সিভিল সোসাইটির চরিত্রগত এবং কর্মগত কোনো প্রকৃতির মিল-অমিল-গরমিল সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন ড. রাহমান নাসির উদ্দিন তাঁর "সিভিল সোসাইটি এবং বাংলাদেশ" প্রবন্ধে।[১৩] বর্তমান বাংলাদেশের সুশীল সমাজ নামে যে শ্রেণিটির উপস্থিতি আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনে লক্ষ করি তাকে প্রকৃতপক্ষে সিভিল সোসাইটি মনে হয় না, বরং তা শ্রেণিস্বার্থকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজের একটি বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হয়। তাই সুশীল সমাজ নামক বর্তমান বাংলাদেশের এই শ্রেণিটিকে এলিট শ্রেণিরূপেই অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

জনগণের অবস্থান

বাংলাদেশের জন্মলগ্নে অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে এর যে চেতনা কাজ করেছিল তাকে আমরা তুলনা করতে পারি রুশোর সাধারণ ইচ্ছার সাথে। তবে কালক্রমে সে চেতনা থেকে সরে এসে বর্তমানে জনগণের মাঝে যে চেতনা কাজ করছে তাকে আমরা আর সাধারণ ইচ্ছা দাবি করতে পারি না। বরং এ পরিস্থিতিকে বলতে পারি সকলের ইচ্ছা (Will of all) যেখানে সামষ্টিক স্বার্থ, অভিন্ন চেতনা কম গুরুত্ব পায় বরং ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুবিধা ও স্বার্থসিদ্ধিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সকলের ইচ্ছা ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল থেকে সংক্রমিত হয়ে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়েছে জাতীয় পরিমণ্ডলে। এ সম্পর্কে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে দৃশ্যমান। যদিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা গঠিত, এবং ত্রয়ী চুক্তিবাদীদের লেখনীতে আমরা দেখেছি রাষ্ট্র তার নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

সামাজিক চুক্তির উদ্দেশ্য থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য জন রলস 'অজ্ঞতার পর্দার' (Veil of ignorance) প্রস্তাব করেছেন। 'অজ্ঞতার পর্দা' ধারণা ব্যবহারে তিনি যে 'আদি অবস্থান' (original position) এর উল্লেখ করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। রলস মনে করেন "the

principles to be chosen should play a public role in life of the society being treated like a founding constitutions or convent."[১৪]

সাংবাদিক সোহরাব হাসান 'রাষ্ট্রের মেরামত সামাজিক চুক্তি ও ইসির ইফতার' শিরোনাম নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন– 'সুশাসনের জন্য নাগরিক' (সুজন) রাষ্ট্র মেরামতের জন্য যে ১৮ দফা প্রস্তাব দিয়েছে যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কার ও নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করা হয়। এতে 'সুজন' নতুন সামাজিক চুক্তি প্রসঙ্গে বলেছে, রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান আয় ও সুযোগের বৈষম্য নিরসনে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*-এর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, সমাজ গঠনের এমন একটা আদর্শ থাকতে হবে, যাতে সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির জীবন ও সম্পদ সমবেত শক্তির সাহায্যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আপন আদেশই পালন করবে ও আগের মতোই স্বাধীন থাকবে। এর ফলে সামাজিক চুক্তি বিকশিত হয়। এ চুক্তি কোনো নিরঙ্কুশ শাসক তৈরি করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব অধিকারকে সামাজিক চুক্তির দ্বারা সমষ্টির কাছে সমুদয়ভাবে সমর্পণ করে।[১৫] বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিত্তবান ও বিত্তহীন শ্রেণির মধ্যকার যে প্রগাঢ় বৈষম্য, যাতে আয়ের বৈষম্য ও সুযোগের বৈষম্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত তা রুশোর সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের যে মূল চেতনা তার সাথে স্পষ্টত সাংঘর্ষিক। রুশোর চুক্তিবাদে একটি শ্রেণিবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও রাজনীতির সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা স্থাপনের যে প্রয়াস লক্ষ করা যায় তা আধুনিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুপস্থিত। সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যদিও সহজ নয়, তবুও রাষ্ট্রে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সে বাস্তবায়নের পথকে আরো কঠিন করে তুলেছে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার সাথে অর্থনৈতিক ন্যায্যতার বিষয়টি নিবিড়ভাবে যুক্ত। বর্তমান বিশ্বে আমরা প্রায়শ এমন প্রশ্ন উত্থাপন করি অথবা সম্মুখীন হই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সঠিকভাবে বণ্টনকৃত কিনা। কোনো কোনো শ্রেণির মানুষের কাছে সম্পদের প্রাচুর্য এবং অন্য শ্রেণির কাছে সম্পদের অপ্রতুলতা আমাদের সামনে প্রশ্ন জাগায়– ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা সমর্থনযোগ্য কিনা। যদিও লক *সেকেন্ড ট্রিটিজ* গ্রন্থে স্পষ্টতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাকে সমর্থন এবং তার যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।[১৬] আবার রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করেছেন। কেবল শ্রমের মালিকানার ভিত্তিতে লক যেভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন তাঁর বিপরীত চিত্র আমরা পাই রুশোর কাছে। রুশোর চিন্তার সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায় হেগেল এর সাথে। তাছাড়াও হার্বার্ট স্পেন্সারও অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে স্বাধীনতার প্রতি ক্ষতিকারক মনে করেন।[১৭]

হেগেল ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত শ্রমের নিরিখে দেখা যথাযথ মনে করেননি, বরং তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তিকে তার স্বীয় ইচ্ছার নৈর্ব্যক্তিককরণে অনুমোদন দেয় এবং এর ফলে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানে উপনীত হতে পারে (it allows one to objectify one's will, and thereby to come to self-definition.)।[১৮] হেগেল ব্যক্তিইচ্ছার নৈর্ব্যক্তিকরণের যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন এটি দ্বারা তিনি মূলত সামষ্টিকতা নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছা হলো একজন ব্যক্তির ইচ্ছা। আর একজন ব্যক্তি হলো সমগ্রের অংশ বা ক্ষুদ্র একক। সে অর্থে ব্যক্তির ইচ্ছা সামগ্রিক বা সম্মিলিত ইচ্ছার প্রকাশ হয়ে পড়ে। সম্পত্তির মালিকানা ও বণ্টন সংক্রান্ত এসকল সমস্যার প্রেক্ষিতে বণ্টনমূলক ন্যায্যতার বিষয়টি এসেছে। আমাদের ন্যায্যতার মানদণ্ড কি হবে ব্যক্তির প্রয়োজন, নাকি যোগ্যতা, নাকি সবকিছুই রাজার কর্তৃক নির্ধারিত হবে? এর উত্তরে কার্ল মার্কস মনে করেন– 'from each according to his abilities, to each according to his needs'। অবশ্য মার্কসের এ বক্তব্যে পুনরায় একটি প্রশ্ন সামনে আসে– তাহলো প্রয়োজনের সীমারেখা কিরূপ? মানুষের চাহিদা যখন অসীম তার প্রয়োজনও তাহলে সীমাহীন হয়ে উঠে।

সম্পদের ন্যয্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য হিউম থেকে শুরু করে সমকালে জন রলস, রবার্ট নোজিক প্রমুখ বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। তবে ডোর্কিন এক্ষেত্রে একটি সমন্বয়মূলক অবস্থান তৈরির চেষ্টা করেছেন। এ প্রচেষ্টাতে তিনি সমন্বয় সাধন করেছেন (the demand for equality with the idea of responsibility for one's choices) একজন ব্যক্তির সমতার চাহিদা / দাবির সাথে তার পছন্দের ক্ষেত্রে দায়িত্বের ধারণার। এর দ্বারা ডোর্কিন সমবন্টন এবং ব্যক্তির নির্বাচনকৃত পছন্দের সমন্বয় করেন।[১৯]

রুশো *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থে যে সাধারণ ইচ্ছার আলোচনা করেছেন তাতে সরকারকে তিনি জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশরূপে ব্যক্ত করেছেন।[২০] তাঁর এ বক্তব্যটিকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে বলতে পারি সরকারের কাজ কিন্তু কেবলমাত্র জনগণের বৈষয়িক স্বার্থ সম্পাদনে ভূমিকা রাখাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার এ বক্তব্যে আমরা জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্কের যে আবেগগত চরিত্র রয়েছে তা দাবি করা যায়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ কেবল রাজনৈতিক জীবনযাত্রার একটি তত্ত্ব নয়, পাশাপাশি এ চুক্তি দ্বারা জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্কের দিকসমূহ উল্লিখিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক চুক্তির প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ করলে জনগণের জীবনের প্রতি সরকারের দায়িত্ব বনাম জনগণের সম্পদ তথা অর্থনৈতিক অধিকারের এ দিকটি উদাহরণ রূপে আনতে পারি।

সতেরো এবং আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে এবং ফ্রান্সে গণসার্বভৌমত্ব বা 'পিপলস সভেরিনিটি' কথাটি বেশ আলোচিত এবং চালু হয়েছিল। রুশো যে কোনো বিচারে সেই গণসার্বভৌমত্বের অন্যতম উদগাতা। এ বিষয়ে লকের চাইতেও রুশোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ভিন্নতর ও গভীরতর। লক যেখানে ১৬৮৮ সনের উচ্চবিত্তের পার্লামেন্টকে সর্বশক্তির আধার বলেই প্রায় দাঁড়ি টেনেছেন, সেখানে গণের সন্তান রুশো বলেছেন, আসল সার্বভৌম হচ্ছে জনগণের 'সাধারণ ইচ্ছা' বা ইংরেজিতে বললে 'জেনারেল উইল অব দ্যা পিপ্‌ল্'।[২১]

হবসের কাছে ব্যক্তির জীবিকা নয়, জীবনের নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কাজ। কিন্তু জীবন ও জীবিকার মধ্যে সমন্বয় সাধনে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র জীবিকাকেই অধিকতর অগ্রাধিকার দিয়েছে। অবশ্য কেবল বাংলাদেশই নয় উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই এ পথে হেঁটেছে। যা প্রকারান্তরে লকের নীতির সাথে আংশিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আংশিক বলা হচ্ছে এ কারণে যে, লক তাঁর সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের যে দাবি তুলেছেন তাতে জীবনের সুরক্ষার প্রশ্নটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। জীবন অপেক্ষা সম্পত্তিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণরূপে তিনি বিবেচনা করেছেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে দাবি করা যায় না। যেমন: করোনাকালীন বাংলাদেশে লকডাউনের পদক্ষেপটি যখন সরকারি তরফে ঘোষিত হলো তাহলে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের মতো বাংলাদেশেও জনগণের জীবন আগে নাকি জীবিকা আগে– এ প্রশ্নটি সামনে আসে। যদিও এ প্রশ্নটি যখন উত্থাপিত হয়, তাহলে এ বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হয় না যে জীবনের সাথে সম্পত্তি কীভাবে সমমূল্যে মূল্যায়িত বা একে অন্যের বিকল্পরূপে বিবেচিত হতে পারে। যদিও করোনাকালে দেশে দেশে প্রয়োগকৃত লকডাউন শব্দটি মানুষের জীবনকে সুরক্ষা দেওয়ার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। তবে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে লকডাউন ঘোষিত হয়েছে বিশেষত করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় জীবনের পাশাপাশি জীবিকাকে সচল রাখার জন্য 'সীমিত পরিসরে' 'সর্বাত্মক' লকডাউন এর ঘোষণা। এতে পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষেত্রে অর্থনীতিই যে গুরুত্বপূর্ণ তা পুনরায় সামনে আসে। এ সমস্ত লকডাউনের চিত্র বিশ্লেষণে বলা যায়– যতই সরকার জনজীবনের নিরপত্তা প্রদানে লকডাউন প্রয়োগের উল্লেখ করুক বাস্তবে তাতে জীবন যতটা না সুরক্ষিত হয়েছে, শিল্পপতি বা পুঁজিপতিদের স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হয়েছে। এতে সরকার বা রাষ্ট্রের কাছে জনগণের জীবন অপেক্ষা জীবিকা যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ– গরীবের বেঁচে থাকার লড়াইকে যেমন সামনে আনে তেমন জীবনকে গৌণ করে সম্পত্তির জন্য লড়াইয়ের যে প্রবণতা উচ্চবিত্ত শ্রেণি পুনরায় তা প্রমাণ করলো। অর্থাৎ

বেঁচে থাকার লড়াইয়ে রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ে যে অভিন্ন সূত্রে রয়েছে তা হলো সম্পদের আহরণ ও সুরক্ষা। সমাজের উঁচুশ্রেণির প্রতি রাষ্ট্রের যে অতি সুবিধা প্রদানের প্রবণতা তা পুনরায় দৃশ্যমান।

ধর্ম প্রসঙ্গে

চুক্তিবাদীরা ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি অর্থাৎ রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করেছেন। যদিও এদের মাঝে ধর্মবিশ্বাস ছিল না এমনটা বলা যায় না। যেমন– হবস তাঁর *লেভিয়াথান*– এ মরণশীল ঈশ্বরের প্রসঙ্গ টেনেছেন। তবে হবসের মরণশীল ঈশ্বরের ধারণা থেকে এ ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমীচীন হবে না যে তিনি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সমর্থন করেছেন। বরং গির্জায় প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যের স্থলে তিনি শাসক ও শাসিতের রাজনৈতিক ঐক্যের শক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। রুশো মনে করেন, ইংল্যান্ডের রাজারা যখন গির্জার প্রধান হয়ে উঠেছিলেন তারা গির্জায় অধিনায়ক নন, সেবকরূপে নিজেদের তুলে ধরেছেন। তাঁরা গির্জার চরিত্র যত না পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অধিক তার চরিত্রকে বজায় রেখেছেন। তাঁরা আইনদাতা হতে পারেননি।[২২] দার্শনিকদের মধ্যে হবসই একমাত্র দার্শনিক যিনি বিষয়টার খারাপ দিক এবং এর সমাধানের দিকও স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনিই সাহস করে বলেছিলেন, দ্বি-মুণ্ডের ঈগলের দুই মুণ্ডকে এক মুণ্ডতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং সকলকে একটিমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থার অন্তর্গত হতে হবে। এর ব্যতিরেকে কোনো রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।[২৩] আবার লকের রাষ্ট্রদর্শনেও তিনি ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্বাস রেখেছেন প্রাকৃতিক আইনের আলোচনাতে। চুক্তিবাদীগণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনাচরণে ধর্মের বিশ্বাসকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেননি; তবে রাষ্ট্র পরিচনালনার ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ব্যবহার তাঁদের রাষ্ট্রদর্শনে গোচরীভূত হয় না। কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। আবার শাসকের কোনো বিশেষ ধর্মপ্রীতিও লক্ষ করা যায়নি তাঁদের লেখনীতে। সামাজিক চুক্তির প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায়, যে সকল কারণে রাষ্ট্রের আবির্ভাব, জনগণের একত্রীকরণ তাতে কিন্তু ধর্মের প্রভাব তথা ধর্মীয় উন্মাদনা অথবা শুধুমাত্র ধর্মীয় ঐক্যের কারণে রাজনৈতিক সমাজের সৃষ্টি হয়নি তা অত্যন্ত স্পষ্ট। রুশোর লেখনীতে ধর্মের নৈতিক আবেদন প্রথাগত ব্যবহারের দিককে ছাপিয়ে স্থান পেয়েছে।

রুশো রাজনৈতিক সমাজে ধর্মের সংবিধিবদ্ধ আচার-ব্যবহার অপেক্ষা মানুষের নৈতিক নিয়ন্ত্রণবিধিরূপে ধর্মের ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ফলে মানুষ স্বপ্রণোদিত হয়ে আইন মান্য করবে, অপরের হুকুমে বলপ্রয়োগের দ্বারা নয়। সমাজের পটভূমিতে, সাধারণ কিংবা বিশেষভাবে, রুশো ধর্মকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন– মানুষ হিসেবে মানুষের ধর্ম এবং নাগরিক হিসেবে মানুষের ধর্ম।[২৪] তিনি মনে করেন "মানুষের ধর্মের কোনো আচার-অনুষ্ঠান, বেদী, বিধি-বিধান কোনো কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না। এ ধর্ম হচ্ছে বিশ্ববিধাতার সঙ্গে ব্যক্তির আত্মার মিলন। বিশ্বনিয়ন্তার উদ্দেশ্যে আত্মার নিবেদন। নৈতিকতার চিরন্তন বিধানের প্রতি মানুষের আনুগত্য।"[২৫] রুশোর কাছে মানুষের ধর্মই হচ্ছে যথার্থ ধর্ম। এ ধর্মের সম্পর্ক কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নয়। এ ধর্মে সমাজে মানুষ আইনকে মান্য করে অপরের হুকুমে নয়। মানুষ আইনকে মান্য করে নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে।[২৬]

কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশের জন্মলগ্নে রাষ্ট্রটি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিরূপে ঘোষণা করলেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমানাধিকার সংরক্ষণের দাবি করা হলেও এবং বিশেষত ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা হলেও কালক্রমে দেশটি তার সে চরিত্র হারিয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক দলসমূহ রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে দিনে দিনে তীব্রতর করছে। আর তা কেবল রাজনৈতিকভাবে বিভাজন নয়; সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কালক্রমে কালোমেঘের মতো বেশ ঘনীভূত হচ্ছে। রাজনীতিতে ধর্মের উগ্র ব্যবহারের ফলে তা কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রকে নয়, ব্যক্তির মুক্ত মনন ও চিন্তাশীলতাকেও আক্রান্ত করছে। ধর্মান্ধ জনগোষ্ঠীর

উগ্র আচরণ যেমন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিরূপে আর্বিভূত, একই সাথে তা মুক্তচিন্তার গতিশীলতাকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ করছে। যা রাষ্ট্রের মূল প্রকৃতির সাথে (সামাজিক চুক্তি অনুযায়ী) সাংঘর্ষিক। ধর্মান্ধ আচরণ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবেই কেবল হুমকি সৃষ্টি করছে না, সেই সাথে তা ব্যক্তির মানবতাবোধকে শাণিত করার পরিবর্তে সহিংসতার জন্ম দিচ্ছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য বাসযোগ্য ও সহাবস্থান নিশ্চিতের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম। বাংলাদেশের জনজীবনে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসমূহের মধ্যে যে সমন্বয়বাদী ধারা ও সম্প্রীতির সহাবস্থান ছিল তা হারিয়ে ফেলছে। বাংলাদেশের সমাজজীবনে ইসলামের উপস্থিতি সম্পর্কে অধ্যাপক আলী রিয়াজকে উদ্ধৃত করে বলা যায় – "বাংলাদেশের সমাজ দীর্ঘদিন ধরে যে স্থানীয় ও সমন্বয়বাদী (সিনক্রেটিক) ইসলামের প্রাধান্য ও প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হতো, তার পরিবর্তে একটি আক্ষরিক (লিটারালিস্ট) ও বৈশ্বিক ব্যাখ্যায় ইসলামেরই প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠে এবং তা ক্রমবর্ধমান।"[২৭]

"বাংলাদেশের সমাজে সেক্যুলারইজেশনের প্রক্রিয়া কখনোই শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু সমন্বয়বাদী ইসলামের যে ধারাটি প্রধান ধারা বলে বিবেচিত হতো, মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক বড় অংশই সম্ভবত এখন আর সে ধারাকে বহন করে না।" [২৮] অধ্যাপক রীয়াজ মনে করেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সে অংশটিকে 'নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলা যায় যাদের কাছে গণতন্ত্রের উদারনৈতিক দিকসমূহের আবেদন কম এবং তাদের কাছে সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য ভূমিকা অধিক। আন্তর্জাতিক রাজনীতিই এক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত।

১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি সংযোজন করে একে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিরূপে ঘোষণা করা হয়। এর দ্বারা আশা করা হয়েছিল রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবের অবসান সূচিত হবে। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো, রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের প্রভাব আরো ব্যাপকতর হয়েছে। রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক দলসমূহের সংখ্যা বেড়েছে। এমনকি অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহ অর্থাৎ ডান বা বাম দলসমূহও তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে, অথবা ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার লক্ষ্যে গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করেছে। সেই সাথে বর্তমান রাজনীতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমূহ ও নেতৃবৃন্দের তোষণনীতিও যথেষ্ট দৃশ্যমান। রাজনীতি ও সমাজে ধর্মের যে ব্যবহার তা কতটা ইতিবাচক আর কতটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিলের উপায় সে প্রশ্ন সামনে চলে আসে। রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব আলোচনায় বর্তমান বাংলাদেশের বিদ্যমান ইসলামিক দলগুলোর রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো লক্ষ করলে দেখা যায় প্রায় সকল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর (ইসলামিক) রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নে তারা গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিকে সমর্থন করছে না। তারা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

আইন ও সংবিধানের প্রশ্ন

চুক্তিবাদীদের আলোচনায় আইনের একটি দৃঢ় অবস্থান লক্ষ করা যায়, যাতে কেবলমাত্র বলপ্রয়োগ বা আমলাতন্ত্র বা সামরিক বাহিনী– এদের কোনোটির একক ভিত্তিতে তারা রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখেনি। বরং হবস, লক, রুশো সকলের ক্ষেত্রেই আমরা কমবেশি এটি লক্ষ করেছি একটি স্থিতিশীল, ন্যায়ধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁরা আইনের শাসনকে গুরুত্বের সাথেই গ্রহণ করেছে। প্রশ্ন আসতে পারে, হবসের সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন কি সংহত স্থান পেয়েছে? উত্তরে বলা যায়, হ্যাঁ। হবসের কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও তিনি শাসক বা রাজার খামখেয়ালীপনার পরিবর্তে শাসকের ক্ষমতার সাথে আইনের ব্যবহারকে সংযুক্ত করেছেন। আইনকে তিনি রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের হাতিয়াররূপে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীতে লকের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের স্থলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিকাশে সম্পত্তির সুরক্ষার্থেও আইন ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বলা যায় 'সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকে বণিক পুঁজির

উদ্ভব এবং পরবর্তী সময়ে তা বিকশিত হয়ে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইন একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।'[২৯] সামাজিক চুক্তিবাদীরা ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেননি, বরং জাতীয় অখণ্ডতা ও সংহতির বিষয়সমূহও মুখ্য হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের সংবিধান লক্ষ করলে দেখা যায় এতে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিরূপে ঘোষণা করা হলেও বর্তমান বাংলাদেশে ধর্মান্ধতা, ধর্মভিত্তিক উগ্র রাজনীতির প্রসার লক্ষ করা যাচ্ছে। অবশ্য রাষ্ট্র নিজেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথকে সুগম করতে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে বিভিন্নভাবে কাজ করেছে। ১৪ মে ১৯৭৬ সালে এক সামরিক আদেশ দেয়া হয়।[৩০] এতে ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি বাতিলের দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতা ত্যাগ করে রাষ্ট্র নিজেই বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চর্চার ধারা উন্মুক্ত করে দেয়। এ ফরমান মূলত সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর একটি অংশ। মধ্যযুগের পরে আধুনিককালের রাষ্ট্রদর্শনে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল তা পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দী থেকে সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে পুনরায় যুক্ত হয়েছে। সংবিধানে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ স্বীকৃত কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে ধনী-গরীব বৈষম্য তীব্রতর হয়েছে। ধনতান্ত্রিক বৈষম্য শক্তিশালী হয়েছে, পুঁজিবাদের প্রসার ঘটেছে যা গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ বা সুখকর নয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সৃষ্ট এধরণের ধনবৈষম্য অবশ্যই মানুষের মননশীলতার বৈষম্য তৈরি করে। রাজনীতি-সচেতন বা রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল জনগণ সৃষ্টির পরিবর্তে গা এড়িয়ে চলা মধ্যবিত্ত শ্রেণির জনগণ সৃষ্টি হয়েছে, যারা তাদের সম্পত্তির সমৃদ্ধিতে তুষ্ট, রাষ্ট্রের বিষয়ে যাদের খুব একটা মাথাব্যথা দেখা যায় না। ফলে নিম্নমধ্যবিত্ত বা আগ্রহহীন নিম্নবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক উদাসীনতার সুযোগে জেগে ওঠে ব্যবসায়ী আমলাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী। রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে তারা যে প্রকৃত রাজনীতি-সচেতন বা জনসচেতন এমনটা বলার সুযোগ না থাকলেও তারা যে সম্পদ (ব্যবসায়ী) এবং ক্ষমতা (আমলা) সম্পর্কে ব্যাপক সচেতন তা বলা বাহুল্য।

সংবিধানে উল্লেখিত আছে 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ' এবং 'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বণ্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ' কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হলো– প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার ব্যাপক অংশের মালিক একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির জনগণ (যারা সরকার পরিচালনায় সরাসরি যুক্ত অর্থাৎ রাজনৈতিক দল, নেতা, শিল্পপতি, আমলা প্রমুখ); এবং সম্পদের ক্ষেত্রেও জনগণ নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণি নিয়ন্ত্রণকর্তা। আমাদের সংবিধানের উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহের সাথে রুশোর সাধারণ ইচ্ছা এবং *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* এর সাদৃশ্য পাওয়া গেলেও বর্তমানের রাষ্ট্রের প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* গ্রন্থ এবং সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (যা ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বরের অব্যবহিত সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানরূপে গণ্য হতো) তার সাথে ভাবগত দিক থেকে এক প্রকার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন– ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যান। সে সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠায় স্বাধীনতার যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন তাতে অনুমোদিত হয় – " ... বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।"[৩১]

সামাজিক চুক্তির ফলে উদ্ভূত রাজনৈতিক সমাজে বিশ্বাসের বিষয়টি কতটা এবং কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার সরাসরি আলোচনা লক্ষ করা যায় লক ও রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায়। হবসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিশ্বাসের অভাবে প্রকৃতির রাজ্য ' নিঃসঙ্গ, ঘৃণ্য, পাশবিক ও স্বল্পায়ু' হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে চুক্তি সম্পাদন দ্বারা হবসীয় জনগণকে কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করতে হলো। জনগণ এধরণের বিশ্বাস করতে চাইল প্রত্যেকের শান্তি ও নিরাপত্তার তাগিদে। প্রাকৃতিক সমাজ থেকে হবসের রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের চালচিত্র থেকে বলা যায় নাগরিকের বা ব্যক্তির মধ্যেকার পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্কই হলো সামাজিক পুঁজি। সামজিক পুঁজি এবং বিশ্বাস

জনগণকে কেবল ব্যক্তিগত নয়, রাজনৈতিকভাবেও শক্তিশালী বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গে রুশো মনে করেন, একজন নাগরিকের কোনো কার্য যদি সমাজের কোনো ক্ষতির কারণ না হয়, তবে সে কাজের কোনো জবাবদিহি নাগরিক সার্বভৌমকেও দিতে বাধ্য নয়।[৩২] তবে তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেছেন। রুশোর মতে, সামাজিক ক্ষেত্রে তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নাগরিক কোন বিশ্বাসকে ধারণ করবে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রের অবশ্যই উদ্বিগ্ন হওয়ার ব্যাপার থাকবে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি সে-বিশ্বাসকে নির্ধারিত করে দেবে সামাজিক প্রয়োজন পূরনের সামাজিক অনুভূতি হিসেবে। সামাজিক অনুভূতি ব্যতিরেকে কোনো মানুষ একজন সুনাগরিক কিংবা রাষ্ট্রের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারে না। সামাজিকবোধ ধারণ করার ব্যর্থতার কারণে একজন নাগরিককে রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করতে পারে।[৩৩] অবশ্য সমকালীন রাষ্ট্রদার্শনিক জর্জ ক্লোসকো মনে করেন রাজনৈতক আনুগত্য নিহিত থাকে উদার রাজনৈতিক তত্ত্বে। তিনি রাজনৈতিক আনুগত্য বা দায়বদ্ধতার (political obligation) সাথে রাজনৈতিক কর্তার প্রকৃত বিশ্বাসের মাঝে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ও সমন্বয় করতে চেয়েছেন।[৩৪] এখানে ক্লোসকো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বলতে বুঝিয়েছেন রাজনৈতিক কর্তার রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে মান্য করার নৈতিক দায়বদ্ধতা। যেমন– রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করা, কর পরিশোধ করা ইত্যাদি ব্যক্তির কেবল আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়, একই সাথে এসব মান্য করা ব্যক্তির নৈতিক বাধ্যবাধকতা। তদ্রূপ রাষ্ট্রের বিবিধ সংস্থার দায়িত্ব হলো এ সকল বিষয়াদি পালনে প্রয়োজনে বাধ্য করা। কিন্তু একই সাথে তিনি রাষ্ট্রদার্শনিক নৈরাজ্যবাদীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন।[৩৫] ক্লোসকো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকে চূড়ান্ত (absolute) দায়বদ্ধতা রূপে মান্য করাও সমর্থন করেন না। যেমন, নাগরিকের কোনো মৌলিক অধিকার যদি আইন কর্তৃক ভঙ্গ হয় বা খর্ব হয় তবে সেরূপ আইন মান্য না করার ক্ষমতা ও সুযোগ ব্যক্তির রয়েছে। তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা 'চূড়ান্ত' নয়', দৃষ্টত (political obligations are *prima facie*, rather than 'conclusive')।[৩৬]

ক্লোসকোর এ মতকে যদি আমরা বাংলাদেশের নিরীখে বিচার করি তাহলে বলা যায়, রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বা আনুগত্যের শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকরূপে কাজ করে যা পরিবর্তিত হতে পারে নৈতিক দায়বদ্ধতায়। কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতার সাথে যখন নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত হয় তাহলে তা দমনমূলক বা পীড়নমূলক হয়ে উঠতে পারে না। তবে দমনমূলক না হয়েও তা সংশোধনমূলক হতে পারে।

রাজনৈতিক সমাজে সামাজিক পুঁজি ও বিশ্বাসের একটি গুরুত্ব রয়েছে যা সমাজকে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। এমনকি সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য, সমাজে মঙ্গলকর কিছু সম্পাদন করার নিমিত্তে সমাজস্থিত সদস্যদের পারস্পরিক বিশ্বাস প্রয়োজন। পারস্পরিক এ বিশ্বাস সমাজের চুক্তিকে প্রতিপালনে উৎসাহ যোগায়। সমাজের সদস্যদের এ বিশ্বাস স্থাপন জরুরী যাতে নাগরিকগণ একে অন্যকে সন্দেহের চোখে না দেখে। একই সাথে প্রয়োজন সমাজস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বাসের জায়গায় পরিণত করা যাতে যদি কোন নাগরিক চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে তবে তার ওপর যেন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃত্বারোপ করতে পারে।[৩৭] সংস্কার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনে পর্যাপ্ত ভূমিকা রাখতে পারবে না যদি না তার সাথে যুক্ত হয় সামষ্টিক নৈতিক মূল্যবোধ, যে মূল্যবোধ আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক না হয়ে দেশাত্মবোধকেন্দ্রিক হবে। একটি রাজনৈতিক সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক পুঁজি ও বিশ্বাসের মধ্যেকার পারস্পরিক সুসম্পর্ক রাষ্ট্রকে নৈরাজ্যবাদী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগযোগ্য হতে পারে। পুটনাম এবং অন্যান্যরা মনে করেন গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন সমাজের মধ্যে বিশ্বাস এবং সামাজিক পুঁজি।[৩৮] এক্ষেত্রে ম্যাকফার্সন প্রচলিত উদারতাবাদের সমালোচনা করে বলেন, উদারতাবাদে মূলত ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ওপর আদর্শনিষ্ঠ মূল্য আরোপ করা হয়,

কিন্তু সমাজে বসবাসরত মানুষের পরস্পরের প্রতি যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে সে বিষয়ে কোনো গুরুত্বারোপ করা হয় না।[৩৯] ম্যাকফার্সনের ভাষায়ঃ The repair that was needed [to liberal theory] was on that would bring back a sense of the moral worth of the individual, and combine it again with a sense of the moral value of community, which had been present in some measure in the Puritan and Lockean theory.[৪০] এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে প্রচলিত উদারতাবাদে সংস্কার প্রয়োজন এবং উক্ত সংস্কারের অংশরূপে ব্যক্তিমানুষের মূল্যের পাশাপাশি সমাজের নৈতিক মূল্যের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হবে, যা অংশত উল্লিখিত হয়েছে পিউরিটান এবং লকীয় তত্ত্বে।

ম্যাকফার্সন তাঁর গ্রন্থে যে বিশেষ প্রকারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের কথা উল্লেখ করেছেন তা মালিকানামূলক বা অধিকারমূলক। তিনি মনে করেন, আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক তত্ত্বের দুর্বলতার মূল নিহিত ছিল সতের শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মাঝে।[৪১] এ সময়কালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মাঝে মালিকানামূলক গুণাবলী লক্ষ করা যায়, যাতে ব্যক্তি মূলত তার স্বীয় সামর্থের মালিক, এতে ব্যক্তি সমাজকে ধারণ করে না, কেবল নিজেকে ধারণ করে। ব্যক্তিকে কোনো সামাজিক নৈতিকতার অংশরূপে দেখা হতো না, কেবলমাত্র স্বীয় মালিকরূপে দেখা হতো।

ফলে মালিকানার সম্পর্ক কালক্রমে জটিল কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রূপ নেয়। এতে ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা এবং তাদের সুপ্ত প্রতিভার পরিপূর্ণ ও প্রকৃত উপলব্ধির বিষয়টি বিস্মৃত হতে থাকে। মানুষের সারসত্তা হলো অপর ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা হলো অধিকারের বিষয়। সমাজের মুক্ত, স্বাধীন মানুষ পরস্পরের সাথে স্বীয় সামর্থানুযায়ী মালিকানার (Proprietor) সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। ম্যাকফার্সন মনে করেন, সমাজ সংগঠিত হয় প্রোপাইটারদের মধ্যেকার বিনিময়ের ওপর।[৪২]

ম্যাকফার্সন উল্লিখিত অপরের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি তথা স্বাধীনতা বলতে তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তির সে ধরণের সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়াকে যে সকল সম্বন্ধে ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করেছে বা সম্পর্কযুক্ত হয়েছে।[৪৩] প্রাথমিকভাবে ব্যক্তি তার স্বীয় সামর্থের মালিক, তাই সে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ নয়, ধনীও নয়। যদিও ব্যক্তি সমাজবদ্ধ সত্তারূপে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না তাই সে সম্পত্তিতে তার সামর্থের শ্রমটুকুকে পৃথক করে, পুরো সম্পত্তিকে নয়। এভাবে দেখা যাচ্ছে, মানবসমাজ ধারাবাহিকভাবে বাজারসম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক সমাজ হলো– মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষণাবেক্ষণের একটি কৌশল বা আবিষ্কার; এর সাহায্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলাপূর্ণ বিনিময়– ব্যবস্থা বজায় রাখতে পারে। ব্যক্তি এভাবে নিজেকে মালিকরূপে গণ্য করে। এভাবেই ম্যাকফার্সন তাঁর লেখনীতে "মালিকানামূলক" পদটিকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে তিনি ব্যক্তির একক অবস্থান ব্যতীতও সামষ্টিকভাবে ব্যক্তির সামাজিক নৈতিক অবস্থান প্রত্যাশা করেছেন।

ম্যাকফার্সন তাঁর মালিকানামূলক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Possessive Individualism) দ্বারা ব্যক্তি এবং সামাজিক জগতে ব্যক্তির ভূমিকা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন।[৪৪] এতে তিনি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন। রাষ্ট্রে সামাজিক কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন দ্বারা ব্যক্তি সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে তার যে নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং সামাজিক গণতন্ত্রের জন্য রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ যে একটি শক্তিশালী আদর্শনিষ্ঠ ভিত্তি তৈরি করতে পারে ম্যাকফার্সন তাঁর লেখনীতে সেটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।[৪৫]

হবসের দর্শন সম্পর্কে সমাজের মডেলসমূহের (models of society) ম্যাকফার্সনের বিশ্লেষণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে। তাঁর মতে হবস সমাজের তিনটি মডেল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেগুলো হলো– প্রথাগত সমাজ,

সাধারণ বাজার– সমাজ এবং মালিকানামূলক বাজার সমাজ।[৪৬] মালিকানাসূচক বাজার– সমাজ মহৎ কিংবা কোনো স্বেচ্ছাচারী বির্নিমাণ নয়। এটি স্পষ্টভাবে মার্ক, ভেবার এবং অন্যদের কর্তৃক উল্লিখিত বুর্জোয়া শ্রেণি বা পুঁজিবাদী সমাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁরা পুঁজিবাদে বাজারের অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছেন শ্রমের মানদণ্ডে এবং তাঁদের ধারণানুযায়ী এটি মডেল বা আদর্শরূপে অভিপ্রেত যাতে আধুনিক (অর্থাৎ সামন্তউত্তর) ইউরোপীয় সমাজসমূহকে অনুমিত ধরা হয়েছে।

জন লকের সম্পত্তিতত্ত্বে জনগণের এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা দান ব্যতীত রাষ্ট্রের কোনো বৈধ ভূমিকা নেই। সরকার কর্তৃক জনগণের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে অনৈতিক এবং অনধিকার প্রবেশ। কারণ ব্যক্তির সম্পত্তির এবং স্বাধীনতার অধিকার রাষ্ট্র সীমিত করে দিতে পারে না। এক্ষেত্রে নোজিক মনে করেন, নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা প্রদান দ্বারা রাষ্ট্র ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে।[৪৭]

পক্ষান্তরে জন রলস মনে করেন একটি অধিকারপ্রসূত গণতান্ত্রিক সমাজে কিছু মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন।[৪৮] যেমন– একক ব্যক্তিসত্তার সমাজের সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর প্রতি যেমন দায়বদ্ধতা রয়েছে, অনুরূপভাবে, সরকারের দায়িত্ব রয়েছে সমাজে স্বল্প সুবিধাভোগী কিংবা অনুন্নত বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দেওয়া সরকারের দায়িত্ব রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে সংগঠনকারী ক্ষতিকারক কার্যাবলীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ কার্যকরী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বনিরূপণ দ্বারা গ্রহণ। সম্পদ এবং ক্ষমতার অসমতা নিয়ন্ত্রণ হওয়া প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে সমাজে রাজনৈতিক স্বর নিশ্চিতকরণে। আইনপ্রণয়ন এবং সমাজে বিদ্যমান সকল সদস্যের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার মাধ্যমে ন্যায্যতা প্রদান সম্ভব।[৪৯]

তথ্যনির্দেশ

১. হারুন রশীদ, "বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট: রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ", *নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা* (২০১১-২০২০), খণ্ড ১, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ১৩৪।

২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, "নৈতিক চেতনা ও বাংলাদেশের বিকাশশীল বাস্তবতা", *নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা*, খণ্ড ১, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ২৬৫।

৩. হারুন রশীদ, "বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট: রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ", পৃ. ১৪২।

৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, "নৈতিক চেতনা ও বাংলাদেশের বিকাশশীল বাস্তবতা", পৃ. ২৬৫।

৫. Antonio Gramsci, "State and Civil Society" in *Selections from the Prison Notebooks,* Quintin House and Geoffrey Nowell Smith (eds. and trans.), Orient Longman, India, 1998, p.210.

৬. সলিমুল্লাহ খান, *রাষ্ট্রসমাজের উৎপত্তি : জন লকের সঙ্গে বিচার*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২।

৭. Karl Marx, *Capital*, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1986, p. 339.

৮. Ernest Barker, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau,* Oxford University Press, London, 1982, p. 255.

৯. *Ibid.*, p. 255.

১০. *Ibid.*, p. 221.

১১. Nicolo Machiavelli, *The Prince,* Worlds Worth References Ltd., London, 1993, p. 73.

১২. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, Hasnat Abdul Hye, *Governance: South Asian Perspective,* Dhaka University Press, Dhaka, 2000, p. 27.

এছাড়াও সিভিল সোসাইটি সম্পর্কে আরো জানার জন্য দেখুন, মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।

১৩. বিডিনিউজ২৪.কম, ৭ জুলাই, ২০১৪।

https://opinion.bdnews24.com

১৪. Robert E. Goodin & Philip Pettit (eds.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Blackwell Publishers, Oxford, 2007, p. 13.

১৫. সোহরার হাসান, "রাষ্ট্রের মেরামত, সামাজিক চুক্তি ও ইসির ইফতার", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মে ২০১৯। https://www.prothomalo.com/opinion/column

১৬. John Locke, *Two Treatises of Government*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967.

১৭. M. Rosen & J. Wolf (ed.), *Political Thought*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 187.

১৮. G. W. F. Hegel, *Philosophy of Right*, T. M Knox (trans.), Clarendon Press, Oxford, 1952, pp. 40-2, 235-6.

১৯. Richard Dworkin, "Equality of Resources", in Rosen M. & J. Wolf (eds.), *Political Thought*, Oxford University Press, Oxford, 1999, p. 248-254.

২০. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, তৃতীয় পুস্তক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৮৫-৯১।

২১. *প্রাগুক্ত*, ভূমিকা।

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

২৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।

২৫. *প্রাগুক্ত*।

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮।

২৭. আলী রীয়াজ, "বাংলাদেশের রাজনীতি, বিকাশমান মধ্যবিত্ত এবং কয়েকটি প্রশ্ন", দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ই মে ২০১৯।

২৮. *প্রাগুক্ত*।

২৯. "বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা, গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন", ২য় মুদ্রণ ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৩।

৩০. সংবিধানের ৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয়। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে মূলত ধর্মীয় নামে রাজনৈতিক সংগঠন করার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল।

৩১. "বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা, গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন", ২য় মুদ্রণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৩।

৩২. সরদার ফজলুল করিম (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, পৃ. ১৭২।

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

৩৪. George Klosko, *The Principle of Fairness and Political Obligation*, New Edition, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham, UK, 1992, pp. 133-148.

৩৫. *Ibid.*, p. 135.

৩৬. রাষ্ট্র সম্পর্কে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীগণ, যেমন, রর্বাট পি. ওলফ, এ. জন. সিমন্স প্রমুখ মনে করেন রাষ্ট্রের এরূপ কোনো কর্তৃত্বমূলক বা বলপ্রয়োগকারী ভূমিকা গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও চিরায়ত নৈরাজ্যবাদীদের ন্যায় দার্শনিক

নৈরাজ্যবাদীগণ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিলুপ্তি চান না কিন্তু তারাও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিষয়টিকে বাতিল করে দেন। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীগণ আইনকে গ্রহণ করেন এবং তারা আইনের বিধান চান কিন্তু তারা কোনো অপরিসীম অধিকার দাবি করেন না যা আইন ভঙ্গ করে।

৩৭. B. Rothstein, "Trust and Social Capital" in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Second Edition, Vol. 2, R. E. Godin, P. Pettit & T. Pogge (eds.), Blackwell Publishers, 2007, p. 830.

৩৮. R. D. Putnam, R. Leonardi and R. Y. Nanetti, *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, NJ Princeton University Press, Princeton, 1993.

৩৯. C. B Macpherson, *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke*, pp. 2-3.

৪০. *Ibid.*, p. 2.

৪১. *Ibid.*, pp. 4-6.

৪২. *Ibid.*

৪৩. *Ibid.*, pp. 7-9.

৪৪. *Ibid.*, pp. 47-48.

৪৫. *Ibid.*, p. 48.

৪৬. pp. 47-48.

৪৭. Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 1999, pp. 110-118.

৪৮. John Rawls, *Justice As Fairness: A Restatement*, Erin Kelly (ed.), Harvard University Press, USA, 2001, p. V.

৪৯. *Ibid.*

উপসংহার

রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগাযোগ সবকিছু বিকশিত হয়। ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনেও তা ভূমিকা রাখে। আধুনিক রাষ্ট্র পণ্য বিনিময়ের সুবিধা দেয়। যুক্তিবাদিতাই এর মূল কথা। নৈতিকতা অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় আইন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষ আইনের শাসন মানতে বাধ্য।

হবস তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মানুষ অত্যন্ত স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক। মানবচরিত্র সম্পর্কে হবসীয় বিশ্লেষণ আরো মূর্তমান হয়ে উঠে বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়। মানুষ কেবল স্বীয় চাহিদা ও পরিতৃপ্তি সাধনে ব্যস্ত যা তাকে ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত করে, বিচ্ছিন্ন করে। মানুষ নিরন্তর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকে।

হবসীয় পর্যবেক্ষণে মানবচরিত্র কেবল আত্মস্বার্থ সংরক্ষণে পরিচালিত হয়। পক্ষান্তরে লকীয় মানবপ্রকৃতির মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা ও নৈতিকতাবোধ, যা তাকে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। রুশোর কাছে গুরুত্ব পায় সমবেদনা, দয়া, সহানুভূতি, করুণা– যা ব্যক্তিকে চালিত করে মহত্তর উদ্দেশ্যের দিকে। হবস এবং রুশো উভয়ের প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে আইন, নৈতিকতা ও মানবাধিকারের কোনো অবস্থান পরিলক্ষিত হয়নি। যদিও রুশোর প্রকৃতির রাজ্যে জনগণের মধ্যে কোনো নৈতিক অনুশাসন বা প্রজ্ঞার উপস্থিতি ছিলো না, তবুও জনগণ অপরের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থেকেছে। রুশোর দৃষ্টিতে মানুষ সাধারণত শান্তিপ্রিয়, অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, অন্যের জন্য তার মমত্ববোধ রয়েছে। তাই মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অপরের ক্ষতি এড়িয়ে চলতে চায়। বলা যায় রুশোর মানবচরিত্র কোনো নৈতিক নির্দেশনা কিংবা আইনের অনুশাসনের জন্য নয়, বরং সহজাত সমবেদনার অনুভূতির কারণে সে অপরের দুঃখের কারণ হতে চায় না।

চুক্তিবাদী দার্শনিদের প্রকৃতির রাজ্য ও মানবপ্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ব্যক্তি রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণের দ্বারা স্বীয় নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, সম্পত্তির সুরক্ষা ইত্যাদি অন্যের থেকে প্রত্যাশা করে। এ প্রত্যাশার পরিপূরণ ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতা ও পারস্পরিকতাবোধ। রাজনৈতিক সমাজে ব্যক্তি ক্ষমতা ও অধিকার উভয়ই অন্বেষণ এবং প্রতিষ্ঠা করে। আবার রাষ্ট্রের উদ্ভবের মাধ্যমে ব্যক্তি রাজনৈতিক দায়দায়িত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ সমাজে রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আবার অন্যদিকে রয়েছে সামষ্টিকতা। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানবপ্রকৃতির মধ্যে রয়েছে যুক্তিবাদিতাও। যার সাহয্যে ব্যক্তি অরাজনৈতিক সমাজ থেকে রাজনৈতিক সমাজের উন্মেষ ঘটিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিই রাজনৈতিক সমাজের নিয়ন্ত্রকরূপে আর্বিভূত হয়েছে।

ব্যক্তির জীবনকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও স্থিতিশীল করার জন্য আইনের প্রয়োজন। কেবলমাত্র আইনের তাত্ত্বিক ঘেরাটোপ নয়, আইনের সাথে নৈতিকতার সংযোগ আইনকে অধিকতর মানবিক করে তুলতে পারে। রাষ্ট্রের গতিশীলতা, সমৃদ্ধি এবং সরকারের কার্যক্রমকে বেগবান করতে হলে জনগণকে আইন মান্য করা যেরূপ অপরিহার্য, একইসাথে জরুরী উচ্চতর রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য। নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা জনগণের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আইনের অনুশাসনে আবদ্ধ না হলে ব্যক্তির জীবন ও ক্ষমতা সুস্থিত হয় না। প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনের উপস্থিতি শক্তি, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বার্তা দেয়। হবস প্রাকৃতিক আইনকে প্রজ্ঞার সাহায্যে আবিষ্কৃত মনে করেন। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক অধিকার অপেক্ষা প্রাকৃতিক আইন অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি *লেভিয়াথানে* উনিশটি প্রাকৃতিক আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। এসব আইনের আলোচনায় দেখা যায়, প্রকৃতির রাজ্যের বর্বর, আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক জনসমাজ কীভাবে এবং কেন রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির দিকে ধাবিত হয়। আইন তাঁর

মানবপ্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি করে ন্যায্যতাবোধ এবং যৌক্তিকতা। প্রাকৃতিক আইনের মূলসূত্রটি হলো শান্তির অন্বেষণ। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ববর্তী জনসমাজের কাছে এসব আইনের উপস্থিতি আত্মরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথপরিক্রমাকে তরান্বিত করে। হবসের প্রাকৃতিক আইন কেবলমাত্র আত্মস্বার্থবাদী নয়। এ আইনের আছে নৈতিক আবেদন এবং বিবেকের নির্দেশনা। যদিও তিনি মনে করেন নৈতিকতা আইন বা রাষ্ট্র কোনোটির ভিত্তি হতে পারে না। তার প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারতত্ত্বে ঈশ্বরতাত্ত্বিক ভিত্তি পরিলক্ষিত হয় না। জড়বাদী ব্যাখ্যার ওপর তা প্রতিষ্ঠিত।

প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা লকের রাষ্ট্রচিন্তায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এসকল অধিকারের সুরক্ষা প্রদানের জন্যই তিনি সম্মতি, সরকার, ক্ষমতার বিভাজনকে স্বীকার করেছেন। অধিকারের সুরক্ষার্থে তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদকে সমর্থন করেছেন এবং প্রকৃতির রাজ্যের সকলের কাছে প্রাকৃতিক আইনের নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত করেছেন। এ থেকে সৃষ্ট অসুবিধার কারণে পরবর্তীতে তিনি রাজনৈতিক সমাজ এবং অভিন্ন বিচারকের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। যদিও প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত প্রাকৃতিক আইনে পরার্থবাদী প্রবণতাও দৃশ্যমান। লকের দর্শনে বৈষয়িকতার সুরক্ষার্থে প্রাকৃতিক আইন ও প্রজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে। বলা যায়, প্রাকৃতিক অধিকার নামক বৈষয়িক সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রাক-রাজনৈতিক জনগণ রাজনৈতিক সমাজ গঠন করেছে।

রুশোর প্রাক-রাজনৈতিক সমাজে প্রাকৃতিক আইন মুখ্য ছিলো না। তিনি প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে ভ্রান্ত মনে করেন, কারণ আইনের নিয়ন্ত্রণ অসৎ কাজ বন্ধ করতে পারে না। ব্যক্তি যদি চরিত্রগতভাবে সৎ ও সুশৃঙ্খল হয় তবে আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তিনি প্রাকৃতিক আইনের পরিবর্তে গুরুত্ব দিয়েছেন জনপ্রজ্ঞাকে। অবশ্য রাজনৈতিক সমাজে বা রাষ্ট্রে ব্যক্তির মুক্তির জন্য তিনি আইনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছেন। এ আইন হবে সাধারণ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। রুশোর রাষ্ট্রপূর্ব সমাজে প্রাকৃতিক আইনের অনুপস্থিতির কারণ বলা যায় মানুষের স্বাধীনতার সংরক্ষণ, বিচার-বিবেচনা, ক্ষমতার অপারগতা ও অপ্রয়োজনীয়তা, সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের সংরক্ষণ। সম্ভবত এ কারণে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক অধিকারের আলোচনা অনুপস্থিত। তাঁর দর্শনের সামষ্টিক নৈতিকতার মূল্যবোধ তাঁর প্রাকৃতিক অধিকার ও প্রাকৃতিক আইনের ধারণাকে বিশালতায় অতিক্রম করে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর চিন্তায় ব্যক্তির অধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বিষয়ে অবস্থান পরিলক্ষিত হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সাধারণ ইচ্ছার ধারকরূপে নৈতিক সত্তার চিত্রায়ন দ্বারা সামষ্টিকতাবাদী অবস্থান চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়নি। তাঁর রাজনৈতিক সমাজে এসব আইন ও অধিকারসমূহ হস্তান্তর বা পরিবর্তন, পরিবর্ধনের কোনো দিক নেই, যা লক্ষ করা যায় হবস ও লকের কাছে।

পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি দ্বারা সংগঠিত জনগণের উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে সুরক্ষার অন্বেষণ এবং সংঘবদ্ধ জীবনযাপন। মানবসমাজের চুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস এ বার্তা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণে (মূলত) সংঘবদ্ধ জীবনে আবদ্ধ হয়। স্বীয় স্বার্থে এ জীবনে প্রবেশ দ্বারা মানুষ স্বেচ্ছায় শাসন ও শৃঙ্খলার প্রতি অনুরক্ততা প্রকাশ করে। রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার, সামাজিক জীবন, সম্পত্তির ভোগব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষের সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য এবং তার নাগরিক হয়ে ওঠার প্রয়োজনে রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনের মূর্তমান প্রকাশ রাষ্ট্র। চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রোর উৎপত্তির অর্থই হলো পারস্পরিক ও স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তবে সে ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন শাসনব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ এবং তার প্রতি আনুগত্য, ঐক্যমত্য প্রদর্শন। মানুষ স্বীয় সম্মতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য উপস্থিত হয় তা যেমন সত্য, একই সাথে অতি নিয়ন্ত্রণে জনগণের

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ দ্বারা জনরোষের বিস্ফোরণ ঘটায় এটিও বাস্তবতা। সম্মতির ফলে সৃষ্ট চুক্তিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার জনগণ ও শাসকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

হবসের চুক্তিবাদে যে শর্তহীন আনুগত্যের কথা বলা হয় তা নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য প্রদর্শনের বিনিময়ে রাষ্ট্র তার নাগরিকের সুরক্ষা বিধান করবে। এ ধরণের আনুগত্যকে শর্তহীন বলা যায় কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে সর্বাত্মকবাদের যে অভিযোগ আনা হয় সে বিষয়টিকে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করাটা অধিক যুক্তিযুক্ত। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার্থে জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা আপাত গ্রহণযোগ্য। লক্ষ রাখতে হবে এ কর্তৃত্ব যেন ব্যক্তির বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করে। যদি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতার জন্য ক্ষতিকর হয় তবে সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ দোষণীয় হতে পারে না।

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিকের জন্য যেমন দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও অনুরূপ কর্তব্য রয়েছে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যখন নাগরিকের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানে সমর্থ হয় এবং এর দ্বারা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিধান সম্ভব হয় তখন তা অনভিপ্রেত নয়। জনগণের স্বীয় সুবিধা প্রাপ্তির জন্য যেমন রাষ্ট্রের প্রয়োজন তদ্রুপ রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজন নাগরিকের আনুগত্য। এ পারস্পরিকতাবোধ থেকে হবসের রাষ্ট্রের ধারণা জন্মলাভ করেছে। তাই তাঁর বিরুদ্ধে সর্বাত্মকবাদের যে অভিযোগ আনা হয় তা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। বলা যায়, সমকালীন রাষ্ট্রসমূহে যে কর্তৃত্ববাদী প্রকৃতি এর মূল বীজ রোপিত হয়েছে হবসের *লেভিয়াথানে*। কর্তৃত্ববাদী ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে ধারা বর্তমানে দৃশ্যমান তা বহু পূর্বেই হবস তার রাষ্ট্রব্যবস্থায় চিত্রিত করেছেন এবং এর প্রাসঙ্গিকতা নিরূপণ করেছেন। যদিও হবসীয় চুক্তিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা অপেক্ষা সমালোচনা প্রকট, তবে বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় এ কথা বলা যেতে পারে– শৃঙ্খলাপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নাগরিকের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। এ আনুগত্য ভীতি থেকেই উৎসারিত হবে তেমন নয়, এতে থাকবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং রাষ্ট্র ও শাসকের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব। অন্যথায় রাষ্ট্র পর্যবসিত হয় নৈরাজ্যবাদী ব্যবস্থায় এবং তা ব্যর্থ হয় জনগণের জানমালের সুরক্ষা বিধানে। কেবলমাত্র শাস্তির ভীতি বা আইনি অনুশাসনই জনগণকে আদর্শ নাগরিক করতে পারে না, এটি যেমন সত্য তার পাশাপাশি রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে জনগণ দায়িত্বশীল আচরণ না করলে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণ, যার সাথে যুক্ত রয়েছে কর্তৃত্বপরায়ণতা। হবসের রাষ্ট্রচিন্তা যতটা দমনমূলকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে তা যথার্থ নয়। রাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা ও জনজীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সীমিত অর্থে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

লকের চুক্তিতত্ত্বে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায়। পুঁজিবাদী ধারা অনুযায়ী ব্যক্তি তার সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণার্থে রাজনৈতিক সমাজে পদার্পণ করেছে। তার কাছে আইনের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অনুপস্থিতির দরুন প্রাক-রাজনৈতিক সমাজ থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটায়। তবে আইনের উপস্থিতি, মান্যতা প্রদর্শন এসবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষার্থে। শর্তহীন আনুগত্যের ওপর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না করে তিনি সম্মতির ভিত্তিতে তা শর্তসাপেক্ষ আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণ এ সম্মতি ততক্ষণ বহাল রাখে যতক্ষণ তার স্বার্থের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। লকের চুক্তিবাদে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসম্মতির ওপর। আর জনসম্মতি নির্ভর করে তার অধিকারের সুরক্ষার ওপর। হবসীয় রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা থাকলেও লকের রাষ্ট্রে সম্মতির ওপর নির্ভরশীল সরকার লক্ষ করা যায়। লকের সামাজিক চুক্তি জনগণের বৈষয়িক সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা রাষ্ট্রকে কার্যকর রাখে।

ক্ষমতার সংরক্ষণ দ্বারা জনগণ স্বাধীনতা উপলব্ধি এবং উপভোগ করে, যার মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক আচরণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। রাষ্ট্র এবং সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে জনগণের ঐক্যবদ্ধতা গুরুত্বপূর্ণ। জনগণের ঐক্যবোধের চালিকাশক্তি সামষ্টিকতাবোধ। সামষ্টিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা জনগণকে ভালোর দিকে ধাবিত করে। সামষ্টিক নৈতিকতাকে রুশোর দর্শনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। রুশোর কাছে রাষ্ট্র একটি সামাজিক এবং নৈতিক শক্তি। সামাজিক চুক্তির ভিত্তি হলো সম্মতি। সম্মতিই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং স্বায়ত্বশাসনের বিষয়সমূকে বৈধতা প্রদান করে। এ চুক্তি সম্পাদন দ্বারা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির পথে অগ্রসর হয়েছে এবং কর্তৃত্বকে বৈধতা ও মান্যতা দিয়েছে। রাষ্ট্র নিজে নাগরিকের বা প্রজার মধ্যেকার বিরোধ নিষ্পত্তি করে না। এ প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করে জনগণ। রুশোর চুক্তিতত্ত্বে পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ধারাটি অধিকতর শক্তিশালী। রুশোর চিন্তায় সামষ্টিকতাবাদী কল্যাণমূলক ধারা এবং নৈতিকবোধের সম্মিলনে একটি বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার রূপকল্প পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে চুক্তিবাদীগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। হবসের রাজনৈতিক দর্শন আবর্তিত হয়েছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে রাজনৈতিক সমাজ ব্যতীত একজন ব্যক্তি কীরূপ আচরণ করে এবং রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবন তাদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সভ্য জীবনযাপনে সাহায্য করে। হবস মনে করেন ব্যক্তি এবং সমাজ তাদের নাগরিক অধিকার এবং নৈতিকতা সার্বভৌম রাষ্ট্র থেকে অর্জন করবে।

লকের রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের প্রকৃতি মূলত উদীয়মান বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ও সুরক্ষা প্রদানের দ্বারা গড়ে উঠেছে ও বিকশিত হয়েছে। লকের উদারতাবাদে ব্যক্তির স্বায়ত্বশাসন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিঅধিকারের সুরক্ষা বিধান করা সরকারের রাজনৈতিক সমাজসৃষ্ট দায়বদ্ধতা। সরকারের মূল্য, গুরুত্ব এবং উপযোগিতা নির্ধারিত হয়েছে ব্যক্তিগত চাহিদা ও ইচ্ছার পরিতৃপ্তির প্রেক্ষিতে। লকের রাষ্ট্রদর্শনে রাজনৈতিক শক্তি ও রাজনৈতিক সমাজের দায়বদ্ধতা বিত্তের কাছে, ধনতান্ত্রিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কাছে। বলা যায় পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষমতার কাছে। যদিও পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকগণ লকের দর্শনে শাসক-শোষিতের প্রভেদের দিকটি এড়িয়ে গেছেন। লকের চিন্তায় রাজনৈতিক সমাজ অপেক্ষা অর্থনৈতিক সমাজ অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। আদর্শ প্রকৃতির রাজ্যেও ব্যক্তির জীবন অনিরাপদ নৈরাজ্যপূর্ণ হতে পারে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সমাজ জীবনকে অধিকতর নিরাপদ ও সুরক্ষিত করতে পারে।

রুশোর রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ মানুষের সাধারণ ইচ্ছার কাছে। রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের ফলে ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হলো নৈতিক স্বাধীনতা। ব্যক্তির নৈতিকতার উন্মেষস্থল হলো রাজনৈতিক সমাজ। এখানে নৈতিক স্বাধীনতা সৃষ্টি করে সামাজিক সংহতি। রুশোর রাজনৈতিক চিন্তায় ব্যক্তিগত স্বার্থ সামাজিক স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে কমিউনিটারিয়ানিজমে রূপলাভ করেছে। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তি কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী আত্মকেন্দ্রিক সত্তা নয়। ব্যক্তি সামষ্টিকতার আধারে লালিত, প্রতিপালিত এবং নৈতিক সত্তা। একজন ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতি এবং ব্যক্তিত্ব সামাজিক তথা গোষ্ঠীগত সম্পর্কসমূহের নিরিখে গড়ে ওঠে। এতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয় না কিংবা স্বকীয়তা নষ্ট হয় তা বলা যাবে না। তবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ কমিউনটারিয়ানিজম বা সংহতিবাদকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। রুশোর রাষ্ট্রচিন্তায় অন্যতম উপজীব্য বৈধ রাষ্ট্রক্ষমতার সৃষ্টি করা। এ বৈধতার মানদণ্ডরূপে শক্তি, সফলতা, শান্তি বা নিরাপত্তা কোনোটিকে তিনি গ্রহণ করেননি। রুশোর কাছে রাষ্ট্রের বৈধতার ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি হলো জনগণের অবিরাম সম্মতি। এতে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সরকারের শক্তিমত্তা তার সাফল্যের নির্দেশক হবে। অন্যদিকে শান্তি বা নিরাপত্তা যদি বৈধতার

Dhaka University Institutional Repository

পরিমাপক হয় তাহলে হবসের চরম রাজতান্ত্রিক সরকার কিংবা যে-কোনো স্বৈরাচারী সরকার জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারলে সে সরকার বৈধতা পেতে পারে।

সরকারের গঠন মানুষকে একটি সংঘবদ্ধ এবং রাজনৈতিক সমাজের সন্ধান দেয়। সরকার ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এর পেছনে দুটি উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে– ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সামষ্টিক জীবন নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণ সাধন এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। অবশ্য সবসময় এ ব্যাখ্যা এত সরলভাবে বাস্তবজীবনে প্রতিফলিত হয় না। কিছু ক্ষেত্রে শাসক তার নাগরিকের মুক্তচিন্তার ভয়ে ভীত হয়ে ক্ষমতাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। যে-কোনো সুগঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, যা প্রকৃতবিচারে নাগরিকের উন্নততর জীবনবিধানে রত সেখানে নাগরিকগণ তাদের উন্নত জীবনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে। তারা তাদের প্রকৃত চরিত্র (যা কলুষিত বা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর, অযৌক্তিকতাপূর্ণ)কে অবদমিত রাখে। এভাবে জনগণ সামাজিক এবং নৈতিক কারণে নিজেদের পরিবর্তন করে যথার্থ নাগরিক এবং উন্নততর মানবসত্তায় পরিণত করার চেষ্টা করে। হবসের সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতাকে বৈধ করার লক্ষ্যে জনগণের অধিকারের সংরক্ষণকে সমন্বিত করা হয়েছে। এতে জনগণ নিরবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা ও জাতীয় সংহতির আকাঙ্ক্ষায় রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শনে সম্মত। এক্ষেত্রে আনুগত্যের সাথে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের বিষয়টি জড়িত। সরকারের আইনি আদেশ-নির্দেশ মান্য করা নাগরিকের কর্তব্য। এর দ্বারা সরকার নাগরিকের জন্য উন্নততর রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুযোগ-সুবিধার বিধান করতে পারে। যদিও সংবিধান প্রদান করা হলেই রাষ্ট্র কর্তৃক বলপ্রয়োগ বা কর্তৃত্ববাদী আচরণকে বৈধতা দেওয়া যায় কি না সে প্রশ্ন থেকে যায়। লকের প্রকৃতির রাজ্য থেকে রাজনৈতিক সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে সরকার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এখানে সরকার স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতার অধিকারী নয়, এটি একটি ট্রাস্টরূপে কার্যকর। জনগণ চুক্তি ও সম্মতির দ্বারা আইনপ্রয়োগের বৈধ ক্ষমতা সরকারের কাছে দিয়েছে।

রুশোর রাষ্টচিন্তায় জনগণই শাসক আবার জনগণই শাসিত। জনগণ সরকার পরিচালনা করে আবার তারা নাগরিকরূপে সরকারের আদেশ-নির্দেশ মান্য করে। তাঁর দর্শনে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যেকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক দৃশ্যমান। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থেকে ব্যক্তির দ্বৈতসত্তার উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। রুশোর সরকারব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা সাধারণ ইচ্ছার কাছে। সাধারণ ইচ্ছা পরিচালনা শক্তিরূপে কাজ করে যা একপ্রকার উদারনৈতিক অবস্থান, যাকে আমরা বলতে পারি ন্যায্যতার স্পৃহা। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাতত্ত্ব থেকে এটি বলা যায়, চুক্তিতত্ত্ব কেবলমাত্র সাধারণের মঙ্গলের জন্য সামষ্টিক স্বার্থের পরিত্যাগ নয়, পাশাপাশি কীভাবে সার্বিক মঙ্গলকে সংরক্ষণ করা যায় তার উপলব্ধি।

প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থা থেকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও নিরাপদ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য হবস সমর্থন করেছেন চরম সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীভূত সরকারব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত। শক্তিই এখানে মূল ভিত্তি। হবস ম্যাকিয়াভেলির মতো সম্পূর্ণ জবাবদিহিপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন, যে সার্বভৌমকে তিনি সসীম ঈশ্বরের সম্মান দিয়েছেন সে শাক্তিকে দায়বদ্ধ রেখেছেন অসীম বা অমরণশীল ঈশ্বরের কাছে। এক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ঈশ্বর-কেন্দ্রিকতা থেকে তিনি পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে লোকায়ত শক্তির উত্থান তিনি ঘটিয়েছেন তা ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। হবসের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতি বিচারে বলা যায় তিনি পুঁজিবাদী সমাজের কর্তৃত্ববাদী শক্তির উত্থানকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। তাঁর রাষ্ট্র ও সার্বভৌম ক্ষমতা লকের রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বভৌম চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী নয়। লকের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সার্বভৌম অর্থনীতির বিনিময়মূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে স্থাপিত। বিত্তশালী জনগণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সার্বভৌম ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক। সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা জনগণ নিয়ন্ত্রিত হয় না। জনগণের ইচ্ছানুযায়ী সার্বভৌম পরিচালিত হয়। যার সাহায্যে ট্রাস্টের পরিবর্তন ঘটে। লকের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংসদীয় ব্যবস্থার উপস্থিতি রয়েছে। সংসদ সরকার ও সার্বভৌমের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করে। তাঁর সার্বভৌমত্ব ধর্মতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রথাগত ধারণার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে। যেমন, তিনি রাষ্ট্রকাঠামো ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রথাগত পরিবর্তন দ্বারা হবস অপেক্ষা ভিন্নভাবে সার্বভৌমকে উপস্থাপন করেছেন। সার্বভৌমত্বের একক প্রকৃতির সাথে সমন্বয় করেছেন এর বহুত্ববাদী কার্যপ্রণালীর। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি সমর্থন দ্বারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগসমূহের ক্ষমতার বিভাজন করেছেন, যা দ্বারা তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মাত্রাগত পৃথকীকরণকে সুযোগ করে দিয়েছেন। সার্বভৌমের ক্ষমতা সাংবিধানিক সরকার দ্বারা, সরকারের প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রুশোর রাষ্ট্র একটি নৈতিক প্রতিষ্ঠান যা গণমানুষের অভীপ্সা দ্বারা পরিচালিত। তাঁর সার্বভৌমত্ব গণসার্বভৌমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে তা আইনের তথা জবাবদিহিতার উর্দ্ধে নয়। আইন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে তার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, আবার সে কর্তৃত্বের সাহায্যে ব্যক্তিকে স্বীয় স্বাধীনতা প্রত্যার্পণে কাজ করে। রুশোর রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রাথমিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রকাশ পাওয়া যায়। গণঅভীপ্সার দ্বারা তাঁর গণসার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাঁর রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এক শক্তির কাছে নয়, সামষ্টিকের কাছে ন্যস্ত। তিনি কোনো নিরঙ্কুশ সার্বভৌত্বকে সমর্থন করেননি।

রাজনৈতিক সমাজে নাগরিকের স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রজা বা নাগরিকের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতীত যথার্থ রাজনৈতিক সমাজ গঠিত হতে পারে না। হবসের কাছে স্বাধীনতা হলো সাহস, প্রজ্ঞা এবং ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তিনি সার্বভৌমের কাছে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করেননি। জনগণ সার্বভৌমের ক্ষমতা মান্য করবে স্বীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। হবসের স্বাধীনতার ধারণার সাথে আইনের অনুশাসনের সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে আইন ব্যক্তির স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আবার আইনই ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতা সংকুচিত করেছে। তিনি নাগরিকের স্বাধীনতা এবং ভীতির প্রশ্নে তাদের নিরাপত্তার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এক্ষেত্রে স্বাধীনতা কম গুরুত্বপূর্ণ। সার্বভৌমের নির্দেশই আইন এবং জনগণ সে আইন মানতে বাধ্য। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে স্বাধীনতা নয় শক্তির ভয়ই উপজীব্য। তবে ক্ষমতার অপব্যবহার, অযাচিত হস্তক্ষেপ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে। হসব সমতা বলতে বুঝিয়েছেন প্রতিটি নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। তিনি ন্যায্যতাকে সমতা অর্থে নির্দেশ করেছেন। ন্যায্যতা কেবল কমনওয়েলথেই বিধান করা যায়। স্বাধীনতা এবং অধিকার উভয়ের উপভোগে সার্বভৌমের অনুমতি যুক্ত। হবস প্রজার আত্মরক্ষার্থে বিদ্রোহের অধিকার সমর্থন করেছেন।

লকের দর্শনে স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকারের ধারণা অপর দুজন চুক্তিবাদী অপেক্ষা বেশ স্পষ্ট ও জোরালো। তাঁর কাছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের জয়গান সূচিত হয়েছে। যার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। স্বাধীনতা তাঁর কাছে প্রাকৃতিক অধিকার, যা প্রকৃতির রাজ্য থেকেই ব্যক্তি উপভোগ করে। রাজনৈতিক সমাজ অধিকারসমূহকে সুরক্ষিত করতে কাজ করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির দরুন সৃষ্ট অসমতা লকের কাছে বৈধতা পেয়েছে, সম্পত্তির প্রশ্নে পুঁজিপতি বনাম পুঁজিহীন শ্রেণির দ্বন্দ্ব অমীমাংসিত রয়েছে। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ভূ-সম্পত্তিসম্পন্ন নাগরিকের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং ভূ-সম্পত্তিহীন, দরিদ্র জনগণের মর্যাদায় পার্থক্য দেখা যায়। সমতাকে তিনি কখনো প্রাকৃতিক আইনের সমার্থকরূপে আবার কখনো প্রাকৃতিক আইনের অনিবার্য শর্তরূপে উল্লেখ করেছেন। ভূমি, করারোপ, নিরপরাধীর ন্যায্যতা প্রাপ্তি, আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে হবস সমতাকে প্রয়োগ করেছেন। লক স্বাধীনতা বলতে যে-কোনো ধরণের স্বৈরাচারী, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থেকে মুক্তিলাভকে বুঝিয়েছেন। ব্যক্তির যদি স্বীয় জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকে তবে ব্যক্তি দাসত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মানুষের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হলো পৃথিবীর যে কোনো উচ্চতর শক্তির হাত থেকে মুক্তি। এক্ষেত্রে কোনো আইনগত কর্তৃত্বও তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে ব্যক্তির স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য লক ব্যক্তির অবাধ স্বাধীনতারও সমর্থক নন। সরকারের অধীনে ব্যক্তির স্বাধীনতা হবে এমন যেখানে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী ব্যক্তি পালন করবে এবং ইচ্ছার স্বাধীনতা ভোগ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

রুশোর রাজনৈতিক সমাজের প্রণেতা নাগরিকবৃন্দ। তাদের হাতে মূল ক্ষমতা। রুশোর রাষ্ট্রদর্শনে স্বাধীনতা রাজনৈতিক মুক্তির মূলমন্ত্র। স্বাধীনতা এবং সমতার ধারণা তাঁর দর্শনে সমান্তরালে চলে। শক্তি বা ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটাতে পারে স্বাধীনতা, সাধারণ ইচ্ছার কোনো হস্তান্তর হতে পারে না। ব্যক্তির ইচ্ছাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা শর্তাধীন করা যায় না, কারণ তাতে ইচ্ছা স্বাধীনতা হারিয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। রুশো হবসের মতো সার্বভৌমের অবিভাজ্য ক্ষমতার পক্ষে। সার্বভৌমের কাছে জনগণ স্বেচ্ছায় তাদের অধিকার এবং ক্ষমতা সমর্পণ করে সমাজ সৃষ্টি করছে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব স্ব ইচ্ছা সমাজে সাধারণ ইচ্ছার সাথে একীভূত হয়ে পড়ে। রুশোর কাছে স্বাধীনতা, সমতা ও অধিকার সমস্ত কিছুই গুরুত্ব পেয়েছে সামষ্টিক বা গোষ্ঠীস্বার্থের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সামষ্টিক স্বার্থ সংঘাতপূর্ণ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয়ের স্বার্থের সমন্বয় ঘটে, যেমন, রাষ্ট্রের অস্তিত্বশীলতার প্রশ্নে। যেক্ষেত্রে সমন্বয় সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে সামষ্টিক স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে। রুশো নাগরিকের স্বাধীনতা উপভোগের সাথে যুক্ত করেছেন তার স্ব স্ব দায়িত্ব-কর্তব্যপরায়নতার প্রতি। ব্যক্তির মধ্যে যখন প্রজ্ঞা, বৌদ্ধিকতার উন্মেষ ঘটে তখন ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয়। অন্যায্যতার শৃঙ্খলমুক্তি ঘটে।

সম্পত্তিতত্ত্ব ও ব্যক্তিমালিকানার ধরণ সংক্রান্ত চুক্তিবাদীদের আলোচনায় সতের শতকের পুঁজিবাদী বাজারসমাজের চালচিত্র ফুটে উঠেছে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি শ্রমের পারস্পরিক বেচাকেনার দ্বারা বাজার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যা বিশেষত লকের দর্শনে দৃশ্যমান। ব্যক্তিমালিকানাধীন শ্রমের বেচাকেনা পরবর্তীতে উদার পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইউরোপে কাজ করেছে। যদিও সার্বভৌমের কাছে চরম ক্ষমতা ন্যস্তকরণ দ্বারা বাজার অর্থনীতিতে পুঁজিপুতি শ্রেণির উত্থান এবং আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি হবসের কাছে যথার্থরূপে ধরা পড়েনি। লকের সম্পত্তিতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পণ্যরূপে শ্রমের বেচাকেনা বা বিনিময়, যা পরবর্তীতে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি তৈরিতে সাহায্য করে। লকের কাছে সম্পদের অসমতা স্বাভাবিকরূপে গৃহীত হয়েছে। রাজনৈতিক সমাজে অর্থের উপস্থিতি এ সমাজকে বাণিজ্যিক সমাজে পরিণত করে। লকের রাজনৈতিক সমাজের দায়িত্ব হয়ে ওঠে ব্যক্তি ও তার অর্জিত সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান। রুশোর সম্পত্তিতত্ত্বে প্রজাতন্ত্র ও সাধারণ ইচ্ছার লক্ষ্য ছিল ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যেকার সুশৃঙ্খল সম্পর্ক বজায় রাখা।

হবসের সম্পত্তিতত্ত্বে সার্বভৌম সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারিত হবে পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার দ্বারা। যার মূলভিত্তি হবে সমতা ও পক্ষপাতহীনতা। তবে কিছু ক্ষেত্রে তিনি বণ্টনমূলক নীতির আশ্রয় নিতে পারেন। সম্পত্তির অধিকার উপভোগের লক্ষ্যে নাগরিকেরও সার্বভৌমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে। একজন প্রজার সম্পত্তির অধিকার থাকার অর্থ হলো সে অপর প্রজার আধিপত্য থেকে মুক্ত কিন্তু সার্বভৌমের কর্তৃত্ব থেকে নয়। সার্বভৌম কমনওয়েলথের জনগণের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় সুবিধার সমবণ্টনের পরিবর্তে জনগণের প্রয়োজনসাপেক্ষে বণ্টনমূলক নীতির পরিবর্তনমূলক ন্যায্যতার মাধ্যমে সম্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। যদিও হবস মনে করেন সার্বভৌমের প্রধান কাজ জননিরাপত্তা বিধান করা, সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান নয়। সার্বভৌম কর্তৃক প্রজাদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয় তখন– যখন তা করা হয় রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্রজাদের সম্পত্তির পূর্ণ উপভোগের জন্য। হবসের সম্পত্তিতত্ত্ব ও ব্যক্তিমালিকানার ধরণ পর্যালোচনা করলে তাঁকে বুর্জোয়া শ্রেণির কট্টর প্রতিনিধিত্বকারী মনে হয় না, বরং কিছুটা উদারপন্থী ভাবধারা দৃশ্যমান।

লকের সম্পত্তিতত্ত্বে সম্পত্তির অবস্থান রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টির পূর্বে। প্রকৃতির রাজ্যের জনগণ তাদের সম্পত্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমাজ সৃষ্টি করে। সম্পত্তির সুরক্ষার্থে সরকার কাজ করে এবং আইন ও বিচার বিভাগকে ক্রিয়াশীল করে। তাঁর সম্পত্তিতত্ত্বে স্পষ্টতই পুঁজিবাদী শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। মালিক পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে শ্রমিক শ্রেণি ঘুঁটিরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পত্তির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নয়, ব্যক্তিগত মালিকানাই স্বীকৃত। লকের রাষ্ট্রদর্শনে সম্পত্তির অধিকার বিশেষভাবে সংবেদনশীল। এ অধিকারের সুরক্ষা প্রদানে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হলে সরকার নামক ট্রাস্টের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। লকের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে শ্রমের মূল্যমান স্বীকৃত হয়েছে এবং তিনি মনে করেন শ্রমই সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার বা মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে । সম্পত্তিতে ব্যক্তির শ্রমারোপের পূর্ব পর্যন্ত তা প্রকৃতিতে ঈশ্বরের দান যা উপভোগের অধিকার সকলের রয়েছে। ঈশ্বর প্রদত্ত সম্পত্তি ব্যবহার বা উপভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার প্রশ্ন থাকে না, এ পর্যন্ত তা সামষ্টিক অধিকার। শ্রম সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা স্থাপন করে। সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার সীমা নির্ধারণের প্রশ্নে কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অধিক সম্পদের মালিকানা দাবি করবে না। লকের এধরণের বক্তব্য থেকে প্রাথমিকভাবে একধরণের আদর্শগত অবস্থান পাওয়া যায়, যাতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কিছু না কিছু সম্পদপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। তথাপিও লক কর্তৃক সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির যে জয়জয়কার সূচিত হয়েছে তা সতেরো শতক থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক অর্থনীতিতে নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় কীভাবে অর্থনীতি রাজনীতির মুখ্য চালিকাশক্তি হয়েছে এবং অর্থনীতি রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সম্পত্তির মালিকানাকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপমুক্ত রেখে তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, বিপরীতদিকে সম্পদের অসম বণ্টনকেও প্রকারান্তরে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

রুশো সম্পত্তি বলতে বুঝিয়েছেন যা আইনগতভাবে অর্জিত এবং ব্যক্তি বৈধভাবে দাবি করতে পারে। তিনি মনে করেন অধিকারের সাথে শক্তির কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে না। ন্যায়সঙ্গতভাবে কোনো অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হলো সে অধিকারটি নৈতিক এবং আইনগত বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রুশোর অধিকার সম্পর্কিত ধারণা শক্তি বা জোরপূর্বক কোনো ব্যবস্থা নয়, বরং ন্যায়সিদ্ধতার দিকটি এতে গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায্যতার দিকটি গুরুত্ববহ এ কারণে যে একজনের অধিকার অপরের জন্যও প্রযোজ্য। কোনো অধিকার যখন একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন তার প্রয়োগ ব্যক্তির স্বীয়ক্ষেত্রে যতটা উপকারী এবং প্রয়োজনীয় একইভাবে অন্যদের ক্ষেত্রেও উপকারী ও প্রয়োজনীয়। অধিকারের এধরণের চেতনা মানুষকে সামষ্টিকতার স্বার্থে পরিচালিত করে, যা সামাজিক যুথবদ্ধতার রূপ নেয়। সামাজিক চুক্তিতে ব্যক্তির একক অধিকার যূথবদ্ধ অধিকারে রূপান্তরিত হয়। অধিকারের সম্মিলিত প্রকাশ ব্যক্তির একক অধিকারকে যেমন নিরাপত্তা দেয় তদ্রুপ সমাজে বসবাসরত গোষ্ঠীর অধিকারকেও নিরাপত্তা দেয়। ব্যক্তির একক আনন্দ-বেদনা সমগ্র গোষ্ঠীকে তাড়িত করে আবার গোষ্ঠীর আনন্দ-বেদনা ব্যক্তিকে ছুঁয়ে যায়। এভাবে রুশো সম্পত্তিতত্ত্বে ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণ করেছেন। ব্যক্তি তার স্বীয় স্বার্থে সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে গোষ্ঠীগত স্বার্থকে গুরুত্ব দেয়। এতে আপাতদৃষ্টে ব্যক্তিস্বার্থ সংরক্ষিত না হলেও গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থে ব্যক্তি অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থাসমূহ হতে উত্তরণ ঘটাতে পারে। একজনের অধিকার অপরের সাথে সংযুক্ত বিধায় ব্যক্তি গোষ্ঠীর সর্বোচ্চ মঙ্গলার্থে কাজ করে। ব্যক্তি সম্পত্তির কোনো একক মালিকানার দাবিদার না হয়ে সমাজের গোষ্ঠীর জন্য সামষ্টিকভাবে মালিকানা দাবি করে। ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি সামষ্টিকভাবে পরিচালিত হয় এবং নিরাপত্তা প্রদত্ত হয়। সম্পত্তির প্রতি মালিকানার ক্ষেত্রে এমন এক দায়বদ্ধতা চলে আসে যাতে ব্যক্তি এবং সমাজ সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে বা স্বার্থে পরস্পর একত্রে কাজ করে।

যদিও বেন্থাম, হিউম প্রমুখের পরে কেউ কেউ সামাজিক চুক্তি মতবাদের অসাড়তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন তথাপিও একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রের অধিকারের যুক্তিরূপে সামাজিক চুক্তি টিকে আছে। সামাজিক চুক্তি রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে এমন এক রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে যার সাহায্যে ব্যক্তি এবং সমাজের তথা গোষ্ঠীর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশ এবং প্রয়োজনীয়তার একপ্রকার রাজনৈতিক ও নৈতিক মেলবন্ধন ফুটে উঠে। রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিচারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ কেবল একটি রাজনৈতিক-দার্শনিক মতাদর্শই চিত্রিত করে না, পাশাপাশি এর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট নৈতিক ব্যঞ্জনা রয়েছে তার বিশ্লেষণ পাওয়া যায় চুক্তিবাদীদের লেখনীতে। সামাজিক চুক্তিতত্ত্বে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবরূপে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির চরিত্রের ভিন্নতা, ব্যক্তি ও সরকারের পারস্পরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব, রাজনৈতিক সত্তারূপে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিবিধরূপ লাভ করা সত্ত্বেও নৈতিকতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্তি, সাধারণ নীতমিলা মান্য করতে সম্মত হওয়া, পারস্পরিক সহিংসতা কিংবা অন্য কোনো ক্ষতি তথা বিপদ থেকে রক্ষা পেতে দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ চুক্তিতত্ত্বের আলোকে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডে মূল্যায়িত হতে পারে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ আমাদের একটি বিষয়ে স্পষ্টতা প্রদান করে যে রাজনৈতিক জনরায় অবশ্যই সম্মতি থেকে উদ্ভূত হতে হবে, যা মূলত রাজনৈতিক এবং নৈতিকতার সম্মিলন বলে হবসের লেখনীর বিভিন্ন পর্যায়ে চিত্রিত হয়েছে। চুক্তিবাদীদের প্রাক-রাজনৈতিক সমাজের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি ব্যক্তির জীবনের জন্য সন্তোষজনক নয়। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক শাসন তথা সরকার, সার্বভৌম, আইনব্যবস্থা ইত্যাদির অনুপস্থিতি ব্যক্তির নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য সহায়ক ও কল্যাণকর নয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদ এটাও নির্দেশ করে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থ এবং স্বাধীনতাকে কীভাবে রাজনৈতিক অন্যান্য সুবিধাদি উপভোগের জন্য সংকুচিত করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতার বিনিময়ে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাকে গ্রহণ করে। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে আইন এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলার আর্বিভাব প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্য সৃষ্ট।

সামাজিক চুক্তির আর্বিভাব ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর যে কোনো পরিসরে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে জনসম্মতির সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি তুলে ধরে। একইসাথে একটি চুক্তিবাদী ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিবাদীগণ জনগণ কর্তৃক বিপ্লবের অধিকার সমর্থন করেছেন যা আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক সমাজের সভ্যরূপে ব্যক্তি যখন নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে তখন ব্যক্তির মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং আপাত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সরকারব্যবস্থায় গোড়াপত্তন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টেনে ধরে, সামষ্টিক স্বার্থের প্রতি মনোনিবেশ করে, সার্বভৌমত্বের তথা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারনার প্রসার ঘটায়। মানুষের পারস্পরিক অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণসমূহ আইনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সার্বভৌমকে অটুট রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রকৃতির রাজ্যের জনগণের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতাপরায়ণ মনোভাব তা রাজনৈতিক সমাজে লুপ্ত হয়নি। বরং পূর্বের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার বলয় থেকে শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের মানসিকতা সংক্রমিত হলো রাষ্ট্র বনাম রাষ্ট্রে, জাতি বনাম জাতিতে। সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের যে সুদীর্ঘকালের সংগ্রাম ও প্রয়াস সমকালীন যুগের সেসব কিছুর অস্তিত্বশীলতা ও বৈধতা কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠেছে স্বৈরাচারী, বলপ্রয়োগকারী, নৈরাজ্যবাদী আচরণে। সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও সরকারব্যবস্থার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য। তবে সে আইন যদি মব ভায়োলেন্স হয়ে ওঠে তা জননিরাপত্তার জন্য অশনিসংকেত।

ব্যক্তি এবং জনগণের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রের যে হস্তক্ষেপ সামাজিক চুক্তিতে বৈধ ছিল কালের পরিক্রমায় রাষ্ট্রের অধিকার চর্চায় এসকল ক্ষেত্র নতুনভাবে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্র কি ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা প্রদানের নামে তার স্বাধীনতা ও অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে? রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে ভিন্নমতকে দমন করবে? আবার ভিন্নমত প্রকাশের অজুহাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও সার্বভৌমের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ফেলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কি গ্রহণযোগ্য? সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কি স্বৈরাচারিতা নাকি স্বাধীন মতপ্রকাশের প্রতি হুমকিরূপে চিহ্নিত হবে? ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তার তাগিদে রাজনৈতিক সমাজের আর্বিভাব ঘটলেও বর্তমানে নাগরিকের তথা ব্যক্তির জীবনের বিনিময়ে শাসকের ক্ষমতাসীন থাকাটা চুক্তিতত্ত্বের শর্তের বিরোধী। কেবল রাজনৈতিক আনুগত্য কিংবা অর্থনৈতিক ক্ষমতা নয়, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সংহতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সামষ্টিক মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় একাত্মতা, দেশপ্রেমের চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়ে নাগরিকের স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সফলভাবে সম্পাদন অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যরূপে নাগরিকের উচিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, যৌক্তিক অনুশাসনের সাথে নৈতিকতার সংমিশ্রণে রাজনৈতিক ক্ষমতার গতিপথ নির্ধারণ করা।

সামাজিক চুক্তিবাদে ব্যক্তির ঐচ্ছিক পছন্দ বা নির্বাচন বা সম্মতি প্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমে রাজনৈতিক ন্যায্যতার বিষয়টি বিবেচিত হয়। যেহেতু ঐচ্ছিক সম্মতির বিষয়টিতে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ প্রণিধানযোগ্য, ফলে সামষ্টিক কল্যাণ এবং স্বার্থসমূহ স্বল্পরূপে প্রাধান্য পায়। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের যেমন প্রয়োজন আছে পাশাপাশি প্রয়োজন কমিউনিটারিয়ানিজমের। কমিউনিটির নৈতিক তাৎপর্য ও সুনির্দিষ্ট অধিকার রাজনৈতিক জীবনকে মসৃন, সুশৃঙ্খল ও টেকসই করতে সাহায্য করে। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচিতি তৈরি হয় কিংবা গড়ে ওঠে তার পারিপার্শ্বিক কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে। চুক্তিতত্ত্বকে কেবলমাত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী বা উগ্রজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা একপাক্ষিক। তার পরিবর্তে বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সামষ্টিকতাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের সমন্বয় চুক্তিবাদকে আরো সুদৃঢ় ভিত্তি দিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

A. John, Simmons, "Tacit Consent and Political Obligation", *Philosophy & Public Affairs 5*, Vol. 5, Spring, 1976.

Apeldoorn, Laurens Van, "Hobbes on Poperty: Between Legal Certainty and Sovereign Discretion", *Hobbes Studies*, Vol. 34, 2021.

Aquinas, Thomas, *Summa Theologica II*, a question 94, arts. 1-4 in Twenty Great Books of the Western World, W. Benton, Chicago, 1952.

Austin, John, *Lectures On Jurisprudence Or The Philosophy Of Positive Law*, Part.1, Lec. I, Sec.2, R. Camp (ed.), Henry Holt and Company, New York, 1875, Harvard University, 2005.

Bardin, Andrea, "Materialism and Right Reason in Hobbes's Political Treatises: A Troubled Foundation for Civil Science", *History of Political Thought*, Vol. XL, No. 1, Spring, 2019.

Barker, Ernest, *Essays in Social Contract: Locke, Hume & Rousseau*, Oxford University Press, London, 1982.

_______, *The Politics of Aristotle*, The Clarendon Press, Oxford, 1961.

Berlin, Sir Isaiah, "Two Concepts of Liberty" in *Political Philosophy*, Anthony Quinton (ed.), Oxford University Press, London, 1969.

Bertman, Martine A., "Equality in Hobbes, with Reference to Aristotle", *The Review of Politics*, Vol. 38, No. 4, Cambridge University Press, 1976. https://www.jstor.org/stable /1406416

Barzel, Y., *Economic Analysis of Property Rights*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

Baumgold, Deborah, *Hobbes Political Theory*, Cambridge University Press, New York, 1988.

Billing, Andrew Geoffry, "Rousseau's Critique of Market Society: Property and Possessive Individualism" in *The Discours Sur L'Inégalité*, Journal of European Studies, Vol. 48, Issue 1. 2018. https://doi.org/10.11771004/24417744090

Bird, Colin, *An Introduction to Political Philosophy*, Cambridge University Press, New York, 2008.

Bluhm, William T., *Theories of the Political System; Classics of Political Thought and Modern Political Analysis*, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1965.

Broome, J. H., *J. J. Rousseau: A Study of His Thought*, Edward Arnold Ltd., London, 1963.

Calvin, John, Institutes of the Christian Religion, S. C. M. Press Ltd., 1960.

Carbonneau, Thomas E., "The Implicit Teaching of Utopian Speculations: Rousseau's Contribution to the Natural Law Tradition", *Penn State Law e-library*; Vol. 3:123, 3U. Puget Sound L. Rev., 1979, p. 131. http://elibrary.law.psu.edu/fac-works

Carlyle, A. J., *Political Liberty. A History of the Conception in the Middle Ages and Modern Times*, Routledge, London, 2019.

Dhaka University Institutional Repository

Carritt, Edgar F., *Ethical and Political Thinking*, Oxford University Press, 1947.

_______, "Liberty and Equality" in Political Philosophy, Anthony Quinton (ed.), Oxford University Press, Oxford, 1969.

Cartland, Ronald, "Why am I a Democrat?", Law Quarterly Review, Vol. 56, 1940.

Cobban, Alfred, *Rousseau and The Modern State*, in Routledge Library Edition: 18th Century Philosophy, Ch. 6, Routledge, London, 2019.

Connoly, William E., *Political Theory and Modernity*, Cornell University Press, Ithaca, 1993.

Cranston, Maurice, *John Locke and Government by Consent*, David Thompson (ed.), *Political Ideas*, Watts, London, 1966.

Curran, Eleanor, "An Immodest Proposal: Hobbes Rather than Locke Provides A Forerunner for Modern Rights Theory", Vol. 32, No. 4, Springer: *Law and Philosophy*, 2013.

_______, *Locke on Politics, Religion and Education*, The Macmillan Company, New York, 1965.

D'Entrves, A.P., *Natural Law: An Historical Survey*, 2nd Edition, Harper and Row, London, 1965.

Duke, George, "Law and Philosophy", Vol. 33, No. 5, Springer Nature, 2014.

Dunn, John, *Rethinking Modern Political Theory*, Cambridge University Press, New York, 1985.

Dworkin, Richard, "Equality of Resources", in Rosen M. & J. Wolf (eds.), *Political Thought*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Dworetz, Steven M., *The Unvarnished Doctrine: Locke Liberalism, and the American Revolution*, Duke University Press, Durham, 1994.

Ebenstein, W. (ed.), *The Republic* of Plato in *Great Political Thinkers: Plato to the Present*, 4th Edition, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1969.

Entreves, A. P., *Natural Law: An Introduction to Legal Philosophy*, Eighth Printing, Transaction Publishers, New Jersey, 2009.

_______, *The Case for Natural Law Re-Examined*, University of Notre Dame, Natural Law Forum, 1968.

Ernest, Barker, *Greek Political Theory: Plato and His Predecessors*, Revised Edition, Barnes & Noble Inc., New York, 1947.

Fellman, D., *Ideology and Modern Politics*, New York, 1971.

Frazer, Michael, "The Modest Professor: Interpretive Charity and Interpretive Humanity in John Rawls' Lectures on the History of Political Philosophy," *European Journal of Political Theory*, 2010. https://doi.org/10.1177/1474885109355968

Gauthier, David P., *The Logic of Leviathan: The Moral and Political Theory of Thomas Hobbes*, Clarendon Press, Oxford, 1969.

_______, *Logic*, in Andrew Hacker, *Political Theory: Philosophy, Ideology, Science*, Macmillan, New York, 1961.

Gencer, Bedri, "Sovereignty and the Separation of Powers in John Locke", *The European Legacy*, Vol. 15, No. 3, 2010.

Dhaka University Institutional Repository

Gierke, Otto and Barker, Ernest, *Natural Law and the Theory of Society,* Ernest Barker (trans.), Reprint, The Law Book Exchange Ltd., 2001.

Goodin, Robert E. & Pettit, Philip (eds.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Blackwell Publishers, Oxford, 2007.

Goldsmith, M. M., “Hobbes On Law”, in The Cambridge Companion to Hobbes, Sorell, Tom (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

_______, “Hobbes On Law”, in The Cambridge Companion to Hobbes, Sorell, Tom (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Gough, Jonathan Wolf, John Locke’s Political Philosophy, Eight Edition, Clarendon Press, Oxford, 1968.

_______, *John Locke’s Political Philosophy*, Eight Studies, The Clarendon Press, Oxford, 1968.

Gramsci, Antonio, “State and Civil Society” in *Selections from the Prison Notebooks,* Quintin House and Geoffrey Nowell Smith (eds. and trans.), Orient Longman, India, 1998.

Green, T. H., *Principles of Political Obligation,* The Law Book Exchange Ltd., Clark New Jersy, 2005.

Gregor, Mary (trans and ed.), *Immanuel Kant: Practical Philosophy,* Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

Griffith, Mark F., “John Locke's Influence on American Government and Public Administration”, *Journal of Management History,* Vol. 3, No. 3, Emerald Group Publishing Limited, 1997.

Grimsley, Ronald, *The Philosophy of Rousseau*, Oxford University Press, London, 1973.

Grunebaum, James O., *Private Ownership,* Routledge and Kegan Paul, London, 1987.

Hampton, Jean, “Contract and Consent”, in *Companion to Contemporary Political Philosophy*, Robert E. Goodin, Philip Pettit, Thomas Pogge (eds.), Blackwell Publishing, Cambridge, 2007.

Hardin, Russell, “Hobbesian Political Order”, Vol. 19, No. 2, Sage Publications, 1991, p.156.

Harrington, James, *The Commonwealth of Oceana and a System of Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

Hart, H. L. A., *The Concept of Law,* Third Edition, Oxford University Press, Oxford, 2012.

Hegel, G. W. F., *Philosophy of Right*, T. M Knox (trans.), Clarendon Press, Oxford, 1952.

Hendel, Charles W. (ed.), *Citizen of Geneve: Selections from the Letters of Jean Jacques Rousseau*, Oxford University Press, New York, 1937.

Herzog, Don, *Happy Slaves: A Critique of Consent Theory,* University of Chicago Press, Chicago, 1989.

Hobbes, Thomas, *De Cive: On the Citizen*, R. Tuck and M Silver Thorne (Eds. and Trans.), Cambridge University Press, Cambridge, Reprint, 2003.

Dhaka University Institutional Repository

_______, *Leviathan*, A. P., Martinich, and B., Battiste, (eds.), Revised Edition, Broadview Edition, Canada, 2011.

_______, *The Elements of Law: Natural and Politic*, Gaskin JCA (ed.), Reprint, Oxford University Press, 1999.

Hocutt, Max, "Compassion Without Charity, Freedom Without Liberty: The Political Fantasies of Jean-Jacques Rousseau", The Independent Review, Vol. 8, No. 2, 2003. https://www.jstor/stable/24562684

Hood, FC., *The Divine Politics of Thomas Hobbes: An Interpretation of Leviathan*, Clarendon Press, Oxford, 1964.

https://doi.org/10.1177/0090591791019002002

Hye, Hasnat Abdul, *Governance: South Asian Perspective,* Dhaka University Press, Dhaka, 2000.

Jones, W. T., *Masters of Political Thought: Machiavelli to Bentham*, Reprint Edition, Vol. 2, Houghton Mifflin Co., 1966.

Jouvenel, Bertrand de, *Sovereignty: An Inquiry into the Political Good,* Huntington, J. F. (trans.), Cambridge University Press, Cambridge, 1957.

Kahn, Victoria, "Hobbes, Romance, and the Contract of Mimesis," in *Political Theory,* Vol. 29, No. 1, Sage Publications Inc., New York, 2001. https://www.jstor.org/stable/3072541

Keith, Thomas, "The Social Origin's of Hobbes Political Thought" in *Hobbes Studies,* Keith C. Brown (ed.), Basil Blackwell, Oxford, 1965.

Kendall, Willmoore, *John Locke and the Doctrine of Majority-Rule,* University of Illinois Press, Urbana, 1959.

Klosko, George, '*Multiple Principles of Political Obligation*', *Political Theory*, Vol. 32, No. 6, Sage Publications Inc., 2004. https://www.jstor.org/stable/414816

_______, *The Principle of Fairness and Political Obligation*, New Edition, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham, UK, 1992.

Kropotkin, Peter, *Law and Authority*, Reprint in The Anarchist Reader, Creative Media Partners, LLC, 2022.

Lamprecht, Sterling P., "Hobbes and Hobbism", *The American Political Science Review*, Vol. 34, 1940.

Lloyd, S. A., *Ideals as Interests in Hobbes's Leviathan: The Power of Mind Over Matter,* Cambridge University Press, 1992.

Locke, John, *A Letter Concerning Toleration,* Hackett Publishing Co., Indianapolis, 1983.

_______, *An Essay Concerning Human Understanding,* abridged and edited with an introduction by A. D. Woozley, New American Library, New York, 1974.

_______, *Two Treatises of Government*, 2nd Edition, Peter Laslett (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1967.

Lopata, Benjamin B, "Property Theory in Hobbes", *Political Theory,* Vol. 1, No. 2, Sage Publications, 1973.

Macfarlane, L. J., *Modern Political Theory*, Thomas Nelson and Sons Ltd., London, 1970.

Dhaka University Institutional Repository

Machiavelli, Nicolo, *The Prince,* World's Worth References Ltd., London, 1993.

Macpherson, C. B., "The Social Bearing of Locke's Political Theory" in *Western Political Quarterly*, Vol. VII, No. 1, 1988.

Maritain, Jacques, *The Rights of Man and Natural Law,* D. Anson (Trans.), Scribner, New York, 1943.

Margaret, Mead, "Some Anthropological Considerations Concerning Natural Law", *Natural Law Forum*, Vol. 6, University of Notre Dame Law School, 1961.

Marks, Jonathan, "The Savage Pattern: The Unity of Rousseau's Thought Revisited" *Polity*, Vol. 31, No. 1, Autumn, 1998.

Marx, K, Engels, F, and Lenin, V. I., *Engle's Speeches in Elberfeld*, rep. in *On Communist Society,* Progress Press, Moscow, 1974.

Marx, Karl & Engels, Frederich, *Collected Works*, Vol. 4, Progress Publishers, Moscow, 1975.

Marx, Karl, *Capital*, Vol. 1, Progress Publishers, Moscow, 1986.

McDonald, F., *Novus Ordo Seclorum: The Intellectual Origins of the Constitution,* University Press of Kansas, Lawrence, Kans, 1985.

McNeilly, F. S., *The Anatomy of Leviathan,* St. Martin's Publications, New York, 1968.

McPherson, C.B., *The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke,* Reprint, Oxford University Press, Oxford, 2011.

Melzer, Arthur M., "Rousseau's Moral Realism: Replacing Natural Law with the General Will", Vol. 77, Issue. 3, Cambridge University Press, 1983. https://doi.org/10.2307/1957264

_______, *The Natural Goodness of Man: On the System of Rousseau's Thought*, University of Chicago Press, Chicago, 1990.

Mintz, Samuel I, *The Hunting of Leviathan*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970.

Mill, David Van, "Civil Liberty in Hobbes's Commonwealth", *Australian Journal of Political Science*, Vol. 37, Issue 1, 2002.

_______, "Hobbes' Theories of Freedom", *The Journal of Politics,* University of Chicago Press, Chicago, Vol. 57, No. 2, 1995.

Munzer, Stephen R., *A Theory of Property,* Cambridge University Press, New York, 1990.

Murphy, Joseph S., *Political Theory: A Conceptual Analysis,* The Dorsey Press, Illinois, 1968.

Neuhouser, Frederick, "Freedom, Dependence and the General Will" *The Philosophical Review*, Vol. 102, No. 3, July, 1993.

Nicholls, Sophie, Sovereignty and Government in Jean Bodin's *Six Livres de la* République (1576),' Journal of the History of Ideas, Vol. 80, No. 1, University of Pennsylvania, 2019.

Noone, John B. (Jr.), "Rousseau's Theory of Natural Law as Conditional", *Journal of the History of Ideas*, Vol. 33, No.1, University of Pennsylvania Press, 1972.

Dhaka University Institutional Repository

Nowakowski, Piotr I., "The Natural Law in Jean-Jacques Rousseau's Philosophy and its Social and Pedagogical Consequences", The Catholic University of Eastern Africa, CUEA International Symposium, Kenya, Nairobi, 2010.

Newman, Jeremiah, *Conscience Versus Law: Reflections on the Evolution of Natural Law*, Franciscan Herald Press, Chicago, 1971.

Nozick, Robert, *Anarchy, State and Utopia*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 1999.

Oakeshott, Michael, "Introduction to Leviathan" in *Hobbes On Civil Association*, University of California Press, Berkeley, 1975.

Okin, Susan Moller, "The Sovereign and His Counsellors: Hobbes's Reevaluation of Parliament" in *Hobbes' Political Theory*, Deborah Baumgold, 1982.

Olsthoorn, Johan, "Hobbes on Justice, Property Right and Self-Ownership", *History of Political Thought*, Vol. 36, No. 3, 2015.

Peters, Richard, *Hobbes*, Penguin, London, 1956.

Pettit, Philip, "*Liberty and Leviathan*", Vol. 4, Issue. 1, Sage Journals Publications Ltd., London, 2005. https://doi.org/10.1177/1470594x05049439

_______, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Pennock, J. R., "Hobbes's Confusing "Clarity"- The Case of "Liberty"," *The American Political Science Review*, Vol. 54, No. 2, June, *American Political Science Association*, 1960.

Plamenatz, John, *Man and Society*, Vol. 1, Longmans, 1963.

Plato, *The Statesman*, Translated by J.B. Skemp, Martin Ostwald (ed.), Bobbs-Merrill Company, Indiana Polis, New York, 1957.

Putnam, R. D., Leonardi, R. and Nanetti, R. Y., *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*, NJ Princeton University Press, Princeton, 1993.

Quinton, Anthony (ed.), Political Philosophy, Oxford University Press, London, 1969.

R. Ashcraft, "Hobbes's Natural Man: A Study in Ideology Formation", *The Journal of Politics*, Vol. 33, No. 4, The University of Chicago Press on behalf of the Southern Political Science Association, 1971. https://doi.org/10.2307/2128422

Rapaczynski, Andrez, *Nature and Politics: Liberalism in the Philosophy of Hobbes*, Locke and Rousseau, Cornell University Press, Ithaca, 1987.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, rev. ed. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999.

_______, *Justice As Fairness: A Restatement*, Erin Kelly (ed.), Harvard University Press, USA, 2001.

_______, *Lectures on the History of Political Philosophy,* Samuel Freeman (ed.), Harvard University Press, Cambridge, MA, 2007.

Replogle, Ron, "Natural Rights and Distributive Justice: Nozick and the Classical Contractarians," *Canadian Journal of Political Science*, Vol. 17, No. 1, 1984. https://www.jstor.org/stable/3227654

Dhaka University Institutional Repository

Riley, Patrick, *The General Will Before Rousseau: The Transformation of the Divine into the Civic,* Princeton University Press, Princeton, 1986.

_______, "A Possible Explanation of Rousseau's General Will", *The American Political Science Review,* Vol. 64, No. 1, 1970. https://doi.org/10.2307/1955615

_______, "Rousseau's General Will: Freedom of a Particular Kind", *Political Studies,* Vol. 39, Issue 1, 1991. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1991.tb00581.x

Rohr, J. A., *To Run a Constitution: The Legitimacy of the Administrative State*, University Press of Kansas, Lawrence, Kans, 1986.

Rosen, M. & Wolf, J. (ed.), *Political Thought*, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Rothstein, B., "Trust and Social Capital" in *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Second Edition, Vol. 2, R. E. Goodin, P. Pettit & T. Pogge (eds.), Blackwell Publishers, 2007.

Rousseau, Jean Jacques, *A Discourse on Inequality*, Maurice Cranston (ed.), Penguin Books, England, 1984.

_______, *A Discourse on Political Economy*. http: //www.constitution.org/jir/polecon.html

_______, *Constitutional Project for Corsica*, Kessinger Publishing, 2004.

_______, *Considerations on the Government of Poland and On its Proposed Reformation,* April, 1772 (completed but not published). www.isn.ethz.ch http://www.consititution.org/jjr/poland.html

_______, *Discourse on the Origin of Inequality,* Donald A Cress (trans.), Indianapolis, Cambridge, 1992.

_______, Emile, Barbara Foxley (trans.), Everyman Library, No. 518, J. M Dent and Sons Ltd., London, 1911.

_______, *The Collected Works of Rousseau: Discourse On Political Economy,* Jean Seine (trans.), United States, 2023.

_______, *The Social Contract*, Maurice Cranston (trans.), Penguin Books, 1968.

_______, "Discourse on the Arts and Sciences", Translated by G. D. H. Cole, International Relations and Security Network: Primary Resources in International Affairs. www.isn.ethz.ch http://oll.libretyfund.org/

Russell, Bertrand, *History of Western Philosophy*, Routledge, London, 1995.

Sabine, George H., *A History of Political Theory,* Revised by Thomas Landon Thorson, 4th Edition, IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi: Oxford, 1973.

Sartori, G. G., "Constitutionalism: A Preliminary Discussion", *American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4, 1962.

Sartre, Jean Paul, Being and Nothingness, Routledge, New York, 2018.

Schlatter, Richard, *Private Property: the History of an Idea,* George Allen & Unwin, London, 1973.

Scott, John T., "Politics as the Imitation of the Divine in Rousseau's Social Contract," *Polity*, Vol. 26, No. 3, 1994.

Sevel, Michael, "Hobbes: Patriarch of Legal Positivism, or Reinventor of Natural Law?" in *The Bloomsbury Companion to Hobbes,* S. A. Lloyd (ed.), Continuum Press, London, 2012.

Simmons, A. John, *Moral Principles and Political Obligations*, Princeton University Press, New Jersey, 1979.

Singh, Raghuveer, "John Locke and the Idea of Sovereignty", *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 20, No. 4, 1959. https://www.jstor.org/stable/42743527

Skinner, Quentin, *Visions of Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Smith, George H., "Negative and Positive Liberty: Some Historical Reflections". https://www.liberlarianism.org/publications/essays/excursions/negative-positive-liberty-some-historical-reflections.

Sommerville, Johann P., *Hobbes & Absolutism*, in *The Oxford Handbook of Hobbes* A.P., Martinich, and K., Hoekstra, (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2016.

_______, *Thomas Hobbes: Political Ideas in Historical Context*, Macmillan Press Ltd., London, 1992.

Starobinski, Jean, *Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction,* University of Chicago Press, Chicago, 1988.

SteinBerger, P. J., "Hobbes, Rousseau and the Modern Conception of the State", *The Journal of Politics,* Vol. 70, No. 3, July, 2008. https://doi.org/10.1017/s002238/60808064x

Stephen, Sir James Fitzjames, *Liberty, Equality and Fraternity*, Holt & Williams, New York, 1878, R. J. White (ed.), Cambridge University Press, 1967.

Strauss, Leo, "On the Intention of Rousseau", *Social Research,* Vol. 14, No. 4, The Johns Hopkins University Press, 1947.

_______, *The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Genesis*, University of Chicago Press, Chicago, 1963.

Stumpf, Samuel E., *Socrates to Sartre: A History of Philosophy,* 2nd Edition, McGraw-Hill Book Company, U.S.A. 1975.

Taylor, E., "The Ethical Doctrine of Hobbes", in K. C. Brown (ed.), *Hobbes Studies*, Harvard University Press, Cambridge, 1965.

Thomson, David (ed.), *Political Ideas,* Penguin Books, Harmondsworth, 1969.

Untersteiner, MR., *The Sophists,* Blackwell Publishing, UK, 1954.

Vallentyne, Peter, *Contractarianism and Rational Choice: Essays on David Gauthier's Morals By Agreement*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

Vaughan, C.E. (ed.), *The Political Writings of Jean Jacques Rousseau,* Vols. 1, 2, John Wiley & Sons. Inc., New York, 1962.

_______, *Studies in the History of Political Philosophy before and after Rousseau*, Manchester University Press, 1935, Published online by Cambridge University Press, 2009.

Dhaka University Institutional Repository

Waldman, Theodore, 'A Note on John Locke's Concept of Consent', *Ethics*, Vol. 68, No.1, University of Chicago Press, Oct. 1957.
Waldron, Jeremy, *The Right to Private Property*, Oxford University Press, Oxford, 1988.
Warner, J.M. & Zink, J.R., "Therapeutic Politics: Rawls's Respect for Rousseau", *The Review of Politics*, Vol.78, University of Notre Dame, 2016.
Warrender, Howard, *The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of Obligation*, Clarendon Press, Oxford, 1970.
Watt, E. D., "Rousseau Rechaufee– Being Obliged, Consenting, Participating, and Obeying only Oneself", *The Journal of Politics,* Vol. 43, No. 3, 1981. https://doi.org/10.2307/2130633
Winch, Peter, "Man and Society in Hobbes and Rousseau" in *Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays,* Cranston M. W., and Peter R. S. (eds.), Anchor Books, Garden City, N. Y., 1972.
Watkins, John W. N., "Liberty" in *Hobbes and Rousseau: A Collection of Critical Essays*, Cranston, M. W., and Peter, R. S. (eds.), Anchor Books, New York, 1972.
_______, *Hobbes's System of Ideas: A Study in the Political Significance of Philosophical Theories,* Hutchinson University Library, 2nd Edition, London, 1973.
West, Thomas G., *Vindicating the Founders: Race, Sex, Class and Justice in the Origins of America*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, 1997.
Wolff, Jonathan, *An Introduction to Political Philosophy,* Revised Edition, Oxford University Press, New York, 2006.
Wootton, David (ed.), *The Selected Political Writings of John Locke,* Mentor, New York, 1993.
Zagorin, Perez, *Hobbes and the Law of Nature*, Princeton University Press, 2004.

করিম, সরদার ফজলুল (অনূ.), *রুশোর সোশ্যাল কনট্রাক্ট*, ৩য় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।
খান, সলিমুল্লাহ, *রাষ্ট্রসমাজের উৎপত্তি : জন লকের সঙ্গে বিচার*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১।
"বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা, গণতান্ত্রিক আইন ও সংবিধান আন্দোলন", ২য় মুদ্রণ ২০১৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বিডিনিউজ২৪.কম, ৭ জুলাই, ২০১৪। https://opinion.bdnews24.com
ভৌমিক, ননী (অনূ.), *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস*, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, অবসর প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।
মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্ত কুমার, *বাংলাদেশের সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম,* অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।
রশীদ, হারুন, "বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক সংকট: রাষ্ট্রদার্শনিক ও নীতিদার্শনিক বিশ্লেষণ", *নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা* (২০১১-২০২০), খণ্ড ১, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২০।
রায়, ড. প্রদীপ (অনূ.), *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬।
রাষ্ট্রচিন্তা, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, অক্টোবর ২০১৭।
দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ১৩ ও ২৫ মে, ২০১৯।
সেন, নির্মল কুমার, *রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস*, ৩য় মুদ্রণ, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

স্যাবাইন, জর্জ এইচ. (মূল), *রাজনৈতিক তত্ত্বের ইতিহাস*, হিমাংশু ঘোষ (অনূ.), ৩য় সংস্করণ, বিশ্বাস বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল, "নৈতিক চেতনা ও বাংলাদেশের বিকাশশীল বাস্তবতা", *নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা*, নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০২০।

হক, এ. এ. এম. আতাউল (অনূ.), *গেটেলের রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ইতিহাস*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।